বিপিন বিহারী গুপ্ত

বিদ্যাভারতী ● ৮-সি, ট্যামার লেন, কলিকাতা-নয়

দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পর্কে প্রকাশকের নিবেদন

'পুরাতন প্রসঙ্গ'-এর 'বিশ্বভারতী সংস্করণ' বাহির হইবার পর বিদগ্ধ পণ্ডিত-সমাজের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহাদের কারোর কারোর পরামর্শ মত কোঁৎ (Comte)-এর ধ্রুবদর্শন (Pcsitivism) সম্পর্কে লেখকের সহিত আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এই সংস্করণে যুক্ত করা হইল। এই আলোচনা ইতিপূর্বে 'আর্যাবর্ত' মাসিক পত্রিকার বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩১৯ এবং আষাঢ় ১৩২০ সংখ্যায় ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই সংস্করণে 'সংশোধন ও সংযোজন' অধ্যায়ে আরো অনেক তথ্য ও টীকা সংযোজিত হইয়াছে। এই অবসরে আমরা সম্পাদক শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। সম্পাদনার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য শ্রীমতী দীপান্বিতা গুপ্ত ও অধ্যাপিকা শ্রীমতী গীতা গুপ্ত (সাহিত্যভারতী)-কে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

চৌদ্দ পৃষ্ঠার সম্মুখস্থ গ্রুপ ফটোর 'অজ্ঞাত' ব্যক্তির সনাক্তকরণ করা সম্ভবপর হইয়াছে। ইনি বিদ্যাসাগরের দৌহিত্র ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (১৮৭০-১৯২০)। এই সনাক্তকরণ ব্যাপারে শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ), শ্রীকালীচরণ ঘোষ ও শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সম্পাদককে সাহায্য করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহারাও সম্পাদক ও আমাদের ধন্যবাদার্হ।

কলিকাতা

প্রকাশক

সম্পাদকের নিবেদন

উনবিংশ শতাব্দীর প্রায়াবসানকালে মদ্দেশে যে সকল বিদ্বজ্জন ও কৃতী সাহিত্য-সাধক জন্মগ্রহণ করেছিলেন, অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম উল্লেখযোগ্য পুরুষ। জীবনধারণের আবশ্যকতায় এবং উচ্চশিক্ষা প্রচারের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষকতাকে ব্রত হিসাবে তিনি গ্রহণ করলেও, সর্বোপরি বাংলা-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে তিনি তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের মধ্যে যে অমূল্যসম্পদ ও নিষ্ঠার নিদর্শন রেখে গিয়েছেন, তা আজও বিদগ্ধসমাজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকেন। অধিক সংখ্যক গ্রন্থ তিনি রচনা করেন নি সত্য, কিন্তু 'পুরাতন প্রসঙ্গ' ও 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' নামক যে দু'খানি গ্রন্থ রচনা করে গিয়েছেন তা অবিসংবাদী ভাবে অনন্যসাধারণ। এই গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে 'পুরাতন প্রসঙ্গ'-তে ইতিহাসাশ্রিত সমাজ-জীবনের যে নিখুঁত সর্বাঙ্গীণ চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে এবং অপরখানির মধ্যে তাঁর চিন্তাশীলতা ও বিজ্ঞতার যে গভীরতা বিধৃত হয়েছে, তা অতুলনীয় সাহিত্যকীর্তির পরিচায়ক।

এই 'পুরাতন প্রসঙ্গ' গ্রন্থের প্রথম পর্যায় প্রকাশিত হলে (১৩২০), তার পরিচয় সম্পর্কে ত্রিপঞ্চাশৎ বৎসর পূর্বে যা বিজ্ঞাপিত হয়েছিল, আজ সুদীর্ঘকাল পরে, বর্তমান নূতন পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণের পাঠকগণের অবগতির জন্য এখানে প্রথমেই তা উদ্ধৃত করে দেওয়া হ'ল :

"'আর্যাবর্তে' (হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা; প্রথম প্রকাশকাল ১৩১৭) যাহা ধারাবাহিক ভাবে বাহির হইয়াছিল, যাহা পাঠ করিবার জন্য সকলে প্রতিমাসে উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতেন, যাহা চিত্তাকর্ষিণী শক্তিতে উপন্যাসকেও পরাজিত করিয়াছে, যাহার প্রশংসায় সাময়িক পত্রসমূহের স্তম্ভ প্রতিমাসে পূর্ণ থাকিত—সেই একাধারে সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম ও দর্শনের তথ্য ও তত্ত্বপূর্ণ 'পুরাতন প্রসঙ্গ' বা আচার্য কৃষ্ণকমলের পূর্বস্মৃতি, অনেক পরিবর্তিত ও বহুল পরিবর্ধিত হইয়া প্রকাশিত হইল।

"পুরাতন প্রসঙ্গ কি ?

"যে যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে, যে যুগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সাহিত্য ও সমাজ-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, আর তারানাথ তর্কবাচস্পতি স্বয়ং অগাধ পাণ্ডিত্য

লইয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যে যুগে গুপ্তকবি ও দাশরথি রায়ের প্রভাবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম প্রমুখ সাহিত্যরথিগণ বাঙ্গালা ভাষাকে অপূর্ব শ্রীবৃদ্ধি-শালিনী করিয়া তোলেন, যে যুগে বাঙ্গালা রঙ্গমঞ্চের সূচনা প্রতিষ্ঠা হয়, যে যুগ দ্বারকানাথ মিত্র প্রমুখ মনীষীগণের জ্ঞানগরিমায় উজ্জ্বল, যে যুগে রামগোপাল ঘোষ ও কেশবচন্দ্র সেন বক্তৃতার মন্দাকিনীতে স্বদেশ ও ধর্মের তরণী ভাসাইয়াছিলেন, যে যুগ ভাবের ও ধর্মের, জ্ঞানের ও চিন্তার আকস্মিক বন্যায় প্লাবিত হইয়াছিল, যে যুগের ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই, 'পুরাতন প্রসঙ্গ' সেই স্মরণীয় যুগের প্রসঙ্গ, এবং তাহা সেই যুগেরই একজন মনীষী কর্তৃক কথিত হইয়াছে।

"এই সকল প্রসঙ্গের বক্তা কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয় ইংরাজী ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিদ্যাসাগরের সহিত পরিচিত, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরে বি. এ. পাশ করিয়া ১৮৬২ হইতে ১৮৭২ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকতা করেন। 'বঙ্গদর্শন'-এর বহু পূর্বে ইনি বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকায় লিখিতেন, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পূর্বে ইনিই 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' নামক গ্রন্থে সেই ধরণের লেখার প্রবর্তয়িতা—শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার এইরূপ বলেন। সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, সারদাচরণ মিত্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, কবি নবীনচন্দ্র সেন প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত বাঙ্গালী এক সময়ে ইঁহার ছাত্র ছিলেন। পরে ইনি হাইকোর্টে ওকালতি, Tagore Law Lecturer হয়েন। ইনি 'হিতবাদী' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। শেষে রিপন কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়া অনেক বৎসর পরে অবসর গ্রহণ করেন।

"সেই অতীত যুগের একটি সুস্পষ্ট চিত্র ত' ইহাতে পাইবেনই, তদ্ব্যতীত বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল, হেমচন্দ্র, বিহারীলাল চক্রবর্তী, দ্বারকানাথ মিত্র, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, অক্ষয়কুমার দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি মহাত্মাগণের সম্বন্ধে এমন অনেক কথা ইহাতে আছে, যাহা তাঁহাদের কোন জীবনচরিতে এ পর্যন্ত বাহির হয় নাই। ইহাতে আরও আছে অগস্ত কোঁৎ, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীগণের এবং তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম ও দর্শনের মনোমত আলোচনা। এরূপ পুস্তক বাংলা ভাষায় আর নাই। পরিশিষ্টে হেমচন্দ্রের নবাবিষ্কৃত হাস্যরসোজ্জ্বল কৌতুক-নাটিকা 'নাকে খৎ' সন্নিবেশিত হইয়াছে।"

'পুরাতন প্রসঙ্গ' সম্বন্ধে এই উদ্ধৃতি বা বিজ্ঞাপিত অংশ ইদানীন্তনকালের রচনা-পরিপাট্য বা বিজ্ঞাপন-কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হলেও, উপযুক্ত-রচনাটির সাহায্যে প্রকাশক গ্রন্থখানির পরিচয় যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবেই প্রকাশ করার যে চেষ্টা করেছেন তাতে আর ভুল নেই, এবং প্রসঙ্গত বর্তমান সংস্করণের সম্পাদকের দায়িত্বও এতদ্বারা কিছুটা লাঘব করেছেন। এই বিজ্ঞপ্তির ফলে অত্যন্ত স্বল্পকালের মধ্যে গ্রন্থখানির প্রথম পর্যায় নিঃশেষিত হয়ে যায়। তদানীন্তন সাহিত্য-সমাজে তো বটেই, এমনকি সাধারণ্যেও এই গ্রন্থ বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং বহু মনীষী, খ্যাতিমান সাহিত্যিক ও সমালোচক এই রচনা সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করেন।

'আর্যাবর্ত' পত্রিকার সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এই স্মৃতিকথারূপ আশ্চর্যসুন্দর রচনাগুলি প্রকাশের প্রারম্ভিক কালে, উক্ত পত্রিকায় (১ম বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৭) ব্যক্ত করেন যে, "বাঙ্গালায় ইংরেজী-শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে দেশে যে নূতন ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, কয়েকজন মনীষীর মানসক্ষেত্রে সেইভাব পরিস্ফুট ও পূর্ণাঙ্গ হইয়া বাঙ্গালার জাতীয়-জীবনে নবীন আদর্শ উপস্থিত করিয়াছিল। আচার্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁহাদিগের অন্যতম। সেই সময় বঙ্গদেশে যে সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তির আবির্ভাব হয়, ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহাদের সহযোগী। তিনি এক্ষণে কর্মক্লান্ত জীবনের সায়াহ্নে বিশ্রাম-ভোগ করিতেছেন। তিনি তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিদিগের ঘটনাবলীর যে বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয় তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। ইহা হইতে পাঠক তৎকালীন বঙ্গীয় শিক্ষিত সমাজের ইতিহাস জানিতে পারিবেন।"

'পুরাতন প্রসঙ্গ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে 'মানসী' পত্রিকায় অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, "নূতন পুরাতন হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং নূতন তাহার সম্পদ, সৌন্দর্য ও সারবত্তার জন্য পুরাতনের নিকট ঋণী। বিপিনবাবু এই 'পুরাতন প্রসঙ্গ' সাধারণের সম্মুখে অধুনা নীরব ঋষিকল্প আচার্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয়ের মুখ হইতে পঞ্চাশ বৎসরের পুরাতন ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বঙ্গভাষা ও বাঙ্গালীকে অভিনব সম্পদ দান করিবে। এই প্রসঙ্গ হইতে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত, বিদ্যোৎসাহী ও ধনীগণের এবং তৎকালীন আচার-ব্যবহারের বেশ একটি আনন্দোদ্দীপক ও সরস বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারা যায়। ইহার ভিতর এমন অনেক কথা আছে, যাহা তিনি না বলিলে, বঙ্গবাসীর কোনদিন জানিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। কেবল ইহাই নয়, গ্রন্থকার

প্রসঙ্গক্রমে বিদেশের লেখকদের কথাও বলিয়াছেন; জটিল প্রশ্নের মীমাংসাও গ্রন্থের অনেক স্থলে আছে।...

"বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বিপিনবাবু এই যে গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাংলা সাহিত্যে নূতন পথ দেখাইয়া দিয়াছে। গ্রন্থখানি চিত্তাকর্ষক, কোথাও একঘেয়ে বলিয়া বোধ হয় না; প্রতি অধ্যায়ে নূতন নূতন বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। ভাষা প্রাঞ্জল, কোথাও আড়ম্বর নাই, বলিবার ভঙ্গীও খুব নূতন। গ্রন্থখানি সর্বত্র সমাদৃত হইবে আশা করি।"

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ একটি পত্রে (১৪ই পৌষ, ১৩১৮) বিপিনবিহারী গুপ্তকে এই রচনাগুলি সম্পর্কে লিখেছিলেন, "আপনার 'পুরাতন প্রসঙ্গ'গুলি খুব ভাল লাগিয়াছে, সেগুলি প্রকাশের যোগ্য সন্দেহ নাই।......কৃষ্ণকমল বাবু প্রবীণ পণ্ডিত, তিনি লেখেন না, এই জন্য তাঁহার মত ও স্মৃতি আপনি যেমন করিয়া আদায় করিয়াছেন তাহা না করিলে পাওয়াই যাইত না।"

অনুরূপ বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও তৎসমসাময়িককালের বহু প্রখ্যাত পত্রিকায় আলোচ্য গ্রন্থের দুটি পর্যায় সম্পর্কে অগণিত গুণোৎকর্ষের কথা প্রকাশিত হয়। এস্থলে সেগুলির অধিকাংশ প্রকাশ করা যে সম্ভব নয় তা সহজেই অনুমেয়। অতঃপর এই গ্রন্থের অপরাপর বিশেষ পরিচয়ের মধ্যে, দশ বৎসরের ব্যবধানে দুটি পর্যায়ের প্রকাশকালে, গ্রন্থকার স্বয়ং তাঁর 'নিবেদন'-এ ব্যক্ত যা করেছিলেন এস্থলে তা উপস্থিত করছি।

প্রথম পর্যায়ের 'নিবেদন'-এ ছিল—

"পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্ররোচনায় 'পুরাতন প্রসঙ্গ' রচিত হয়। প্রথম তিনটি সন্দর্ভের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় নাম রাখিলেন 'পুরাতন প্রসঙ্গ', এবং যে 'আর্যাবর্ত' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, সেই 'আর্যাবর্তে' এগুলির ক্রমিক প্রকাশের ব্যবস্থা করিলেন। গ্রন্থের সূচনাটি 'মানসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার সময় আচার্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয় স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্তন ও নূতন কথা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। 'মহাভারত রচনা সভা' 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার ব্লক হইতে গৃহীত; অন্য ব্লকগুলি 'আর্যাবর্তে'র।

পত্রিকায় প্রকাশকালে যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমার ভুল দেখাইয়া দিয়াছিলেন,

তাঁহাদিগের মধ্যে আমার পূজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও 'উপাসনা' পত্রিকার সমালোচকের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত জলধর সেন ও শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ পুস্তকের প্রুফ যথাসাধ্য দেখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমার দোষে অনেক ত্রুটি রহিয়া গেল। ত্রুটি স্বীকার করিলেই যে পাঠক-পাঠিকা লেখককে ক্ষমা করিবেন এমত কোনও কথা নাই; আমি কিন্তু নাকে খৎ দিয়া এবারকার মত বিদায় লইলাম।"

৬০, নিমতলা ঘাট স্ট্রীট
কলিকাতা
৬ই শ্রাবণ, ১৩২০

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে, 'পুরাতন প্রসঙ্গ'র দ্বিতীয় পর্যায় প্রকাশিত হয় প্রথম পর্যাযের সুদীর্ঘ দশ বৎসর পরে। রাজা হৃষীকেশ লাহাব বদান্যতায় 'হৃষীকেশ সিরিজ' গ্রন্থমালার সপ্তম সংখ্যক গ্রন্থরূপে ইহার প্রকাশ ঘটে। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের ভূমিকাতেও গ্রন্থকার উল্লেখ করেন—

"পুরাতন প্রসঙ্গ দ্বিতীয় পর্যায় পুস্তকাকাবে প্রকাশিত হইতে কিছু বিলম্ব হইয়া গেল। এতদিন মনে করিয়াছিলাম আরও কিছু পুরাতন কথা সংগ্রহ করিতে পারিব। নানা কারণে তাহা কার্যে পরিণত হইল না। পবম স্নেহভাজন শ্রীমান সত্যচরণ লাহার উৎসাহে ও ডাক্তাব নরেন্দ্রনাথ লাহার উদ্যোগে এতদিন পবে এই পুস্তকখানি 'হৃষীকেশ সিরিজে' গ্রথিত হইল।"

রামকৃষ্ণপুর
হাওড়া
২৬শে আশ্বিন, ১৩৩০

শ্রীবিপিনবিহারী গুপ্ত

উপস্থিত এই নূতন সংস্করণে দুটি পর্যায়ই একত্রে প্রকাশ করার আয়োজন করা হয়েছে। 'সূচনা' থেকে আরম্ভ করে পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের একটি ঘটনা অবলম্বনে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত হাস্যকর নাট্য-কাব্য 'নাকে খৎ' পর্যন্ত ১৫২ পৃষ্ঠায় প্রথম পর্যায় সমাপ্ত হয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্যায় সমাপ্ত হয়েছে ২৯৮ পৃষ্ঠায়।

এতদ্‌ব্যতীত এই 'পুরাতন প্রসঙ্গ'র অন্যান্য মূল্যবান যে রচনাগুলি এযাবৎ বিভিন্ন পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত ছিল, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি, সেগুলিও এই পুস্তকের তৃতীয় পর্যায়ে সংযোজিত হয়েছে, এবং এর দ্বারা এই গ্রন্থের মর্যাদা যে অধিকতর ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তা অবশ্যই সর্বজন স্বীকৃত হবে। তৃতীয় পর্যায়ের লেখাগুলি নিম্নলিখিত পত্র-পত্রিকায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল :

১। আর্যাবর্ত (মাঘ, ১৩২০)
২। মানসী ও মর্মবাণী (আশ্বিন, ১৩৩৩)
৩। ঐ (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬)
৪। ঐ (আষাঢ়, ১৩৩৬)

এই গ্রন্থের বর্তমান মূল্যমান অন্য আর এক যে কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে, তা হ'ল প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও প্রবীণ অধ্যাপক তীক্ষ্ণধী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী রচিত এতৎ-সংক্রান্ত 'ভূমিকা'টি। মদীয় বক্তব্যের মধ্যে ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে 'পুরাতন প্রসঙ্গ'র সঠিক মূল্যায়ন করা যেক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি, শ্রদ্ধেয় ভূমিকাকার তাঁর পাণ্ডিত্যের দিগ্‌দর্শনে ও ভাষার প্রাঞ্জল বর্ণনে তা স্পষ্ট করে তুলেছেন। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এবম্প্রকার আরও বহুজন আছেন যাঁদের কাছে আমি নানা ভাবে উপকৃত। ব্যক্তিগতভাবে তো বটেই, পরন্তু সৎসাহিত্য সম্বন্ধে অনুরাগীদের তরফ থেকেও সেই উপকৃতির প্রথম স্বীকৃতি দিতে হয় এই সংস্করণের প্রকাশক প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে। পঞ্চাশোর্দ্ধ বৎসরের অধিক বৎসরকাল অপ্রকাশিত থাকার পর, সাধারণ্যে এই গ্রন্থের পরিচয় যখন বিস্মৃতির অতলে, তখন এই নূতন সংস্করণ প্রকাশে উদ্‌যোগী হওয়া কম সাহসিকতার কথা নয়!

প্রকৃতপক্ষে যেকালে 'পুরাতন প্রসঙ্গ' গ্রন্থাকারে প্রকাশলাভ করে, সেকালে অনুরূপ আর কোন গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে অবশ্য স্মৃতিকথা-রূপ বা বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবন-কথা অবলম্বনে কিছু সংখ্যক গ্রন্থ রচিত হয়েছে সত্য, কিন্তু যে ঊনবিংশ শতাব্দীকে অনেকে রোমান্টিসিজিমের যুগ বলে থাকেন, সেই ঊনবিংশ শতাব্দীতেই রিয়েলিজিমের চরম অভিব্যক্তি দেখিয়েছেন বিপিনবিহারী। রূপ, রস ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবরাজ্যে বিচরণশীল মানুষজনের চাক্ষুষ কাহিনী বর্ণিত, ব্যক্ত ও চিত্রিত হয়েছে প্রসঙ্গক্রমে তাঁর এই সাহিত্যেতিহাসের মধ্যে। এর অন্তরে মানবহৃদয়ের

স্পন্দনধ্বনি যেমন শ্রুত হয়েছে, তেমনি দেশজ সমাজ-দর্পণে প্রতিভাত হয়েছে ঐতিহ্যের ভাস্বর কাহিনী। মূলতঃ এই প্রসঙ্গ পুরাতন কালের হলেও, সাহিত্যের অন্তর্নিহিত বস্তু দেশ, কাল ও জাতিকে অতিক্রম ক'রে যে ভাবে চিরন্তন ও শাশ্বত সাহিত্যের রূপ ধারণ করে, এই অমূল্য গ্রন্থেও তা সম্ভাবিত হয়েছে। যে সকল বাগ্মী, সাহিত্যিক, শিল্পী ও সমাজহিতৈষী, রুচিবান, সংস্কৃতিসম্পন্ন সুপণ্ডিত ব্যক্তি কালস্রোতে আজ বিস্মৃতির অন্তরালে গিয়ে পড়েছেন বলে মনে হয়, সে সকল পুরুষজনও এই সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে মূর্ত হয়ে আছেন জীবন্তরূপ পরিগ্রহ করে—সেই কাল, সেই সংস্থান ও ঘটনার সঙ্গে যেন সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে, পাঠক যেন এক অনাস্বাদিতপূর্ব রসের আস্বাদন লাভ করেন এই গ্রন্থ পাঠে।

মোটামুটিভাবে 'পুরাতন প্রসঙ্গ'-এ যাবৎ জ্ঞানেব সত্য তথ্য যেমন আস্তীর্ণ আছে যুক্তি-নিরপেক্ষতার সঙ্গে, তেমনি তৎকালীন সমাজের এমন সব পুণ্যশ্লোক, প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিবর্গ তাঁদের চরিত্রের মাধুর্য, কথোপকথনের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য নিয়ে আছেন, যা যুগপৎ আলোচ্য গ্রন্থকে শিক্ষাপ্রদ ও রোমাঞ্চকর করে তুলেছে।

বর্তমান কালের শিক্ষার্থীদের, বিশেষ করে প্রাচীন বঙ্গ সমাজের ইতিহাস সম্বন্ধে আগ্রহশীল পাঠক ও গবেষকদের নিকট এ গ্রন্থের প্রয়োজন যে অপরিহার্য তা সকলেই স্বীকার করবেন। এক সময় এই গ্রন্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ পর্যায়ে পাঠ্যরূপে ধার্য হওয়ার কথাও উত্থাপিত হয়েছিল বলে বিদিত আছে।

এস্থলে পাঠকগণের অবগতির জন্য আরও একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করি যে, এই গ্রন্থের পাদটীকাগুলির মধ্যে তারকা (*) চিহ্নিত নির্দেশগুলি মূল গ্রন্থের, বাকী অন্যান্য সংখ্যাবাচক নির্দেশগুলি বর্তমান নূতন সংস্করণের নিজস্ব।

'পুরাতন প্রসঙ্গ' গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশ সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা যিনি আগ্রহান্বিত ছিলেন, তিনি বিপিনবিহারী গুপ্তর সহধর্মিণী মাতৃস্বরূপা স্নেহময়ী নীরবালা দেবী। অসাধারণ স্মৃতিসম্পন্না এই মহিলার সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, এবং তাঁর কাছে এই গ্রন্থের সুদীর্ঘকাল অপ্রকাশজনিত বেদনার কথা শুনে আমি অভিভূত হয়েছিলুম। তাঁরই আগ্রহাতিশয্যে ও আশীর্বাদে এই গ্রন্থ আজ প্রকাশিত হ'ল বটে, কিন্তু তাঁর কাছে উপস্থিত করার আনন্দ থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। বিগত ১৪ই ভাদ্র, ১৩৭২ তিনি তাঁর স্বগৃহে ইতিমধ্যে পরলোকগমন করেছেন।

এই গ্রন্থ-প্রকাশ বিষয়ে আরও দুজনের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। এদের একজন মনীষী বিপিনবিহারী গুপ্তর পৌত্রী শ্রীমতী দীপান্বিতা গুপ্ত ও অপরজন শ্রীমান অশোক দাস। এই গ্রন্থের নব-সংস্করণ প্রকাশের জন্য কল্যাণীয়া দীপান্বিতার অপরিসীম আগ্রহ ও তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য অনলস পরিশ্রম আমাকে মুগ্ধ করেছে। পিতামহের প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে, সাহিত্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ব্যতীত ঈদৃশ কার্য সম্পাদন কখনই সম্ভব ছিল না। অনুরূপ ভাবে স্নেহভাজন অশোকের কাছেও এই গ্রন্থ সম্পাদনে আমি প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হয়েছি। তার নৈষ্টিক উদ্যম আমাকে এই কার্যে যথেষ্ট উৎসাহিত ও সাহায্য করেছে। প্রকৃতপক্ষে এতদ্‌উভয়ের সহযোগিতা ব্যতিরেকে 'পুরাতন প্রসঙ্গ'-র নূতন সুষ্ঠু রূপদান সম্ভব ছিল না। প্রসঙ্গক্রমে এই গ্রন্থের নির্মীলন-কার্যে আন্তরিক ধৈর্য ও সহযোগিতাপূর্ণ প্রযত্নের জন্য শ্রীঅবনীকুমার দাস ও তাঁর সহযোগী শ্রীগোপালচন্দ্র বসাককেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

নিবেদনের শেষ পর্যায়ে 'পুরাতন প্রসঙ্গ'-এর প্রথম পুরুষ সুপণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয় পুরাতন প্রসঙ্গ-কথায় নবীনদের সম্পর্কে যে মূল্যবান কয়েকটি কথা বলেছিলেন, এখানে তারই পুনরুক্তি করে আমার প্রসঙ্গ শেষ করছি। তিনি বলেছিলেন, "পুরাতনকে শ্রদ্ধা করিও, মনে বল পাইবে, আনন্দ পাইবে। তোমাদের পূর্বপুরুষেরা ইদানীন্তন বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের ইতিহাসে যে রেখাপাত করিয়া গিয়াছেন, তাহা তোমাদের স্পর্ধার সামগ্রী, গৌরবের জিনিস।"

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

ইংল্যাণ্ডের ভিক্টোরিয় যুগ এবং বাংলাদেশের উনবিংশ শতক নানা কারণে তুলনীয়। দুটি যুগেরই বিভিন্নমুখী কীর্তি সর্বজনস্বীকৃত। আবার এই সব কীর্তিকে লঘুভাবে দেখাবার চেষ্টাও কম হয়নি। সমকাল যাঁদের গৌরবের আসন দিয়েছিল, পরবর্তীকাল সেই আসন থেকে তাঁদেব বঞ্চিত করতে চেষ্টা করেছে। এর দুটি কারণ সম্ভব ; একটি সাধারণ কারণ, পূর্ববর্তী যুগের দাবী অব্যবহিত পরবর্তী যুগ প্রসন্নমনে স্বীকার করতে চায় নি। অপর বিশেষ কারণটি শুনলে কিছু অদ্ভুতই মনে হবে। ভিক্টোরিয় যুগে অধিকাংশ কীর্তিমান পুরুষদের আয়ুষ্কালের মাত্রাতিরিক্ত দৈর্ঘ্য। ব্রাউনিং (১৮১২-৮৯), টেনিসন (১৮০৯-৯২), রাস্কিন (১৮১৯-১৯০০), কার্লাইল (১৭৯৫-১৮৮১), নিউম্যান্ (১৮০১-৯০) প্রভৃতি সকলেই দীর্ঘজীবী। আর যাঁর নামে এই যুগের নামকরণ, সেই রানী ভিক্টোরিয়ার জীবনকাল (১৮১৯-১৯০১) এত দীর্ঘ যে, পুত্র সপ্তম এডওয়ার্ডের সিংহাসন-প্রাপ্তিব সম্ভাবনা প্রায় অসম্ভবের পর্যায়ে এসে ঠেকেছিল। কোন কৃতীপুরুষ দীর্ঘজীবী হলে জীবনের শেষাংশে তাঁর সম্বন্ধে একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে থাকে। যদিচ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ পূর্ববর্তী যুগের ব্যক্তি, কিন্তু তাঁর দীর্ঘজীবনের (১৭৭০-১৮৫০) শেষ ভাগ ভিক্টোরিয় কালের মধ্যে প্রবেশ করেছিল এবং সেকারণ, তাঁর জীবনের শেষেও একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। এই বিষয়ে পূর্ববর্তী রোম্যান্টিক সাহিত্যের যুগ অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যবান। সে যুগের প্রতিভাধরদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা স্বাভাবিক বা আকস্মিক কারণে অল্পবয়সে মারা গিয়েছেন। কীটসের পচিশ বছর, শেলীর ত্রিশ বছর, বায়রনের ছত্রিশ বছর, সেকালের মাপকাঠিতেও স্বল্পায়ু ; এমনকি স্কটের বাষট্টি বছরকেও দীর্ঘ বলা যায় না। এখন এই দুই যুগ সম্বন্ধে পরবর্তীকালে ধারণার বিচার করলে দেখা যাবে যে, ঐ স্বল্পায়ুর যুগ সম্বন্ধে মানুষের মনে যে সহৃদয়তা সঞ্চারিত হয়েছিল, দীর্ঘায়ুদের সম্বন্ধে হয়েছে ঠিক তার বিপরীত। বিংশ শতকের প্রথম বৎসর থেকেই ভিক্টোরিয় যুগের কীর্তিকে হেয় করবার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। এই প্রতিক্রিয়ার স্বাক্ষর স্বরূপ লিটন স্ট্র্যাচির 'এমিনেণ্ট ভিক্টোরিয়ান' গ্রন্থখানির নাম করা যায়। ভিক্টোরিয় যুগ যাঁদের 'গ্রেট্' মনে করেছিল, গ্রন্থকার তাঁদের 'এমিনেণ্ট'-এর চেয়ে বেশী মনে করেননি। কিন্তু ঠেকে গেলেন তিনি 'কুইন ভিক্টোরিয়া' গ্রন্থখানি লিখতে বসে। গ্রন্থখানির প্রারম্ভে কিশোরী ভিক্টোরিয়া সম্বন্ধে তিনি অনেক লঘু পরিহাস করেছেন, কিন্তু যতই অগ্রসর হয়েছেন ততই সেই লঘু

পরিহাস শ্রদ্ধায় পরিণত হতে শুরু করেছে। অবশেষে ভিক্টোরিয়ার গম্ভীর মহিমময় শেষ জীবন তাঁকে একেবারে অভিভূত করে ফেলেছে। ভিক্টোরিয় যুগ সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত যেমন লিটন স্ট্র্যাচিতে, ভিক্টোরিয় যুগ সম্বন্ধে নূতন শ্রদ্ধাভাবেরও সূত্রপাত তেমনি লিটন স্ট্র্যাচিতে। তারপর থেকে ভিক্টোরিয় যুগের কীর্তি সম্বন্ধে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচার করবার জোয়ার দেখা দিয়েছে ইংরেজী সাহিত্যে। এবারে বাংলা দেশের উনবিংশ শতক সম্বন্ধে অনুরূপ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আলোচনা করা যেতে পারে।

বিংশ শতকের প্রারম্ভে উনবিংশ শতক সম্বন্ধে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল তার কারণ সেকালের মনীষীদের দীর্ঘজীবন নয়, পরবর্তীকালের বিচারে সেই কালটাই যেন ছিল অত্যন্ত অহেতুক ভাবে দীর্ঘস্থায়ী। বৃদ্ধ পিতার জীবনাবসানের আশায় বয়স্ক পুত্রদের যেমন নিষ্ক্রিয় ভাবে অপেক্ষা করে থাকতে হয়, পরবর্তী যুগ অনেকটা সেই রকম মানোভাবেই মুমূর্ষু উনবিংশ শতকের শিয়রের কাছে অপেক্ষা করছিল। রাজনারায়ণ বসু সেকাল আর একালের মাঝখানে সীমারেখা টেনেছেন ১৮১৭ সালে যখন হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। রাজনারায়ণ বসুর নির্দেশিত একালটা যে এত দীর্ঘ হবে কেউ ভাবতে পারে নি, তিনি নিজেও কি ভাবতে পেরেছিলেন! একালের সঙ্গে যাঁর জন্ম, সেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৫ সাল পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। রাজনারায়ণ বসুরও ১৮৯৯-এর আগে মৃত্যু হয়নি, ইতিমধ্যে অর্থাৎ ১৮১৭-র পরে, এক শতাব্দীর কমে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনকালেই অনেক যুগান্তর ঘটে গিয়েছে এই বাংলা দেশে। ইয়ং বেঙ্গলের দল, রামমোহনের আত্মীয় সভার দল, দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সভার দল, বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের দল, কেশব সেনের নববিধানের দল, পরমহংসদেবের শিষ্যের এবং বিবেকানন্দের সন্ন্যাসীর দল। কারও সঙ্গে কারও বড় মিল নেই, অথচ সকলেই একটা বৃহৎ ভাব-তরঙ্গের অংশ; এই বৃহৎ ভারতবর্ষের সূত্রপাত যদি হয় ১৮১৭ সালে, তবে তার অন্তিম রেখা মোটামুটি টানা যেতে পারে ১৯১৪ সালে—এই তিন বছর কম একশ বছর বাংলা দেশের মহত্তম যুগ।

সাতানব্বই বছর আগে যে বিচিত্র ও বিভিন্নমুখী সাধনার সূত্রপাত হয়েছিল, বিংশ শতকের প্রথমে এসে তার কতক সিদ্ধিতে পৌছল, কতক অর্ধ-পরিণত অবস্থায় থেমে গেল বা দিক পরিবর্তন করল। বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য সাধনা রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিতে জাগতিক সিদ্ধিলাভ করল। রামমোহন যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমন্বয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন, রামকৃষ্ণের সাধনায় তার পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটল। বিদ্যাসাগরের কর্মযোগ এমন সার্থক সিদ্ধিলাভ করেছে বলা চলে না। কারণ শেষের দিকে বাঙালী সমাজ কর্মের চেয়ে ভাবের দিকেই বেশী ঝুঁকে পড়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন পরিকল্পনাও সাধনোচিত পরিণাম লাভ করেছে বলা চলে না; তাঁর অনুশীলন তত্ত্ব, 'অনুশীলন সমিতি'র বেশী পৌঁছল না। মোটের উপরে বলা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ভাব-সাধনায় যেমন সিদ্ধিলাভ করেছিল, জ্ঞান বা কর্ম-সাধনায় তেমন করতে পারেনি। পরাধীন জাতির পক্ষে এ বোধ করি অনিবার্য। চেস্টারটন ভিক্টোরিয় যুগের প্রকৃতি আলোচনা উপলক্ষ্যে Victorian Compromise-এর উল্লেখ করেছেন, অনুরূপ একটা compromise আমাদের সমাজেও ঘটেছিল। সেটা আর কিছুই নয়, ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারাকে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা। এই প্রচেষ্টার নায়ক নবোদিত মধ্যবিত্ত সমাজ। মনে রাখতে হবে যে ইংরেজ শাসনের অন্যতম সুফল বাংলাদেশের একটি নূতন বিরাট ও শক্তিমান মধ্যবিত্ত সমাজের সৃষ্টি। দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির মত সামান্য কয়েকজন অভিজাতকে বাদ দিলে বাঙালী সমাজের ইতিহাস এই মধ্যবিত্ত সমাজের ইতিহাস। ১৯১৪-এর পর থেকে এই সমাজে অবক্ষয়ের চিহ্ন দেখা দিতে থাকে। প্রথম দিকে স্বভাবতঃই সেই চিহ্ন ক্ষীণ ছিল, কিন্তু দুটো যুদ্ধের অভিঘাতে, দেশ বিভাগে এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলে মধ্যবিত্তের অবক্ষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর পঁচিশ বছর পরে দেশে যে নূতন শ্রেণীবিভাগ দেখা দেবে তার মধ্যে পূর্বতন মধ্যবিত্ত সমাজের বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তখন হয়ত বাঙালী সমাজে নূতন মহত্ত্ব প্রকট হয়ে উঠবে, তবে সে মহত্ত্বের প্রকৃতি উনবিংশ শতকের মহত্ত্বের থেকে স্বতন্ত্র হতে বাধ্য। আমরা এখন একটা পটপরিবর্তনের মধ্যবর্তীকালে অবস্থান করছি,—কি হবে জানি না, কি ছিল তাও ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে আসছে। মানুষ কি চেয়েছিল তা দেখে, কি চায় অনুমান করবার পদ্ধতি যদি ভুল না হয়, তবে উনবিংশ শতকের সামাজিক ইতিহাস বিশেষ ভাবে আলোচনার বিষয়। এই আলোচনা যত হয়, ততই মঙ্গল, ততই নূতন দিগ্‌দর্শনের সম্ভাবনা অধিক। এক সময়ে উনবিংশ শতাব্দীর কীর্তিকে অবহেলা করবার প্রবৃত্তি আমাদের সমাজে দেখা দিয়েছিল, সৌভাগ্যবশতঃ সে ঝোঁক এখন কেটে গিয়েছে। সুশীল দে, ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বাগল, নির্মলকুমার বসু, বিনয় ঘোষ প্রভৃতির কল্যাণে উনবিংশ শতকের মহিমা ক্রমেই আমরা অবগত হচ্ছি। এ কাজের কেবল সূত্রপাত হয়েছে, এখনও অনেক কর্তব্য আছে। একটি কর্তব্য হচ্ছে, তৎকালে লিখিত বা তৎকালীন মনীষিগণের স্মৃতি অবলম্বনে পরবর্তী-কালে লিখিত গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ। এই রকম একখানি পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থের ভূমিকা লিখবার ভার আমার উপর অর্পিত হওয়াতে গৌরব বোধ করছি।

স্বর্গীয় অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত কর্তৃক লিখিত 'পুরাতন প্রসঙ্গ' ১৯১৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। আজ তিপ্পান্ন বৎসর পরে সুসাহিত্যিক শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়ের

সম্পাদনায় ঐ গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হতে চলেছে। বিশুবাবু ইতিপূর্বে 'রবীন্দ্র-সাগরসঙ্গমে' নামক সংগ্রহ গ্রন্থে রবীন্দ্র-সাহিত্য সমালোচনার সংকলন করেছেন। এসব সমালোচনা বিভিন্ন কালে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে সাধারণের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য অবস্থায় পড়েছিল, আর কিছুদিন পরে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যেত। বিশুবাবু সেগুলিকে সাধারণের করায়ত্ত করে দিয়ে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এবার তাঁর দ্বিতীয় উদ্যম 'পুরাতন প্রসঙ্গ'-র পুনঃপ্রকাশ। তিপান্ন বছর আগে প্রকাশিত এই বই দুষ্প্রাপ্য হয়ে গিয়েছিল ত' বটেই, এমন কি জনশ্রুতি হতেও লোপ পাওয়ার মতন হয়েছিল। অথচ বইখানি উনবিংশ শতককে বুঝবার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। অন্য দেশে স্মৃতিকথা ও ডায়েরী অবলম্বনে ইতিহাসের উপরে নূতন আলোকপাত হয়ে থাকে। আমাদের দেশেও হওয়া উচিত, অন্ততঃ উনবিংশ শতক সম্বন্ধে; কেননা এই সময়ের নব-শিক্ষিত বাঙালীর লিখবার দিকে বিশেষ ঝোঁক ছিল, বিস্তর চরিতকথা, স্মৃতিকথা, ভ্রমণবৃত্তান্ত তাঁরা লিখে গিয়েছেন। বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস রচনায় এগুলি প্রধান উপাদান হওয়া উচিত। এ সময়ের শিক্ষিত লোকের অনেকের ডায়েরী লিখবার অভ্যাস ছিল, সে সব ডায়েরী সন্ধান করে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক, এ কাজটি একেবারেই হয়নি। এদিকে ঐতিহাসিকদের আশা কারি দৃষ্টি পড়বে। 'পুরাতন প্রসঙ্গ' জীবনচরিত বা ডায়েরী নয়, স্মৃতিকথা মাত্র। তবে যাঁদের কাছ থেকে এই কথা আদায় করা হয়েছে, তাঁরা সকলেই বিশিষ্ট ব্যক্তি। অনেকে নিজ পরিচয়ে খ্যাত এবং তাঁদের সকলেরই জন্ম উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদে। কাজেই এঁদের মন উনবিংশ শতকের রসে পুষ্ট। আর শুধু তাই নয়, এঁদের কয়েকজন নিজেদের সাধনায় উনবিংশ শতকের ধারাকে পুষ্ট করে তোলবার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তাঁদের যে স্মৃতি তিপান্ন বছর আগে পুরাতন মনে হয়েছিল আজ তা নূতন মনে হতে বাধ্য। কারণ ইতিমধ্যে পুরাতনকে আমরা ভুলে বসে আছি। আমার নিজের কথা বলতে পারি, এমন আগ্রহে অনেক দিন বই পড়িনি। যদিচ এই বই আমার কাছে নূতন নয়। বইখানার বিশেষ গুণ এই যে, মুখে মুখে কথিত হওয়ায় একটা অনায়াস ভাব এর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। মনে হয় যেন লেখকের সঙ্গে বসে আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের কাছে বিগত দিনের কাহিনী শুনে যাচ্ছি। এ যেন ইতিহাস পড়া নয়, ইতিহাসের স্রোতের মধ্যে দিয়ে অবাধে সন্তরণ। কথক ও লেখক দুজনেই এই গুণের অংশ দাবী করতে পারেন।

'পুরাতন প্রসঙ্গ' দুই খণ্ডে বিন্যস্ত। গোড়ায় দুই খণ্ড আলাদাভাবে মুদ্রিত হয়েছিল, এখন সেই দুই খণ্ড এবং তৎসহ অপ্রকাশিত তৃতীয় খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হোল। প্রথম পর্যায়ের স্মৃতিকথার কথক দুজন,—আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ও

মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কৃষ্ণকমল স্বনামে পরিচিত, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অপেক্ষাকৃত অপরিচিত।

দ্বিতীয় পর্যায়ে স্মৃতিকথার কথক পাঁচজন ব্যক্তি। তন্মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অমৃতলাল বসু সকলের পরিচিত ; উমেশচন্দ্র দত্ত, ব্রহ্মমোহন মল্লিক ও রাধামাধব কর তত সুপরিচিত নন, যদিচ রাধামাধব করের ভ্রাতা ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর বা আর. জি. কর বিখ্যাত ব্যক্তি। তৃতীয় পর্যায়েরও কথক আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য।

তিন পর্যায়ে মিলিয়ে যে সাতজন ব্যক্তির কাছে থেকে স্মৃতিকথা আদায় করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে উমেশচন্দ্র দত্তর জন্ম সবচেয়ে আগে, ১৮২৯ সালে। তার কয়েক বছর পরে ব্রহ্মমোহন মল্লিক জন্মেছেন ১৮৩২-এ। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে পরে জন্মেছেন অমৃতলাল বসু ও রাধামাধব কর, ১৮৫৩ সালে। কৃষ্ণকমল, মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৪০ সালে বা দুই এক বছর এদিক্-ওদিকে। ১৯১১ সালে এঁরা সকলেই জীবিত ছিলেন,—কৃষ্ণকমল, অমৃতলাল ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তার পরেও দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। কথকদের জন্মকাল না জানলে পুরাতন প্রসঙ্গের গুরুত্ব বুঝতে পারা যাবে না। ১৮১৭ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত যে সময়টাকে বাংলাদেশের মহত্তম যুগ বলেছি, এঁরা সকলেই সেই যুগের মানুষ, অনেকে সেই যুগের অন্তেও জীবিত ছিলেন। শুধু তাই নয় কৃষ্ণকমল, অমৃতলাল ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই যুগের চিন্তানায়কদেয় অন্যতম। তাঁরা সেই যুগ দ্বারা প্রভাবিত আবার সেই যুগকে প্রভাবিত করছেন। অপর চারজন সেভাবে যুগকে প্রভাবিত করতে সমর্থ না হলেও, সেই যুগের ভালোয়-মন্দয় পুষ্ট। এঁদের মুখ থেকে সেই যুগের কথা জানবার বিশেষ মূল্য আছে। সেই যুগে যুবকরা কোন্ বই পড়ত, কোন্ মনীষী দার্শনিকের প্রভাব স্বীকার করত, একথা জানলে সে যুগের এক দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ্ণকমলের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় যে, ফরাসী দার্শনিক কোঁৎ ও ইংরেজ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল্ তাঁদের মনকে আকৃষ্ট ও পুষ্ট করে তুলেছিল। সে যুগের মনীষী ছাত্রদিগের উপরে কোঁতের প্রভাবের ব্যাপকতা ও গভীরতা একালের লোককে বিস্মিত করে দেবে ; সে প্রভাবের আজ আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। কৃষ্ণকমলের মুখ থেকে বিদ্যাসাগরের এমন একটা পরিচয় পাওয়া যাবে যা অন্যত্র দুর্লভ। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অমৃতলাল ও রাধামাধব কর বাংলা থিয়েটারের আদিযুগ ও মধ্যযুগের কথা শুনিয়েছেন। ব্রহ্মমোহন মল্লিক পুরাতন হিন্দু কলেজের ছাত্র। উমেশচন্দ্র দত্ত হিন্দু কলেজের অধ্যাপক রিচার্ডসনের প্রত্যক্ষ ছাত্র। এঁদের দুজনের স্মৃতিকথায় পাওয়া যাবে সেকালের হিন্দু ও কৃষ্ণনগর কলেজের পাঠ্য তালিকা, ঐ

দুই কলেজের অধ্যাপকদের অনেকের নাম ও আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় যা পরবর্তী কাল ভুলে বসে আছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর নব্য বাংলা সাহিত্য ও দেশাত্মবোধের আদিযুগের মানুষ। তাঁর স্মৃতিকথা পড়লে জানতে পারা যায় যে সেকালের ইংরেজী ভাবাপন্ন দেশাত্মবোধের সঙ্গে তাঁর মনের মিল ছিল না। তিনি সব বিষয়েই গোড়া থেকে একটু স্বতন্ত্র ধরনের। সে যুগে সকলেই ইংরেজী চিন্তার ও আচরণের ছাঁচকে মহৎ মনে করত, দ্বিজেন্দ্রনাথ তার মহত্ত্ব কখনো স্বীকার করেন নি। এতে বুঝতে পারা যায় যে, সে যুগের চিন্তার ধারার মধ্যেই একটা অন্তর্নিহিত প্রতিবাদ ছিল। ঐ প্রতিবাদ প্রেরণা যুগিয়েছে পরবর্তী যুগের সৃষ্টিতে। যে যুগ পরবর্তী যুগের ভূমিকা রচনা করতে পারে, সে যুগ অবশ্যই মহৎ। পুরাতন প্রসঙ্গের যুগ আমি যতদূর বুঝি বাঙালীর ইতিহাসে মহত্তম যুগ।

অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত সেই যুগের ইতিহাস লিখে গিয়ে বাঙালীর কল্যাণ চিন্তার পথ সুগম করে দিয়েছেন আর সেই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থকে সাধারণের করায়ত্ত করে দিয়ে সুসাহিত্যিক শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় সেই পথের বাধা দূর করলেন। তাঁরা দুজনেই আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

বিপিনবিহারী গুপ্তর জীবন-কথা

(১৮৭৫-১৯৩৬)

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় পশ্চিম বঙ্গের এক বৈদ্য ব্রাহ্মণ পরিবারে বিপিনবিহারী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ জয়নারায়ণ গুপ্ত ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ ও সঙ্গতিসম্পন্ন কবিরাজ এবং পিতা কেদারনাথ গুপ্ত ছিলেন রেলওয়ে কোম্পানীর সাধারণ কর্মচারী। ২৪-পরগনা জেলার গরিফা নিবাসী নন্দকুমার রায়ের কন্যা ছিলেন তাঁর মাতা সর্বমঙ্গলা দেবী। তৎকালীন রসিক সমাজে মাতামহ নন্দকুমারের নাট্যকার হিসাবে বিশেষ খ্যাতি ছিল। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটক রচনা করে তিনি প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেন।

সহোদরগণের মধ্যে বিপিনবিহারীই ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ। তাঁর অন্য তিন কনিষ্ঠের মধ্যে দ্বিতীয় ছিলেন বিনোদবিহারী, তৃতীয় কৃষ্ণবিহারী এবং সর্বকনিষ্ঠ বঙ্কুবিহারী। তৃতীয় কৃষ্ণবিহারী অগ্রজ বিপিনবিহারীর ন্যায় শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যিক হিসাবেও সুপরিচিত ছিলেন। ভাগলপুর টি. এন. জুবিলী কলেজে অধ্যাপনা করার পর, পরবর্তীকালে তিনি আরা কলেজের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। তাঁর গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'গীতাঞ্জলির ভাবধারা' ও 'অনিন্দ্যা' বিশেষ খ্যাতিলাভ করে।

অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় বিপিনবিহারীকে অত্যন্ত আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যে বিদ্যার্জন করতে হয়। তথাপি তাঁর অসাধারণ মেধা ও অধ্যবসায়ের জন্য তিনি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী-সাহিত্য ও ইতিহাসে ডবল অনার্স নিয়ে বি. এ. পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। উক্ত সময়ের সামান্য কিছুদিন পরেই তিনি ডেপুটী-ম্যাজিস্ট্রেট পদের জন্য একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দেন। কিন্তু পরীক্ষা আশানুরূপ না হওয়ায়, তাঁকে সাব্‌ডেপুটী পদ গ্রহণে অনুরোধ করা হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

শিক্ষকতা বা জ্ঞান-বিতরণই যেন ছিল তাঁর জীবনের নির্ধারিত পথ। সে জন্য কর্মজীবনের সূচনাতেই তিনি বরিশাল রাজচন্দ্র কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে বৃত হন। এরপর থেকেই বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে চলতে থাকে তাঁর বিদ্যা-দানের মহৎ ব্রত। এই দায়িত্বপূর্ণ ব্রতজীবনের শেষ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বিপিনবিহারী ঐকান্তিক আন্তরিকতা ও একাগ্রতার সঙ্গে পালন করে যান। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি ছিলেন কলিকাতা রিপন কলেজের (বর্তমান নাম : সুরেন্দ্রনাথ

কলেজ) ইতিহাসের অধ্যাপক। তাঁর মৃত্যুতে উক্ত কলেজ ম্যাগাজিনে (১৯৩৬) জনৈক তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর সাহিত্য-বিভাগের ছাত্র লিখেছিলেন, "তাঁহার মৃত্যুতে রিপন কলেজের ইতিহাসের ছাত্ররা একজন বিজ্ঞ ও সুদক্ষ অধ্যাপকের অধ্যাপনা হইতে বঞ্চিত হইল।......তিনি যখন ইতিহাসের পাঠ অতি সুন্দর ইংরেজীতে একটি একটি করিয়া গল্পের মত আবৃত্তি করিয়া যাইতেন, তখন এমন ছাত্র থাকিত না, যে তাঁহার হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা না শুনিয়া পারিত। তাঁহার বক্তৃতার গুণে অমনোযোগী ছাত্ররাও যেন পাঠে মনোযোগ না দিয়া থাকিতে পারিত না।......তাঁহার ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ, তিনি যখন ক্লাসে কোন ছাত্রকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেন, তখন মনে হইত যেন তিনি সে ছাত্রের অন্তর অবধি দেখিতেছেন। তাঁহার নিকটে আসিলে অবাধ্য রূঢ় ছাত্রের মস্তক নত হইত আর দুর্বলচেতা ছাত্র যেন মনে বল পাইত। এইরূপ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আসা ছাত্রদের পরম সৌভাগ্য সন্দেহ নাই।"

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় প্লেগ দেখা দিলে তিনি কৃষ্ণনগরে যান এবং তথায় উমেশচন্দ্র দত্ত (দত্তগুপ্ত) মহাশয়ের পুত্রদের গৃহশিক্ষক রূপে নিযুক্ত থাকাকালীন ইংরেজী-সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৮৯৯)। ইংরেজী-সাহিত্যে তাঁর প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক, এবং সেই কারণেই সম্ভবতঃ ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর সমূহ সাহিত্যকর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। অধ্যাপনা কার্যের ক্রমপর্যায় পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কলিকাতায় মেট্রোপলিটন কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা, বরিশাল রাজচন্দ্র কলেজ ও শ্রীহট্টের মুরারিচাঁদ কলেজের অধ্যাপনা করার পর ১৯০৬ সালে বিপিনবিহারী কলিকাতার রিপন কলেজে যোগদান করেন এবং এই কলেজেই তাঁর কর্মজীবনের অবসান হয়।

অতঃপর যথাসম্ভব সংক্ষেপে গুপ্তমহাশয়ের সাহিত্য-সৃষ্টির আলোচনায় আসা যাক। এই সাহিত্য-সৃষ্টির প্রারম্ভে পুরোধা হিসাবে যিনি তাঁকে প্রেরণা দান করেন, তিনি হলেন আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। বাংলা-সাহিত্যে বিজ্ঞান-চেতনার উদ্বোধক, গৌড়জন শ্রদ্ধেয় রামেন্দ্রসুন্দরের আগ্রহাতিশয্যেই বিপিনবিহারী সাহিত্য-সাধনায় আকৃষ্ট ও বিভিন্ন ধরনের রচনা প্রকাশে মনোযোগী হন।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ভাগলপুর সাহিত্য সম্মেলনের বিবরণ সম্পর্কে তাঁর একটি সরস আলোচনা মুদ্রিতাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। তদবধি বিভিন্ন প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রিকাগুলিতে তাঁর বিভিন্ন রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। সুপণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমৃতলাল বসু, ব্রহ্মমোহন মল্লিক, রাধামাধব কর, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্মৃতিকথা আহরণ করে 'পুরাতন প্রসঙ্গ' নামে একখানি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন। এই রচনাগুলি পর্যায়ক্রমে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

সম্পাদিত 'আর্যাবর্ত' মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে (অগ্রহায়ণ, ১৩১৭)।

'বিচিত্র প্রসঙ্গ' বিপিনবিহারীর আর একখানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ। এই দুখানি গ্রন্থ-রচনার মূলেই ছিলেন আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর। 'বিচিত্র প্রসঙ্গ'র জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধগুলি শাশ্বতকালের সাহিত্যকর্মের নিদর্শনভূয়িষ্ঠ। এই নিবন্ধগুলি 'ভারতবর্ষ', 'মানসী ও মর্মবাণী' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

'পুরাতন প্রসঙ্গ' দুটি পর্যায়ে ১৩২০ ও ১৩৩০ সালে এবং 'বিচিত্র প্রসঙ্গ'ও দুটি পর্যায়ে ১৩২১ ও ১৩৩৪ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশলাভ করে।

'মাসিক বসুমতী' ও 'ভারতবর্ষ' নামক মাসিক পত্রিকাদ্বয়ের সঙ্গেও বিপিনবিহারীর বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁর তিরোধানে এই দুটি পত্রিকায় কি ধরনের সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল, পাঠকগণের সুবিধার জন্য এস্থলে তার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল। চিত্রসহ 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত হয়, 'মাসিক বসুমতী'র প্রকাশ-সূচনায় আমরা সর্বদা তাঁহার পরামর্শ ও সাহচর্যলাভে উপকৃত হইয়াছি। বিশ্বের রাজনৈতিক প্রহেলিকাকে সরস মনোজ্ঞ করিয়া তিনি যে কয়টি প্রবন্ধ 'মাসিক বসুমতী'তে লিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক। এক সময়ে তাঁহাকে 'মাসিক বসুমতী'র সম্পাদক করিবার প্রস্তাবও হইয়াছিল। বিপিনবাবু সুরসিক, উদার, বন্ধুবৎসল, সৌম্যপ্রকৃতির লোক ছিলেন।" (মাসিক বসুমতী, ১৪শ বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৪২)।

'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, "আমাদের পরম হিতৈষী বন্ধু, ভারতবর্ষের কৃতী লেখক বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয়ের পরলোকগমন সংবাদে আমরা মর্মাহত হইলাম।......'ভারতবর্ষের' সূচনা হইতে বহু বৎসর পর্যন্ত তাঁহার 'বিচিত্র প্রসঙ্গ', 'পুরাতন প্রসঙ্গ' প্রভৃতি পুস্তকের অধিকাংশ প্রবন্ধই 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল। আমাদের 'সাময়িকী'র তিনিই প্রবর্তক। কয়েক বৎসর যথানিয়মে তিনি 'সাময়িকী' লিখিয়াছেন।" (ভারতবর্ষ, ২৩শ বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৪২)।

শিক্ষাব্রতী, সাহিত্যসেবক মনীষী বিপিনবিহারী গুপ্তর তিরোভাব ঘটে ১৩৪২ সালের ১৯শে মাঘ, তাঁর রামকৃষ্ণপুরের (হাওড়া) বসতবাটীতে মাত্র ৬১ বৎসর বয়সে। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র শ্রীনির্মলকুমার গুপ্ত ও শ্রীবিমলকুমার গুপ্ত, এবং তিন কন্যা শ্রীমতী সরযূ দেবী, শ্রীমতী বিমলা দেবী ও শ্রীমতী মলিনা দেবীকে রাখিয়া যান।

উমেশচন্দ্র দত্ত

ব্রহ্মমোহন মল্লিক

অমৃতলাল বসু

রাধামাধব কর

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিদ্যাসাগর

ডেভিড হেয়ার

সূচীপত্র

প্রথম পর্য্যায়

সূচনা

প্রথম যৌবনে সুখের কল্পনা আমাদের মনোমধ্যে যে মায়াজাল রচনা করে, উত্তরকালে তাহা স্মরণ করিয়া হয়ত সকলেই দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া থাকেন ; তাই হয়ত ইংরাজ ঔপন্যাসিক লর্ড লিটন লিখিয়াছেন, 'Imagination is perhaps holier than memory,' 'কল্পনা বোধ হয় স্মৃতি অপেক্ষা পবিত্রতর'। কল্পনা নবীন-নবীনার, স্মৃতি প্রবীণ-প্রবীণার। কিন্তু যখন এমন একটি বয়ঃসন্ধিকালে উপনীত হই, যখন যৌবনে ভাটা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, সংসারের কঠিন সত্যগুলি কল্পনার অরুণরাগকে একেবারে মুছিয়া ফেলিয়া দেয়, অথচ নিজেকে প্রবীণ বলিয়া পরিচয় দিবার সময় আসিয়াছে বলিয়া মনে হয় না, তখন বোধ হয় বয়োবৃদ্ধের মুখে তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতির বিবৃতি শুনিবার জন্য একটা ঔৎসুক্য হয়। ছেলেবেলাকার রূপকথা শুনিবার প্রবৃত্তি কালক্রমে রূপান্তরিত হইয়া এইরূপে প্রকাশ পায় কিনা, বলিতে পারি না। পুরাণের কথার আলোচনায় যে মাদকতা আছে তাহাতে আমাদের হৃদয়ে পুলক সঞ্চার করে সন্দেহ নাই ; কিন্তু সেই পুরাণের কথার মধ্যে আমাদের সমাজের যে স্তরটি লুক্কায়িত আছে, সেইটিকে যদি লোক-সমক্ষে উন্মেষিত করা যায়, তাহা হইলে হয়ত ঐতিহাসিকেরও কতকটা সাহায্য হইতে পারে।

আজ এই শরতের সায়াহ্নে বীডন উদ্যানের মধ্যে সহস্র বালকের কলকণ্ঠে আমার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অনুভূতি অনেক পরিমাণে প্রতিহত হইয়া যাইতেছে। জোর করিয়া বলিতে পারিতেছি না,—

আজ নীরবে ভুঞ্জন
এই সন্ধ্যাকিরণের সুবর্ণ মদিরা,
যতক্ষণ অন্তরের শিরা উপশিরা
লাবণ্যপ্রবাহভরে ভরি' নাহি উঠে,
যতক্ষণে মহানন্দে নাহি যায় টুটে
চেতনা বেদনাবন্ধ।

হঠাৎ শুনিতে পাই, আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট কয়েকজন সপ্ততি বর্ষীয় যুবক
ক্ষমা করিবেন। সত্তর বৎসরের যুবক এবং পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় বৃদ্ধ
কি? অশীতিপর বৃদ্ধ অধ্যাপক ব্ল্যাকিকে একবার জিজ্ঞাসা করা হইয়াছি

যে, এই ছেলেদের সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়ান, আপনার বয়স কত? তিনি হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন, 'I am eighty years young,' 'আমি অশীতিবর্ষীয় যুবক।' তাই বলিতেছিলাম, কয়েকজন সপ্ততিবর্ষীয় যুবক পুরানো কথার আলোচনা করিতেছিলেন। শুনিতে শুনিতে সেই স্নিগ্ধ, শান্ত, সুন্দর শরতের আকাশ, সেই বিচিত্র জনকোলাহলপূর্ণ উদ্যান যেন এক মায়ামন্ত্রবলে আমার চক্ষুর অন্তরাল হইয়া যায়, এবং চল্লিশ বৎসরের পূর্ব্বেকার কলিকাতার একটি চিত্র আমার মনোমধ্যে অঙ্কিত হইয়া যায়। যে বিচিত্র ঘটনাপরম্পরার মধ্যে কলিকাতার হিন্দু-সমাজ গঠিত হইয়া আসিয়াছে, তাহারা কি সমাজের উপর একটিও রেখাপাত করে নাই? তাহাদের স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত আজ বিলুপ্তপ্রায়!

তখন বাঙ্গালীর সহিত ইংরাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরব্ধ হয় নাই; ইল্‌বার্ট বিল সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত; আমাদের জমিদার সভার সহিত ইংরাজ বণিকসম্প্রদায় একযোগে পরামর্শ করিয়া সরকারী বিধিব্যবস্থার সমর্থন ও প্রতিবাদ করিত; তখনও বাঙ্গালী সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে নাই; তখনও বাঙ্গালীর ছেলে ইংরেজের ফুটবল খেলায় ইংরাজকে পরাভূত করিয়া জয়ধ্বনি করে নাই। কলিকাতার বাঙ্গালী ধনকুবেরগণ ইংরাজের অনুকরণে স্ব স্ব ভবনের প্রাঙ্গণে রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের সেই অধ্যায়ে আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু), কালীপ্রসন্ন সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও পাইকপাড়ার রাজাদিগের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ইংরাজের অনুকরণে থিয়েটারের ষ্টেজ বাঁধা হইল বটে, কিন্তু যে নাটকগুলি অভিনীত হইত, তাহার প্রায় সকলগুলিই সংস্কৃত সাহিত্য হইতে গৃহীত হইয়াছিল। মাইকেল মধুসূদন ও রামনারায়ণ পণ্ডিত তখনকার নাটককার; মাইকেল অন্য হিসাবে সাহিত্যে অমর হইয়াছেন, কিন্তু এখনকার দিনে রামনারায়ণ পণ্ডিতের নাম কয়জন জানে?

ইংরাজের দেখাদেখি বাঙ্গালীরাও তখন আলাদা Race course করিয়াছিল। ঘোড়দৌড় হইত কলিকাতার উত্তরাংশে রাজা নরসিংহের বাগানে। অনুষ্ঠানের ক্রটি ছিল না,—starter ছিল, jockey ছিল, book-maker ছিল, betting ছিল। ছাতু-বাবুর দৌহিত্র শরৎবাবু, লাটুবাবুর (ছাতুবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা) পোষ্যপুত্র মন্মথবাবু, ও হাটখোলার দত্তবাবুরা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া আনিতেন। শরৎবাবু নিজেই jockey হইতেন। প্রতি বৎসরে শীতকালে ঘোড়দৌড় হইত।

সখের থিয়েটার, সখের ঘোড়দৌড় বিদেশীর অনুকরণ হইতে পারে, কিন্তু প্রতি বৎসর শীতকালে ছাতুবাবুর মাঠে যে বুলবুলির লড়াই হইত, তাহা আমাদের দেশীয় নবাবী আমল হইতে চলিয়া আসিতেছিল, আজ তাহার স্মৃতিটুকু পর্য্যন্ত বিলুপ্ত

হইয়াছে। এখন যেখানে অনাথবাবুর বাজার, গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার প্রভৃতি হইয়াছে, সেখানে কেবলমাত্র একটা প্রকাণ্ড মাঠ ছিল। শীতকালে সেই মাঠে খুব ধুমধামের সহিত বুলবুলির লড়াই হইত। অনেক তাঁবু পড়িত। পোস্তার রাজা নরসিংহ দেড়শত শিক্ষিত বুলবুলি লইয়া আসিতেন, ছাতুবাবুও দেড়শত বুলবুলি আনিতেন। উভয় দলের মাঝখানে কিছু খাদ্যদ্রব্য ছড়াইয়া দেওয়া হইত; সেই খাবার লইয়া তাহাদের লড়াই বাধিয়া যাইত। লড়ায়ে হারিয়া গেলেই পাখী উড়িয়া যাইত, অমনি অন্যদলের লোকেরা উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিত "বো মারা"। বেলা এগারটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত এই লড়াই চলিত।

এই সকল দেশী-বিদেশী আমোদপ্রমোদের দিনেও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-সন্তান তাঁহার সনাতন ফলাহারের ব্যবস্থা বিস্মরণ করেন নাই। 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটকের রচয়িতা বৈদিক ব্রাহ্মণকুলতিলক পণ্ডিত রামনারায়ণ ফলাহারের যেরূপ শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে অব্রাহ্মণেরও রসনায় রসসঞ্চার হয়। ৺শারদীয় পূজার প্রাক্কালে একবার সেই ফলাহারের কথা স্মরণ করিলে ক্ষতি কি?

ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি
দুচারি আদার কুচি,
    কচুরি তাহাতে খান দুই,
ছোকা আর শাক ভাজা,
মতিচুর, বোঁদে, খাজা,
    ফলারের যোগাড় বড়ই।
নিখুঁতি, জিলিপি, গজা,
ছানাবড়া বড় মজা,
    শুনে শক্ শক্ করে নোলা,
হরেক রকম মণ্ডা
যদি দেয় গণ্ডা গণ্ডা,
    যত খাই তত হয় তোলা।
খুরি পুরি ক্ষীর তায়,
চাহিলে অধিক পায়,
    কাতারি কাটিয়া শুখো দই,
অনন্তর বাম হাতে,
দক্ষিণা পাণের সাথে,
    উত্তম ফলার তাকে কই॥

এ তো গেল উত্তম ফলার। মধ্যম ফলার কিরূপ ?

সরু চিঁড়ে শুকো দই,
মর্ত্তমান ফাঁকা খই,
খাসা মণ্ডা পাত পোরা হয়,
বৈদিক ব্রাহ্মণে তবে
মধ্যম ফলার কবে,
দক্ষিণাটা ইহাতেও রয়।

ইহার পরে অধম ফলার। সে, কিরূপ ?

গুমো চিঁড়ে, জলো দই,
তেতো গুড়, ধেনো খই,
পেট ভরা যদি নাহি হয়,
রদ্দ রেতে মাথা ফাটে,
হাত দিয়ে পাতা চাটে,
অধম ফলার তারে কয়।

১৮৫৪ সালের 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটকের অভিনয়ের পর প্রায় ষাট বৎসর চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু পণ্ডিত রামনারায়ণের এই ফলাহারে শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি ?

পণ্ডিত রামনারায়ণের সহিত ভিখারী কবিচন্দ্রের তুলনা হইতে পারে না বটে, কিন্তু ছাতুবাবুর আসরে কবিচন্দ্র ছাগশিশু সম্বন্ধে যে গানটি গাহিতেন, বোধ হয় সেটি ফলাহার-প্রসঙ্গে খাপ খাইতে পারে। গানের প্রথমাংশ এই—

ওরে শঙ্করা,
তোর এই পাঁটা কি শির্‌খরা ?
কেটে কুটে মোটে মাটে
মাংস হোল এক সরা ?
আমরা চার ইয়ারে খেতে ব'সে
হোলো না কো পেট ভরা।

অপরাংশে শঙ্করা উত্তর দিতেছে,—

দাম বুঝে দাও,
পাঁটা নাও,
মিছে কেন চোক রাঙ্গাও ?

তোমার সবে রেস্ত একটি টাকা,
মস্ত (পাটা) কোথায় পাও ?
এ কি লক্ষ টাকার মহাভারত
পাঁচ সিকেতে সারতে চাও ?

স্বভাবকবি কবিচন্দ্রকে সকলেই ভালবাসিত। ছাতুবাবু তাহাকে গাড়িতে নিজের পার্শ্বে বসাইয়া তাঁহার পেনেটির বাগানবাড়ীতে লইয়া যাইতেন। একদিন উভয়ে বাগানে যাইবার সময় পথে একটা পলায়নতৎপর বলদের পশ্চাতে ধাবমান গোপবৃদ্ধকে দেখিলেন ; অমনি ছাতুবাবু কবিচন্দ্রকে বলিলেন, কবিচন্দ্র, যা দেখ্‌লে, ঐটি গান করতে পার ? কবিচন্দ্র বলিলেন, পারব না কেন বাবু ! তবে শুনুন—

গোয়ালের আগড় ভেঙ্গে
দামড়া গরু পালিয়ে গেল ;
পাছে কার গায়ে পড়ে
গয়লা বুড়ো তাই দৌড়াল।
বাহিরে এক ছাগল দেখে,
শুঁতোতে গেল তাকে,
ভাঙ্‌লো তার পায়ে ঠেকে
ঘোলের হাঁড়ি, বাহিরে ছিল।
ভাঙ্‌লো যেই ঘোলের হাঁড়ি,
রাগলো তায় গয়লা বুড়ী,
নিয়ে এক খ্যাংরা মুড়ি
বুড়োর পিঠে মারতে গেল !

তখন বাচ্‌খেলার বড় ধুম ছিল। এই বাচ্‌খেলা উপলক্ষে হয়ত আজকালকার হিসাবে অনেক রুচিবিগর্হিত ব্যাপার সংঘটিত হইত ; বোধ হয় এই রকম কোনও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় তীব্র কষাঘাতের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু ছাতুবাবুর পেনিটির বাগানবাড়িতে যে বাচ্‌খেলা হইত, তাহা অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের বাচ্‌খেলার ন্যায় বিশুদ্ধ sport ছিল। প্রধান পাণ্ডা ছিলেন প্রসন্ন-বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসন্ন মিত্র। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এড়িয়াদহনিবাসী, পূর্ত্তবিভাগে কর্ম্ম করিতেন ; ইডেন উদ্যান তাঁহারই তত্ত্বাবধানে করা হয়। মিত্রজ মহাশয় ছিলেন ছাতুবাবুর নাত-জামাই। উভয়ে নিজ নিজ নৌকায় বাছাই করা দাঁড়ি মাঝি লইতেন ; প্রত্যেক নৌকায় ছয় জন করিয়া দাঁড়ি থাকিত। যে নৌকা জিতিত, তাহার মাঝি এক জোড়া শাল বকৃশিশ পাইত।

উদ্যানের বেঞ্চের উপর উপবেশন করিয়া যাহাদের মুখ হইতে কলিকাতার এই পুরাতন কাহিনী শ্রবণ করিতেছিলাম, হঠাৎ তাঁহাদের মধ্যে একজন আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আমাদের প্রথম যৌবনের এই সকল আমোদ-প্রমোদের কথা তোমার হয়ত ভাল লাগিতেছে না। কিন্তু আমরা কয়জন যে কয়দিন আছি, মাঝে মাঝে আমাদের সেকালের কলিকাতার কথা আবৃত্তি করিয়া তোমাদের কর্ণকুহর ব্যথিত করিব। তাহার পরে সমস্তই মুছিয়া যাইবে। এখনই তো এক প্রকার মুছিয়া গিয়াছে। যাহা চলিয়া যাইতেছে, তোমরা তাহার স্মৃতিরক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস পাইতেছ; মন্দির উঠাইতেছ, পদক দিতেছ, tablet বসাইতেছ, মূর্ত্তি গড়িতেছ। দেখিয়া বড় আনন্দ হয়। (বাঙ্গালীর ছেলে, পুরাতনকে শ্রদ্ধা করিও। আপনার হৃদয়ের বিজন কক্ষে পুরাতনের শ্রাদ্ধোৎসব করিলে আনন্দ পাইবে, হৃদয়ে সাহস পাইবে, বাহুতে বল পাইবে, আপনার পায়ে ভর করিতে শিখিবে, ধর্ম্মভীরু হইবে, কর্ম্মে উৎসাহ বাড়িবে। কথাটা ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিও। যখন চাকরিগত-প্রাণ বাঙ্গালীর ছেলে চাকরি করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে, যদি তাহার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে বলিয়া তোমার ধারণা হয়, যদি তাহার এই দম্ভ বৃথা আস্ফালন বলিয়া তোমার মনে না হয়, তাহা হইলে তাহাকে রামগোপাল ঘোষ ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা স্মরণ করাইয়া দিও। বলিও যে স্বয়ং লাট সাহেব,—মনে রাখিতে হইবে তখনকার দিনে ছোট লাট বাঙ্গালীর মস্‌নদে ছিলেন না,—রামগোপাল ঘোষকে গভর্ণমেণ্টের চাকরি করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। রামগোপাল উত্তর করিল, 'চাকরি করিব না;—গভর্ণমেণ্টের চাকরি করিব না।' লাট সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তবে তুমি কি করিবে?' উত্তর হইল, 'আর কিছু না পারি কলিকাতার রাস্তায় পাথর ভাঙ্গিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিব।' বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদত্যাগ করিলেন, সম্পাদক বিস্মিত হইয়া জনৈক বন্ধুকে বলিলেন, 'ঈশ্বর তো চাকরি ছেড়ে দিলে; এখন খাবে কি করে?' কথাটি বিদ্যাসাগরের কর্ণে পৌঁছিলে তিনি বলিলেন, 'বোলো, মুদির দোকান ক'রে খাবে'।" বক্তা একটু থামিলেন। আমি মুগ্ধনেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাঁহার কৃশ, গৌর, সরল দেহখানি যেন হোমাগ্নি-শিখার মত দীপ্ত হইয়া উঠিল। ধীর অকম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা পুরাতনের অনুকরণ করিতেছ, অথচ স্বীকার করিতে কেন কুণ্ঠিত হও যে, অনুকরণ করিতেছ? তোমরা সভা করিয়া কাগজে ছেলেদের স্বাক্ষর লইতেছ, তাহাদের প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইতেছ যেন তাহারা পঁচিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ না করে এবং ষোড়শীর পাণিগ্রহণ করে। তোমাদের বহু পূর্ব্বে প্যারিচরণ সরকার এই রকম সভাসমিতি করিয়া বালক, যুবক, বৃদ্ধের নিকট হইতে প্রতিজ্ঞাপত্র লইয়াছিলেন, যেন তাঁহারা মদ্যপান না করেন; তাহাতে সমাজের প্রভূত উপকার হইয়াছিল। তোমরা

ত সেই পথ অনুসরণ করিয়া, সেই রকম সভাসমিতি করিয়া (তোমরা league কথাটা পর্য্যন্ত চুরি করিয়াছ) সমাজের কল্যাণ-সাধন করিতে এইরূপ বদ্ধপরিকর হইয়াছ। যে এগারজন বাঙ্গালী হিন্দুসন্তান দলে দলে সমাগত গোরা খেলোয়াড়দিগকে ফুটবলে পরাস্ত করিয়া এই অধঃপতিত বাঙ্গালী জাতির মস্তকে বিজয়মুকুট পরাইয়া দিলেন, তাঁহারা কি পঞ্চবিংশতি-ষোড়শী পরিণয়ের সন্তান ? তুমি হাসিতেছ ? কি বলিতেছ ? exception ? accident ? ষোড়শী চাই ? আচ্ছা, তাহাই হউক। কিন্তু সমাজে যে ভূকম্প উপস্থিত হইবে, তাহার আভাস কিছু পাইতেছ কি ? সে ভূকম্পে পুরাতনের একটি বৃহৎ অট্টালিকা তাহার ইট, কাঠ, চুন, সুরকি সমেত ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে ! জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর তাহার বিরাট বিপুল কায়া বিরাজিত। সেই একান্নবর্ত্তী পরিবার ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। কি বলিলে ? তাহাতে ক্ষতি কি ? আবার নূতন করিয়া ইট, কাঠ, চুন, সুরকি লইয়া নূতন হর্ম্ম্য গড়িয়া তুলিবে ? তোমাদের কবি রবীন্দ্রনাথের কথায় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে, তোমরা কি এতই শক্তিমান ? বেশ, ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারিলে তো ভালই হইতে পারে। তোমরা পাণ্ডিত্যের অভিমান কর, কিন্তু looking before and after কাজ কর কি ? পুরাতনের প্রতি অত্যন্ত অশ্রদ্ধা তোমাদের হইয়াছে, তাই বোধ হয় looking before-টা ভাল রকম হয় না, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—and after ? অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ান "এম্পায়ার" পত্রিকা হিন্দুর এই বিবাহ-সংস্কার সম্বন্ধে কি বলিতেছে, শুন :—

Another sign of the times is the suggestion put forward for the need of a Divorce Law for Hindus. It will come, we are convinced, with the passage of time.*

"অনেক দেখিলাম, কিন্তু এখনও অনেক বাকি আছে। তোমাদের কল্যাণে তাহাও দেখিতে হইবে। চলিতে হইবে চল ; কিন্তু ধীরে ধীরে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট একবার বক্তৃতার মুখে বলিয়াছিলেন, আমরা মার্কিনবাসী নক্ষত্রলোকের দিকে আমাদের মস্তক উন্নত করিয়া চলি বটে, কিন্তু আমাদের পা থাকে নিরেট পৃথিবীর উপর।"

ভদ্রলোক চুপ করিলেন। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, কিন্তু তখন দেখিলাম যে সেই বেঞ্চে উপবিষ্ট আমরা কয়জন ছাড়া আর সে বাগানে কেহ উপস্থিত নাই। হঠাৎ বাক্যের স্রোত বন্ধ হইলে সেই চন্দ্রালোকিত উদ্যানের বিজনতা যেন কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল। আমি একটু নড়িয়া চড়িয়া বসিলাম। ভদ্রলোকটি এবার একটু নরম

* ১৯১১ সালের ১৩ই আগষ্টের "বেঙ্গলী" পত্রিকায় উদ্ধৃত।

স্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন—"পুরাতন কথা কহিতে গিয়া নিজেকে সামলাইতে পারি নাই, বয়সোচিত গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারি নাই; কিছু মনে করিও না। তোমরা পুরাতনকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছ বৈ কি, সে কথা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? খাল বিল পুষ্করিণী হইতে প্রস্তর ও ধাতুমূর্ত্তি কুড়াইয়া আনিয়া সযত্নে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিতেছ; পুরাতন কীটদষ্ট পুঁথি বাহির করিয়া মুদ্রিত করিবার ভার লইতেছ, হিন্দুর পুরাণগুলিকে যত্নসহকারে অধ্যয়ন করিতেছ। বেশ ভাল কাজই করিতেছ। কিন্তু যাহা হারাইয়াছে, এক একবার মাঝে মাঝে সমস্ত বিক্ষিপ্ত চিত্ত কুড়াইয়া আনিয়া একাগ্রভাবে তাহাকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবে কি? হারানোর মধ্যে পাওয়া কাহাকে বলে বুঝিতে পার কি? একদিন সন্ধ্যাকালে অথবা প্রভাতে মেছোবাজার ষ্ট্রীটের যে একতলা বাড়িতে বিদ্যাসাগর প্রথমে বাস করিতেন, সেই বাড়িটি খুঁজিয়া বাহির করিবে কি? সেখান হইতে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাড়ির যে ঘরটিতে বিদ্যাসাগর থাকিতেন, সেই ঘরটি দেখিতে যাইতে ইচ্ছা হয় কি? সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল অবস্থায় কলেজের যে ঘরটিতে বাসা করিয়াছিলেন, সেই ঘরটি কি বিদ্যাসাগরের স্মৃতি বক্ষে করিয়া এখনও দণ্ডায়মান নাই? তাঁহারই ঘরের সম্মুখে যে মাটি তিনি কোদাল দিয়া কাটিয়া তথায় কুস্তির আখ্ড়া করিয়াছিলেন, যে মাটি তিনি নিজে গায়ে মাখিয়া কুস্তি করিতেন, সেই ভূমির সেই পবিত্র মাটি মস্তকে করিয়া একটু লইয়া আসিবে কি? সেখানে এখন মাটি আছে তো, না, সমস্ত জায়গাটা কঠিন পাষাণবৎ সানবাঁধান হইয়াছে? সেই মাটি মাখো, মাটি মাখো। গ্রীকপুরাণের অসুরের মত সে মাটি স্পর্শ করিলেই নবীন বলে বলীয়ান হইবে; মাটি মাখো, মাটি মাখো। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন তাঁহাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারি নাই, অথচ মনে বড় দম্ভ ছিল যে, তাঁহাকে চিনিতে আমার বাকি নাই। কিন্তু এখন যেন তাঁহাকে সম্পূর্ণ ভাবে সমগ্র ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি, কোথাও অসম্পূর্ণতা অনুভব করিতেছি না। তাঁহাকে হারাইয়াই কি ভাল করিয়া পাইলাম? কলিকাতা পর্য্যটন করিয়া তাঁহার পুরাতন বাসস্থানগুলি দেখিয়া আসিবার সামর্থ্য আমার নাই। বিশ বৎসর পূর্ব্বে সমস্ত কলিকাতাবাসী ছোট বড় লোক শ্মশানঘাটে যে স্থানে তাঁহার চিতা সাজাইয়াছিল, আমি এক-একদিন প্রত্যূষে সেই তীর্থস্থানে উপনীত হইয়া সেই পবিত্র চিতাভস্মের অন্বেষণ করি। হায়, তখন যদি কমণ্ডলু ভরিয়া সেই ভস্ম আনিতে পারিতাম! অনেক দিন তোমার মত অবহিতচিত্ত শ্রোতা পাই নাই, তাই আজ আমার মুখে এত কথা ফুটিয়াছে। আমি বক্তা নহি, আমি বোধ করি এতাবৎ সংসারে কোনও উপকারে আসি নাই; কিন্তু আজ যদি আমার এই কথাগুলি তোমার মনোমধ্যে একটুও চাঞ্চল্য উৎপাদন করে, তাহা হইলে ধন্য হইয়া যাইব। যদি কোনও বিজন সন্ধ্যায়

সেকালের ছায়া তোমার মনের উপর আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে কৃতার্থ হইব। পুরাতনকে শ্রদ্ধা করিও, মনে বল পাইবে, আনন্দ পাইবে। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ইদানীন্তন বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের ইতিহাসে যে রেখাপাত করিয়া গিয়াছেন, তাহা তোমাদের স্পর্দ্ধার সামগ্রী, গৌরবের জিনিস।

"বিদ্যাসাগরের কথা বলিতেছিলাম, উজ্জ্বলে-মধুরে ওরূপ সংমিশ্রণ আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রমুখ মহারথিগণের সহিত যখন তিনি একাকী শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই যোদ্ধৃবেশ আমার মনে পড়ে; আবার যখন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ী থিয়েটারের ষ্টেজ বাঁধা হইল, সেখানে তিনি মাইকেল মধুকে লইয়া রঙ্গমঞ্চের তত্ত্বাবধান করিতেন, তাঁহার সে অবস্থাও আমার বেশ স্মরণ হয়। বিদ্যাসাগরের উর্ম্মিসঙ্কুল, তরঙ্গভঙ্গভীষণ, বত্যাবিক্ষুব্ধ প্রবাহে একটি স্বচ্ছসলিলা কলস্বনা স্রোতস্বিনী ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। নিষ্কলঙ্ক ঋষিকল্প রামতনুর কথা স্মরণ করিও। কেমন করিয়া রামগোপাল, দক্ষিণারঞ্জন, রাজনারায়ণের সমসাময়িক রামতনু লাহিড়ী প্রথম ইংরাজী শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী দোষগুলি এড়াইয়া গিয়াছিলেন, সেই কথা ভাবিয়া দেখিও। প্রিন্স দ্বারকানাথের পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সত্যনিষ্ঠার কথা স্মরণ করিও। কালীপ্রসন্ন সিংহের কথা মনে পড়ে। তোমাদের সাহিত্য-পরিষদের মন্দিরে তাঁহার যে সুন্দর প্রতিকৃতিখানি বঙ্কিমবাবুর প্রতিকৃতির পার্শ্বে বসাইয়াছ, তাহা দেখিয়া আমার মনে বড় আহ্লাদ হয়। বিচিত্র বিলাস-ব্যসনের মধ্যে লালিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াও তিনি যেরূপে আপনার মনুষ্যত্ব রাখিয়া মহীয়ান্ হইয়াছিলেন, তাহা যে তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? যে ঘরটিতে কালীপ্রসন্ন, কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ কয়েকজন বন্ধু লইয়া 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' গঠিত করিয়াছিলেন, সেই ঘরটি মনে পড়ে। যে ঘরটিতে হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলী অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন, সেই ঘরটি মনে পড়ে। যে প্রাঙ্গণে রামনারায়ণ পণ্ডিতের 'বেণীসংহার নাটক' অভিনীত হইয়াছিল, সেই প্রাঙ্গনে সেই রাত্রের কথা একটিও ভুলি নাই। যে দিন রেভারেণ্ড লং সাহেবের হাজার টাকা অর্থদণ্ড হইল, সে দিন কালীপ্রসন্ন তৎক্ষণাৎ সেই টাকা আদালতে জমা করিয়া দিলেন, সে কথা তোমরা জান কি?

"আজ পুরাতনের মোহ আমাকে উতলা করিয়া তুলিয়াছে। হৃদয়ের যে গোপন কক্ষ গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে উদ্ঘাটিত হয় নাই, কি জানি আজ কেমন করিয়া সেই দূর অতীতের দিগন্ত হইতে একটা দমকা বাতাস আসিয়া তোমার সমক্ষে সেই অর্গলবদ্ধ কক্ষদ্বার মুক্ত করিয়া দিল। আমার সমস্ত সঞ্চিত বেদনা আজ এই নিশীথের বায়ুস্তরে মিশাইয়া গেল। আমার এই অফুরাণ কথা কত শুনিবে? ভাষায় কি আমি মনের

ভাব ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিতেছি? বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত কোকিলকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, 'যে কথাটি বলি বলি মনে করি বলিতে পারি না, পাখী তুই সেই কথাটি বল্ দেখি রে!' আমিও অনেক বকিলাম, কিন্তু আমি যেটি বলিতে চাহি, সে কথাটি কি গুছাইয়া বলিতে পারিলাম?

শুধু, কথার উপরে কথা,
নিষ্ফল ব্যাকুলতা!
বুঝিতে বুঝাতে দিন চলে যায়,
ব্যথা থেকে যায় ব্যথা।
মর্ম্মবেদন আপন আবেগে
স্বর হয়ে কেন ফোটে না?
দীর্ণ হৃদয় আপনি কেন রে
বাঁশী হয়ে বেজে ওঠে না?"

এক

২৪শে আশ্বিন, ১৩১৭

তখনও সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে নাই; সূর্য্যাস্তের রক্তিম আভা পশ্চিমাকাশের লঘু ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডের ভিতর দিয়া তখনও ঝিকিমিকি করিতেছিল; অদূরে সান্ধ্য-আরতির বাজনা বাজিতেছিল।

বীডন উদ্যানে একখানি বেঞ্চের উপর উপবিষ্ট আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দেখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি সস্নেহে আমার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "বোসো"। আমি তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলাম।

দু' একটি কথার পর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আপনার কখনও কোন বিষয়ে Controversy হইয়াছিল কি?" তিনি বলিলেন—"হাঁ, হইয়াছিল। এ কথা আজ কেন জিজ্ঞাসা করিলে বল দেখি?" আমি বলিলাম—"আমাদের রিপন কলেজের অধ্যাপকদিগের বিশ্রামাগারে আজ এই বিষয়ের আলোচনা হইতেছিল। আলোচনা করিতেছিলাম আমরা তিন জন—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমি। জিতেনবাবু প্রথমে এই প্রশ্ন উত্থাপিত করেন। একটু কারণ ছিল। সম্প্রতি 'সুপ্রভাত' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকখানি পুরাতন চিঠি প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রগুলি ৺রাজনারায়ণ বসুকে লেখা হইয়াছিল। একটি পত্রের একাংশে লেখা আছে,— 'কৃষ্ণকমল is no যে সে লোক; he can write and he can fight and he can slight all things divine!'[১] আমরা কিন্তু আপনার এরূপ কোনও বাদানুবাদের বিষয় অবগত নহি; তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

পণ্ডিত মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত আমার একবার controversy হইয়াছিল বটে; সে আজ অনেক দিনের কথা। 'ভারতী' পত্রিকার পুরাতন ফাইল নাড়াচাড়া করিয়া দেখিলে আমার প্রবন্ধগুলি দেখিতে পাইবে। যতদূর স্মরণ হয় প্রত্যেক প্রবন্ধের নিম্নে আমার নাম দেওয়া আছে। তর্ক উঠিয়াছিল, কোঁতের ধ্রুবদর্শন (Positivism) লইয়া। 'সুপ্রভাতের' যে সংখ্যায় উক্ত বাদানুবাদ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া দ্বিজেন্দ্রবাবুর পত্র সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, সেই

[১] "কৃষ্ণকমল is not যে সে লোক—he is a terrible fellow. He knows how to write and how to fight and how to slight all things divine.' দ্রঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য'।—সং

সংখ্যাখানি আমাকে দেখাইও। আমি তখন কলেজে অধ্যাপনা করিতাম না; ওকালতি করিতাম। রাজনারায়ণবাবু তখন কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়াছেন।

"সম্প্রতি জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের সমস্ত চিঠিপত্রগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। সেগুলি পাঠ করিয়া যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিয়াছি। অনেকদিন পূর্ব্বে যখন কোঁতের চিঠিপত্রগুলি ফরাসী ভাষায় পড়িয়াছিলাম, তখন মনে একটা বড় আকাঙ্ক্ষা হইত, যে ষ্টুয়ার্ট মিলের যাহা কিছু বক্তব্য ছিল, তিনি কোঁতের চিঠিগুলির উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন, সেইগুলি যদি পাওয়া যাইত, তাহা হইলে সেগুলি পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করা যাইত। কিন্তু এই পত্রগুলির মধ্যে সে সম্বন্ধে কিছু পাইলাম না। উক্ত দার্শনিকদ্বয়ের সম্বন্ধ কেমন রহস্যময় ও জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যিনি কোঁতের Synthetic Philosophy-র আলোচনার প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, এমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রগাঢ় তত্ত্বজ্ঞান আমি আর কুত্রাপি দেখি নাই; তিনিই আবার সেই প্রবন্ধেই কঠোর সমালোচক হইয়া কোঁৎকে বিদ্রূপ করিয়াছেন! কোঁতের শিষ্য কঙ্গ্রীভ্ মিল্‌কে একখানি পত্র লিখেন। তিনি জানিতে চাহেন, কেন ষ্টুয়ার্ট মিল্ কোঁতের এমন কঠোর ও বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা করিতেছেন। তদুত্তরে মিল্ লিখেন—আমি কোঁৎকে খুব শ্রদ্ধা করি; আমার ভয় হয় পাছে তাঁহার মন্দ ও ভ্রান্ত ভাবগুলি তাঁহার দর্শনশাস্ত্রের ভাল অংশটিকে বা নষ্ট করিয়া ফেলে; অথবা তিনি যে সুন্দর সত্য জগতে প্রচার করিয়াছেন, তাহা মানবচক্ষুকে এমন করিয়া ধাঁধা দিবে যে, লোকে তাঁহার ভ্রমগুলির প্রতি একবারও দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবে না। সত্য-মিথ্যা সকলগুলিই তাহারা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে পারে।

"তোমরা জান, ঐ ঝগড়ার সূত্রপাত কি লইয়া। ষ্টুয়ার্ট মিল চাহেন Representative Government এবং Enfranchisement of Women; কোঁৎ ঠিক বিরুদ্ধ মতের পরিপোষক—তাঁহার মতে ও দু'টা ফাঁকা অসার বস্তু। উভয়ে অনেক চিঠি লেখালিখি করিলেন; উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য হইল। কোঁৎ হতাশ হইয়া বলিলেন তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, মিল্ তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার ধ্রুবদর্শন শাস্ত্রের প্রধান উপদেষ্টা হইতে পারিবেন, এখন দেখিতেছেন, তাহা হইল না। কিন্তু যখন তাঁহার দর্শনশাস্ত্র কোঁতের জীবিকার্জ্জনের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইল, তাঁহার মাষ্টারি চাকরিটি গেল, তাঁহাকে পরীক্ষক নিযুক্ত করা হইল না, তাঁহার অত্যন্ত অর্থকষ্ট হইল, তখন ষ্টুয়ার্ট মিল্ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া মোল্‌সওয়ার্থ ও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রোট্ এবং অন্যান্য বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া কোঁতের সাহায্যার্থ চাঁদা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েক বৎসর তাঁহাকে অর্থসাহায্য করা হইলে পর কোঁতের স্বদেশবাসীরা দরিদ্র দার্শনিককে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল।

"কোঁতের অর্থকষ্টজনিত দারিদ্র্যের জন্য তিনি নিজে অনেকটা দায়ী। যখন তিনি তাঁহার পুস্তকের এক এক খণ্ড মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতেছিলেন, প্রায় প্রত্যেক খণ্ডের মুখবন্ধে তিনি Polytechnic School-এর কর্তৃপক্ষীয় কোনও না কোনও ব্যক্তির তীব্র সমালোচনা করিতেন। একবার তাহা লইয়া তাঁহাকে আদালতে মোকর্দ্দমা করিতে হইয়াছিল। কর্তৃপক্ষের মধ্যে অ্যারাগো নামক সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বেত্তা, বেশী মাহিনার একটি পদ খালি হইলে কোঁৎকে তাহা না দিয়া অন্য এক ব্যক্তিকে সেই পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কোঁৎ তাঁহার পুস্তকের মুখবন্ধে এই বিষয়ের তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। সেই প্রতিবাদ মুদ্রণকালে মুদ্রাকর প্রমাদ গণিল; সে দেখিল যে, একজন দরিদ্র ইস্কুল মাষ্টার অ্যারাগোর ন্যায় একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তির যে কড়া সমালোচনা করিতেছে, তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলে মুদ্রাকরের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। ভয়ে ভয়ে সে প্রতিবাদের কথা অ্যারাগোকে জ্ঞাপন করিল, এবং জিজ্ঞাসা করিল যে, উহা মুদ্রিত হইলে তিনি মুদ্রাকরের উপর বিরক্ত হইবেন কি? অ্যারাগো বলিলেন, 'আমি বিরক্ত হইব কেন? অঙ্কশাস্ত্রে যাহার কিছুই ব্যুৎপত্তি নাই,—না সামান্য, না বিশিষ্ট, কোনও প্রকার ব্যুৎপত্তি নাই—এমন একটা লোককে ঐ পদে উন্নীত না করিয়া যদি গণিতশাস্ত্রে বিশিষ্ট ব্যুৎপন্ন একজনকে গণিতশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া থাকি, তজ্জন্য লজ্জিত হইবার কারণ দেখি না। দর্শনকার মহাশয় আমার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন তুমি স্বচ্ছন্দে মুদ্রিত করিতে পার।' মুদ্রাকর ও প্রকাশক কোঁৎকে না জানাইয়া তাঁহার পুস্তকের গোড়ায় অ্যারাগোর চিঠিখানি সন্নিবেশিত করিয়া দিল। কোঁৎ তাহা দেখিয়া তেলেবেগুনে জ্বলিয়া গেলেন। তিনি মুদ্রাকরের নামে নালিশ করিয়া আদালত হইতে খেসারৎ পাইলেন।

"এই সব ঝগড়া বিবাদের জন্য স্ত্রীর সহিত তাঁহার বনিবনাও হইল না। স্ত্রী প্রায়ই তাঁহাকে এই দ্বন্দ্বকলহ হইতে বিরত হইতে বলিলেন। কাপ্তেনের সহিত কোঁতের স্ত্রীর পলায়ন-ব্যাপারটির যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমি সঠিক অবগত নহি; তবে তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলে কোঁৎ তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন নাই। কিন্তু ১৮৪৪ সালে চিরন্তন বিবাদ-কলহ উপলক্ষে স্ত্রী-পুরুষে আপোষে পৃথক হইলেন। সেই অবধি স্ত্রীর গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তিনি নিজের আয় হইতে বাৎসরিক দুই হাজার ফ্র্যাঙ্ক তাঁহার স্ত্রীকে দিতেন। তাঁহার যতই অর্থকষ্ট হউক, ঠিক নিয়মমত এই দুই হাজার ফ্র্যাঙ্ক স্ত্রীকে বরাবর দিতেন।

"এই সময়ে তাঁহার জীবনে একটি বিয়াট্রিচি (Beatrice)[১] দেখা দিয়াছিলেন; যুবতীর নাম ক্লোটিল্ড (Clotilde)। তাঁহার স্বামী কোনও গুরুতর অপরাধের জন্য

[১] দান্তের প্রণয়িনী।—সং

যাবজ্জীবনস্থায়ী নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। যুবতী বিশেষ গুণবতী ছিলেন ; দার্শনিক কোঁৎ মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণপ্রার্থী হইয়া বলিলেন, 'এস আমরা বিবাহ করি। আমাদের উভয়ের সাংসারিক জীবনে যে দারুণ tragedy হইয়া গিয়াছে, একবার ভাবিয়া দেখ, তাহার পর এ বিবাহে কোনও দোষ আছে কিনা।' ক্লোটিল্ড তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু সামাজিক-নীতি বিরুদ্ধ এই বিবাহে সম্মত হইলেন না। অতি অল্পদিন পরেই ক্লোটিল্ড ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন ; কোঁৎ তাঁহার Positive Politics বা ধ্রুবরাজনীতি নামক প্রকাণ্ড পুস্তকখানি ক্লোটিল্ডের উদ্দেশে উৎসর্গ করিলেন। তাঁহার নিজের এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে ক্লোটিল্ডের সহিত দেখা সাক্ষাৎ না হইলে তাঁহার জীবন কেবল দর্শনশাস্ত্রসৃষ্টি কার্য্যেই পর্য্যবসিত হইত। তিনি যে এক নূতন ধর্ম্মের প্রচারক হইতে পারিয়াছেন তাহা শুধু এক বৎসর কাল ক্লোটিল্ডের সহিত আলাপ পরিচয় কথাবার্ত্তার ফলে।

"বোধ হয়, এ প্রসঙ্গে আমার একটি নিজের কথা বলিয়া লইলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই ক্লোটিল্ড-কোঁৎ ব্যাপার অবলম্বন করিয়া ক্লোটিল্ডের বিরচিত Lucie নামক একখানি অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ দৃষ্টে আমি একটি গল্প রচনা করিয়াছিলাম। আমার পরম আত্মীয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী তাহা পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন ও আমাকে বলিয়াছিলেন—'আমার বিশেষ অনুরোধ, তুমি ইহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ কর।' পুস্তকের মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হইলে আমার মতের পরিবর্ত্তন হইল। আমি ভাবিয়া দেখিলাম যে, আমার নাম দিয়া এই গল্প প্রকাশিত হওয়া উচিত নহে। তখন আমার জীবনে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়াছে যে, আমার স্বাক্ষরিত গল্পটি প্রকাশিত হইলে লোকে নানারূপ জল্পনা-কল্পনা করিবে। আমি কালবিলম্ব না করিয়া ছাপাখানায় উপস্থিত হইলাম ; সমস্ত টাইপ্‌গুলি ওলোট্‌পালোট্ করিয়া দিয়া গল্পটি নষ্ট করিয়া ফেলিলাম ; তাহার চিহ্নমাত্রও রহিল না। পরে বিহারীর নিকট আমি অত্যন্ত তিরস্কৃত হইয়াছিলাম। আর কখনও এরূপে আমার লেখা নষ্ট হয় নাই। ফরাসী ভাষা হইতে 'পল-বর্জ্জিনিয়া' বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিলাম। বোনাপার্টের জীবন-চরিত অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, বোধ হয় লোডির যুদ্ধ পর্য্যন্ত। কবিতাও লিখিতাম।

"ষ্টুয়ার্ট মিল ও মিসেস্ টেলরের প্রণয় সম্বন্ধে সাধারণতঃ কতকগুলি বিষয় জানা আছে ; এই যে মিলের চিঠিপত্রগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাতে অনেক বিষয় পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। শ্রীমতী টেলরও মিলের ন্যায় নাস্তিক ছিলেন ; কিন্তু তিনি তাঁহার নারী-হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম, পূজারিণীর ন্যায় মিলের চরণে ঢালিয়া দিয়াছিলেন। একস্থানে তিনি লিখিতেছেন, মানুষ যে কতদূর perfection-এ পৌঁছিতে পারে,

তাহা জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্‌কে দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। শ্রীমতী তাঁহার হৃদয়ের ভাব স্বামীর নিকট গোপন করেন নাই। সমস্ত কথা তাঁহাকে বলিতেন। স্বামী বলিলেন, —'তাই ত, ইহার একটা বিধান করিতে পারা যায় না কি? ব্যাপারটা ত ভাল নয়! একটা কাজ করা যাক্,—তুমি এখন প্যারিসে গিয়া থাক না কেন? দিনকতক ছাড়াছাড়ি হইলে এ নেশা কাটিয়া যাইতে পারে।' অনেক বিবেচনা করিয়া প্যারিসে যাওয়াই সাব্যস্ত হইল। কয়েক মাস তথায় অবস্থান করিয়া শ্রীমতী টেলর তাঁহার স্বামীকে লিখিলেন— 'আমার পক্ষে এখানে থাকা নিরর্থক, ইহাতে কোনও ফল দর্শিবে না, অনুমতি কর ত ফিরিয়া যাই।' তাহাই হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সামাজিক হিসাবে এই অবৈধ সম্বন্ধ লইয়া কোনও scandal, কোনও লোকাপবাদ হইবার কোনও কথাই ছিল না। তবে মিলের পিতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, পরস্ত্রীর প্রতি এই আসক্তি অতীব গর্হিত।"

পণ্ডিত মহাশয় একটু থামিলেন। আমি বলিলাম, "এ সম্বন্ধ সম্পূর্ণ platonic ছিল বোধ হয়?"

"হাঁ, তাহাই বটে; তুমি ঠিক বলিয়াছ, এ সম্বন্ধে পাশবতা ছিল কিনা সন্দেহ; intellectual fascination অত্যন্ত প্রবল ছিল। ক্লোটিল্‌ড ও কোঁৎ ঠিক ঐ রকম ভাবেই কতকটা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। মিষ্টার টেলর উইল করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার স্ত্রীকে দান করিয়া যান। বিধবা হইবার প্রায় আড়াই বৎসর পরে মিসেস্ টেলব মিল্‌কে বিবাহ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, বিবাহের পর বেশি দিন মিসেস্ টেলর জীবিতা ছিলেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কন্যা হেলেন টেলর মিলের মৃত্যু পর্য্যন্ত কন্যার ন্যায় তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। হেলেন সেই জন্য আজীবন কুমারীব্রত পালন করিলেন। অ্যাভিনিয়নের (Avignon) নিকটবর্ত্তী যে স্থানে মিসেস্ টেলরের সমাধি হইয়াছিল, মিল্ তাহারই অতি নিকটে একটি বাগানবাড়ীতে শেষ-জীবন অতিবাহিত করিলেন। যেস্থানে বসিয়া তিনি চিঠিপত্র লেখা ও পুস্তকাদি পাঠ করিতেন, ঠিক সেস্থান হইতে তাঁহার স্ত্রীর গোর দেখা যাইত। হেলেনও বিদুষী ছিলেন; মিলের অনেক চিঠিপত্র তিনি লিখিয়া দিতেন; মিল কেবল দেখিয়া দিতেন এবং স্বহস্তে নকল করিয়া স্বাক্ষর করিতেন।

"এক একবার আমার সন্দেহ হয় যে, পিতাপুত্রের মধ্যে কাহার প্রতিভা অধিক, জেম্‌স্ মিলের না জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের? কেমন করিয়া যে তিনি তিন বৎসরের শিশুকে গ্রীক শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া ঠিক করা যায় না। তুমি যে অক্সফোর্ডে গ্রীক ভাষার অধ্যয়ন polite education-এর প্রধান অঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করিতেছ, তাহার সহিত জেম্‌স্ মিলের এ শিশু পুত্রের অধ্যাপনার কোনও বিশেষ সাদৃশ্য

দেখিতেছি না। বিশেষতঃ জেম্‌স্ মিল নিজে একজন মুচির ছেলে। সেই মুচি কিন্তু নিজের ছেলেটিকে নিজের ব্যবসায় হইতে দূরে রাখিয়া ভদ্রলোকের ছেলের মত তাহার লেখাপড়ার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু লেখাপড়া শিখিয়াও জেম্‌স্‌কে অনেক দিন অর্থকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। বেন্থামের সহিত তাঁহার পরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পত্রিকাদিতে প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি কিঞ্চিৎ পয়সা উপার্জন করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু তবুও তাঁহার দারিদ্র্য ঘুচিল না। পরে যখন তাঁহার ইণ্ডিয়া হাউসে চাকরি হইল, সেই সময় হইতে তাঁহার আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন বুঝা গেল।

"এত কষ্টের মধ্যে তিনি তাঁহার জীবনের দুইটি বড় কাজ করিয়া ফেলিয়াছিলেন; —ছেলেটিকে মানুষ করিয়া তুলিলেন, এবং তাঁহাব ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা শেষ করিলেন। দেখ, আমার একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল; আমার বিশ্বাস ছিল যে জেমস্ মিল্ ইণ্ডিয়া হাউসে চাকরি করার পর তাঁহার ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন; কারণ, সেই সময়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাগজপত্র দেখিবার তাঁহার খুব সুযোগ হইয়াছিল। এখন আমাব সে ভ্রম অপনোদিত হইয়াছে; এখন দেখিতেছি যে, ইণ্ডিয়া হাউসে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার ইতিহাস-রচনা শেষ হইয়া গিয়াছিল। তিনি ছেলেটিকে লইয়া যখন পদব্রজে ভ্রমণ করিতে বাহির হইতেন, তখন মুখে মুখে তাহাকে অর্থশাস্ত্র (Economics) সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন। বাড়িতে ফিরিয়া আসিলে বালক পিতার নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া পিতাকে দেখাইত; মনের মত না হইলে বালকের উপব আবাব লিখিবার আদেশ হইত। এমনই করিয়া তিনি পুত্রকে মানুষ করিয়া তুলেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে জেম্‌স্ মিলেব মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি পুত্রকে ইণ্ডিয়া হাউসে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শেষ পর্য্যন্ত মিল্ চাকরি করিয়া বাৎসরিক পনেব শত পাউণ্ড পেন্সন লইয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

"পার্লামেন্টে প্রবেশ করিবার জন্য যখন মিলকে অনুবোধ করা হয়, তিনি বলিলেন, আমি candidate হইতে রাজি আছি, কিন্তু এক পয়সাও খরচ কবিব না। কেহ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হয় নাই। একবার তিনি মেম্বর হইয়াছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয় বাবের সময় লোকে সন্দেহ করিল যে, তিনি ব্র্যাডলকে পার্লামেন্টে প্রবেশ করাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তখন তাঁহার পৃষ্ঠপোষকগণ তাঁহাকে ত্যাগ করিল। মিল্ কিন্তু নিজে বলিতেন যে, ব্র্যাডল ঘটিত ব্যাপারে তাঁহার কোনও অনিষ্ট হয় নাই; তাঁহার পৃষ্ঠপোষকদিগের Organisation ভাল ছিল না। তাই তিনি হটিয়া গেলেন।

"কার্লাইলের সম্বন্ধে মিলের খুব উচ্চ ধারণা ছিল। কিন্তু তবুও তিনি লিখিয়াছেন যে, মানবের মনোবিকাশের খানিক দূর পর্য্যন্ত কার্লাইলকে পাঠ করিলে উপকার হইতে পারে; একটু উপরে উঠিলে আর চলিবে না। তবে তখনও কার্লাইলের রচনা পাঠে

অনেক আনন্দ অনুভব করা যায়। তিনি কার্লাইলের হস্তলিখিত পুঁথি French Revolution খানি হারাইয়া ফেলিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইয়া কার্লাইলকে পুনশ্চ ঐ গ্রন্থ লিখিতে অনুরোধ করিলেন; এবং কার্লাইলের অবস্থা ভাল ছিল না, তাই তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে জোর করিয়া টাকা দিলেন। কার্লাইল তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"গ্ল্যাড্‌ষ্টোন্ সম্বন্ধে মিল্ একস্থানে লিখিয়াছেন যে, যদি তিনি যথার্থই বড় লোক হইতেন তাহা হইলে কখনই Franco-Prussian যুদ্ধ হইতে দিতেন না। তিনি যদি বলিতেন যে, ফরাসি ও প্রুসিয়ার মধ্যে যে প্রথমে সৈন্য-চালনা পূর্ব্বক বিপক্ষকে আক্রমণ করিবে, তাহার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের সমস্ত নৌবাহিনীর অভিযান হইবে, তাহা হইলে কি ঐ যুদ্ধ বাধিতে পারিত?

"দেখ, কার্লাইলের স্ত্রীর সহিত যে মতের অনৈক্য ও বিরোধের কথা ফ্রুড প্রচার করিয়াছেন, সেটা না কি ঠিক নয়। দম্পতীর মধ্যে না কি প্রগাঢ় প্রীতি ছিল। মিলের পত্রে কিন্তু এ বিষয়ের উল্লেখ নাই।

"তাঁহার কয়েকখানা পত্রে হার্বার্ট স্পেন্সরের দার্শনিক মত লইয়া অনেক তীব্র সমালোচনা আছে; পাঠ না করিলে তাহার সম্পূর্ণ রসগ্রহণ করিতে পারিবে না। স্পেন্সরের Relativity ও Conservation of Energy—এ দুটার কোনটিই তিনি পছন্দ করেন না। তাঁহার Universal Postulate মিলের একেবারেই অসহ্য।

"বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদপ্রার্থী Dr Martineau তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি বলিলেন, 'আপনাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি; কিন্তু আপনার পক্ষ সমর্থন করিলে আর এক জনকে ত্যাগ করিতে হয়। তিনি অনেকটা আমার দার্শনিক মতের পরিপোষক। আমার মতাবলম্বী লোক অল্প; আশা করি, আপনি দুঃখিত হইবেন না।'"

বীডন্ উদ্যানে একখানি বেঞ্চের উপর উপবেশন করিয়া রিপন কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয়ের সহিত এইরূপ আলাপ করিতে করিতে লক্ষ্য করি নাই যে, একে একে প্রায় সকল ভদ্রলোকই উদ্যান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। একজন হিন্দুস্থানি দ্বারবান পণ্ডিত মহাশয়কে সেলাম করিয়া বলিল, "বাবুজি, বহুৎ রাৎ হুয়া।"

পণ্ডিত মহাশয় উঠিলেন। আমিও উঠিলাম। একটু দাঁড়াইয়া তিনি বলিলেন—"যে পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রবাবুর চিঠিখানি প্রকাশিত হইয়াছে, সে পত্রিকাখানা আমাকে একবার দেখাইও। আমার মনে হয়, ভগবানকে লইয়া তর্ক হইয়াছিল; আমি বোধ হয় বলিয়াছিলাম, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ (omnipotent) ও সর্ব্বজ্ঞ (omniscient)

তাঁহাকে all-merciful বলা কিছুতেই যায় না। এই কথাতেই বোধ হয় দ্বিজেন্দ্রবাবু আপত্তি করিয়াছিলেন। কিন্তু জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের সহিত আমার ঐক্যমত দেখিতে পাইবে। মিল্ বলিতেন, ঐ তিনটি attributes একত্র করিয়া এক পরমপুরুষ কল্পনা করা যাইতে পারে না; জোর এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, সমগ্র বিশ্বের মধ্যে একটা ভালর দিকে ঝোঁক—a tendency towards the good—কল্পনা করা যাইতে পারে; তেমনই একটা মন্দের দিকে ঝোঁকও কি কল্পনা করা যাইতে পারে না? কোঁৎ বলেন যে, ভগবানকে একেবারে বাদ দিতে হইবে; যাহা বিজ্ঞানের অজ্ঞেয় তাহাকে সম্মুখে খাড়া করিয়া জ্ঞানের পথ রোধ করিও না। অবশ্যই theology জগতে কতকটা উপকার সাধন করিয়াছে,—সমাজের কল্যাণকার্য্যে অনেকটা পুলিশ প্রহরীর মত কাজ করিয়া আসিতেছে; কিন্তু theology-র দিন চলিয়া গিয়াছে।"

গৃহে ফিরিবার সময় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্রের একটি ছত্র আমার মনে হইতে লাগিল—"he can write, and he can fight, and he can slight all things divine!"

দুই

৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩১৭

আজ পূজ্যপাদ পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলিলাম, "রামেন্দ্রবাবুর বিশেষ অনুরোধ যে, আমি আপনার পুরাতন কাহিনী শুনিয়া কোন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করি। আপনি স্বয়ং লিখিতে পারিবেন না; আপনার নিকট শুনিয়া আমি আপনার কথাগুলি যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করিয়া আপনাকে শুনাইব; পরে আপনার কথামত আবশ্যক পরিবর্ত্তন করিয়া পত্রিকায় প্রকাশ করিব। Modern Review পত্রিকায় শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় Men I have seen প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি মনীষী ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিতেছেন; আপনার বিদ্যাসাগব মহাশয়ের সঙ্গে আশৈশব ঘনিষ্ঠতা ছিল; আমরা মনে করি, আপনি তাঁহার সম্বন্ধে এমন অনেক কথা বলিতে পারিবেন যাহা অন্য কেহ পারিবেন না। ৺জষ্টিস দ্বারকানাথ মিত্র সম্বন্ধে আপনার কাছে অনেক কথা শুনিয়াছি; আজ সেইগুলি ভাল করিয়া শুনিয়া কাগজে প্রকাশ করিয়া আরও দশ জনকে শুনাইবার ইচ্ছা করিয়াছি।"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "আমি ঠিক ধারাবাহিক একটানা বলিতে পারিব কি? কথাবার্ত্তার মাঝখানে প্রসঙ্গক্রমে দু'টা কথা বলিয়া যাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে আপনার প্রথম পরিচয় কিরূপে হয়?"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "তখন আমার বয়স আন্দাজ ৬।৭ বৎসর; বোধ হয় ইংরাজি ১৮৪৭ সাল হইবে। আমি আমার দাদার[১] সঙ্গে সংস্কৃত কলেজে যাইতাম। তিনি আমাকে একটা বেঞ্চে বসাইয়া রাখিতেন। এই রকম ২।৫ দিন যাইতে যাইতে একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে বলিলেন, 'আয় তোকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দি।' তখন কোনও ছাত্রের বেতন দিবার পদ্ধতি ছিল না; কাজেই ইস্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার প্রতিবন্ধক হইল না।

"তখনও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই; একটা Council of Education ছিল। সেই কাউন্সিলের অধীনতায় সংস্কৃত কলেজের একজন সেক্রেটারি ছিলেন,—তাঁহার নাম রসময় দত্ত। রসময় বাবু Small Cause Court-এর জজ ছিলেন; তিনি প্রত্যহ বেলা ৩টার সময় কলেজে আসিতেন ও ঘণ্টাখানেক সব কাগজ-পত্র ও ক্লাসগুলি দেখিতেন। তাঁহার সহকারী সম্পাদক ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়[২]; তিনি সমস্ত

[১] রামকমল ভট্টাচার্য।—সং

[২] ১৮৪৬, ৬ই এপ্রিল হইতে ১৮৪৭, ১৬ই জুলাই পর্যন্ত।—সং

দিনই কলেজে থাকিতেন। সেক্রেটারি হিসাবে রসময় বাবুর মাসিক বেতন ছিল একশত টাকা; বিদ্যাসাগর মহাশয় পাইতেন পঞ্চাশ টাকা মাত্র।

"ইস্কুলে ভর্ত্তি হইয়াই আমার 'মুগ্ধবোধ' পড়া আরম্ভ হইল। প্রথম দুই বৎসর ৺প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে অধ্যয়ন করিলাম। তিনি মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যাপক কালীকৃষ্ণ পণ্ডিতের পিতৃব্য। তৃতীয় বৎসর ৺গোবিন্দ শিরোমণি মহাশয়ের ক্লাসে ও চতুর্থ বৎসর ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কাছে 'মুগ্ধবোধ' অধ্যয়ন করিলাম। বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'সোমপ্রকাশ' কাগজের সম্পাদক ছিলেন। এই চারি বৎসরে 'মুগ্ধবোধ' পড়া শেষ হইল। ইস্কুলে যাইবার সময় ও ইস্কুল হইতে আসিবার সময় পথে দাদার কাছে ব্যাকরণ আবৃত্তি করিতাম।

"ইতিমধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় চাকরি ত্যাগ করিলেন। রসময় বাবুর সঙ্গে তাঁহার কি একটা বিষয় লইয়া ঝগড়ার মত একটা কিছু হইয়াছিল। অনেক দিন পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়েব কাছে এই ব্যাপার সম্বন্ধে একটা কথা শুনিয়াছিলাম। রসময়বাবু যখন শুনিলেন যে, তিনি চাকবি ত্যাগ করিয়াছেন, তখন না কি বলিযাছিলেন —'ঈশ্বর ত চাকরি ছেড়ে দিলে; এখন খা'বে কি কবে?' কথাটা যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কানে পৌঁছিল, তখন তিনি বলিলেন—'বোলো, মুদির দোকান ক'রে খাবে!'

"সেই সময়ে ফোর্ট উইলিযম কলেজের জন্য একজন পণ্ডিতের প্রয়োজন হওয়ায় বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই চাকরি পাইলেন। মাসিক বেতন আশী টাকা। এই সময়ে তিনি 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' বহিখানা লিখেন। এই বহি তাঁহার প্রথম রচনা।

"কিছুদিনের মধ্যে বীটন্ (J. Drinkwater Bethune) সাহেবের সঙ্গে বিদ্যসাগর মহাশয়ের পরিচয় হইল। বীটন্ সাহেব তখন কাউন্সিল অভ্ এডুকেশনের প্রেসিডেন্ট। তিনি সংস্কৃত কলেজ পরিচালনের নূতন ব্যবস্থা করিলেন; সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পদ লুপ্ত কবিযা দিলেন। তাঁহাদের পরিবর্ত্তে একজন প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত করাই স্থির হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের প্রথম প্রিন্সিপ্যাল হইলেন;[১] মাসিক বেতন তিনশত টাকা হইল। তাঁহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ার পরেও পাঁচ ছয় বৎসর আমি সংস্কৃত কলেজে পড়িয়াছিলাম।

"এখন তিনি সংস্কৃত কলেজের একরকম আমূল সংস্কার করিলেন। মোটামুটি এই কয়টা কথা বলিলেই বুঝিতে পারিবে:—

১। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ব্যতীত অন্য কোনও বর্ণের সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না। তিনি ব্যবস্থা করিলেন, বর্ণনির্ব্বিশেষে হিন্দুর ছেলেমাত্রই কলেজে পড়িতে পারিবে।

---

১ ১৮৫০, ৫ই ডিসেম্বর।—সং

২। ছাত্রদিগের নিকট হইতে বেতন লওয়া আরম্ভ হইল।

৩। ব্যাকরণ পড়ানর সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল; 'মুগ্ধবোধ' উঠাইয়া দিয়া 'উপক্রমণিকা' পড়ান আরম্ভ হইল।

৪। অধিক ইংরাজি পড়াইবার ব্যবস্থা হইল। এত দিন ছাত্রেরা ইংরাজি মাষ্টারের কাছে ইচ্ছামত অধ্যয়ন করিত। দুইজন ইংরাজি শিক্ষক ছিলেন; ছেলেদের ইচ্ছা হইলে তাঁহাদের কাছে অধ্যয়ন করিত। এখন হইতে ইংরাজি পড়া কয়েক ক্লাস উপর হইতে Compulsory হইল।

৫। সংস্কৃত গণিত—লীলাবতী, বীজগণিত ইত্যাদি পড়া উঠিয়া গেল। ইংরাজিতে অঙ্কশাস্ত্র পড়া আরম্ভ হইল। অঙ্কের অধ্যাপক হইলেন শ্রীনাথ দাস; ইংরাজির অধ্যাপক প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী। আমি তাঁহাদের উভয়ের কাছেই পড়িয়াছি।

"এই সকল পরিবর্ত্তন যে বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং করিলেন, ইহাতে তাঁহার উপরওয়ালাদের কোনও হাত ছিল না, এমন কথা আমি বলিতেছি না। কিন্তু ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি না থাকিলে তখনকার হিন্দুসমাজের গোড়ামির দিনে সংস্কৃত কলেজে এত পরিবর্ত্তন হইতে পারিত না।

"নূতন নিয়মে পড়ান হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের Education Despatch-এর ফলে, গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের ভাঙ্গাগড়া হইল। শিক্ষা-বিভাগের একজন ডাইরেক্টর নিযুক্ত হইলেন। অনেক বাঙ্গালা ইস্কুল স্থাপিত হইল, ইস্কুলের ইন্স্পেক্টরও নিযুক্ত হইলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের প্রিন্সিপ্যাল রহিলেন এবং ইস্কুলের পরিদর্শক হইলেন।[১] এখন তাঁহার মাসিক বেতন হইল পাঁচ শত টাকা। সেই সময় সংস্কৃত কলেজে একজন সহকারী প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হইলেন।

"এই সময়ে ধীরে ধীরে বাঙ্গালীর মন বাঙ্গালা ভাষার দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল। এখনকার বাঙ্গালা সাহিত্যের বনিয়াদ প্রস্তুত করা আরম্ভ হইল। প্রসন্নবাবু বাঙ্গালায় পাটিগণিত লিখিলেন। আমার দাদা তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রসন্ন বাবুর সংস্কৃত অঙ্কশাস্ত্র পড়া ছিল না, তাই তাঁহার পাটিগণিতের সমস্ত terminology (যথা—বর্গ, ঘন, বর্গমূল, ঘনমূল, করণী, ত্রৈরাশিক, ভগ্নাংশ, গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক, লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণীতক ইত্যাদি) আমার দাদা করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পাটিগণিতের প্রথম সংস্করণে তাঁহার প্রিয় ছাত্র রামকমল ভট্টাচার্য্যের নাম এই জন্য বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালায়

[১] নদীয়া, মেদিনীপুর, হুগলী এবং বর্দ্ধমান জেলার পরিদর্শক হন।—সং

ভূগোল লিখিলেন। আজ পর্য্যন্ত তাঁহারই terminology প্রচলিত। সকলের অপেক্ষা অধিক লিখিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়,—

(১) জীবন চরিত—Chamber's Biography-র অনুবাদ;
(২) বাঙ্গালার ইতিহাস—Marshman-এর অনুবাদ;
(৩) মহাভারতের উপক্রমণিকা;
(৪) বোধোদয়;
(৫) ব্যাকরণ কৌমুদী;
(৬) ঋজুপাঠ;
(৭) Expurgated রঘু, কুমার, ভারবা, মাঘ।

"১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে য়ুনিভার্সিটি স্থাপিত হইলে, ঐ বৎসরই আমি এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় শুনিলেন যে, আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইতেছি। তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; আমাকে বলিলেন,—'তুমি ষোল টাকা বৃত্তি নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে যা'চ্চ; আমি বলি, তুমি মেডিক্যাল কলেজে যাও, ডাক্তারি পড়, আমি তোমার আটাশ টাকা বৃত্তি ক'রে দেবো।' আমার কেমন দুর্ব্বুদ্ধি, আমি তাঁহার কথা শুনিলাম না; প্রেসিডেন্সি কলেজেই ভর্ত্তি হইলাম। এই রকম একগুঁয়েপনা আমার বরাবর রহিয়া গেল। ভবিষ্যতে এমন অনেকবার আমি শুধু যে তাঁহার কথা অমান্য করিয়াছি তাহাই নহে, তাঁহার উপর অভিমান করিয়া, রাগ করিয়া তাঁহাকে অনেক কড়া কথা লিখিয়াছি। অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তি আমার 'বিচিত্রবীর্য্য'-এর প্রশংসা করিয়াছিলেন; তাই আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আমার বইখানি পড়িতে অনুরোধ করি। মাস তিনেক পরে বহিখানি আমাকে ফিরাইয়া দিয়া তিনি বলিলেন,—'ওরে, আমার এমন সময় হচ্চে না যে, তোর বইখানা পড়ি।' আমার বড় রাগ হইল। আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া একেবারে Byron-এর English Bards and Scotch Reviewers-এর মত চারি পাঁচ শত লাইন পয়ার লিখিয়া ফেলিলাম। রাগ হইল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর, কিন্তু আমি রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি অনেককে জড়াইয়া ফেলিলাম। একটু একটু এখনও মনে আছে। ষোলো-সতের বৎসর বয়সে 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ'[১] নামক একখানি পুস্তক আমি রচনা করিয়াছিলাম; সেইটির উল্লেখ করিয়া এই কবিতার গোড়াপত্তন করিলাম।

যৌবনের রক্তজোরে হইয়া উদ্দাম,
লিখেছিনু গল্প এক "দুরাকাঙ্ক্ষ" নাম

[১] ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।—সং

পাগল বলিয়া তাহে কেহ দিল গালি,
বুঝিতে পারি না বলি কেহ দিল আলি,
বালিশতা বলি উপহাস করে কেহ,
কেহ বা তাহারে কহে অশ্লীলের গেহ।
এইরূপে সবে তার নিন্দা একটি করে,
পয়সা দিয়া কিনিল না কেহই সাদরে।
তা' বোলে কি ছেড়ে দিব লেখা একেবাধে,
যখন বোকার দল ঘেরিল সংসারে ?
ক অক্ষর গোমাংস যাহাদের পেটে,
বানান করিতে যারা মরে দম ফেটে,
যা' দি'কে দেখিলে মোরে দংশে যেন অহি,
এরূপ লোকের সব বিকাইছে বহি !

"কবিতার মধ্যে বাল্মীকির কথা আসিয়া পড়িল,—

নরমুণ্ড জমা করি যে করিত স্তূপ,
যে ছিল জঙ্গলা পথে ডাকাইত ভূপ,
* * *
সে বাল্মীকি বহুকাল করিয়া কঠোর,
রামায়ণে কবে মোহ-রজনীর ভোর।

"কালিদাসের কথাও পাড়িলাম,—

যখন যে ডালে বসে কাটে সেই ডাল
কালিদাস তপোবলে হোলো সুকপাল।

"সকলেরই কপাল খুলিল, আমারই কেবল কপাল খুলিল না! হ্যাম্‌লেটের কথাগুলি আমার মস্তিষ্ককে যেন নাড়াচাড়া দিতে লাগিল। আমিও আবৃত্তি করিয়া লইলাম,—

সুখদুঃখশবলিত এই যে জীবন,
যাহারে সকলে কহে অমূল্য রতন,
অশেষ যন্ত্রণাজাল যাহে ঘেরিয়াছে,
দণ্ডধারী যম যার ধাইতেছে পাছে,
কষ্টসিন্ধুতরঙ্গে যা হয় বিলোড়ন,
দৈব যত্নপরি করে বিশিখ বর্ষণ,

লোকে কেন এরে ইচ্ছা করি নাহি ছাড়ে,
কেন নাহি ফেলে দেয় মরণের গাড়ে?
মরণ নিদ্রায় সুখে হইয়া শয়ান
বিস্মৃতিকুহরে লীন হইবেক প্রাণ।
সে নিদ্রার ভিতরেতে আছে কি স্বপন?
আর কি চেতনা হয় প্রাণের তখন?
এই ভাবি লোকে নাহি হয় আত্মঘাতী,
এই ভাবি বর্ত্তমান লয় মাথা পাতি।
নতুবা কে বল দেখি বাঁচিতে চাহিত,
জীবন দুর্ব্বহ ভার বল কে বহিত,—
যখন খুলিয়া এক নিশিত কৃপাণ
সমুদয় দুঃখবহ্নি হইত নির্ব্বাণ।

"পরক্ষণেই বায়রণকে স্মরণ করিয়া বলিলাম—

তাদৃশ ক্ষমতাবল যদিও না ধরি,
তথাপি, রাজেন্দ্র, তুমি মম যোগ্য অরি।
কখনও মাছের* মত মারহ ঠোক্কর
দু' এক খানি সংস্কৃত গ্রন্থের উপর।
গাধারে পিটিলে কভু হয় নাকি ঘোড়া?
লুই কি ধোয়ালে হয় গঙ্গাজলে জোড়া?
হাজার সাধনা কিম্বা করিলে প্রয়াস
মূর্খ কভু নাহি পায় লিখিয়া সাবাস॥

এ পয়ারটিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আরও কড়া কথা শুনাইয়া দিয়াছিলাম। 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায় কিন্তু প্রকাশ করি নাই।

"আমি সংস্কৃত কলেজ ছাড়িবার বৎসর খানেক পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় চাকরি ত্যাগ করিলেন।[১] শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর গর্ডন ইয়ং সাহেবের সঙ্গে তাঁহার বনিবনাও হইল না। কাউয়েল সাহেব সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হইলেন।

"এক বৎসর পরে কাহাকেও কিছু না বলিয়া পশ্চিমে যাইলাম। পরে ১৮৫৯-৬০

* বিবিধার্থ-সংগ্রহ নামক পত্রিকাতে তিনি একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম Roach ও Dace বিলাতে দুই প্রকার মাছ।

[১] ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে।—সং

খৃষ্টাব্দে বি. এ. পাশ দিলাম। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে আমার দাদা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেন।[১] সুতরাং আমাকে চাকরি করিতে হইল। ইস্কুলের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর হইলাম। ইন্‌স্পেক্টর উড্রো সাহেব আমায় বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার স্ত্রীও বিদুষী ছিলেন। ফরাসী ভাষায় লেখা বহি আমি তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম। তিনি আমার উচ্চারণের বড় প্রশংসা করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের কাছে কখনও মাথা হেঁট করিতাম না। সেটা যে চাকরির পক্ষে ভাল, তাহা বলিতেছি না। অনেক সময় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতাম। এই যে ভাব, এটা আমার মনে হয় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে অত নিবিড় ভাবে ছেলেবেলা হইতে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় হইয়াছিল। এখন অনেক বয়স হইয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে তৎকালে আমার যে এই প্রকার বৃত্তি ছিল, তাহা কেবল মূর্খতামূলক এবং অনভিজ্ঞতাজনিত। এখন আমি ভাবিয়া লজ্জিত হই যে, সেই মূর্খতা ও অনভিজ্ঞতাবশতঃ আমার হিতৈষী অনেক ব্যক্তির প্রতি যে প্রকার কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শন করা উচিত ছিল তাহা আমার করা হয় নাই। ইংরাজিতে যে একটা কথা আছে Might have been আমার তাৎকালিক পূর্ব্বোক্ত আচরণ সেই কথারই একটি উদাহরণস্বরূপ। উড্রো সাহেব এক দিন আমায় বলিলেন,—'এস, আমার গাড়ীতে এস। তোমার বাড়ি অনেক দূর, তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আমি যাব।' আমি বলিলাম,—'No, thank you, I shall walk home.' তিনি আমাকে তাঁহার নিজের খরচে বিলেত পাঠাইবার মৎলব করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, আমি সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষা পাশ করিয়া আসি। কিন্তু তাহা হয় নাই, কারণ হিসাব করিয়া দেখা গেল, তখন সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দেওয়ার বয়সের যে নিয়ম ছিল, আমার পরীক্ষা দিবার সময় তাহা উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে।

"১৮৬২ খৃষ্টাব্দে আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের Junior Professor of Vernacular পদে নিযুক্ত হইলাম। ছয় মাস পরে রামচন্দ্র মিত্র অবসর গ্রহণ করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় ছোটলাট Sir Cecil Beadon-কে বলিয়া আমাকে Senior Professor পদে নিযুক্ত করাইয়া দিলেন, আর রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে Junior Professor করাইয়া দিলেন। আমি বাঙ্গালা পড়াইতাম। কাশীদাস ও কৃত্তিবাস লইয়া আরম্ভ করা হইল। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য পুস্তক যেমন প্রকাশিত হইতে লাগিল, অমনি আমি কলেজে পড়াইতে লাগিলাম। কৃষ্ণ বন্দ্যোর 'ষড়দর্শন', হেম বন্দ্যোর 'চিন্তাতরঙ্গিণী', 'মেঘনাদবধ' প্রভৃতি ধরাইলাম।

"কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মিচেল সাহেব হিন্দুদর্শনের উপর স্বতন্ত্র দুইটি Prize Essay লিখিয়াছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সন্দর্ভের নাম Dialogues

[১] 'প্রকৃতপক্ষে রামকমল ভট্টাচার্য ১১ই জুলাই আত্মহত্যা করেন।' দ্রঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।—সং

on Hindu Philosophy. মিচেল সাহেবই প্রাইজ পাইলেন। কৃষ্ণমোহন নিজের সেই dialogue-গুলি বাংলায় অনুবাদ করিয়া নানা খণ্ডে ষড়দর্শন সন্দর্ভ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সেই সন্দর্ভ, চিন্তাতরঙ্গিনী, মেঘনাদবধ, বেকনের সন্দর্ভ ও লালমোহনের অলঙ্কারনির্ণয় আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচিত করিয়াছিলাম। তখন পাঠ্যনির্ব্বাচন সমিতি (Text-book Committee) ছিল না।

"হেমবাবুকে জনসাধারণের কাছে বোধ হয় আমিই পরিচিত করি। হাওড়ার হিতকারী পত্রিকায় আমি 'চিন্তাতরঙ্গিণী'র সমালোচনা করিয়া তাহার ভালমন্দ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছিলাম। Byron-এর Don Juan হইতে যে অংশ তিনি ছাঁকা তর্জ্জমা করিয়াছেন, অনুবাদ হিসাবে তাহা মন্দ হয় নাই। আমার দাদার 'বেকনের সন্দর্ভ'ও কলেজে পড়ান হইত। রাসবিহারী (Dr Ghosh) শুধু এই বইখানা পড়িয়া বি. এ. পাশ হইয়াছিলেন। অনেক দিন পরে একদিন রাসবিহারী আমাকে হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, 'আমি বাংলা কিছুই জানিনা, অথচ বাংলার paper-এ আমি ফাঁকি দিয়া আপনার নিকট হইতে full number লইয়াছি।' আমি কহিলাম—'এখন তুমি ও কথা বলিতেছ, কিন্তু তখন পরীক্ষা পাশ হ'বার গরজে বেকনের সন্দর্ভখানি খুব ভালরূপই আয়ত্ত করিয়াছিলে তাই full number পাইয়াছ। তোমার মত বুদ্ধিমান ছেলে যদি কোন বিষয়ে মন দিয়া লাগে তাহা হইলে কি তাহার চূড়ান্ত না করিয়া ছাড়ে ?'

"শুধু বাঙ্গালা পড়াইয়া আমার তৃপ্তি হইত না। কাউয়েল্ সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একটু একটু সংস্কৃত পড়ান আরম্ভ করিয়া দিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল একেবারেই 'কাদম্বরী' আরম্ভ করি। সাহেব বলিলেন, 'ওটা too ambitious'। কাজেই 'ঋজুপাঠ' তৃতীয় ভাগ লইয়া সংস্কৃত ক্লাস আরম্ভ হইল। ক্রমে 'কুমার', 'বেণীসংহার' ইত্যাদি পাঠ্যপুস্তকের তালিকাভুক্ত হইল।

"বাঙ্গালা পড়ুয়ার শেষ দলের মধ্যে ছিলেন রাসবিহারী, সংস্কৃত পড়ুয়ার প্রথম দলের মধ্যে ছিলেন সারদাচরণ মিত্র।

"রাসবিহারীর এক বৎসর পূর্ব্বে গুরুদাস পড়িয়াছিলেন। মেঘনাদবধ পাঠ্যগ্রন্থ ছিল। গুরুদাস বিশেষ যত্নের সহিত ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং এখন পর্য্যন্ত আমার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ হইলে আমি গ্রন্থের কোন স্থান কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছিলাম তাহা স্মরণ করাইয়া দেন। আমি অবশ্য সে সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছি; কিন্তু অত বড় এক ব্যক্তি তাঁহার বাল্যকালে,—একপ্রকার ক খ শিখিবার সময়ে বলিলেই হয়, আমার নিকট কখন কি শুনিয়া যে মনে রাখিয়াছেন তাহা অবগত হইয়া আমার অবশ্যই বিশেষ প্রীতিলাভ হয়।

"সারদা খুব ভাল সংস্কৃত শিখিয়াছিল; ৺তারানাথ তর্কবাচস্পতির 'আশুবোধ ব্যাকরণ' একেবারে কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল। সংস্কৃত ক্লাসের অধিকাংশ ছেলেই প্রায় পলাইত; সারদার পড়ার আগ্রহ দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইতাম,—যেমন ইংরাজী সাহিত্যে, তেমনই সংস্কৃতে।

"আমার ছাত্রদিগের আমি পরীক্ষক হই, এটা ভাল নহে, ইহা বিবেচনা করিয়া আমি স্বেচ্ছায় পরীক্ষক হইলাম না। সেইবার হইতে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন পরীক্ষক নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু আমার ছাত্রেরা খুব উচ্চস্থান অধিকার করিত; সারদা সকলের অপেক্ষা ভাল ছিল। সংস্কৃত কলেজের ছেলেরা পারিয়া উঠিত না।

"কেহ কেহ মনে করেন যে, আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের পদত্যাগ করিয়াছিলাম কারণ তৎকালে Principal Sutcliffe সাহেবের সহিত সম্পূর্ণ বনিবনাও হয় নাই। লোকের এই ধারণাটি নিতান্ত অমূলক। আমি মুক্তকণ্ঠে অম্লানবদনে বলিতে পারি যে, যে দশ বৎসর আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে চাকরি করিয়াছিলাম বরাবরই সাহেব আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিয়াছিলেন; একদিনের তরেও কখনও কথান্তর হয় নাই। যদিও আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কখনও তাঁহার নিকটে অধ্যয়ন করি নাই, তথাপি তিনি জানিতেন আমি তাঁহার ছাত্রদিগের সমসাময়িক ও সমকক্ষ, এবং চিরকালই আমার প্রতি সেইরূপ আচরণ করিতেন। যখন আমি পদত্যাগ করি, তাহার পূর্ব্বেই আমি সে বিষয়ের অগ্রসংবাদ দিয়া রাখিয়াছিলাম; কিন্তু ইতিমধ্যে আমার পরিবারে এক ঘোরতর দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া আমাকে একেবারে অভিভূত করিয়া দিল। একথা শুনিয়াও সাহেব লোক পাঠাইলেন; পুনঃ পুনঃ আমাকে এরূপ অভিপ্রায় জানাইয়াছিলেন যে, ইচ্ছা করিলে আমি আবার আসিয়া চাকরি রক্ষা করি। কিন্তু আমি আর তাহা করিলাম না।"

তিন

পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে আজ প্রথমেই বিদ্যাসাগরের প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিলাম, "দেখুন, তাঁহার বিষয়ে যাহা কিছু লিখিত হইতেছে সমস্তই তাঁহার হৃদয়ের উদারতা দেখাইবার জন্য। বিদ্যাসাগর ত দয়ার সাগর বটেই; কিন্তু তাঁহার intellect-এর দিক হইতে তিনি আপনার নিকট কিরূপ প্রতীয়মান হইয়াছিলেন, আজ সেই কথা আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন। তাঁহার সাধারণ কথাবার্ত্তা কিরূপ ছিল?"

তিনি বলিলেন—"কথাবার্ত্তা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ডাক্তার জন্‌সনের অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। মেকলে ডাঃ জন্‌সন্ সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, বোধ হয় তোমার মনে আছে। যিনি লিখিবার সময় গম্‌গমে Johnsonese ও Latinisms ছাড়া কিছুই লিখিতে পারিতেন না, তিনি কিন্তু সাধারণ কথাবার্ত্তায় একটিও ল্যাটিন কথা ব্যবহার করিতেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সাধারণ কথাবার্ত্তায় সংস্কৃত শব্দ আদৌ ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার লেখা পড়িলে মনে হয় যে, যেন তিনি সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত আর কিছুই জানেন না; কিন্তু লোকের সঙ্গে মজ্‌লিসে কথা কহিবার সময় এমন কি বাঙ্গালা Slang শব্দ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না—'ফ্যাপাতুড়ো খাওয়া' (to be confounded), 'দহরম মহরম', 'বনিবনাও', 'বিধঘুটে', 'বাহবা লওয়া'—এই রকমের ভাষা প্রায়ই তাঁহার মুখে শুনা যাইত। যাহাকে সাধু ভাষা বলে তিনি সে দিকেই যাইতেন না। 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি পুস্তকের রচয়িতা সম্বন্ধে লোকের সাধারণতঃ ধারণা হয় যে, তিনি নিশ্চয়ই শক্ত শক্ত সংস্কৃত কথা ভালবাসিতেন, এবং তাঁহার রচনাও সেই প্রকার শব্দেই গঠিত। কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ভাষার উপরে আপনার Style গঠিত করিয়াছিলেন তাহা সংস্কৃত গ্রন্থের ভাষা নহে; সেই সময়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা কথোপকথনে যে ভাষা ব্যবহার করিতেন সেই ভাষাই বিদ্যাসাগরের রচনার বনিয়াদ। একটা উদাহরণ দিয়া আমি এই বিষয়টা ভাল করিয়া তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি। 'মহাসমারোহে' এই কথাটা সাধারণে যে অর্থে ব্যবহার করে তিনিও সেই অর্থে সর্ব্বদাই ব্যবহার করিতেন; অথচ সংস্কৃত ভাষায় কুত্রাপি সমারোহ ও অর্থে ব্যবহৃত হয় না,—ও কথার ও অর্থ হইতে পারে না; উহা একেবারে ভুল।

"একটিবার আমার স্মরণ হয় যে, সাধারণ কথাবার্ত্তার মধ্যে তিনি একটি বড় গোছের সংস্কৃত কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন,—কথাটি 'স্বরূপযোগ্যতা।' এই শব্দটি ন্যায়-শাস্ত্রের ভয়ানক কঠিন একটি পারিভাষিক শব্দ; ইংরাজীতে ইহার অর্থ এইরূপ করা যায়—Fitness *per se*। যে উপলক্ষে তিনি এই কথাটি ব্যবহার করিয়াছিলেন সেটি

এই :—একদিন আমি তাঁহার সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম, এমন সময় দ্বারবান আসিয়া তাঁহার হাতে একখানা চিঠি দিল। চিঠিখানি পড়িয়া তিনি আমাকে বলিলেন, 'প্রসন্নকুমার ঠাকুর আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। দেখ, আমরা এক দেশের লোক, এক জাত, এই সহরের ভিতরেই আছি, তিনি ডেকে না পাঠিয়ে একবার এসে দেখা কর্‌লেই পার্‌তেন। সাহেবেরা যদি এই রকম চিঠি দিয়ে আমাদের ডেকে পাঠায় ত যাওয়া উচিত মনে করি ; স্বদেশীর সঙ্গে আসা যাওয়ার স্বরূপযোগ্যতা আছে, সাহেবদের সঙ্গে সেটা নেই।'—অবশ্যই তিনি দেখা করিতে যান নাই।

"আজকাল একটু আধটু সংস্কৃত ভাষা শিখিয়াই কেহ কেহ সংস্কৃতে কথা কহিতে প্রবৃত্ত হয়, তিনি একেবারেই তাহা পছন্দ করিতেন না। একদিন এক জন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়া সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দি:ত জবাব দিতে লাগিলেন। আমি কাছে বসিয়া ছিলাম। আগন্তুকের ভাষা অশুদ্ধ ও ব্যাকরণদুষ্ট। বিদ্যাসাগর কথা কহিতে কহিতে aside আমাকে বলিলেন—'এ দিকে কথায় কথায় কোষ্ঠশুদ্ধি হোচ্চে, তবুও হিন্দি বলা হবে না!' এই ঘটনাব অনেক বৎসর পরে নীলাম্বরের বাড়ীতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এই হিন্দুস্থানী পণ্ডিতটির কথা আমি স্মরণ করাইয়া দিলে তিনি প্রাণ খুলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

"তিনি বলিতেন যে, একালে প্রকৃত সংস্কৃত লেখা অসম্ভব, যাহা লেখা যায় সবই গোঁজামিল। কিন্তু আমার মনে হয় যে, ইদানীং যত লোক সংস্কৃত রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে বিদ্যাসাগরের রচনাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ; তিনি 'উত্তরচরিত', 'শকুন্তলা' ও 'ঋজুপাঠ' তৃতীয় ভাগের টীকায় স্থলে স্থলে যৎকিঞ্চিৎ সংস্কৃত লিখিয়াছেন। তাহা অতি সুন্দর, এমন কি প্রাচীন সংস্কৃতের ন্যায় বোধ হয়।

"একদিন কালিদাস ও সেক্ষপীয়র সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলাপ করিতেছিলাম। বিদ্যাসাগর কালিদাসের এমন একান্ত ভক্ত ছিলেন যে, কালিদাস যে কাহারও অপেক্ষা হীন এ কথা একেবারেই স্বীকার করিতে চাহিতেন না। আমি হেম বাবুর 'ভারতের কালিদাস জগতের তুমি' এই কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় তিনি রাগিয়া উঠিলেন ও বলিলেন, 'হেম বাবুর এ কথা বলিবার অধিকার নাই। সে ত সংস্কৃত জানে না।' আমি তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বলিলাম যে হেমবাবুর অভিপ্রায় বোধ হয় এই কথা প্রকাশ করা যে, ইংরাজ সর্ব্ববিষয়ে যেমন শ্রেষ্ঠ তেমনই উহাদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব আছে। কথাটা তাঁর মনে লাগিল। আগ্রহের সহিত ইংরাজের নানা বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন,—'বটেই ত, খেতে, বস্‌তে, শুতে, বেড়াতে, সব বিষয়েই ইংরাজ শ্রেষ্ঠ।'

"বিদ্যাসাগরের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বাঙ্গালা-সাহিত্য গঠনে কি প্রকার বিকাশ

পাইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু এই সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি তাঁহার রাজতক্তের নিকট আর কাহারও আসন হইতে পারে, একথা কল্পনা করিতেও পারিতেন না। তাঁহার এই literary jealousy সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। দেখ, আমার মনে হয় যে, যেমন জগৎ-সংসারে তেমনই ভাষার মধ্যেও একটা natural selection আছে; নহিলে শ্যামাচরণ সরকার, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল, মদনমোহন, তারাশঙ্কর, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, হরিনাথ শর্ম্মা, যাঁহা'রা প্রত্যেকেই সাহিত্যের,—আমাদের যে নূতন বাঙ্গালা সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছিল সেই সাহিত্যের,—এক একটি দিক্‌পালরূপে গণ্য হইবার উপযুক্ত, তাঁহারা কোথায় পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন; একা বিদ্যাসাগরের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রহিল!

"শ্যামাচবণ সরকার ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন; ল্যাটিন ও গ্রীক্ জানিতেন। পণ্ডিতের দল তাঁহাকে বিদ্রূপ কবিতেন; সংস্কৃত 'সাহিত্যদর্পণ'কারের ভাষায় ভরতশিরোমণি তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিতেন—অষ্টাদশভাষাবারবিলাসিনীভুজঙ্গঃ (the fancyman of eighteen courtezans of languages)। শ্যামাচরণ বাবু যখন সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন, তখন ইংরাজী সাহিত্যের প্রধান শিক্ষক ছিলেন রসিকলাল সেন। শ্যামাচরণ বাবু খাঁটি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় একখানা ব্যাকরণ লিখিযাছিলেন। এখন মনে হয় যে, বইখানি বাস্তবিকই খুব ভাল হইয়াছিল; কিন্তু যেমন পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল, অমনই বিদ্যাসাগর সে বইখানাকে pooh pooh করিলেন, আমরাও সকলে বিদ্যাসাগরের সহিত যোগ দিলাম। শ্যামাচরণ বাবু মাথা তুলিতে পারিলেন না। ইহার পরে Hindu Law সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তির জন্য হাইকোর্টের জজরাও তাঁহার প্রশংসা করিতেন। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহাকে চিরদিনের জন্য হারাইল।

"কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় Encyclopaedia Bengalensis ও মহাভারতের ইংরাজী তর্জ্জমা লিখিয়া আপনার কৃতিত্ব দেখাইলেন। Encyclopaedia-তে ইংরাজী ও বাঙ্গালা পাশাপাশি ছাপা হইয়াছিল। ইংরাজি তাঁহার নিজের রচনা ছিল না। বামপৃষ্ঠে কোনও ইংরাজি গ্রন্থ, দক্ষিণ পৃষ্ঠে তাঁহার রচিত বাঙ্গালা অনুবাদ, এই প্রণালীতে ঐ পুস্তকগুলি প্রচারিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর কিন্তু তাঁহাকে মোটেই দেখিতে পারিতেন না; কেবল বলিতেন, 'লোকটার রকম দেখছ? টুলো পণ্ডিতের মত কথায় কথায় ভট্টির শ্লোক quote করে।'

"রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর বলিতেন, 'ও লোকটা ইংরাজিতে একজন ধনুর্দ্ধর পণ্ডিত, কহিতে লিখ্‌তে খুব মজবুত, কিন্তু সাহেবদের কাছে বোলে বেড়ায়—'ইংরাজি আমি যৎসামান্য জানি; যদি কিছু আমার জানা শুনা থাকে তা' সংস্কৃতশাস্ত্রে।'

ইহাতে সাহেবেরা মনে ভাবেন—বাস্ রে, ইংরাজিতে এত সুপণ্ডিত হোয়ে যখন সে বিদ্যেকে যৎসামান্য বলে, তখন না জানি সংস্কৃততে এর কতই বিদ্যে আছে! এইরূপ কোনও এক আসরে বিদ্যাসাগরের নিজের মুখেই শুনিয়াছি, তিনি কোনও পদস্থ সাহেবকে বলিয়াছিলেন, 'তোমাদের মত বুদ্ধিমানও নেই, নির্বোধও নেই; তোমরা যে বুদ্ধিমান, তাহা বলা বাহুল্য; তোমাদের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় চতুর্দ্দিকে দেদীপ্যমান; কিন্তু তোমাদিগকে নির্বোধ এই জন্য বলি যে, আমাদের দেশের অকর্ম্মণ্য অনেক ব্যক্তি তোমাদের কাছে বেশ পশার করিয়া লইয়াছে; আমরা তাহা দেখিয়া অবাক হইয়া যাই।' রাজেন্দ্রলালের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' কোথায় ভাসিয়া গেল!

"ইহার একটা কারণ বেশ বুঝা যাইত। বিদ্যাসাগর মহাশয় ভাবিতেন সংস্কৃত না জানিলে কেবল ইংরাজিতে ব্যুৎপত্তি থাকিলে বাঙ্গালা ভাষার গঠন বিষয়ে কেহই সহায়তা করিতে পারে না। একজন লোককে তিনি সুখ্যাতি করিতেন, তিনি অক্ষয়কুমার দত্ত। কিন্তু তাঁহার সুখ্যাতির মধ্যেও যেন damning with faint praise ছিল। তিনি বলিতেন—'অক্ষয় লিখ্‌তে টিখ্‌তে বেশ পারে, আমি দেখে শুনে দি, অনেক জায়গায় লিখে সংশোধন করে দিতে হয়।' কিন্তু আমার মনে হয় না যে, অক্ষয় দত্ত বিদ্যাসাগরের সংশোধনে বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন। দু'জনের Style, ভাব, লিখিবার বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

"মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জন্য আমার বড় আপশোষ হয়। স্কুলে যত দিন শিক্ষক ছিলেন, সেই সময়েই তিনি বাঙ্গালা সাহিত্য-চর্চ্চা করিতেন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়ার পর আর সে দিকে নজর দেন নাই। তাঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা তাঁহাকে যে স্বাতন্ত্র্য-দান করিয়াছিল, সেই স্বাতন্ত্র্য বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা অমূল্য জিনিষ। সেই স্বাতন্ত্র্যই বাঙ্গালা সাহিত্যকে বৈচিত্র্য দান করিতে পারিত, শুধু বিদ্যাসাগরের ভাষাই বাঙ্গালার একমাত্র উপকরণ হইয়া থাকিত না। কিন্তু তিনি সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালা-সাহিত্যচর্চ্চাও ছাড়িলেন। যিনি 'বাসবদত্তা'র প্রণেতা তাঁহারই 'শিশুশিক্ষা' এখনও আমাদের ছেলেমেয়েদের উপভোগ্য জিনিষ। তাঁহার 'পাখী সব করে রব' কবিতাটি কোন্ শিশু না সুর করিয়া আবৃত্তি করিয়াছে? তিনি 'সর্ব্বশুভকরী' নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকাও সম্পাদন করিয়াছিলেন।

"কুক্ষণে মদনমোহন বীটন সাহেবের মেয়ে স্কুলে (Bethune College) নিজের মেয়েকে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মেয়ে এই প্রথম ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠান হইল দেখিয়া সাহেবেরা অত্যন্ত খুসী হইলেন। মদনমোহন স্কুল ছাড়িয়া 'জজের পণ্ডিত' হইলেন, মাসিক বেতন দেড়শত টাকা। তখনকার এই 'জজের পণ্ডিত' একজন Law Officer, জজদিগকে Hindu Law ব্যাখ্যা করিয়া দিবার ভার,

তাঁহার উপর ছিল। কিছুকাল পরেই তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে আর তাঁহার অনুরাগ রহিল না। সাহিত্যচর্চ্চা হইতে তিনি তফাৎ হইয়া পড়িলেন।

"মদনমোহন প্রবাস হইতে মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিলে সংস্কৃত কলেজে বেড়াইতে আসিতেন। বহরমপুর হইতে আসিয়া একদিন তিনি প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। আমি তখন তর্কবাগীশ মহাশয়ের ক্লাসে পড়ি। তর্কবাগীশ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ও দেশের লোকজন কেমন? ভদ্র লোকের মতন বটে?' মদনমোহন উত্তর করিলেন, 'মহাশয়, সে কথা বলিবেন না; অধিকাংশ লোক এরূপ যে, শাঠ্য, লাম্পট্য, কাপট্য, ব্যতিরেকে পদবিন্যাসটিমাত্র নাই।' ফলতঃ সংস্কৃত সুদীর্ঘশব্দঘটা যেন মদনমোহনের তুণ্ডাগ্রে সর্ব্বদা বিদ্যমান ছিল। তিনি যেন সে বিষয়ে এক জন স্বভাবসিদ্ধ বাগ্মী ছিলেন।

"আমার মনে আছে, তিনি একবার সর্ব্বশুভকরী পত্রিকাতে 'অসামান্যশেমুসীসম্পন্ন' এইরূপ শব্দপ্রয়োগ করিয়াছিলেন। বোধ হয় বিদ্যাসাগরও শেমুসী (আভিধানিক শব্দ=বুদ্ধি) শব্দ প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন। সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা মদনমোহনের সংস্কৃত কলেজের শিক্ষকতার সময়ে তাঁহারই উদ্যোগে আবির্ভূত হইয়াছিল, কিন্তু কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পরই অদর্শন হইল। পত্রিকাখানি সংস্কৃতবহুল প্রগাঢ় রচনার চূড়ান্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল। কিন্তু এই মদনমোহনই আবার তাঁহার 'বাসবদত্তা' নামক পদ্যগ্রন্থে অতি সরল প্রাঞ্জল বাঙ্গালা ভাষার চমৎকার নমুনা দেখাইয়া গিয়াছেন। লোকটি নিঃসন্দেহ বিশ্ববলিনী শক্তির (Versatility) অধিকারী ছিলেন।

"বাঙ্গালা সাহিত্য যে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নিকট কতটা ঋণী তাহা বোধ হয় তোমরা ঠিক অনুভব করিতে পার না। তিনি রোমের ও গ্রীসের ইতিহাস বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন; কিন্তু তাঁহার 'সোমপ্রকাশ' বাঙ্গালা ভাষাকে ও বাঙ্গালা সাহিত্যকে গৌরবশ্রী দান করিয়াছিল। সুন্দর সরল বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, পলিটিক্স, আলোচিত হইতে লাগিল। বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রকার ভাব প্রকাশ করিবার এরূপ ক্ষমতা আছে, ইহা পূর্ব্বে লোক ভাল করিয়া ধারণা করিতে পারে নাই।"

"এই সময়ে তারাশঙ্কর 'কাদম্বরী'র এবং হরিনাথ শর্ম্মা 'মুদ্রারাক্ষস'-এর বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।"

চার

১৫ কার্ত্তিক, ১৩১৭

পণ্ডিত মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "৺দ্বারকানাথ মিত্রের কথা আমার নিকট হইতে শুনিতে চাহ; সে ত আর এক ঘণ্টার কর্ম্ম নহে। এতাবৎ আমার যত লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইয়াছে, তাহার মধ্যে ৺দ্বারকানাথ মিত্রের মত সমুজ্জ্বল ধীশক্তি-সম্পন্ন লোক, এমন brilliant intellect, আমার নয়ন-গোচর হয় নাই। বাইশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন; বত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ না হইতেই তিনি হাইকোর্টের জজ হয়েন। অন্ততঃ দশ বৎসর ওকালতি না করিলে হাইকোর্টের জজ হওয়া যায় না, এই নিয়ম না থাকিলে তিনি যে আরও পূর্ব্বে জজ হইতেন না, এমন কথা বলা যায় না। গ্রে সাহেব তখন বাঙ্গালার ছোটলাট; সার বার্ণস্ পীকক্ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। যখন সকলেই মনে করিয়াছিল যে জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় হাইকোর্টের জজ হইবেন, তখন হঠাৎ একদিন লাট সাহেব দ্বারিবাবুকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার হাইকোর্টের জজ হইতে আপত্তি আছে কি?, দ্বারিবাবু উত্তর করিলেন, 'না।' লাট সাহেব বলিলেন, 'Did you apply for the post?' উত্তর হইল, 'No, I thought that these appointments did not go by application.' কয়েক দিবস পরেই তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি হইলেন।

"তাঁহার সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়, আমার বন্ধু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের বাড়ী। প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগেন্দ্র আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন। দ্বারিবাবু শুনিয়াছিলেন যে, আমি কিছু কিছু কোঁৎ পড়িতাম; তাই আমার সহিত আলাপ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয়; দ্বারিবাবু তৎকালে কোঁতের পাকা শিষ্য হইয়াছিলেন। আন্দাজ ১৮৬৫ সালে তাঁহার সহিত আমার প্রথম আলাপ পরিচয় হয়। ওকালতিতে তখন দ্বারিবাবুর খুব প্রতিপত্তি। রাইয়ৎদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যে বিরাট মোকদ্দমা তিনি চালাইয়াছিলেন, সেটা The Great Rent Case নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রধান বিচারপতি পীকক্ তাঁহার প্রতিভার প্রশংসা করিলেন। দ্বারিবাবু দশ বৎসর ওকালতি করিলেন; কিন্তু একদিনের জন্যও কার্য্যে শৈথিল্য প্রকাশ করেন নাই। প্রত্যহ রাত্রি দুইটা তিনটা পর্যন্ত মোকর্দ্দমার কার্য্য করিতেন, তাহার পরে কোঁতের এক chapter না পড়িলে তিনি কিছুতেই ঘুমাইতে পারিতেন না। বেলা আটটা নয়টার সময় তিনি শয্যা হইতে উঠিতেন। বেড়ান কি অন্য কোন রূপ ব্যায়াম তাঁহার ছিল

না; আদালতে যাওয়া আসা গাড়ীতেই হইত। তিনি পাশা খেলিতে খুব ভাল বাসিতেন, দাবাও খুব ভাল খেলিতে পারিতেন, কিন্তু পাশাই খুব বেশী খেলিতেন।

"জজ হইয়া প্রথম প্রথম তিনি প্রধান বিচারপতির সহিত বসিতেন। তিনি বলিতেন, 'দেখুন, আমি চিফ্‌এর সঙ্গে বোসে অনেক শিখ্‌চি।' সার বার্ণ্‌স্‌ও প্রত্যহ রাত্রি দুইটা পর্যন্ত আইন অধ্যয়ন করিতেন। দ্বারিবাবুর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় স্নেহ ছিল। যে দিন একটা ইংরাজী পত্রে জনৈক শ্বেতাঙ্গ দ্বারিবাবুর তথা হাইকোর্টের প্রতি বিদ্রূপ করিয়া একখানা চিঠি লিখিয়া কলিকাতা হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল, সেই রাত্রিতে সার বার্ণ্‌স্‌ দ্বারিবাবুকে ডাকাইয়া সেই অপরাধীর নামে এক পরোয়ানা জারি করিলেন। সাহেবকে ধরিয়া আনা হইলে সে ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

"সার বার্ণ্‌স্‌ কার্য্য হইতে অবসর লইলে একবার হাইকোর্টের অন্যান্য বিচারপতিদিগের সহিত দ্বারিবাবুর মনোবাদ হয়। তিনি আমায় বলিতেন, দেখুন, Resignation (পদত্যাগপত্র) আমার পকেটে রেখে দিয়েছি, যখন ইচ্ছে দোবো।' আদালতের কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে বিচারপতিগণ একত্র মিলিত হইয়া মধ্যে মধ্যে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। একবার তর্কস্থলে সার লুইস্‌ জ্যাক্‌সন 'But my dear fellow' বলিয়া সম্বোধন করায় তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'I protest against being addressed in that way.' জ্যাক্‌সন্‌ সাহেব ক্ষমা প্রার্থনা কবিলেন। কিন্তু দ্বারি বাবুর মৃত্যুতে যখন হাইকোর্ট শোক প্রকাশ কবেন, এই জ্যাক্‌সন সাহেব জজদিগের তরফ হইতে তাঁহার যেরূপ প্রশংসা করিয়াছিলেন, সেরূপ প্রশংসাবাদ আর কখনও হাইকোর্টে শুনা যায় নাই। প্রধান বিচারপতি সাব রিচার্ড কাউচ আইনসম্পর্কীয় ছাড়া অন্য বিষয়ে বড় একটা বেশী কথাবার্ত্তা কহিতে পারিতেন না; তাই শোক-প্রকাশ করিবার ভার জ্যাক্‌সন্‌ সাহেবের উপর পড়িয়াছিল। আমি সে সময় আদালতে উপস্থিত ছিলাম। এখনও জ্যাক্‌সন সাহেবের কথাগুলি আমার বেশ মনে পড়ে।

"ইংরাজী সাহিত্যে ও অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তখনকার দিনে লাইব্রেরি পরীক্ষা দিতে পারা বড় সম্মানের বিষয় ছিল। তিনি হুগলি কলেজ হইতে হিন্দুকলেজে আসিয়া কিছুদিন পরে লাইব্রেরি পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ঐ পরীক্ষা দিবার জন্য তিনি Alison's Europe-এর আট ভলুম আট দিনে পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিতেন যে, অঙ্কেও তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারিতেন, অন্যায় করিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু কলেজের জনৈক ছাত্রকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া হইল। তিনি স্বয়ং দেখিয়াছেন যে, হলে একজন পরীক্ষক উক্ত ছাত্রের খাতায় অঙ্ক কসিয়া দিলেন। এখন তাঁহাদের কেহই জীবিত নাই। তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিয়া এ কলঙ্কের কথা প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি আমার নাই।

"কোঁতের দর্শনশাস্ত্র যে দ্বারিবাবুর জীবনে কিরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল তাহা চিন্তা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বাস্তবিক কোঁৎ দ্বারিবাবুর ধর্ম্মোপদেষ্টা গুরুর স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি কেবলই বলিতেন যে, হয় আমরা কোঁৎকে সমগ্র মানব-সমাজের গুরু বলিয়া গ্রহণ করিব, নহে ত মানব সমাজ উৎসন্ন হইয়া যাইবে। ষ্টুয়ার্ট মিলও এক দিন এ কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, সমগ্র মানবসমষ্টির পূজা একটি অত্যন্ত সুন্দর ideal। দ্বারিবাবুকে মিলের মত নাস্তিক না বলিয়া আমি তাঁহাকে অজ্ঞেয়বাদী (agnostic) বলিতে চাহি। তিনি ঈশ্বর, পরকাল, স্বর্গ নরক ইত্যাদি কিছুই মানিতেন না।

"কোঁতের পুস্তক যখন তিনি পড়েন নাই, তখন প্রথম নেপোলিয়ানের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল ; কিন্তু পড়িয়াই তাঁহার মতের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল। কোঁৎ নেপোলিয়ানকে যেরূপ গালি দিয়াছেন, বোধ হয় আর কেহই সেরূপ দেয় নাই। দ্বারিবাবুও শেষাশেষি নেপোলিয়ানকে অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতেন। Franco-Prussian War-এর সময় যে দিন কলিকাতায় সংবাদ আসিল যে, সেডান্ ক্ষেত্রে ফরাসী সম্রাট দেড়লক্ষ ফৌজের সহিত বিপক্ষহস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, সে দিন দ্বারিবাবুর প্রাণে যেন একটা ছট্‌ফটানির মত দেখিলাম ; তিনি ঘৃণায় কর্সিকার ও কর্সিকার গোষ্ঠীর নামোল্লেখ করিয়া চৌদ্দ পুরুষান্ত কবিলেন। এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার সেই মূর্ত্তি আমার স্মৃতিপথে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে, এবং তাঁহার ক্রোধের তীক্ষ্ণতা মনে করিলে এখনও আমার হাসি আসে।

"কোঁৎ তিন প্রকার বিবাহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন:—প্রথমতঃ Civil marriage, এ স্থলে বিবাহ একটা চুক্তিমাত্র ; দম্পতির অমিল হইলে এ বিবাহ বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ Religious marriage, এ সম্বন্ধ ধর্ম্মের সম্বন্ধ, ইহা চিরদিনের জন্য অবিচ্ছিন্ন ; বিপত্নীক কিম্বা বিধবা কেহই দ্বিতীয় বার বিবাহ করিতে পারিবেন না। আর এক প্রকার বিবাহকে তিনি Chaste marriage আখ্যা দিয়াছিলেন, এ বিবাহে স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধ হইয়াও কোন কারণ বশতঃ সহবাস করিবে না ;—হয় ত শারীরিক বা মানসিক ব্যাধি এমন কিছু আছে যাহা সন্তানের পক্ষে মঙ্গলকর নহে।

"কোঁতের ভক্ত শিষ্য দ্বারিবাবু স্ত্রীবিয়োগের পর দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিয়া প্রকাশ্যতঃ কোঁতের আজ্ঞা এক প্রকার উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে তাঁহা কর্ত্তৃক করা হইয়াছিল। সে সম্বন্ধে তিনি কেবল এইমাত্র দোষ-প্রক্ষালন স্বরূপ বলিতেন, 'কি করি? প্রতিদিন আহারের সময় মা নিকটে আসিয়া চোখের জল ফেলেন ; আর কত দিন মা'র এই ভাব দেখিতে পারি? কিন্তু আমার

দোষ হইয়াছে বলিয়া আমার গুরুদেবের উপর দোষস্পর্শ হওয়া ত উচিত নয়।' তদুত্তরে আমি কেবল এই মাত্র বলিয়াছিলাম, 'লোকে বোলবে কি জানেন?—যে doctrine লোকের conduct inspire কোর্‌তে না পারে তা'র value কি?'

"প্যাট্রিয়টের[১] সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কিছু কিছু পান-দোষ ছিল। সেই দেখাদেখি go-ahead যুবকের দলের অনেকে মদ খাইতে শিখিয়াছিলেন; বোধ হয় দ্বারিবাবুও প্রথম তাঁহাদেরই দলের একজন হইয়াছিলেন। কিন্তু কোঁতের পুস্তক পাঠ করার পর তিনি মদ একেবারে ত্যাগ করিলেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি মদ স্পর্শ করেন নাই; কিন্তু শেষাশেষি তিনি পুনরায় মদ ধরিয়াছিলেন। কোঁতের নিষেধ যে তিনি এতদিন মানিয়া চলিতে পারিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে।

"Distincton of function অর্থাৎ অধিকারভেদ কোঁতের একটি প্রধান কথা। Temporal Power ও Spiritual Power স্বতন্ত্র হওয়া চাহি, ইহা তাঁহার দর্শনের Cardinal Point। দ্বারিবাবুও বোধ হয় সকল বিষয়েই এই মতের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন। কারণ, তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, Legislatör এবং Judge দুইজনের কার্য্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। উভয়ের মধ্যে একজন অন্যের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। একবার লাট সাহেবের ব্যবস্থাপক সভা হইতে একটা আইন সম্বন্ধে হাইকোর্টের মত জানিতে চাওয়া হয়। দ্বারিবাবু মত দেন নাই। তিনি লিখিলেন, 'It is not my function;—my function is to interpret the law; not to make the law.' সকলেই বুঝিলেন তিনি কেমন করিয়া Jus dicere হইতে Jus facere পৃথক রাখিতেন।

"দ্বারিবাবু সংস্কৃত জানিতেন না; কিন্তু Hindu Law সম্বন্ধে যে কয়টি নজির রাখিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্ম-দর্শিতা ও সারগ্রাহিতার পরিচায়ক। দায়ভাগসম্মত উত্তরাধিকার-ব্যবস্থা Law of Inheritance and Succession তিনি যেরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধরূপে ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন, আমার বোধ হয় যে, আমাদিগের কোনও অধ্যাপকের দ্বারা তাদৃশ অতি পরিষ্কার ব্যাখ্যা সম্পাদিত হইতে পারিত না। তাঁহার একটা বিশেষ চেষ্টা ছিল যে, হিন্দু বিধবা যদি স্বামীর বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইয়া ভ্রষ্টা হয়, তাহা হইলে সে সেই বিষয় ভোগ করিতে পারিবে না, এই রকম কিছু করা যায় কি না। ফুলবেঞ্চে চৌদ্দজন জজের মধ্যে এই বিষয় মীমাংসিত হয়; দ্বারিবাবুর পক্ষে মাত্র দুইজন জজ—Justices Kemp and Glover—মত দিয়াছিলেন।

[১] হিন্দু প্যাট্রিয়ট।—সং

"পিতার মৃত্যুর পর দ্বারিবাবু পিতৃশ্রাদ্ধ করেন নাই। তিনি বলিতেন, 'আমার যখন কিছুতেই বিশ্বাস নাই; আত্মা, ভগবান, পরকাল কিছুতেই বিশ্বাস নাই, তখন আমি লোক-দেখানো কেনই বা পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে যাই?' কিন্তু আমার বোধ হয় যে, তৎকালে যদি তাঁহার কোঁতের সহিত বিশেষ পরিচয় থাকিত, তাহা হইলে তিনি সামাজিক নিয়মে পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। কারণ, কোঁতের আর এক প্রধান কথা এই—To destroy, you must replace, অর্থাৎ যতক্ষণ সাবেকের বদলে নূতন কিছু জুটাইতে পারিতেছ না, ততক্ষণ সাবেক বজায় রাখাই কর্ত্তব্য। অন্যান্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের মত কোঁৎ নূতন ধর্ম্মপ্রচার-কালে প্রাচীন ধর্ম্মপ্রণালীগুলির প্রতি কিছুমাত্র দোষারোপ বা কটাক্ষপাত করেন নাই। তিনি অনেক বার রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়কে চাঁদাস্বরূপ টাকা দিয়াছেন। তিনি বলিতেন, 'কেন দিব না? ক্যাথলিক ধর্ম্ম এক সময়ে জগতের অনেক উপকার করিয়াছে, এখনও করিতেছে, আমি সেই জন্য তাহাকে শ্রদ্ধা করি।' তিনি তাঁহার দর্শন শাস্ত্রেব এক স্থানে লিখিয়াছেন—Positivism regards all the past creeds as so many preparations for the demonstrated faith। কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়কে অবজ্ঞা করা যায় না। তবে হিন্দু সমাজকে এরূপ ভাবে আঘাত করা কি উচিৎ?

"আর একটি কথা। শ্রাদ্ধের উৎসবের অনুরূপ একটি অনুষ্ঠান কোঁতের পঞ্জিকাতেও রহিয়াছে; তফাতের মধ্যে এই যে, শুধু আমার পিতৃপুরুষের * শ্রাদ্ধের একটি দিন তাঁহাদের উদ্দেশেই উৎসর্গীকৃত না করিয়া সমস্ত মানবসমাজের পক্ষ হইতে যাবতীয় পূর্ব্বতন মৃত ব্যক্তিদিগের নামকীর্ত্তনস্বরূপ একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা তিনি করিয়া দিয়াছেন। একটু পরিষ্কার করিয়া কথাটা বলি। অন্ধসংস্কারবশতঃ মাসের নামকরণ দেবতাদের নামে করা হইয়াছে; তাই তিনি সমগ্র মানবসমাজের মধ্য হইতে তেরজন লোকের নামে তেরটি মাসের নাম করিয়াছেন; তাঁহার বৎসরে তেরমাস; যথা: Moses, Homer, Aristotle, Archimedes, Cæsar, St. Paul, Charlemagne, Dante, Guttenburg, Descartes, Shakespeare, Frederick the Great, Bichat। প্রত্যেক মাসে ২৮ দিন; সেই দিনগুলির নামকরণও এক একজন মহাপুরুষের নামে হইয়াছে;—মনু, মহম্মদ, বুদ্ধ, নিউটন্, কলম্বস্, বেকন ইত্যাদি। এই হিসাবে ৩৬৪ দিন পাওয়া গেল। বাকি এক দিন যাহা রহিল, সেইটাই শ্রাদ্ধের দিন, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে, Feast of all the dead। চারি বৎসর অন্তর আর একটা শ্রাদ্ধের দিন ধার্য্য করা হইয়াছে—Festival of Virtuous Women।

* তবে গয়ার শ্রাদ্ধে সম্পর্কীয় ব্যতীত জ্ঞাত অজ্ঞাত মৃত ব্যক্তিমাত্রেরই নাম উল্লেখ করা হয় বটে।

"কোং এই ব্যবস্থার নাম Positivist Calendar দিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন যে, এই পঞ্জিকাতে পরস্পরবিরুদ্ধ বিভিন্নমতাবলম্বী এমন ব্যক্তিদিগের নাম একত্র সংযোজিত করা হইয়াছে, যাঁহারা জীবিতাবস্থায় পরস্পর একত্র দেখা হইলে গলা কাটাকাটি করিতে প্রস্তুত হইতেন। ফলতঃ মিল মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহাতে বিশেষ গুণপনা ও অপক্ষপাতিতা ও সর্ব্বসংগ্রাহিতা (catholicity) প্রদর্শিত হইয়াছে।

"কোঁৎ যেমন একটি পঞ্জিকা করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ তিনি একটি লাইব্রেরি স্থির করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে, শরীরের সুস্থতারক্ষার্থে আহারীয় দ্রব্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ সাবধান হওয়া উচিত, যাহা-তাহা না খাইয়া বিশেষ পরীক্ষা পূর্ব্বক আহার্য্য দ্রব্য বাছিয়া লওয়া যেমন কর্ত্তব্য, মস্তিষ্কের সুস্থতা রক্ষা করিবার জন্য তদনুরূপ একটি নিয়ম পালন কবা আবশ্যক। যাহা-তাহা পড়া অভ্যাস থাকিলে মস্তিষ্ক কখনই সুস্থ থাকিতে পারে না। এই নিমিত্ত তিনি প্রাচীন গ্রীক্, ল্যাটিন এবং আধুনিক ইংরাজী, ফরাসী স্পেনীয়, ইটালিয়, ও জর্ম্মান এই সপ্ত ভাষার মধ্য হইতে যত সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ আছে, তাহা বাছিয়া লইয়া Positive Library বলিয়া একটি পুস্তকের তালিকা দিয়াছেন। পুস্তকের সংখ্যা আন্দাজ আড়াই শত হইবে। সেগুলি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত,—যথা: কাব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং Synthesis। অত্যুৎকৃষ্ট গদ্যগ্রন্থগুলিও কাব্যশ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাতে দেখা যায় যে, আমাদের সংস্কৃত ভাষায় কাব্যকথাটি ইংরাজি Poetry শব্দ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর; কারণ ছন্দ ব্যতীত Poetry হয়না, কিন্তু কাব্য বলিলে রঘুবংশও বুঝায় কাদম্বরীও বুঝায়। এই লাইব্রেরির কতকগুলি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিলে ইহা যে কতদূর সর্ব্বসংগ্রাহিতাসহকারে সঙ্কলিত হইয়াছে তাহা বুঝা যাইবে,—Homer, Virgil, Shakespeare, Dante, স্কটের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট আখ্যায়িকা, গোল্ড স্মিথের ভিকার, ফিল্ডিঙ্গের টম্ জোন্স্, বায়রণের বাছা বাছা কাব্য, পল বার্জিনিয়া, ইত্যাদি কি ছোট, কি বড়, বোধ হয় কোনও ভাল গ্রন্থ তিনি ভুলিয়া যান নাই। সেই লাইব্রেরি সংগ্রহ করিবার জন্য দ্বারিবাবুর কতকটা চেষ্টা ছিল; কতক সংগ্রহও করিয়াছিলেন।

"এই লাইব্রেরি সম্বন্ধে মিল কিন্তু বিলক্ষণ বিদ্রূপ করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলি ব্যতীত আর কোনও গ্রন্থ পাঠ করা হইবে না, এই কথা তিনি Alexandria-র লাইব্রেরি দগ্ধ করার সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা এক প্রকার sweeping holocaust of books। কিন্তু আমার বোধ হয় এস্থলে কোঁতের অভিপ্রায়ের মিল বিকৃত বর্ণনা করিয়াছেন। কোঁতের উদ্দেশ্য আর কিছুই ছিল না, তিনি জানিতে যে, সাধারণ লোকে বড় একটা বোঝে না কোন্ বহি পড়া ভাল আর কোন্ বহি

পড়া ভাল নহে, সেই জন্য যখন যাহা পায় তাহা পড়ে। সেই কুঅভ্যাসবারণের নিমিত্ত যেরূপ পুস্তক পাঠ করা আবশ্যক তাহারই একটি পরামর্শমাত্র তিনি দিয়া গিয়াছেন।

"কোঁৎ ভালরূপে পড়িবার নিমিত্ত শেষাশেষি দ্বারিবাবু ফরাসী ভাষা কতকটা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। অল্পকালমধ্যে ঐ ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার এমন পারিপাট্য জন্মিয়াছিল যে, আমি স্বয়ং দেখিয়াছি যে, ফরাসী ভাষায় লিখিত Positive Philosophy বহি খানি হাতে লইয়া তিনি এরূপ অনুবাদ করিয়া যাইতে পারিতেন যে লোকে মনে করিত যে তিনি একখানি ইংরাজী বহি পড়িয়া যাইতেছেন; কেহ বুঝিতে পারিত না যে, তিনি ফরাসী হইতে ইংরাজী অনুবাদ করিতেছেন। কিছু দিন পরে তিনি কোৎ প্রণীত Analytical Geometry-খানি ফরাসী ভাষা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

"কোঁতের দর্শনশাস্ত্র সমালোচনা করিয়া মিল একখানি পুস্তক লিখিলেন। সেই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমি কতকটা 'থ' হইয়া গিয়াছিলাম। আমার সেই ভাব দেখিয়া দ্বারিবাবু একদিন বলিলেন, 'আপনি অত চঞ্চল হইবেন না। আমি মিলের বহি খুলিয়া প্রত্যেক ছত্র ধরিয়া দেখাইয়া দিব যে, তাঁহার গ্রন্থের ভিতর কতকটা আইনের চালাকির মত বদমায়েসি আছে।' কিন্তু দেখাইয়া দেওয়া আর ঘটিয়া উঠিল না; ইহার পরেই তিনি জীবনান্তকারী ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার যে Cancer ব্যায়রাম হইয়াছিল, ইহা বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাত্মা চন্দ্রকুমার দে—যিনি দ্বারিবাবুর খুড়শ্বশুর ছিলেন—তিনিই বুঝিতে পারেন। এই ডাক্তার একজন বিশিষ্ট বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। ইংরাজী ডাক্তারি বিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়া তিনি জর্ম্মান্ ভাষা হইতে ডাক্তারি গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন; ফরাসী ভাষাও বেশ জানিতেন। ডাক্তারির পেশাদারি চালচলন তিনি বড় একটা জানিতেন না।

"Cancer এর কথা শুনিয়া দ্বারিবাবু একপ্রকাব হতাশ্বাস হইয়া পড়িলেন, কারণ অ্যালোপ্যাথি মতে Cancer সম্বন্ধে ডাক্তাররা একপ্রকার কবুল জবাব দিয়া বসিয়াছেন; তাঁহারা নিজেই বলেন যে, এ রোগের ঔষধ নাই। দ্বারিবাবুর চিকিৎসা নানা মতে হইয়াছিল বটে; কিন্তু আমার বিশ্বাস যে প্রণালী-সঙ্গতরূপে হয় নাই। আমার মনে হয় যে হোমিওপ্যাথি বা কবিরাজী ধারাবাহিকরূপে ক্রমাগত চালান হইলে, রোগমুক্ত না হউন, তিনি এতাবৎকাল এক প্রকার জীবিতাবস্থায় থাকিতে পারিতেন। উক্ত পীড়ায় তাঁহার মুখাকৃতির কিঞ্চিৎ বক্রতা আসিয়াছিল; সেইটি উপলক্ষ করিয়া আমার একজন পরমাত্মীয় গোঁড়া ব্রাহ্ম বন্ধু সময়ে সময়ে একটা কথা

বলিতেন যাহা আমি silly না বলিয়া থাকিতে পারি না। তিনি বলিতেন, 'দেখেছো কৃষ্ণকমল, আমি এইটি লক্ষ্য করেছি যে, দ্বারিবাবু ঈশ্বর, পরলোক ইত্যাদি দৈব বিষয় সম্বন্ধে যে রকম মুখভঙ্গী করে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের কথাবার্ত্তা উচ্চারণ করেন, রোগে ওঁর ঠিক সেই বিকৃত মুখভঙ্গী করে দিয়েছে; এতে আমার মনে লাগে যে, সাক্ষাৎ ভগবান তাঁর এই শাস্তি দিয়েছেন।' তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া আমি ত অবাক হইয়া যাইতাম; এবং বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত কোনও ব্যক্তির মুখ হইতে এরূপ অসম্বদ্ধ প্রলাপ কখনও নির্গত হইতে পারে তাহা ধারণা করিতে পারিতাম না। ইহা আমি কেবল তাঁহার গোঁড়ামির পরাকাষ্ঠা ব্যতীত আর কিছুই মনে করি নাই।

"দ্বারিবাবুর সহিত শেষ সাক্ষাৎ আমার স্মৃতিপথে এক প্রকার অঙ্কিত হইয়া আছে। তিনি তাঁহার নিজ জন্মভূমি আম্‌তার নিকটবর্ত্তী আগুন্‌সি নামক গ্রামে প্রাণত্যাগ করিতে যাইবার কালে হাইকোর্টের নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরে কিয়ৎক্ষণের জন্য ফেটিন গাড়ীতে শয়ান অবস্থায় অপেক্ষা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে আমি ব্যস্তসমস্ত হইয়া তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত গাড়ীর নিকটে গেলাম; আমাকে দেখিয়া ব্যগ্রতা সহকারে ঘাড় একটু তুলিয়া তিনি নমস্কারসূচক হস্ত-সঞ্চালন করিলেন। সেই আমার তাঁহার সহিত শেষ দেখা।

"প্রায় চল্লিশ বৎসর অতীত হইয়াছে। কিন্তু দ্বারিবাবুর personality আমার চিত্তক্ষেত্রকে এরূপ প্রগাঢ়রূপে অধিকার করিয়া আছে যে, এখনও বৎসরের মধ্যে ৫।৭ বার তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিতে পাই। কেবল আর একটি ব্যক্তি আমাকে বৎসরের মধ্যে ৫।৭ বার স্বপ্নে দেখা দিয়া থাকেন,—তিনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর।"

পাঁচ

১৫ই পৌষ, ১৩১৭

পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বঙ্কিমবাবু কি কখনও আপনার Law lectures শুনিতে আসিতেন?" তিনি বলিলেন—"আমার Law lectures? বঙ্কিমবাবু?" আমি বলিলাম—"আজ্ঞা হাঁ; আপনার।" তিনি বলিলেন—"না। কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, বল দেখি?" আমি বলিলাম—"একজন প্রবীন সাহিত্য-সেবী স্বীয় জীবনের পুরাতন ঘটনাবলির আলোচনা প্রসঙ্গে এইরূপ একটি কথা লিখিয়াছেন; ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পোষাক পরিয়া বঙ্কিমবাবু আপনার ক্লাসে আসিয়া ছাত্রদিগের সহিত বেঞ্চে বসিয়া আপনার লেক্চার শুনিতেন।"* তিনি বলিলেন—"দেখ, এ কথা সম্পূর্ণ অমূলক। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আমি Law lecturer হই নাই। কখনও যে তিনি আমার ক্লাসে আসিয়াছিলেন এমন আমার মনে হয় না। তবে আন্দাজ ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমবাবু ও আমি একত্র Law class-এ লেক্চার শুনিতে যাইতাম। সেই সময়ে তাঁহার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। একটা analogous ঘটনা আমি বলিতে পারি। তারাপ্রসাদবাবু বঙ্কিমবাবুর সমসাময়িক লোক। তিনি যখন বহরমপুরে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, গুরুদাসবাবু তখন তথায় ওকালতি করেন ও কলেজে Law lecturer। তারাবাবু গুরুদাসবাবুর Law class-এ উপস্থিত হইয়া লেক্চার শুনিতেন। এ কথা আমি গুরুদাসবাবুর মুখে শুনিয়াছি।"

আমি বলিলাম—"আপনার বঙ্কিমবাবুর সহিত intercourse বরাবর ছিল কি?"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"ছিল বৈ কি? তিনি যখন আলিপুরে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, তখন হাবড়ায়[১] কখনও কখনও আমার বাড়ীতে আসিতেন; যখন হাবড়ায় ছিলেন, তখন আমি তাঁহার এজলাসে অনেক সময়ে ওকালতি করিয়াছি। এখনও বেশ মনে পড়ে, একদিন হাবড়া হইতে এক গাড়িতেই আমরা দু'জনে যোগেন্দ্রবাবুর বাড়িতে গেলাম। পথে কোঁৎ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিলাম। আমি বলিলাম, 'দেখুন, আমার মনে হয়, কোঁতের দর্শন-শাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের দেশে আলোচনা হইবার সময় বোধ হয় এখনও আইসে নাই, the time is not ripe for it.' বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'কেন? যেটা Truth তা'র আবার সময় অসময় কি?' অবশ্যই বঙ্কিমবাবু যে কোঁৎ ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন তাহা আমার

* প্রশ্নটি ভ্রমপ্রমাদবশতঃ করা হইয়াছিল।

[১] বর্ত্তমান হাওড়া।—সং

মনে হয় না, কিন্তু তখন যেন তিনি বেশ মন খুলিয়াই কথাটি বলিলেন, এ ধারণা আমার হইল।

"হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আমার আলাপ বোধ হয় ইংরাজী ১৮৬০ সাল হইতে। আমার বাল্যবন্ধু যোগেন্দ্রের বাড়ী খিদিরপুরে; হেমচন্দ্রের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ বোধ হয় সেই স্থানেই হইয়াছিল। যখন তিনি ৺রমাপ্রসাদ রায়ের ছেলে দু'টির শিক্ষকতা করেন, তখন বুঝিতে পারা যায় নাই যে তিনি একজন বড় দরের কবি হইতে পারিবেন। বাল্যকাল হইতে তিনি কবিতা রচনা করিতেন; কিন্তু তখন ভবিষ্যতের সূচনা পাওয়া যায় নাই। তিনি মেট্রোপলিটান স্কুলের শিক্ষকতা করিলেন; বৎসর খানেক মুন্সিফি করিলেন। সেই সময়ে গভর্মেণ্ট তাঁহাকে টাকা দিয়া Norton's Law of Evidence বাঙ্গালায় অনুবাদ করাইয়া লয়েন। ওকালতী করিবার ইচ্ছা হইল, কলিকাতায় নহে, বরিশালে। যখন বরিশালে যাইবার জন্য তিনি এক প্রকার সব স্থির করিলেন, হঠাৎ একটা ঘটনায় তাঁহার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে মিষ্টার অ্যালেন নামক একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিলের জুনিয়রি করিয়া দুটা-একটা মোকদ্দমা পাইয়াছিলেন। একটা মোকদ্দমায় একদিন ঘটনাচক্রে 'সাহেব' নিজে উপস্থিত হইতে পারিলেন না; সুতরাং হেমবাবুকেই argue করিতে হইল। তিনি মোকদ্দমা জিতিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাইকোর্টে পসারের সূত্রপাত হইল। 'বরিশাল যাওয়া হইল না। অজস্র পয়সা রোজগার করিতে লাগিলেন; মাসে দুই হাজার আড়াই হাজার টাকা আয় হইতে লাগিল। ইহার মধ্যে কোন্ সময়ে, কি কারণে তাঁহার কাব্য রচনার দিকে ঝোঁক গেল তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না; বোধ হয় মাইকেল মধুসূদনের সহিত ভালরূপ আলাপ হওয়াতে—তিনি 'মেঘনাদবধ'-এর preface লিখিয়া দেন[১]—তাঁহারও কাব্য রচনা করিবার প্রবৃত্তি হইল।

"কিন্তু হেমবাবুর 'চিন্তাতরঙ্গিনী' ইহার বহুপূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। এটা তাঁহারই পাড়ার কোনও গৃহস্থ বাড়ীর একটা ঘটনা অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঘটনাটা কি ? কবে ঘটিয়াছিল ?"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—"আত্মহত্যা; ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে। আমার দাদার মৃত্যুর ঠিক মাস খানেকের ভিতর এই ঘটনাটি ঘটে; বোধ হয় তাঁহার দেখাদেখি। দাদার মত intellect সে সময় ছিল না। কিন্তু তাঁহার মনে আশঙ্কা হইল যে, তিনি বোধ হয় অন্ধ হইতে বসিয়াছেন। অন্ধ হইয়া আজীবন পরাধীনতার কষ্ট হইতে মুক্তির বাসনায়

[১] এ প্রসঙ্গে ৪ঠা জুন, ১৮৬২ তারিখে রাজনারায় বসুকে লেখা মধুসূদনের উক্তিটি উল্লেখযোগ্য: "Meghanad is going through a second edition with notes, and a *real* B.A. has written a long critical preface........." (দ্রঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়')—সং

তিনি বোধ হয় ঐ tragic ব্যাপারের সংঘটন করিয়া বসিলেন। গ্রীক দর্শন শাস্ত্র তাঁহার যথেষ্ট পড়া ছিল; নিশ্চয়ই তিনি Epictetus-এর কথায় নিজের পন্থা ঠিক করিয়া লইলেন। Epictetus বলিতেন—বাঁচিয়া থাকা যখন কষ্টকর, তখন মনে রাখিও যে, there is a door always open। রোমান বীরের ন্যায় বোধ হয়-তিনি Epictetus-এর কথা মানিয়া লইয়াছিলেন।

"আত্মহত্যাও সংক্রামক। দ্বিতীয় ঘটনাটি উপলক্ষ করিয়া হেমবাবু কবিতাটি লিখিলেন। আমিই প্রথম উহার সমালোচনা করি। দেখাইয়া দিই যে, হেমবাবুর 'কেন বা হইবে আন, পুরুষের শত টান' ইত্যাদি, বায়রণের .

'Man's love of man's life is a thing apart' (Don Juan, Canto I) ইত্যাদির অনুবাদ। অনুবাদ হিসাবেও বটে, আর কবিতা হিসাবেও বটে, মোটের উপর ভালই বলিয়াছিলাম।

"মাসিক পত্রিকায় হেমবাবুর ছোট ছোট কবিতা প্রকাশিত হইত। বোধ হয়, 'অবোধবন্ধু' পত্রিকায় তিনি লিখিতেন। 'বৃত্রসংহার' স্থরু হইলে তাঁহার ওকালতিতে শৈথিল্য পড়িয়া গেল। আমি জানি, তাঁহাকে তিন শত টাকা ফী দিয়া আলিপুরে লইয়া যাইবার জন্য মক্কেল আসিয়া তাঁহাকে আদালতে লইয়া যাইতে পারিল না; হেমবাবু ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া কবিতা রচনায় তন্ময় হইয়া রহিলেন। দেবী সরস্বতীর মন্দিরে অনেকে অর্ঘ্য আনিয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন সত্য, কিন্তু এমন একাগ্র উপাসনা আর দেখিয়াছ কি? তাঁহার মাসিক আয় সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই।

"হেমবাবু অত্যন্ত sensitive ছিলেন। কেহ পরিহাস করিয়া তাঁহার কবিতার সমালোচনা করিলে বড়ই তাঁহার মনে লাগিত। সরকারি উকিল অন্নদাবাবু* অনেক সময় ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, 'হেমবাবু বলেন কি জান? Other people's poetry survives them; but I shall survive my poetry.' হেমবাবুকে শুনাইয়া এইরূপ আলাপ হইত; হেমবাবু অস্থির হইয়া উঠিতেন। ড্রাইডেনের একটি কবিতা হেমবাবু বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন; আমাদের স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে তাহা সন্নিবেশিত করা হয়, বোধ হয় 'পদ্যপাঠ' তৃতীয়ভাগে আছে। ঐ যে Third Number Poetical Reader-এ কবিতাটি আছে, এই উপলক্ষ করিয়া অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (তিনি নিজে একজন স্থকবি) বলেন, 'হেমবাবুর poetry ত কেবল third number poetry দেখ্‌তে পাই।' আমি সেই কথা হেমবাবুকে বলাতে, হেমবাবু আমার সহিত বাক্যালাপ প্রায় বন্ধ করিয়া দিলেন।

* অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

"আজকালকার ছেলেরা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' গ্রন্থখানির সহিত বিশেষ পরিচিত নহে। কিন্তু অত originality, অমন রচনা-সৌষ্ঠব আমি আর কুত্রাপি দেখি নাই। ভাব সকল যেন luscious। যদি কেহ বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে শেলীর আস্বাদ পাইতে চায় তাহা হইলে এই গ্রন্থখানি হইতে পাইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—Somehow or other it never came to the surface।

"এইখানে আর একটি কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সাপ্তাহিক পত্রিকা 'হিতবাদী' নামটি দ্বিজেন্দ্রবাবুরই সৃষ্টি, এবং 'হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ' এই Motto-টিও তিনিই বলিয়া দেন। হিতবাদীর জন্মকালে পাঁচজন একত্র মিলিয়া এক বৈঠক বসিয়াছিল; তথায় আমিও ছিলাম, দ্বিজেন্দ্রবাবুও ছিলেন। সেই সময়েই ঐ নাম ও Motto পরিগৃহীত হয়। সুতরাং এক হিসাবে দ্বিজেন্দ্রবাবুই ঐ কাগজের জন্মদাতা বলিতে হইবে। সেই বৈঠকে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে সম্পাদক হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সম্পাদক হইয়া কাগজের উন্নতিকল্পে আমি বিশেষ কিছুই করিতে পারি নাই, এবং ঐ পদও আমি অধিক দিন রাখিতে পারি নাই, কারণ তখন আমার অনেক ঝঞ্ঝাট ছিল। হিতবাদীর সম্পাদকতা সম্বন্ধে কবি নবীন চন্দ্র সেনের একটি কথা আমার মনে আছে। তিনি হিতবাদী পত্রের গ্রাহক হইবার জন্য আমাকে এক চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে আমাকে "দেব" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। নবীন প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার ছাত্র ছিলেন বটে; তাঁর তাৎকালিক কোনও এক কবিতা রচনা পাঠ করিয়া প্রশংসা করিয়াছিলাম এবং ভাবী উন্নতিরও কিছু কিছু পূর্ব্বসূচনা আমার মুখ হইতে বোধ হয় বাহির হইয়াছিল। নবীনের অবশ্য আমার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শন করিবার অধিকার আছে; কিন্তু তা বলিয়া আমাকে "দেব" সম্বোধন যেন আমার কিছু বাড়াবাড়ি বোধ হইয়াছিল। এই সম্বোধনটি পাইয়া আমার একটু হাসি পাইল; আমি বুঝিলাম যে নবীন বড় বড় কাব্য-গ্রন্থ রচনা করাতে "দেব" এই সম্বোধনটা তাহার কলমে কিছু রপ্ত হইয়া গিয়াছে; সেই ঝোঁকে আমাকে সে ঐরূপ সম্বোধন করিয়া ফেলিয়াছে।

"হেমবাবুকে আমি 'স্বপ্নপ্রয়াণের' কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; তিনি বলিলেন, 'আমার ভাল লাগে না।' কিন্তু এ বিষয়ে সারদাচরণ মিত্রের মতও ঠিক আমার অনুরূপ। আমি সারদাকে ভাল মন্দ পূর্ব্বে কিছুই বলি নাই; এমন কথা তুমি বলিতে পারিবে না যে, আমার কথায় তিনি সায় দিয়া গেলেন। দেখিলাম সারদা গ্রন্থখানিকে বিশেষরূপে admire করেন।

"যখন রব উঠিল যে, জগদানন্দবাবু হেমবাবুর নামে নালিশ করিবেন, এবং গভর্মেণ্ট জগদানন্দবাবুকে সাহায্য করিবেন, তখন হেমবাবু অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলেন।

কথাটা নেহাৎ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নহে; কারণ সকলেই মনে করিয়াছিল যে, নিশ্চয়ই কথাটার কোনও বনিয়াদ্ আছে।[১]

"মাইকেল হেমবাবুর উপরে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন; মাইকেলের প্রতিভায় আমরা সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলাম। যাঁহার জীবনের গতি সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে চলিয়াছিল, তিনি যে কেমন করিয়া সংস্কৃত ভাষার শব্দসিন্ধু মন্থন করিয়া কাব্যরত্ন বঙ্গসাহিত্যকে উপহার দিতে পারিলেন তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। কিন্তু আমি একটি বিষয় বরাবর লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি, বাঙ্গালীর flexibility of intellect অসাধারণ। অত্যন্ত সাধারণ কথাবার্ত্তায় মাইকেল মহাভারত রামায়ণ হইতে এমন সুন্দর উপমা হঠাৎ আনিয়া ফেলিতেন যে, শ্রোতৃবৃন্দ অবাক হইয়া যাইত।

"বিদ্যাসাগর মাইকেলের লেখা পছন্দ করিতেন না। Blank Verse তাঁহার একেবারে অসহ্য। তিনি Caricature করিতেন,—

'তিলোত্তমা বলে ওহে শুন দেবরাজ,
তোমার সঙ্গেতে আমি কোথায় যাইব।'

"তিনি বঙ্কিমকেও পছন্দ করিতেন না। Matter সম্বন্ধে তিনি আপত্তি করিতেন না, কিন্তু manner সম্বন্ধে, style সম্বন্ধে, তাঁহার বিশেষ আপত্তি ছিল। আমার মতে Bankim brought about a revolution in Bengali literature similar to that brought about by Crabbe and Cowper in English literature, যে revolution-এর চূড়ান্ত হইল Wordsworth-এ। Edinburgh Review Wordsworth-কে গোড়াতেই চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন,—'This will never do!' কিন্তু কবি অবিচলিত ভাবে অগ্রসর হইলেন ও Poet Laureate হইলেন। বঙ্কিমও বিচলিত হইলেন না। তিনি বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস'কে বলিতেন 'কান্নার জোলাপ'।

"বিদ্যাসাগর ঈশ্বর গুপ্তকেও দেখিতে পারিতেন না। আমার দাদার বেকনও তিনি পছন্দ করিতেন না, কারণ তাহাতে সংস্কৃত কথার সহিত ছোট ছোট সাধারণ

[১] সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড যখন যুবরাজ হিসাবে ভারত দর্শনে আসেন, সে সময়ে কলিকাতায় থাকাকালীন তাঁহার সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীর 'জেনানা' দেখিবার ইচ্ছা হয়। তৎকালীন ব্যবস্থাপক সভার সভ্য এবং হাইকোর্টের জুনিয়ার গভর্মেণ্ট প্লীডার রায় জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর যুবরাজের অভিপ্রায়ের কথা জানিতে পারিয়া যুবরাজকে ভবানীপুরস্থ স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনেন (৩রা জানুয়ারি ১৮৭৬) এবং মুখোপাধ্যায় পরিবারের মহিলারা যুবরাজকে অভ্যর্থনা ও বরণ করেন। এই ব্যাপার লইয়া সে সময়ে সহরে মহা আলোড়ন হয়। এই ঘটনাটিকে উপলক্ষ করিয়া হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাজিমাৎ' নামে এক ব্যঙ্গ কবিতা লেখেন (৭ই মাঘ, ১২৮২)।—সং

বাঙ্গালা কথা ছিল। আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিদ্যাসাগরের ঐ একটা প্রধান দোষ ছিল, তাহার narrowness, তাঁহার bigotry, তাঁহার একান্ত 'বামুন পণ্ডিতি' ভাব। এক হিসাবে catholicity তাঁহার ছিল না। যে তাঁহার প্রদর্শিত পথ না লইল, তিনি তাহাকে নগণ্য মনে করিলেন; যে তাঁহার অনবরতবিগলিতবাষ্পা-কুলিতলোচনের মত ভাষার প্রয়োগ না করিল, তাহার উপর তিনি খড়্গ-হস্ত।

পরগুণপরমাণূন্ পর্ব্বতীকৃত্য নিত্যং
নিজহৃদি বিকশন্তঃ সন্তি সন্তঃ কিয়ন্তঃ।

"এই দুই ছত্রে 'ভাবিনীবিলাস'-এর কবি জগন্নাথ পণ্ডিত যে উদারতার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, বিদ্যাসাগরের সে উদারতা কোথায়? পরগুণের পরমাণুগুলিকে পর্ব্বতপ্রমাণ করিয়া তুলা ত দূরের কথা, তিনি ইংরাজীশিক্ষিত লেখকদিগের গুণ দেখিতেই পাইতেন না।

"বঙ্কিমের হাতে বাঙ্গালা সাহিত্য নূতন রূপ ধারণ করিল। একদিন বঙ্কিম আমাকে বলিলেন, 'বিদ্যাসাগর বড় বড় সংস্কৃত কথা প্রয়োগ কোরে বাঙ্গালা ভাষার ধাতটা গোড়ায় খারাপ করে গেছেন।' আমারও অনেকটা ঐ রকম মত।

"কিন্তু আমিই সর্ব্বপ্রথম বিদ্যাসাগরের ভাষাকে সাধারণ্যে সমর্থন করি। এ কথা আমার জোর করিয়া বলার কারণ আছে। যখন আমি রিপণ কলেজে কাজ করি, একদিন আমার একটি পুরাতন ছাত্র—৺কার্ত্তিকচন্দ্র মিত্র, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ ষ্টুডেন্ট—আমার সহিত কলেজে দেখা করিতে আসিলেন। তখন আমি বিদ্যাসাগরের ভাষার একটু তীব্র সমালোচনা করিতেছিলাম। কার্ত্তিকচন্দ্র হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'সে কি মশাই? আমরা যখন আপনার কাছে প্রেসিডেন্সি কলেজে বাঙ্গালা পড়িতাম, তখন ত আপনিই আমাদের বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, বিদ্যাসাগরের ভাষার মহৎ গুণ এই যে, উহা বাঙ্গালা প্রদেশের সকল অঞ্চলের লোকই বুঝিতে পারিবে। কলিকাতার চলিত কথায় লিখিলে রাঢ়ের বাহিরে লোকে বুঝিতে পারিবে না।' আমি হাসিয়া বলিলাম, 'বটে? তা সে কথাও ত ঠিক।'"

পণ্ডিত মহাশয় উঠিলেন। তখন বেলা দুইটা। শীতকালে এই সময়ে তিনি একটু বেড়াইতে বাহির হন। তিনি বেশ পরিবর্ত্তন করিতেছেন দেখিয়া আমিও উঠিলাম; জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার দাদার কোনও প্রতিকৃতি আছে কি?"

তিনি বলিলেন—"না? তবে বহুদিন পূর্ব্বে আমি একদিন মেট্‌কাফ হলে Moor's Life of Lord Byron পড়িতেছিলাম। তাহাতে বায়রণের যে চেহারা অঙ্কিত ছিল, তাহা অবিকল আমার দাদার। এমন আশ্চর্য্য Similarity of features দেখা যায় না;—ললাট, নাসিকা, চক্ষু, ওষ্ঠাধরের ভঙ্গি, কেশবিন্যাস, এমন কি বসিবার ভঙ্গিটুকু পর্য্যন্ত, সমস্তই মিলিয়া গেল।"

ছয়

আজ প্রথমেই পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—“রামেন্দ্রবাবুর ‘বিজ্ঞানে পৌত্তলিকতা’ প্রবন্ধ পড়িয়াছি। লেখা আমার ভালই বোধ হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় কিন্তু এ রকম ভাষা পছন্দ করিতেন না। গম্ভীর প্রবন্ধের মধ্যে ‘লেনা দেনা’ ও ঐ রকম চলিত কথা তিনি ক্ষমা করিতেন না।

“দেখ, ব্যাকরণ-দুষ্ট ভুল শব্দ ভাষার মধ্যে কেমন স্থান পায় সে বিষয় চিন্তা করিলে বেশ আনন্দ অনুভব করা যায়। এই ‘পৌত্তলিকতা’ শব্দটাই দেখ না কেন। সংস্কৃত ভাষায় ‘পুত্তলিকা’ নাই, ‘পুত্রিকা’ আছে। প্রাকৃত ‘পুত্তলিকা’ সংস্কৃত ব্যাকরণের দৌলতে রূপান্তরিত হইয়া ‘পৌত্তলিকতা’ প্রাপ্ত হইয়াছে। রামেন্দ্রবাবুর বহুপূর্ব্বে এই শব্দ ভাষায় প্রবেশলাভ করিয়াছে। রামমোহন রায়ের ‘পৌত্তলিক প্রবোধ’ প্রবন্ধই এই উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করিতেছে।

“আমার মনে হয়, সংস্কৃত শব্দেব মধ্যে phonetic dacay-র চিহ্ন যেন এখনও সুস্পষ্ট বিদ্যমান আছে। একটা শব্দ দেখ না,—‘কালিন্দী’। আমার যতদূর স্মরণ হয়, যমুনার একটি নাম ‘কালিন্দী’ অমরকোষেও আছে। আমি অনুমান করি যে, ঐ শব্দটি ‘কালী নদী’ এই দুইটি শব্দেব একীকরণে সমুদ্ভূত হইয়াছে। যমুনার কালো জল দেখিয়া উহাকে কালী নদী বলা বিচিত্র নহে। এই কালী নদী কালক্রমে phonetic decay-র দরুণ কালিন্দী রূপ ধারণ করিয়াছে। ক্রমে লোকে ভুলিয়া গেল যে, কালিন্দী কালী নদীব অপভ্রংশমাত্র। শব্দটির জন্মকথা নূতন করিয়া কল্পিত হইল; গঙ্গার ন্যায় তাহাকে গিরিসুতা কল্পনা করাই সঙ্গত বোধ হইল। কালিন্দী দাঁড়াইল ‘কলিন্দ-গিরিনন্দিনী।’ আবার দেখ, বাঙ্গালা ‘অপরূপ’ সংস্কৃত ‘অপূর্ব্ব’ হইতে প্রাকৃত ‘অপূববের’র (বিক্রমোর্ব্বোশী নাটকে দেখিতে পাইবে) ভিতর দিয়া পাওয়া গিয়াছে।

“আবার অনেক সময়ে ছাপার ভুল চিরস্থায়ী হইয়া যায়। সাহিত্যদর্পণকার এই কবিতাটি তুলিয়াছেন,—

দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো
নরকে বা নরকান্তক প্রকামং।
অবধীরিত শারদারবিন্দৌ
চরণৌ তে মরণেঽপি চিন্তয়ামি॥

“গ্রন্থকার লিখিয়াছেন ‘যথা কুন্দমালায়াং’, অর্থাৎ কবিতাটি ‘কুন্দমালা’ নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। কিন্তু হেবার্লিন (Hœberlin) কর্তৃক সম্পাদিত কাব্যসংগ্রহ পুস্তকের

(Sanskrit anthology) মধ্যে মুকুন্দমালা নামক একখানি ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক মুদ্রিত আছে। হঠাৎ একদিন আমি পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে মুকুন্দমালার মধ্যে সাহিত্য-দর্পণের ঐ শ্লোকটি দেখিলাম। তাহাতে বুঝিলাম 'কুন্দমালা' কথাটি ছাপার ভুল। সাহিত্যদর্পণকার 'মুকুন্দ মালা' নিশ্চয়ই লিখিয়াছিলেন। পুরুষানুক্রমে এই ছাপার ভুলটি বদ্ধমূল হইয়া আছে। অদ্যাপি কেহ ইহা জানেনও না, সংশোধনও করেন নাই।

"মদনমোহন তর্কালঙ্কার আপনার এক কন্যার নাম 'কুন্দমালা' রাখিয়াছিলেন। এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে যে তিনিও সাহিত্যদর্পণের ছাপার ভুল হইতে কন্যার নামের আভাস পাইয়াছিলেন। তবে কুন্দমালা নামটিও অর্থশূন্য নহে; এমনও হইতে পারে যে তর্কালঙ্কার সাহিত্যদর্পণ হইতে আভাস না পাইয়াও নিজের পছন্দমত মেয়ের নাম দিয়াছিলেন।

"শুধু নামের গোলমাল নহে, সংস্কৃত মুদ্রিত পুস্তকে প্রেক্ষাবান সংস্কর্ত্তার (editor of a critical acumen) অভাব নাই। প্রাকৃতের শ্লোক পর্য্যন্ত গদ্যের আকারে ছাপা হইয়া আসিতেছে। মুদ্রারাক্ষসে চন্দনদাস যখন প্রথম দেখা দিলেন, তখন তিনি যাহা মনে মনে কহিতেছেন তাহার প্রথম অংশটি নিশ্চয়ই প্রাকৃত আর্য্যা; কিন্তু বরাবর গদ্যের আকারে মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে; যথা,—

চাণক্কম্মি অঅরুণে
সহসা সদ্দাবিদস্স, লোঅস্স।
ণি দ্দোসস্স বি সঙ্কা
কিং উণ মম জাদ দোসস্স॥

"পুরাতন সাহিত্যের আলোচনা করিতে বসিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের আসন খুব উচ্চে। আমাব যখন ১৫।১৬ বৎসর বয়স, তখন কালীপ্রসন্ন সিংহের সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়। প্রথম পরিচয় ঠিক কেমন করিয়া কোন্ সময়ে হয়, তাহা এখন আমার স্মরণ নাই। তাঁহার বাড়ীর দোতালায় একটি Debating Club ছিল, আমি সেই সভার সভ্য হইয়াছিলাম। সেই স্থানে ৺কৃষ্ণদাস পালের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। এখনও আমার বেশ মনে আছে, যেদিন কৃষ্ণদাস পাল commerce সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন; ইংরাজিতে তাঁহার সেই বক্তৃতা শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তখন যদিও আমি ছেলে মানুষ, ইংরাজি বক্তৃতার ভাবটা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ, তথাপি মনে হইল যে, এই লোকটি একদিন বড় লোক হইতে পারিবে। আমিও প্রবন্ধ পাঠ করিতাম, কিন্তু বাঙ্গালায়। আমি ছেলে মানুষ বলিয়াই হৌক বা আর কোনও কারণেই হৌক, প্রবন্ধগুলির জন্য আমি প্রশংসা পাইতাম। একদিন আমার একটি প্রবন্ধের আলোচনা

হইতেছিল—কি বিষয়ে সে প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল, এখন আমার স্মরণ নাই, বোধ হয় বিধবা-বিবাহের উপর,—এমন সময় একজন সভ্য বলিয়া উঠিলেন, 'ছেলে মানুষের প্রশংসা ক'রে রাত কাটান যাবে নাকি?' কালী সিংহ সভার নাম দিয়াছিলেন 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'; দুষ্ট লোকে তাহার নামকরণ করিল 'মদ্যোৎসাহিনী সভা'। তিনি সভার patron গোছ ছিলেন। কখনও কোনও প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন কি না, মনে পড়ে না। মধ্যে মধ্যে সভ্যদিগের ভোজনাদির ব্যবস্থা হইত; আমি কিন্তু কখনও আহারাদিতে যোগদান করি নাই।

"বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তিনি অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। মহাভারতের অনুবাদ বিদ্যাসাগরের প্ররোচনায় হইয়াছিল। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বিদ্যাসাগর এই কার্য্যে ব্রতী করিয়াছিলেন। যে পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা মহাভারত অনূদিত হইয়াছিল, তাঁহারাও বিদ্যাসাগরের লোক। সেকালে সমস্ত বড়লোক বিদ্যাসাগরের অনুগত ছিল। পাইকপাড়ার রাজারা তাঁহার কথায় উঠিতেন বসিতেন; তাঁহার কথায়, কোনও security না লইয়া তাঁহারা এক ব্যক্তিকে তিন লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সময় বিদ্যাসাগরের যখন টাকার দরকার হইল, তিনি টাকার অভাব রাজাদের নিকট জ্ঞাপন করিলে তাঁহারা বলিলেন,—'আপনার টাকার দরকার হইতে পারে, একথা পূর্ব্বে বলেন নাই কেন? তাহা হইলে কিছু রাখিতাম। নগদ টাকা সব খরচ করিয়া ফেলিয়াছি।' সাহিত্যের দিক্ দিয়া যদি দেখ, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, এই পাইকপাড়ার রাজারা মাইকেল মধুসূদনের প্রথম ও প্রধান Patron ছিলেন। তাঁহাদের রাজবাটীতে 'শর্ম্মিষ্ঠা'র প্রথম অভিনয় হয়।[১]

"বিদ্যাসাগরের প্রতি এই যে ভক্তি, ইহার একমাত্র কারণ যে তাঁহার চরিত্রের উৎকর্ষ, তাহা নহে। অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি বিশিষ্ট কারণ আছে, যাহার উল্লেখ করিলে আমাদের বাঙ্গালীর চরিত্রগত একটা দোষ প্রকটিত হইয়া পড়িবে। যে সময়ের কথা আমি বলিতেছি, সে সময়ে এটা বেশ বোঝা যাইত 'সাহেবদের' কাছে বিদ্যাসাগরের খুব প্রতিপত্তি ছিল বলিয়া তাঁহার স্বদেশবাসীর নিকট তিনি অত খাতির পাইয়াছিলেন। 'সাহেবদের' নিকট প্রতিষ্ঠাপন্ন না হইলে বাঙ্গালী মানুষের মূল্য বুঝিতে পারে না। মুখে না বলি, কিন্তু মনে মনে যাহাদের বড় বলিয়া জানি, তাঁহাদের সিল মোহরের ছাপ না পড়িলে জিনিষের মূল্য হয় না।

"আমার দৃঢ় ধারণা যে, বিদ্যাসাগরেরও সময়ে সময়ে আশঙ্কা হইতে যে, পাছে আর কোনও বাঙ্গালীর 'সাহেবদের' কাছে তাঁহার চেয়েও বেশী প্রতিপত্তি হয়। পূর্ব্বে আমি যে তাঁহার literary jealousy-র কথা উল্লেখ করিয়াছি[২] তাহার মধ্যে যে এইরূপ একটা

---

[১] ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৮৫৯।—সং [২] পৃঃ ৩০ দ্রষ্টব্য।—সং

কারণ নিহিত ছিল না, এ কথা বলা যায় না। তিনি কাহারও নিকট মাথা হেঁট করিতেন না সত্য, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে এইটুকু দৌর্ব্বল্য ছিল, এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। 'সাহেবদের' নিকট পসার জমাইবার চেষ্টা যে তিনি কখনও করিয়াছিলেন, একথা আমি বলিতেছি না; তবে তাঁহার বিদ্যাগৌরবে 'সাহেব' সমাজে যে প্রতিপত্তি হইয়াছিল, তাহা তিনি সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন।

"কালীপ্রসন্ন সিংহের দোষ নহে, পাইকপাড়ার রাজাদের দোষ নহে, দোষ দিতে হয় সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে দাও। Mrs Besant হিঁদুয়ানির ব্যাখ্যা করিলেন, বাঙ্গালী গর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বিবি যখন হিন্দুর তীর্থস্থানে হিন্দু কলেজ স্থাপনের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন, হিন্দু রাজন্যবর্গ টাকা ঢালিয়া দিল; প্রকাণ্ড কলেজ স্থাপিত হইল। এই যে ভাব, ইহা আমাদের জাতীয় অবনতির একটা অপরিহার্য্য প্রসব।

"যৌবনেই কালীপ্রসন্নের মৃত্যু হয়; বোধ হয় আমি তাঁহার সমবয়স্ক ছিলাম। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার কতকটা নৈতিক অবনতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার খেয়ালের অন্ত ছিল না। বোধ হয়, তিনি purse-proud ভাব কতকটা প্রকাশ করিতেন; কিন্তু তিনি যেমন তাঁহার Purse-এর সদ্ব্যবহার করিতে জানিতেন, তেমন আর কেহই জানিত না। যেদিন Rev. Mr Long-এর মোকর্দ্দমার রায় প্রকাশ হইবার কথা ছিল, সে দিন কালীপ্রসন্ন আদালতে উপস্থিত ছিলেন; হাজার টাকার জরিমানা হইবামাত্রই তিনি তৎক্ষণাৎ সেই জরিমানার টাকা আদালতে দাখিল করিয়া দিলেন। কেহ তাঁহাকে টাকা লইয়া যাইবার পরামর্শ দেন নাই। আমরা কেহই জানিতাম না যে, তিনি মনে মনে এই প্রকার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

"মহাভারত তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ। রাধাকান্তের 'শব্দকল্পদ্রুম'-এর পার্শ্বে কালীপ্রসন্নের মহাভারতের স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বলিয়াছি, তিনি বিদ্যাসাগরের কথায় এই বিরাট কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার নিজেরও higher, nobler sympathies যথেষ্ট ছিল; লেখাপড়ার দিকে ঝোঁক, লেখাপড়ার প্রচারের একটা প্রবল বাসনা ছিল।

"তাঁহার 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য় অবশ্যই প্রতিভার কোনও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু গ্রন্থখানির মূল্য আছে। রচনা সম্বন্ধে একটি কথা তোমাদের মনে রাখিতে হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত-বহুল রচনার বিরুদ্ধে একটা revolt হইয়াছিল। বোধ হয়, ১৮৫৪।৫৫ খৃষ্টাব্দে রাধানাথ সিকদার 'মাসিক পত্রিকা' নামে একখানি কাগজ বাহির করেন, তাহাতে অনেক চলিত কথা ব্যবহৃত হইত। একটা প্রবন্ধের মধ্যে 'Xenophon থেকে ভাঙ্গা' এই শব্দযোজনা ছিল। বিদ্যাসাগর

হাসিতেন। 'মাসিক পত্রিকা'র সহযোগী সম্পাদক ছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। তিনি তাঁহার 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ সেই tendency-র চূড়ান্ত করিয়া যান। তাহার পরে যখন এই দুই বিরুদ্ধ ভাবের সামঞ্জস্য সঙ্ঘটিত হইল, বাঙ্গালা সাহিত্য নূতন আকাব ধাবণ করিল, নূতন বল সঞ্চয় করিল। সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্র হইতে সাহিত্যরথী রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকলেই আমাদের সাহিত্যের ভাষায় সেই সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিলেন।

"'হুতোম প্যাঁচা'র মধ্যে যথেষ্ট লোকজ্ঞতা ও পরিহাস-রসিকতা প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক স্থলেই তখনকার ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কটাক্ষপাত আছে। পাথুরিয়াঘাটাব কোনও ধনী প্রবীন বয়সে নিজের জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের বিদ্রূপবাণ তাঁহাব উপর বর্ষিত হইল; 'নক্সা'য় পাথুবিয়াঘাটা 'ন্থুড়িঘাটা'য় রূপান্তরিত হইল। মাহেশে রথেব সময় বাচখেলা, মেয়ে মানুষ সঙ্গে লইয়া দ্বাদশগোপাল দেখিতে যাওয়া ইত্যাদি তিনি নিপুণ হস্তে চিত্রিত করিয়াছেন। ইংবাজেরা ঠাট্টাপ্রসঙ্গে যাহাকে' Arry বলে, অর্থাৎ যে সকল সামান্য লোক ইয়ার্কির উপলক্ষে বেইক্তাব হইয়া নানা প্রকার বাঁদরামি কবিয়া থাকে, সস্তায় আমোদ করিবার চেষ্টা কবে, নক্সায় সেই প্রকৃতির লোকদিগের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও বঙ্গসমাজে এইরূপ লোক দেখিতে পাইবে।

"Satire হিসাবে 'হুতোম প্যাঁচা' যে খুব effective হইযাছিল, তাহা বোধ হয় না। But as an early specimen of that type of writing it deserves not to be forgotten; এবং রুচি হিসাবে 'হুতোম' ঈশ্বব গুপ্তের ও 'গুড় গুড়ে ভট্‌চার্য্যির' লেখার চেয়ে অনেক অংশে শ্রেষ্ঠতর। 'প্রভাকরে'র সম্পাদক এবং 'ভাস্করে'র সম্পাদক নির্ভাজ খেউড় গাহিতেন; ধাপার মাঠে ছাড়া আর কুত্রাপি ঐ সকল লেখার জায়গা হইতে পারে না। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ওরফে গুড় গুড়ে ভট্‌চার্য্যি যে 'রসবাজ' রচিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা অপাঠ্য। কিন্তু সে সময়ে ধনীর আসরে, বিষয়ী লোকের বৈঠকখানায় এই সকল রচনা পঠিত হইত। বিকৃতরুচি সমাজের মধ্যে এই সকল রচনা উপভোগ্য হইয়াছিল।

"বিদ্যাসাগরের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? তিনি এই একটানা কুরুচির স্রোতের বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া কি করিতে পারেন? নব্যদলের মধ্যে তাঁহার পসার প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল বটে, কিন্তু প্রাচীন বুনিয়াদি বড় লোকের আসরে তিনি কি করিতে পারেন? তথায় সুরুচির দোহাই দিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে অপদস্থ হইতে হইত।

"কিন্তু unconsciously সাহিত্যে উৎকট কুরুচি হইতে সুরুচির দিকে যে

transition আরম্ভ হইয়াছিল,. বিদ্যাসাগর তাহাতে কতকটা সহায়তা করিয়াছিলেন। সচেষ্ট ভাবে একটা reform movement যে করিতে হইয়াছিল, তাহা নহে। এই transition-এর ইতিহাস চাহ? ঠিক ইতিহাস দিতে পারিব না, তবে কয়েকটি কথা বলিতে পারি।

"বিদ্যাসাগর যখন সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, তখনই যে তাঁহার সাহিত্যিক হিসাবে খাতির হইয়াছিল তাহা নহে। তিনি বালকদিগের শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিতে ব্যস্ত ছিলেন; সমাজের কুরুচি ব্যাধি দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইবার অবসর তাঁহার ছিল না। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই যে সমাজের ও সাহিত্যের রুচি মার্জ্জিত হইবে, ইহা তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল। অত কথায় কাজ কি, স্বভাবকবি ধীরাজ বিধবা-বিবাহের আন্দোলনের সময় বিদ্যাসাগরের নামে যে গান রচনা করিয়াছিল, সে গানটি এত রুচি-বিগর্হিত ও অশ্লীল যে তাহা পত্রিকায় মুদ্রিত করা অসম্ভব। কিন্তু বিদ্যাসাগর ধীরাজকে নিজের বাড়ীতে ডাকাইয়া বলিতেন, 'ধীরাজ, একবার সেই গানটা গাও ত। সেই যে, 'বিদ্যেসাগরের বিদ্যে বোঝা গিয়েছে;' ধীরাজ অমনি সভার মধ্যে গান ধরিত,—

'বিদ্যেসাগরের বিদ্যে বোঝা গিয়েছে,
পরাশরের * * * * * দিয়েছে।'

"গানের অন্যান্য চরণগুলি এখনকার রুচি হিসাবে অপাঠ্য, অশ্রাব্য। এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ যে, সে সময়ে সমাজের বায়ু কিরূপ দূষিত ছিল। কোঁৎ যে intellectual sanitation-এর কথা বলিয়াছেন, আমাদের সমাজে সে দিকে কাহারও দৃক্‌পাত ছিল না।

"কিন্তু বিদ্যাসাগরের সময় যে নব্য-যুবক-সম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠিল, তাহাদের মানসিক স্বাস্থ্য অনেকটা সবল ও পরিপুষ্ট হইতে পারিয়াছিল। কেশব সেন যখন আসিলেন, তখন transition হইয়া গিয়াছে।

"মহারাণী ভিক্টোরিয়ার গভর্মেণ্ট যখন আরম্ভ হইল, তখন হইতে লোকের মন রাজনীতির দিকে ঝুঁকিল। সভায়, debating club-এ, বৈঠকখানার আসরে রাজনীতির চর্চ্চা হইতে লাগিল। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে আমি যখন Presidency College-এ প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করি, তখন আমাদের একটা debating club ছিল। তখন আমাদের কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণী ৺রামকমল সেনের বাড়ীর (এখনকার এল্‌বার্ট্‌ কলেজের) এক অংশে বসিত। ক্লাবের সম্মিলনও সেই স্থানে হইত। সেই ক্লাবে কেশব সেনের বক্তৃতা আমি প্রথম শ্রবণ করি। আমার সহপাঠী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধের বিষয় ছিল Heroism of the ancient Hindus; ভীষ্ম, দ্রোণ ইত্যাদি মহাভারতের কয়েকটি চরিত্র লইয়া প্রবন্ধটি রচিত

হইয়াছিল। কেশববাবু আধঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন, এবং এই সময়ের মধ্যে তিনি 'exonerate' কথাটি চার বার ব্যবহার করিয়াছিলেন। তখনও তাঁহার বোল্ ফোটে নাই। কিন্তু যুবকগণ তাঁহার ইংরাজি বক্তৃতায় চমৎকৃত হইয়াছিল। সকলের মনে seriousness ও religious fervour জাগাইয়া তুলিয়া তিনি যে সাহিত্যে ও সমাজে সুরুচির পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কেশববাবু ক্রমশঃ দেশে বিদেশে খ্রীষ্টান্ অখ্রীষ্টান্ সকলের নিকট আদর পাইলেন। খ্রীষ্টান্ তাঁহার eclecticism-এর আবরণ ভেদ করিতে প্রথম প্রথম পারেন নাই। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, কেশব সেন শীঘ্রই খ্রীষ্টান্ হইবেন ; এমন কি, Lord Lawrence-এর মনেও এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল।

"কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাজ করিয়াছিল 'সোমপ্রকাশ'। রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, সকল বিষয়েই বাদানুবাদ, তর্কবিতর্ক সোমপ্রকাশ পত্রে হইতে লাগিল। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ই প্রথমে দেখাইলেন যে, বাঙ্গালায় সর্ব্বোচ্চশ্রেণীর কাগজ হইতে পারে। সাহিত্যে ও সমাজে সোমপ্রকাশ যুগান্তর আনয়ন করিল। কুরুচি ও অশ্লীলতা আর কতদিন টিকিতে পারে? হিন্দু কলেজের এক শিক্ষকের সহিত বিদ্যাভূষণ মহাশয় এক বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে যখন ছেলেদের জলপান করিবার ছুটি হইত, সেই সময়ে সেই শিক্ষকটি সংস্কৃত কলেজে আসিতেন এবং তাঁহাকে ইংরাজি শিখাইতেন। ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া এইরূপ বিদ্যাভ্যাস হইত। তাঁহার ইংরাজি ভাষায় এমন ব্যুৎপত্তি হইয়াছিল যে, Schmitz রচিত রোমের ইতিহাস তিনি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া ফেলেন।

"৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের কথাপ্রসঙ্গে আমার নিজের একটা কথা মনে পড়িতেছে। তিনি একবার একজন phrenologist-কে আমার মস্তক পরীক্ষা করিতে বলেন। আমি তখন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ক্লাশে অধ্যয়ন করি। Phrenologist-এর নাম কালীকুমার দাস। কালীবাবু সুপণ্ডিত ছিলেন। Dr Duff-এর সঙ্গে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিয়া দুই শত পৃষ্ঠার একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক প্রকাশিত করিয়া ফেলেন। তিনি কি কাজ করিতেন ঠিক আমার স্মরণ নাই। কিন্তু ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে যখন ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইল, কালীবাবু কাজ-কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলেন, বলিলেন, 'খবরের কাগজ পড়িতে হইবে, কাজ না ছাড়িলে সময় হইবে না।' ভদ্রলোক আমার মাথা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, আমার রাগ এত ভয়ানক যে আমি মানুষ খুন করিতে পারি। কথাটা নেহাৎ অমূলক বলিয়া মনে হয় না। বরাবর আপনাকে অত্যন্ত সাবধান হইয়া সামলাইয়া চলিতে হইয়াছে।

"সমাজে ও সাহিত্যে পুরাতনের সহিত নূতনের দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল। নূতন দল

পুরাতনের বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইল; পুরাতন নিজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সমাজকে ও সাহিত্যকে দৃঢ়তরভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিল। এই ঘাতপ্রতিঘাতে সমাজ ও সাহিত্য সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। বিধবাবিবাহের গোলমাল চুকিয়া গেল, কিন্তু কৌলিন্যপ্রথার উপর আক্রমণ আরম্ভ হইল।

"তখন আমার প্রথম যৌবন; ১৪।১৫ বৎসরমাত্র বয়স। শিবতলায় বসাকদিগের বাড়ীতে 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটক অভিনীত হইল।[১] আমি সেই অভিনয় দেখিতে গেলাম। কেমন করিয়া তোমায় বুঝাইব যে, শিক্ষিত বঙ্গসমাজ কিরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিল। The play came out as a surprise upon the Bengali-reading public; বোধ হয় ইংরাজি খুব ভাল ভাল comedy অপেক্ষা কোনও অংশে ইহা মন্দ নহে। রচয়িতা পণ্ডিত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন,[১] আমার শিক্ষক ৺প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের 'রত্নাবলী' শিক্ষিত বঙ্গসমাজের আদরের বস্তু। সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে তিনি যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, সেরূপ প্রায় দেখা যায় না। 'কুলীন-কুলসর্ব্বস্ব' নাটকে ইহার যথেষ্ট নমুনা আছে। একটি শ্লোক আছে যাহা মাঘ কবি লিখিলেও অগৌরব হইত না। কবিতাটি এই :—

অতিরক্তবপুঃ স্খলদ্গতি
র্বসুহীনো বিগতাম্বরো রবিঃ।
পততি প্রতিবারি বারুণী-
বহুসেবাফলমেতদেব হি॥

"এই শ্লোকটির মধ্যে যে double entendre, যে pun রহিয়াছে, তাহা কেমন সুন্দর।

"প্রথম অর্থ—সূর্য্যদেব অত্যন্ত লাল হ'য়ে, মন্দগতি হ'য়ে, কিরণ সব মিলিয়ে যাচ্চে এমন অবস্থায় সমস্ত আকাশ অতিক্রম ক'রে জলে ঝাঁপ দিচ্চেন। পশ্চিম দিকে যাওয়ার এই ফল।

"দ্বিতীয় অর্থ—মদ খেয়ে মাতালের শরীর লাল হ'য়ে উঠেছে, সে চল্‌তে গিয়ে হোঁচট্ খাচ্চে, সব টাকা উড়িয়ে দিয়েছে, গায়ের কাপড় গা থেকে খ'সে পড়্‌ছে, সে জলে ঝাঁপ দিচ্চে। অত্যন্ত মদ খাওয়ার ফল এই।

"এই মদ্যপান-প্রসঙ্গে অধ্যাপক প্যারিচরণ সরকারের নাম স্মরণ করা উচিত। একটি Temperance movement গঠিত করিয়া তিনি অনেক দিন তাহার নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। চারিদিকে মদ্যপানের বিরুদ্ধে crusade চলিতে লাগিল। তাঁহার এই

[১] নতুন বাজারে রামজয় বসাকের বাড়ীতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে রামনারায়ণ তর্করত্নের "কুলীন কুলসর্ব্বস্ব" (১৮৫৪) নাটক অভিনীত হয়।—সং।

Temperance movement শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে মদ্যপান-নিবৃত্তি বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। মাতালদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া তিনি প্রতিজ্ঞাপত্রে তাহাদিগকে স্বাক্ষর করাইয়া লইতেন। আমি কয়েক জনের কথা জানি, যাহারা সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে নাই। তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল ছিল; কিন্তু একটা কথা প্রচারিত হইল, তিনি গঞ্জিকা সেবন করেন! আমার মনে হয়, it was a calumny propagated by drunkards। ধীরাজ কিন্তু গান ধরিল—

মধুপান আর কোরো না,
Young Bengal বাঁচবে না,—
*　　*　　*
কিন্তু ড্যা-ঙ্গা প-থে নাইকো মানা।

"ঐ 'ড্যা-ঙ্গা প-থে নাইকো মানা' চরণটি গাহিবার সময় ধীরাজ হেলিয়া দুলিয়া pantomime-এর মত স্বহস্তে গঞ্জিকামর্দ্দনের অনুকরণ করিয়া, হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া দিত। ধীরাজ মদ খাইত।"

সাত

৩রা বৈশাখ, ১৩১৮

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—"সম্প্রতি একটি হিন্দু মহিলা * 'সৃষ্টি-রহস্য' নামক একখানি গ্রন্থ আমাকে উপহার দিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি পাইয়া আমি যার পর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। রচনা একটি অল্প-বয়স্ক বঙ্গমহিলার। ইহাতে যে সকল প্রতিপাদ্য বিষয় বিবৃত হইয়াছে তাহা অতি উচ্চ অঙ্গের। আত্মানন্দ, ত্রিতত্ত্ব, সচ্চিদানন্দ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, ইত্যাদি দুরবগাহ বিষয় লইয়া গ্রন্থকর্ত্রী শতাধিক পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছেন। যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে গেলে সাধারণ ব্যক্তির মাথা ঘুরিয়া যায়, বুদ্ধি পক্ষাঘাতপ্রাপ্তবৎ হইয়া উঠে, সেই সমস্ত বিষয় লইয়া বিশেষ আনন্দের সহিত আলোচনা করা হইয়াছে। রচনার ভাবভঙ্গি দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে, লেখিকা বিশেষ রসাস্বাদন করিতে করিতে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। আমি পূর্ব্বে জানিতাম যে, যদি চ অর্দ্ধ-শতাব্দী কাল হইল এ দেশে স্ত্রী-শিক্ষা এক প্রকার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তথাপি এখন পর্য্যন্ত সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরা গল্পের বহি বা নাটক অথবা বড় জোর দু'দশখানি কাব্যগ্রন্থ অধ্যয়নে রত থাকেন। তাঁহাদিগের বিদ্যা-চর্চ্চা ইহার উপর বড বেশী উঠে না। কিন্তু উপস্থিত গ্রন্থ দর্শন করিয়া আমার সেই ভ্রম অপসারিত হইতেছে। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মহারাজচক্রবর্ত্তী দার্শনিকগণ যে সকল বিষয়ের অনুশীলন করিয়া যাবজ্জীবন ক্ষেপন করিয়াছেন এবং ভূমণ্ডলে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন, রচয়িত্রী সেই সমস্ত বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতে পরাঙ্মুখ নহেন। আমার নিজের কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, আমি এ সকল বিষয়ের আন্দোলনে নিতান্ত অপটু, একেবারেই অক্ষম, এবং ইহার দোষগুণ বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র—"

পণ্ডিত মহাশয়ের কথায় বাধা দিয়া আমি বলিলাম—"সে কি মহাশয়? আপনার এ কথা শুনিয়া লোকে মাথা নাড়িবে; বলিবে, স্ত্রীলোকের রচনা বলিয়া আপনি সমালোচনা করিতে বিরত হইলেন।"

তিনি বলিলেন—"না। আমাকে ভুল বুঝিও না; আমি যে বেদান্তে পারদর্শী এ ধারণা লোকের হইতে পারে না।"

আমি বলিলাম—"অবশ্যই আমাদের সকলেরই পক্ষে ইহা একটি বিস্ময়ের বিষয় যে আপনি সংস্কৃতশাস্ত্রে এত বড পণ্ডিত হইয়া আপনার spiritual consolation পাশ্চাত্য

* শ্রীমতী ফুলকুমারী দেবী।

positivism-এ কেমন করিয়া পাইলেন। না হয়, আপনি এই পুস্তিকখানি উপলক্ষ করিয়া ধ্রুবদর্শনের ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া আপনার বক্তব্য বলিয়া যাউন।"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"সেটা উচিত নহে। আর আমার পাণ্ডিত্যের কথা যখন তুমি তুলিলে, তখন কয়েকটি কথা আজ বলিব; প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইও না। আমি একটা বিষয়ে আপনাকে কিঞ্চিৎ সৌভাগ্যবান জ্ঞান করি। আমার যে সকল গুণ অথবা বিদ্যাবুদ্ধিসংক্রান্ত যোগ্যতা অথবা বিশেষ পারদর্শিতা নাই, অনেক সময়ে আমি লোকের নিকট সেই সকল বিষয়ে প্রশংসাবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহা এক প্রকার আমার যশোভাগ্য বলিতে হইবে। আমার একটি বন্ধু ছিলেন, ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র তলাপাত্র। লোকটি খুব 'মস্করা' ছিলেন; তাঁহার সঙ্গে যে সময়টা কাটান যাইত, বড়ই হাসি খুসিতে কাটিত। তিনি একদিন আমাকে আধ্ তামাসার ছলে বলিলেন, 'আরে কৃষ্ণকমল, জ্ঞান কি বলত? কেবল ভোগা দিয়ে খাও বৈ ত নয়।' কথাটা বেশ আমার মিষ্ট লাগিল; এবং কতকটা মনে বদ্ধমূল হইল। ভাবিলাম, বলেছে মন্দ নহে। সেই হরিশ্চন্দ্র আবার আর একদিন আর একটা ব্যাপার দেখিয়া কিছু তাক্ হইয়া গিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় যখন 'শব্দস্তোম মহানিধি' নামক ক্ষুদ্র সংস্কৃত অভিধানখানি—ইহা 'বাচস্পত্য' অপেক্ষা অনেক ছোট—মুদ্রিত করিতেছিলেন তখন আমাকে একটা প্রুফ দেখিতে বলিতেন। আমিও দেখিয়া দিতাম; এবং যদিও তাঁহার লেখার উপব আমার কলম চালান এক প্রকার ধৃষ্টতামাত্র, তথাপি সময়ে সময়ে আমি একটু বদল করিয়া দিতাম। সে সমস্ত এই ভাবের পরিবর্ত্তন যে, তিনি হয় ত বড কঠিন সংস্কৃত লিখিয়াছেন, আমি একটু সহজ করিয়া দিলাম। তিনি হয় ত লিখিয়াছেন, 'কোকিলস্য পরপুষ্টত্বাৎ,' আমি হয় ত করিয়া দিলাম 'কোকিলো হি পরপুষ্টঃ'। তিনিও বুঝিতেন যে, ছেলেদের জন্য অভিধান হইতেছে, যত সহজ হয় ততই ভাল; অতএব তিনি আমার এ প্রকার পরিবর্ত্তন গ্রাহ্য করিয়া লইতেন। একদিন হবিশ্চন্দ্র তথায় উপস্থিত। এই ব্যাপাব দেখিয়া তিনি একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন, বলিলেন, 'অ্যাঁ! তুমি কাটিয়া দিয়াছ; আর তারানাথ তাহা মঞ্জুর পর্য্যন্ত করিয়াছেন! তাই ত, তুমি বড় কম লোক নও।' এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলিতে পারি। কায়স্থদিগের একটা চিরস্থায়ী গ্লানি তর্কবাচস্পতি মহাশয় তাঁহার অভিধানে 'কায়স্থ' এই শব্দ উপলক্ষ করিয়া সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। সংস্কৃত পণ্ডিতদিগের একটা উদ্ভট অনুষ্টুভ্ শ্লোক কায়স্থজাতির লোভ ও অর্থকার্পণ্য সম্বন্ধে প্রচলিত আছে। তাঁহার অভিধানে এই শ্লোকটি দেখিয়া আমি তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া উঠাইয়া দিতে কহিলাম। প্রথমে তিনি রাজি হইলেন না, পরে অনেক করিয়া বলাতে শেষ কালে রাজি হইলেন। আমার বোধ হয়, সেই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বহুবিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার

তর্কবিতর্ক চলিতেছিল। শ্যামাচরণ বিশ্বাস বিদ্যাসাগরের ভক্ত ছিলেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সহিত শ্যাম বিশ্বাসের কিছু তীব্র ভাবে সেই উপলক্ষে তর্কবিতর্ক হইয়াছিল। সেইজন্য পণ্ডিত মহাশয় সমস্ত কায়স্থ জাতির উপর চটিয়া গিয়াছিলেন, এবং কায়স্থ শব্দের ব্যাখ্যা লিখিতে বসিয়া রাগ সামলাইতে পারেন নাই। এটি কিন্তু আমার সম্পূর্ণ অনুমানমাত্র।

"যাহা হউক, হরিশ আমাকে যে ভোগা দিয়া খাইবার দোষারোপ করিয়াছিল সে কথাটি আমার সর্ব্বদাই মনে পড়ে, এবং আমি আপনা আপনি হাসি। আমি মনে মনে বেশ জানি যে, সাধারণতঃ লোকে আমাকে সংস্কৃতশাস্ত্রে যতদূর পারদর্শী ও পণ্ডিত মনে করে, আমি তাহার কিছুই নহি। ফলতঃ আমার নিজের বিশ্বাস যে, আমার সংস্কৃত-জ্ঞান কতকটা পল্লবগ্রাহিতা যাহাকে বলে তদ্রূপমাত্র। সুগভীর পাণ্ডিত্য কোনও বিষয়েই আমার নাই, এটি আমার আন্তরিক অমায়িক বিশ্বাস। কিন্তু এই বিশ্বাসের বিষয় আমি আমার পূর্ব্বতন ছাত্র অবিনাশচন্দ্র ঘোষের নিকট বলিবার উপক্রম করিয়াছিলাম। অবিনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ.; এখন গভর্ণমেণ্টের পেন্সন ভোগ করিতেছেন। তাঁহার পিতা ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'বেঙ্গলি' নামক সুপ্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্র সংস্থাপিত করিয়া যান, এবং আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। এই পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্যের কথা বলায় অবিনাশ অত্যন্ত চটিয়া গেলেন এবং আমার মুখের উপরে বলিলেন—'এটা কি হচ্চে? এটা affectation নাকি?' আমি থামিয়া গেলাম। আমি জানি যে, অবিনাশ আমার খুব ভক্ত, আমার বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা। আমি কোন্ কালে সংস্কৃত কোন কোন পাঠ্য গ্রন্থ অধ্যাপনার সময় উহার কি ইংরাজি অনুবাদ তাঁহাদিগকে বলিয়া দিতাম, এখনও পর্য্যন্ত অবিনাশ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে তাহার তারিফ করিতে ছাড়েন না। অবিনাশের মত সুবিদ্বান ব্যক্তির মুখে ঐ সকল প্রশংসাবাক্য শুনিয়া আমিও মনে মনে খুসী হই সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি আমার নিজের সংস্কৃতজ্ঞতা বিষয়ে আমার নিজের যাহা মত আছে, আমি জানি যে সেইটাই ঠিক।

"অধিক দিন নহে, আমি ও মহেশ ন্যায়রত্ন ও নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার, আমরা তিনজন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত প্রবেশিকা গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলাম। জানি না, কি গতিকে by some irony of fate, তাহাতে এত ভুল বাহির হইয়াছিল, যে আমাদের তিন জনকে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। এই ঘটনা লইয়া সংবাদপত্রওয়ালারা দিন কতক খুব আমোদ করিয়াছিল। একজন লিখিয়াছিল—'একৈকমপ্যনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্টয়ম' আর একজন আমার নাম করিয়া লিখিয়াছিল—'নামে তাল পুকুর ঘটি ডোবে না।' যাহা হউক, প্রবেশিকার সেই সংস্করণে যতদূর মূর্খতা দাঁড়াইয়া গিয়াছে, ততদূর

মূর্খ নহি বটে ; কিন্তু সংস্কৃতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা বলিতে গেলে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর রামকমলের প্রকৃতপক্ষে ছিল। আমার তাহা কিছুই নাই। তিনি সংস্কৃত কলেজে যে ১০।১১ বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, সেই কয় বৎসরের মধ্যে সংস্কৃতশাস্ত্রের এমন কোনও অংশই নাই যাহা তিনি প্রগাঢ়রূপে এবং সুগভীর আলোচনার সহিত অনুশীলন করেন নাই,—কি সাহিত্য, কি অলঙ্কার, কি দর্শন যখন যাহা পড়িয়াছিলেন, তাহাতেই এরূপ পারিপাট্য ও পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন যে তাঁহার অধ্যাপকগণ উত্তরকালের ছাত্রদিগের নিকট তাঁহাকে দৃষ্টান্তের স্বরূপ উপন্যাসিত করিতেন। আমার বেশ মনে আছে, আমি যখন প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের শ্রেণীতে অলঙ্কার পাঠ করি তখন আমাদের পাঠশৈথিল্যের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া তিনি বলিতেন, 'যথার্থ শিখিবার উদ্যম কেবল রামকমলের দেখিয়াছি।'

"যাঁহারা নিজে সংস্কৃতজ্ঞ নহেন, তাঁহারা আমার বিষয়ে ভাবেন যে, সংস্কৃত শাস্ত্রের কোনও অঙ্গই আমার অবিদিত নাই ; দর্শন, স্মৃতি, সকল বিষয়েই যেন আমার মতামত দিবার ক্ষমতা আছে। আমি অজ্ঞতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহি ; কিন্তু অনেক সময়ে মনে হয় ওরূপ করিতে গেলে লোকে বিপরীত বুঝিবে, আমাকে অহঙ্কারী বিবেচনা করিবে।

"আমার এই প্রকার যশোভাগ্যের যে কারণ কি তাহাও আমি এক প্রকার ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। কলেজে অধ্যয়ন না করিয়া আমি এণ্ট্রান্স পাসের দুই আড়াই বৎসরের মধ্যে ঘরে পড়িয়া বি. এ. পাস দিয়াছিলাম, সেই জন্য আমার একটা নাম বাহির হইয়াছিল, এবং আমি উপযাচক না হইয়াও প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকের পদ পাইয়াছিলাম। আমাদের দেশের লোকের একটা অভ্যাস এই যে, যিনি গভর্মেণ্টের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তিনি দেশের লোকের নিকটও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েন ; এই কথা ৺নগেন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁহার রচিত কৃষ্ণদাস পালের জীবনীতে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমি অল্প বয়সে প্রেসিডেন্সি কলেজের সিনিয়র প্রফেসর হওয়াতে সাধারণে ভাবিলেন যে, আমি না জানি কত বড় দিগ্‌গজ পণ্ডিত।

"তবে বিদ্যাসাগর মহাশয় যেন কতকটা ভিতরের ব্যাপার বুঝিয়া রাখিয়া ছিলেন, কারণ তিনি একদিন আমাকে স্পষ্ট বলিলেন, 'তোরা দুইয়ের বার হয়ে রইলি ; না ইংরাজিও তেমন লিখতে পারিস, না সংস্কৃততেও পণ্ডিত হলি।' তিনি তখন 'বিধবা বিবাহ' বাদানুবাদে মগ্নপ্রায় হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিলাষ ছিল যে তাঁহার যুক্তিবিন্যাসগুলি ইংরাজিতে উত্তমরূপে প্রতিপাদিত হয়। কিন্তু সংস্কৃতও ভাল বুঝে, ইংরাজিও ভাল লিখিতে পারে এরূপ লোক না পাওয়ায় নিরস্ত হইয়াছিলেন।

"প্রসঙ্গক্রমে নিজের কথা অনেক বলিলাম, বোধ হয় এখন সংস্কৃতজ্ঞান সম্বন্ধে আর

আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। একটু মোড় ফিরাইয়া লওয়া যাউক,—বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা একটু আলোচনা করিলে ক্ষতি কি ?

"বোধ হয় তোমরা জান না যে, তারানাথ তর্কবাচস্পতি বাঙ্গালায় 'বাক্যমঞ্জরী' নাম্নী একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়া ছিলেন। It is an excellent work on syntax,—আমার মনে হয় সে ধরণের পুস্তক আমাদের আর নাই। প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ও বাঙ্গালা লিখিতেন; ঈশ্বর গুপ্তের 'প্রভাকরে' নাকি তিনি একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। প্রভাকরের motto দু দফা তিনি রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। প্রথম দফা :—

সতাং মনস্তামরসপ্রভাকরঃ
সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ।[১]

ইত্যাদি।

দ্বিতীয় দফা :—

নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু ক্বচিৎ
ভ্রামং ভ্রামমতন্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ।
অদ্যোদ্যদ্ বিমল প্রভাকরকরপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে
স্বচ্ছন্দং দিবসে বিবস্তু চতুরস্বান্তদ্বিরেফা রসং॥

"আবার তিনি 'ভাস্করে'র[২] motto-ও লিখিয়া দিয়াছিলেন।—

ভ্রাতর্ব্বোধসরোজ কিং চিরয়সে। মৌনস্থ নায়ং ক্ষণঃ।
দোষধ্বান্ত দিগন্তরং ব্রজ ন তেঽবস্থানমত্রোচিতং।
ভো ভোঃ সৎপুরুষাঃ কুরুধ্বমধুনা সৎ কৃত্যমত্যাদরাৎ,
গৌরীশঙ্কর পূর্ব্ব পর্ব্বতমুখাৎ উজ্জৃম্ভতে ভাস্করঃ॥

"ঈশ্বর গুপ্তের 'প্রভাকর' দৈনিক পত্র; কিন্তু কয়েক বৎসর গতে তিনি প্রতি মাসে একখানি মাসিক সংস্করণ মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতে বিবিধ গদ্য থাকিত এবং যথেষ্ট গুণপনা প্রকাশ পাইয়াছিল। ইহা ব্যতীত কবির গান ইত্যাদি রচনা করিবার শক্তি তাঁহার সামান্য ছিল না। তাঁহার সময়ে 'কবির লড়াই' বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল, এবং তিনি একজন উৎকৃষ্ট বাঁধনদার বলিয়া প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন। তিনি নিজে কোথাও গান বড় একটা গাহিতেন না, তাঁহার গলাটাও ভাঙ্গা ভাঙ্গা গোছ ছিল। কিন্তু সেকালে তাঁহার গান বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে গীত হইত। একটি গান তোমাকে

[১] শ্লোকটির দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি: 'উদেতি ভাস্বৎসকলা প্রভাকরঃ
সদর্থসংবাদনবপ্রভাকর।'—সং

[২] গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের 'সম্বাদ-ভাস্কর'।—সং

বলিতেছি, এই গানটি এখনও আমার দেহে পুলক সঞ্চার করাইয়া দেয়, জানি না এ গানটি মুদ্রিত হইয়াছে কি না। গানটি এই :—

পুরবাসী বলে, রাণী, তোর তারাহারা এলো ঐ।
অমনি পাগলিনী প্রায়, এলোকেশে ধায়,
বলে, কই আমার উমা কই।
স্নেহে রাণী বলে, আমার উমা কি এলে,
একবার আয়, মা, আয় গো করি কোলে।
অমনি দুবাহু পসারি, মায়ের গলা ধরি,
অভিমানে কেঁদে মায়েরে বলে,
হ্যাদে ও পাষাণি, কই মেয়ে বোলে আনতে গিয়েছিলি,
পরের ঘরে মেয়ে দিয়ে, মা, মায়া কি পাসরিলি,
কৈলাসেতে সবাই বলে, উমা তোর কি মা নাই,
অমনি সরমে মরে যাই।
আমি বলি আমার পিতে, এসেছিলেন নিতে,
শিবের দোষ দিয়ে কাঁদি বিরলে।
তুমি গেলে না কো নিতে, জেনে এলেম আপনা হ'তে,
র'ব না কো যাব দু দিন গেলে।

"গানটি বোধ হয় আমার সম্পূর্ণ মুখস্থ নাই, কিন্তু ইহার রচনার লালিত্য ও চমৎকারিতা চিন্তা করিয়া মোহিত হইতে হয়। আজিকার কালে এরূপ রচনা কাহারও লেখনী হইতে বাহির হওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। মেকলে অ্যাডিসনের চমৎকার গদ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, অ্যাডিসনের রচনা দ্বিতীয় চার্লসের আমলের আধা-ফরাসি রচনা হইতে যেমন সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তেমনই এখনকার আধা-জর্ম্মান রীতি হইতেও স্বতন্ত্র। যথার্থ ইংরাজি রীতি যদি দেখিতে হয় তাহা হইলে অ্যাডিসনের গদ্যেই দেখিতে পাওয়া যাইবে। ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ব্বোক্ত গানটির বিষয়েও সেইরূপ বলা যাইতে পারে। উহাতে বামুন পণ্ডিতি সংস্কৃত শব্দের ছড়াছড়ি নাই, এবং এখনকার ইংরাজি তর্জ্জমা বাঙ্গালার ভঙ্গিও নাই। ফলতঃ যদি প্রকৃত বাঙ্গালা ভাষার রীতির নমুনা দেখিতে হয় তাহা হইলে দু-পাঁচ জন পুরাতন গ্রন্থকারের রচনা ভিন্ন আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যাইবে না। একজন দাশুরায়, একজন ভারতচন্দ্র, আর এ কালের মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত।

"উত্তরকালের অনেকগুলি লেখকের ওস্তাদ ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন। বঙ্কিমবাবু আপনাকে তাঁহার একজন সাকরেদ্ বলিয়া জানিতেন, এবং অক্ষয় দত্তের বাঙ্গালা

রচনাতে ঈশ্বর গুপ্তের নিকট হাতে খড়ি হয়। তবে অক্ষয় দত্ত যে বরাবর গুরুর রচনাপদ্ধতি নকল করিয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি অনেকটা বিদ্যাসাগরি রীতির দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা বলিয়া বিদ্যাসাগরেরও মাছিমারা গোছের নকল করেন নাই। অক্ষয় দত্ত যেরূপ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন, তিনি যে কাহারও নকলে চলিবেন, ইহা কোনও মতেই সম্ভবপর ছিল না। তাঁহার রচনার ঔদার্য্য ওজস্বিতা, অকপট আন্তরিকতা এবং মনের ভাব অকাতরে ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা বাঙ্গালার অতি অল্প লেখকেই প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি স্বরচিত 'বাহ্যবস্তু'র প্রথম ভাগের শেষে আমিষ ভক্ষণের বিরুদ্ধকল্পে এক সতেজ প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন, এবং উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের শেষ অংশে সুরাপানের বিরুদ্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গুরু ঈশ্বর গুপ্ত ইংরাজি লেখক অ্যাডিসনের মত মদিরার বিষয়ে কিঞ্চিৎ চিত্ত-দৌর্ব্বল্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; উভয়েরই পেটে একটু পড়িলে মাথাটা খুলিত ভাল। এই কারণেই বোধ হয় ঈশ্বর গুপ্ত সুরাপান সম্বন্ধে শিষ্য অক্ষয় কুমারের কটাক্ষপাত দর্শন করিয়া কিছু দিন পরে বিলক্ষণ 'দাদ তুলিবার' অবসর পাইয়াছিলেন। তাহার বৃত্তান্ত এই—

'বাহ্যবস্তু'র রচনার কয়েক বৎসর পরে অক্ষয়কুমারের মস্তিস্ক বোধ হয় অতিরিক্ত চালনা-দোষে এত নিস্তেজ ও নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার লেখা পড়ার ব্যাপার ত্যাগ করিয়া বালিগ্রামে যাইয়া একটি নিভৃত স্থানে গাছপালা রোপনে অন্যমনস্ক হইয়া জীবনের শেষ কয়েক বৎসর ক্ষেপন করিতে হইয়াছিল। সেই সময় শুনিতে পাই তিনি মাংসও ধরিয়াছিলেন, port wine-ও ধরিয়াছিলেন। তাঁহার এই শেষাবস্থা উপলক্ষ করিয়া ঈশ্বর গুপ্ত পরিহাসগর্ভ একটি পদ্য লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই ছত্রটি ছিল :—

'মাথামুণ্ডু ঘুরে গেল মাথামুণ্ডু লিখে।'

"বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিসাধন সম্বন্ধে যে সকল ব্যক্তির গুণ-কীর্ত্তন করা আমাদের অভ্যাস হইয়াছে তন্মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের নাম যে সর্ব্বোচ্চশ্রেণীতে কীর্ত্তিত হওয়া উচিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু কেন যে তাহা হয় না, কেন যে তাঁহার স্মরণার্থ একখানি ছবি পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত করিবার কোনও উদ্যোগ কখনও প্রকাশ্যরূপে হয় নাই, ইহা শুদ্ধ যে অনাকলনীয় (inconceivable, unaccountable) তাহা নহে, ইহাতে বাঙ্গালী জাতির কৃতজ্ঞতাবৃত্তি যে নিতান্ত ক্ষুদ্রকলেবর তাহাও প্রকাশ পায়। সে বিষয়ে জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দিতে গেলে অধিক দূর যাইতে হয় না, লর্ড রিপণের নাম করিলেই যথেষ্ট হইবে। রিপণের স্মৃতিরক্ষাবিষয়ে আমরা যে ভঙ্গি প্রদর্শন করিয়া বসিয়া আছি, তাহাতে বোধ হয় কিঞ্চিৎ চিন্তাপ্রবণতা থাকিলে প্রত্যেক বাঙ্গালীর

অধোবদন হইয়া থাকা উচিত। ঈশ্বর গুপ্ত আর লর্ড রিপণ এই দুইজনের নাম এক প্রস্তাবে উল্লেখ করিতে কুণ্ঠিত হইবার কোন কারণ নাই। একজন যেমন রাজনৈতিক বিষয়ে অত্যুদারমতি ছিলেন, আর একজন তেমনই একটি অল্পবয়স্ক সাহিত্যশাস্ত্রের উন্নতিকল্পে আপনার জীবন সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। আমার বোধ হয়, ঈশ্বর গুপ্তের বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকের যে ঔদাসীন্য তাহার একটি প্রধান কারণ এই যে, তিনি গভর্মেণ্টের নিকট বড় একটা জানিত ছিলেন না। আর আমরা বাঙ্গালী যতই আস্ফালন করি না কেন, গভর্মেণ্ট আঙ্গুল না বাড়াইলে আমরা কে ভাল কে মন্দ বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

"প্রকৃত বাঙ্গালাভাষায় রীতি-বিশুদ্ধ (idiomatic) রচনা-বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তের যে প্রকার পারিপাট্য ছিল, তাহাতে দাশুরায়ের ততোধিক ক্ষমতা দেখা যায়। দাশুরায়ের রচিত একটি গান আমার মুখস্থ আছে, সেটি হাটে বাজারে ভিখারীরা গাহিয়া দু'এক পয়সা উপার্জ্জন করে। সেই ১০।১২ পংক্তির মধ্যে প্রকৃত বাঙ্গালা রীতির এত নমুনা দেখিতে পাওয়া যায় যে, এখনকার তর্জ্জমা করা আধা ইংরাজী লেখা যাঁহাদিগের অভ্যাস হইয়া গিয়াছে তাহাদের সর্ব্বদা সেই ১০-১২ পংক্তি চক্ষুর সম্মুখে রাখা মন্দ নহে। গানটি এই :—

কি আনন্দের কথা, উমে, ও মা লোকমুখে শুনি,
সত্য বল শিবানি, অন্নপূর্ণা নাম কি তোর কাশীধামে।
অপর্ণা যখন তোরে অর্পণ করি,
ভোলানাথ ছিলেন মুষ্টিকের ভিখারী,
আজ কি আনন্দের কথা বল্লি, শুভঙ্করি,
বিশ্বেশ্বরী না কি বিশ্বেশ্বরের বামে।
খ্যাপা, খ্যাপা সবে বল্‌ত দিগম্বরে,
গঞ্জনা পেয়েছি কত ঘরে পরে,
আজ দ্বারি নাকি আছে বিশ্বেশ্বরের দ্বারে,
দর্শন পায় না ইন্দ্র চন্দ্র যমে।
হিমালয়ে বাস হর করিয়াছে,
কুবের ধনেতে কাশীনাথ হয়েছে,
ফলেছে কি ফল তোমার কপালক্রমে।
বিষয় বুদ্ধি বটে বিশ্বাস হয় যে মনে,
তা না হলে গৌরীর এত গৌরব কেনে,
চেয়ে দেখ না আপন সন্তানে,
মুখ বাঁকাও কেন দাশরথি নামে।

"এমন সরল ভক্ত খাঁটি বাঙ্গালী কবি এখন আর জন্মে না কেন? বহুদিন ধরিয়া আমরা পশ্চিমের দিকে তাকাইয়া আছি, সমস্ত বিষয়েই পশ্চিম হইতে inspiration লইয়া আপনাদিগকে সার্থক মনে করিয়াছি। আপনাদের শব্দসম্পদের দিকে লক্ষ্য না করিয়া বিদেশী কথার তর্জ্জমা করিয়া বিদেশী স্বরে গান গাহিয়াছি, নহিলে ভিত্তিহীন, বিশেষত্ব, সহানুভূতি শব্দ বাঙ্গালা সাহিত্যের ও বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গীভূত হইল কেন? এই গুলির কি খাটি দেশী প্রতিশব্দ পাওয়া যায় নাই? আমাদের এই নবজাগ্রত স্বদেশ-ভক্তি যদি বাস্তবিকই আমাদের দেশের দিকে আমাদের মন আকর্ষণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যে ভক্ত দাশুরায়ের স্থান নির্দ্দেশ করিতে আমাদের কষ্ট পাইতে হইবে না।

"শুনিয়াছি ম্যাক্স মূলার যখন ঋগ্বেদের মুদ্রাঙ্কন সংস্করণরূপ বিরাট ব্যাপারে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন তখন পাণিনির প্রায় চারি হাজার সূত্র সর্ব্বদাই চক্ষুর সম্মুখে রাখিবার জন্য, সূত্রগুলি আগাগোড়া ঘরের দেওয়ালে এমন করিয়া লিখিয়াছিলেন, যে, যখনই যে সূত্রের আবশ্যক হয় তখনই তাহা দেখিবার সম্ভাবনা থাকে। আমার মনে হয় আমাদের সাহিত্যের পর্ণকুটীর হইতে বৈদেশিক 'ভিত্তিহীন' প্রভৃতি শব্দ বহিষ্কৃত করিয়া খাঁটি দেশী কথায় সাহিত্যের চর্চ্চা করিতে হইলে হয় ত প্রথম প্রথম কুটীরগাত্রে খাঁটি বাঙ্গালা শব্দগুলি লিখিয়া রাখিতে হইবে। হয় ত তখন আবার ঈশ্বর গুপ্ত দাশু-রায়ের মত বাঙ্গালী সাহিত্যিক খাঁটি বাঙ্গালায় মনের ভাব প্রকাশ করিতে সক্ষম হইবে।

"ইংরাজি ভাষা বাঙ্গালা ভাষার প্রতি যে কটাক্ষপাত করা হইল তাহার অভিপ্রায় এরূপ নহে যে, বর্ত্তমান অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষাকে ইংরাজি ভাষা কিম্বা তাদৃশ সম্পূর্ণ-বিকাশপ্রাপ্ত অন্য কোন য়ুরোপীয় ভাষা হইতে শব্দ, ভাব ও 'ধরন্তা' ইত্যাদি বিষয়ে সাহায্য লইতে হইবে না, বা অনুকরণ করিতে হইবে না। ইহাতে ভাষা দোঁয়াশলা হইয়া আসে বটে কিন্তু ভাষা দোঁয়াশলা হইলে যে তাহার পূর্ণতাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে বিশেষ কোনও ব্যাঘাত ঘটে এ প্রকাব বোধ হয় না। ইংরাজির মত দোঁয়াশলা ভাষা আর নাই। একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ গ্রন্থকার (ডি ফো) কোনও স্থলে বলিয়া গিয়াছেন,—'আমরা ইংরাজ জাতি বর্ণসঙ্কর-বিষয়ে নাক তুলি কেন? আমাদের মত সঙ্কর জাতি—mongrel race—আর কোথায় আছে? দিনেমার, জার্ম্মান, কেল্ট, টিউটন প্রভৃতি কত জাতির রক্ত আমাদের শিরায় বহিতেছে তাহার ইয়ত্তা করা ভার।' ডি ফো ইংরেজ জাতির বিষয়ে যে সঙ্করের কথা কহিয়া গিয়াছেন, তাহাদের ভাষাতেও সেরূপ দোষ—দোষই বল আর গুণই বল—আবোপ করা যাইতে পারে। তথাপি কিন্তু ইংরাজি অপেক্ষা সমধিক পূর্ণতাপ্রাপ্ত আর কোন্ ভাষা পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে?

"মেকলে আপনার ইতিহাসের একস্থলে সাহঙ্কারে বলিয়াছেন,—আর সে অহঙ্কার অমূলক নহে,—যে কবির কার্য্যই বল, গদ্য লেখকের কার্য্যই বল, বক্তৃতার ব্যাপার বল, পরিহাসরসিকতা, ইতিহাস রচনা ইত্যাদি যে কোন ব্যাপারে ভাষার উপযোগিতা আছে, তাহার কোনটিতেই পূর্ণতা লাভ করিতে ইংরাজি ভাষা অক্ষম বা অনুপযুক্ত নহে, এবং পৃথিবীর অন্য কোনও ভাষার নিকট এ সম্বন্ধে ইংরাজিকে হীনতাস্বীকার করিতে হইবে না; তবে যদি হয়, বোধ হয় প্রাচীন গ্রীক ভাষার নিকট চাই কি হীনতা স্বীকার করিতে হইলেও হইতে পারে।

"অতএব দেখা যাইতেছে যে 'আঁশ'—hybridism, mongrel character—বেশী সংখ্যায় থাকিলে যে ভাষাকে হীন থাকিতে হয়, একথা ঠিক নহে। তবে আমার বোধ হয়, বাঙ্গালার ভবিষ্যতে পূর্ণতালাভ সম্বন্ধে একটা ব্যাঘাত রহিয়াছে,—সেটা আমাদের রাজনৈতিক অবস্থা। পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ, বহুকাল পরাধীন কোনও জাতির ভাষা কস্মিনকালে বিশিষ্ট উন্নতি লাভ করে নাই। এশিয়া মাইনর সেইরূপ একটি দেশ; ইহার কোনও ভাষা কখনও গা তুলিতে পারে নাই। ইটালির ভাষাকে এ বিষয়ের বিরুদ্ধ প্রমাণ বলা যায় না; কারণ, ইটালির মধ্যে কেবল সিসিলি ও নেপ্‌ল্‌স্ অনেক দিন স্পেনের অধীন ছিল, এবং উত্তরে লম্বার্ডি কিছুকাল অস্ট্রিয়ার অধীন থাকে। কিন্তু অন্যান্য অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক গুলি রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল, সে সকল রাষ্ট্রে স্বদেশীয় লোকেরই প্রাধান্য। তাঁহাদের অনেকেই অত্যাচারী ও উৎপীড়ক ছিলেন বটে, কিন্তু তথাপি তাঁহারা ইটালির লোক। অতএব ডাণ্টে, টাসো, আরিয়ষ্টো, পেট্রাক ইহাদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সপ্রমাণ করা যাইতে পারে না যে, এরূপ অবস্থা ভাষা বিকাশের গুরুতর বিঘ্ন নহে। আরও একটা দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে,—প্রাচীন গ্রীক ভাষা ও আধুনিক রোমেক (Romaic) ভাষা। কই, রোমেক ভাষাতে কে কোথায় বড় গ্রন্থকার জন্মিয়াছে? যে অবধি গ্রীসের স্বাধীনতা গেল, সেই অবধি তাহার সাহিত্যও গিয়াছে। অতএব আমার ত বোধ হয়, উন্নতি সম্বন্ধে যতই চেষ্টা কর, বাঙ্গালা 'আধেঙ্গা' গোছ হইয়া থাকিবে। তবে আমি এ কথা বলি না যে, বাঙ্গালার ৪।৫ কোটি লোকের বিদ্যা শিক্ষার জন্য ভাষাটাকে কতকটা গড়িয়া তুলিতে হইবে না। উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা না হউক, মধ্য অঙ্গের শিক্ষা পর্য্যন্ত সাধন করিতে তর্জ্জমার দ্বারাই হউক, স্বাধীন রচনার দ্বারাই হউক, গ্রন্থাদি রচনা চলিতে থাকিবে। কিন্তু মাথার উপরে ইংরাজির যে দাপট আছে সেটা ঘুচিবার কোনও সম্ভাবনা দেখি না। অধিকাংশ অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বাঙ্গালী ইংরাজীর দিকেই আকৃষ্ট ও ধাবিত হইবেন। যদি কখনও তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার করিতে উন্মুখ হয়েন, সেটা যেন তাঁহারা ভাবিবেন বাঙ্গালাকে অনুগ্রহ করিতেছেন।"

আট

৩১শে বৈশাখ, ১৩১৮

অনেক দিন পরে আজ আবার সন্ধ্যার সময় বীডন উদ্যানে পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত আলাপ করিবার অবসর পাইলাম।

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"আজ তোমার সাহিত্য পরিষদের অধিবেশনে উপস্থিত হইবার কথা ছিল, তথায় গেলে না কেন?" আমি বলিলাম,—"শরীর ভাল নহে।" জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই সকল অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করা হয় কি?" আমি উত্তর করিলাম,—"হয় বৈকি? আজ সম্রাট্ কনিষ্কের একটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদর্শন করিবার কথা আছে।" তিনি বলিলেন,—"দেখ, কালিদাসের পুস্তকে যে 'নিষ্ক' কথাটি পাওয়া যায়, আমার মনে হয় উহা আর কিছুই নহে, ঐ কনিষ্কের স্বর্ণমুদ্রা। 'নিষ্ক' কথাটির অর্থ কি জান? ছেলেদের গলায় অলঙ্কার-স্বরূপ যে সোণার ধুকধুকি পরাইয়া দেওয়া হয়, সেই অলঙ্কারবিশেষকে নিষ্ক বলে। এখনকার ছেলেপিলের গলায় যেমন নবাবি আমলের মোহর কিম্বা ইংরাজের গিনি ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, সেইরূপ হয় ত সীথিয় শকরাজের মোহর কালিদাসের সময়ে ব্যবহৃত হইত।"

আমি বলিলাম,—"আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বিশেষতঃ যদি এ কথা ঠিকই হয় যে, কনিষ্ক খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক, এবং মহাকবি কালিদাস চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের এক রত্ন।"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—"দেখ, গ্রীক মুদ্রা আমাদের দেশে এত প্রচলিত ছিল যে, সংস্কৃত ভাষার মধ্যে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া সুকঠিন নহে। সংস্কৃত 'দ্রম্য' নিশ্চয়ই যাবনিক Drachma। অমরকোষে তাম্রের একটি নাম 'ম্লেচ্ছমুখ'। হইতে পারে, ম্লেচ্ছমুখের বর্ণের মত ইহার বর্ণ, কিন্তু আমার মনে হয় যে, বাস্তবিকই এই মুদ্রায় ম্লেচ্ছরাজার মুখ অঙ্কিত ছিল।"

আমাদের এই কথোপকথনের মাঝখানে একজন ভদ্রলোক বলিলেন—"শুনিয়াছেন মহাশয়, অনারেবল্ মোহিনীমোহন রায়ের এক পুত্র নোট জাল করার অপরাধে ধৃত হইয়াছে?" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"মোহিনীবাবু was the architect of his own fortune। যখন তিনি সংস্কৃত কলেজে অঙ্কশাস্ত্র অধ্যাপনা করিতেন, আমি তখন তাঁহার ছাত্র। কিন্তু যখন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইল, তখন আমরা দুজনেই প্রথম বৎসরে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলাম। বঙ্কিমবাবুও আমাদের সহিত উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহার পর আমি বি. এ. পড়িবার

জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হইলাম; মোহিনীবাবু কমিটি পরীক্ষা দিয়া উকিল হইলেন; রাজসাহী জিলায় ওকালতি আরম্ভ করিলেন। জিলার জজ লুইস জ্যাক্‌সন তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন; বলিতেন, মোহিনীর বালকের মত কচি মুখ ও কোঁকড়ান চুল আমার বড় ভাল লাগে। পরে লুইস জ্যাক্‌সন যখন হাইকোর্টে আসিলেন, মোহিনী-বাবুকে কলিকাতায় আসিতে পরামর্শ দিলেন। ক্রমে মোহিনীবাবুর কপাল ফিরিয়া গেল। লুইস্ জ্যাক্‌সনের আদালতে তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। সে কালের সেই কমিটি পাস করা উকিলদিগের মধ্যে তিনি বেশ গুছাইয়া ইংরাজি বলিতে পারিতেন, জ্যাক্‌সনও তাহাই পছন্দ করিতেন। আবার তিনি মোকর্দ্দমা এমন করিয়া আরম্ভ করিতে পারিতেন যে, প্রথম হইতে জজের কাণ খাড়া হইয়া উঠিত। একবার এক আপিলের মুখবন্ধে তিনি বলিলেন—'My Lord, analysis of evidence may be of two kinds,—the one a commonsense view of the evidence, the other a learned analysis of it. Mr Field has here given us a very learned analysis; but your Lordships will, I trust, analyse the evidence in the other way, i.e. will confine yourselves to a commonsense view of the case.' আমার বেশ মনে পড়ে, জজ প্রথম হইতেই মনোনিবেশ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। লুইস জ্যাক্‌সনের আদালতে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। উকিলেরা তাঁহাকে ভয় করিতেন। পচা খাস আপিল দাখিল করিবার জন্য প্রসিদ্ধ কোনও উকিল আপিলের সওয়াল জবাব করিতে না করিতেই তিনি আপিলের কাগজ আস্তে আস্তে ফেলিয়া দিতেন। তিনি আপনার সুখ্যাতি পর্য্যন্ত শুনিতে ভালবাসিতেন না, বরং যে তাঁহাকে সুখ্যাতি করিত তাহাকেই কড়া কথা শুনাইয়া দিতেন। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা তোমাকে পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি;[১] কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কথা আমার মনে পড়িতেছে। একদিন একটা মোকর্দ্দমার argument-এর সময় তিনি লুইস জ্যাক্‌সনকে একটু compliment দিলেন, অমনি জজ বলিয়া উঠিলেন, 'You must not expect to win your case by flattering me;' হেমবাবুও অবিচলিত ভাবে উত্তর দিলেন—'Then I withdraw the remarks, my lord.' হেমবাবুর ঐ একটা অসাধারণ গুণ ছিল; তিনি সদাই প্রফুল্ল থাকিতে পারিতেন। একদিন দ্বারিবাবু তাঁহাকে বলিলেন, 'ছাখ্ হেম, তোর ব্যাপারখানা কি বল্ দেখি? এই যে জজদের কাছে এত লাথি ঝাঁটা খাস্, তবুও তুই সর্ব্বদা হাসিস্! তোর মুখ ত কখনও ভার দেখ্‌লুম না।' দ্বারিবাবুর কথায় হেমবাবু হাসিতে লাগিলেন। হেমবাবুর এই সহাস্য ভাব আমার বড় ভাল লাগিত। একবার তিনি আমাকে উপলক্ষ করিয়া একখানা

[১] পৃঃ ৪২-৪৫ দ্রষ্টব্য।—সং

গোটা নাটকই * রচনা করিয়া ফেলিয়াছিলেন; এবং খান পঞ্চাশেক মুদ্রিত করিয়া বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। আমার নিকট সে নাটকের একখণ্ডও নাই। দেখি যদি উমাকালীর নিকট থাকে।

"কিন্তু মোহিনীবাবুর কথা বলিতেছিলাম। একটা বড় জমিদারি কিনিবার সময় লুইস জ্যাক্সন তাঁহাকে টাকা ধার দিয়াছিলেন। আজ সেই বিষয়-সম্পত্তি তিন নয় ছয় হইয়া গেল!

"তখনকার দিনে জজরা যে উকিলের উপর বিরক্ত হইতেন, তাহার কারণ ছিল। কমিটি পাশ করা অনেক উকিল ভাল করিয়া গুছাইয়া ইংরাজি বলিতে ত পারিতেনই না, পরন্তু! যাহা বলিতে যাইতেন, তাহা অত্যন্ত অদ্ভুত রকম দাঁড়াইত। একজন উকিল একবার একটা right of way-র মোকর্দ্দমা উপলক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বিচারপতিকে বুঝাইতে চাহেন যে, যে পথ লইয়া বিবাদ হইতেছে, সে পথে সদাসর্ব্বদাই সকলের গতিবিধি ছিল। এই কথাটি বুঝাইবার জন্য তিনি ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন—It is a case of promiscuous intercourse, my Lord. জজ ম্যাক্ফার্সন্ উকিলের দিকে তাকাইয়া আস্তে আস্তে বলিলেন—You are a born idiot, Babu.

"বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারেই মোহিনীবাবুর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়। আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে এক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া কয়েক মাস ডভ্টন্ কলেজে পড়িয়াছিলাম। ডভ্টন্ কলেজে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন ডাক্তার জর্জ্জ স্মিথ,—সুন্দর, সরল, সুদীর্ঘ দেহ, প্রশস্ত ললাট, সৌম্য কান্তি, অসাধারণ পাণ্ডিত্য; তাঁহাকে সকলেই ভক্তি করিত। তিনি প্রসিদ্ধ দার্শনিক সার উইলিয়ম হ্যামিল্টনের ভক্ত ছাত্র ছিলেন। তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার গুরু হ্যামিল্টন পক্ষাঘাত-রোগগ্রস্ত অবস্থাতেই অধ্যাপনা করিতেন। মিষ্টার স্মিথ দুইখানা বড় বড় পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন,—ডাক্তার ডফের জীবন-চরিত ও বিশপ কটনের জীবন-চরিত। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। দার্শনিক জর্জ্জ পেনের একখানি পুস্তক আমি এমন করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলাম যে, তিনি আমার আগ্রহ দেখিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন। আমার সহাধ্যায়ীরা সকলেই ল্যাটিন জানিত, আমি উক্ত ভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম, ইহা জানিতে পারিয়া তিনি আমাকে তাঁহার নিজ কক্ষে বসাইয়া ল্যাটিন শিখাইতেন। কিন্তু তিনি অধিক দিন অধ্যাপনা করিলেন না। কলেজের কাজ ছাড়িয়া দিয়া তিনি শ্রীরামপুরে গেলেন; সেস্থানে 'ফ্রেণ্ড অভ্ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদক হইলেন। সম্পাদক হইয়া তিনি কিছু গোল করিয়া বসিলেন। আমি জানিতাম, তিনি একটু গোঁড়া খ্রীষ্টান। সেই জন্যই গোল বাধিল। তখনও

* নাকে খৎ।

সিপাহীবিদ্রোহবহ্নি সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হয় নাই। 'ফ্রেণ্ড অভ্ ইণ্ডিয়া' এমন উৎকট খ্রীষ্টান সুরে লিখিতে আরম্ভ করিল যে, গভর্মেণ্ট পর্য্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষ খ্রীষ্টান না হইলে ইংরেজের আর রক্ষা নাই, এই কথাই উক্ত পত্রিকা বারম্বার বলিতে লাগিল। লর্ড ক্যানিং দেখিলেন, এ এক নূতন বিপদ ; এইরূপ উন্মত্ত প্রলাপে আবার অশান্তির তুফান উঠিতে পাবে। সবিশেষ চিন্তা করিয়া তিনি মুদ্রাযন্ত্রের একটি আইন কবিলেন, এবং উহার ফলে পত্রিকাখানা বন্ধ হইয়া গেল।

"বহুদিন পরে আমি যখন হাইকোর্টে ওকালতি করি; একদিন শ্রীরামপুর রেল ষ্টেসনে মিষ্টাব স্মিথকে দণ্ডায়মান দেখিতে পাই,—সেই সুদীর্ঘ দেহ, প্রশস্ত ললাট, সৌম্যকান্তি। তিনিও আমার প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন ; আমার কিন্তু ভরসা হইল না যে, তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করি।

"হিন্দু কলেজের কাপ্তেন রিচার্ডসনের ন্যায় মিষ্টার স্মিথ যশস্বী হইতে পারেন নাই। আমি কাপ্তেনেব কাছে কখনও অধ্যয়ন করি নাই ; কিন্তু যখন আমি সংস্কৃত কলেজে পড়ি তখন তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছি। তোমরা বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে যে, লর্ড মেকলে রিচার্ডসনেব মুখে সেক্সপীয়রের কিয়দংশের আবৃত্তি শুনিয়া এত চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। পরে কিন্তু মিষ্টার বীটনেব (Drinkwater Bethune) সঙ্গে তাঁহার মনোমালিন্য হয় ; তিনি কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন। যতদূর আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম, তাঁহার এই কর্ম্মত্যাগের একটা নিগূঢ় কারণ ছিল ; কিন্তু সে বিষয়ের আলোচনা এখন নিষ্প্রয়োজন।

"কাপ্তেন রিচার্ডসনের চাকরিটি গেল। অল্পকাল পরেই মতিলাল শীল ও রাজেন্দ্রলাল দত্ত প্রমুখ কয়েকজন ভদ্রলোক সিঁদুরিয়া-পটির গোপাল মল্লিকের বাড়ীতে মেট্রোপলিটান কলেজ নামক একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করিলেন। এখন হ্যারিসন রোডে সে বাড়ীর চিহ্নমাত্রও নাই, তাহার উপর দিয়া উক্ত রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। এই বাড়ীতে 'বিধবা-বিবাহ' নাটক প্রথম অভিনীত হইয়াছিল। কাপ্তেন রিচার্ডসন সেই বিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। কলেজটি কিন্তু বেশি দিন টিকিল না। আমি যখন বি. এ. পাস করিয়াছি, তখন শুনিলাম যে, কাপ্তেন রিচার্ড্‌সন কয়েক মাস প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র। আমি তাঁহার মুখে রিচার্ডসনের যথেষ্ট প্রশংসাবাদ শুনিয়াছি।

"কাপ্তেন রিচার্ডসন 'Selections from English Poets', 'Literary Leaves', প্রভৃতি যে কয়খানি পুস্তক প্রণয়ন করেন সেই কয়খানা পুস্তকেই তিনি যে গুণপনার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। তিনি ইংরাজ ও স্কচ্ কবিদিগকে

যথোচিত সমালোচনা করিতে ছাড়েন নাই। এমন কি সেক্সপীয়রের যে সনেটটি পাঠ করিলে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই বিস্ময়ে ও লজ্জায় অধোবদন হয়েন,—Master mistress of my passion' ইত্যাদি, রিচার্ডসন সেই সনেটটিরও একটি সুরুচিপূর্ণ ব্যাখ্যা করিবার নিষ্ফল প্রয়াস পাইয়াছিলেন। অবশেষে তিনি বলিয়া উঠেন, 'I wish Shakespeare had never written a sonnet like this.' মেকলে একবার হিন্দুকলেজে কাপ্তেন রিচার্ডসনের ছাত্রদের পরীক্ষা লইলেন। ঘটনাচক্রে যে কবিতাটি তাঁহার দৃষ্টিতে পড়িল, সেটি মিল্টনের একটি সনেট—যে কবিতায় তিনি ভয় প্রকাশ করিতেছেন যে, একদল সৈন্য আসিয়া তাঁহার গৃহ ভাঙ্গিয়া দিবে। তিনি কাপ্তেন, কর্ণেল ইত্যাদি সেনানায়কদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন যে, দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার যেমন পিণ্ডারের বাড়ীটি ভগ্ন করেন নাই সেইরূপ তাঁহারাও যেন ইংরাজ কবির বাড়ীটি না ভাঙ্গেন। কবিতাটির প্রথম ছত্র captain or colonel বলিয়া আরম্ভ হইয়াছে; পাঠ করিবার সময় কলোনেল উচ্চারণ না করিলে ছন্দপতন হয়। একজন ছাত্র প্রথমেই কবিতাটি পড়িবার সময় কলোনেল পড়িয়া গেল। মেকলে আনন্দিত হইয়া যুবকটির নিকটে আসিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইতে লাগিলেন।

"সম্প্রতি না কি রমেশচন্দ্র দত্তের এক ভাগনেয়ীর সতীদাহ হইয়াছে? কাগজওয়ালারা না কি খুব বাহবা দিতেছে? দেখ, হরেস্ হেম্যান্ উইলসন্ আইনের দ্বারা সতীদাহ উঠাইয়া দিতে না কি নারাজ ছিলেন। একজন ইংরাজ এই প্রথার বিরোধী হইলেন ইহা কিরূপে ঘটল, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে দিগ্গজ পণ্ডিত ছিলেন বটে, এমন কি সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি জোর এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিতেন যে, সতীদাহরোধ করিলে হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত লাগে। এই বিশ্বাসেই বোধ হয় তিনি আইনের দ্বারা সতীদাহ উঠাইতে চাহেন নাই।

"সিন্ধুদেশ জয় করিয়া যখন স্যর চাল্‌র্স্ নেপিয়র উক্ত প্রদেশে ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তখনই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, তথায় আর সতীদাহ চলিবে না; কারণ সিন্ধুজয়ের দশ বৎসর পূর্ব্বেই লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে ইংরাজ রাজ্য হইতে সতীদাহ প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইংরাজ-রাজত্বের বিশিষ্ট গৌরব এই যে, উহার মধ্যে সতীদাহ-প্রথা অথবা ক্রীতদাস আদৌ থাকিতে পারিবে না। যখন ঘোষণা প্রচারিত হইল, তখন তথাকার কয়েকজন প্রাচীন ধর্ম্মাভিমানী টাই-গোছ হিন্দু তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন—হুজুর, সতীদাহ উঠাইয়া দিলে আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হয়। এই কথা শুনিয়া তিনি অম্লানবদনে উত্তর দিলেন—সতীদাহ তোমাদের ধর্ম্মে অনুমোদিত হইতে পারে; কিন্তু আমি যে

ধর্ম্ম মানি, এ প্রথা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ; অতএব জানিয়া রাখিও, যিনি ইহাতে লিপ্ত হইবেন, আমি নিশ্চয়ই তাঁহাকে ফাঁসি দিব—It may be your religion to burn your widows, but remember, it is my religion to hang those who will be concerned in it.—এই কথায় ভট্টিকাব্যের দুইটি শ্লোক আমার মনে পড়ে। রাক্ষস মারিচ বলিতেছেন—আমাদের ধর্ম্ম এই যে, দ্বিজ ও বেদযজ্ঞীদিগকে হত্যা করা, নগরকে প্রেতের আবাস ভূমি করা—

অস্মো দ্বিজান্ বেদযজ্ঞীন্ নিহন্মঃ
কুর্ম্মঃ পুরং প্রেতনরাধিবাসং

ইত্যাদি,

রামচন্দ্রও উত্তর দিলেন 'তোমাদের যদি ঐ ধর্ম্ম হয়, আমারও এক ধর্ম্ম আছে যাহারা ঐ রূপ করিবে, তাহাদিগকে নিধন করা—

ধর্ম্মোঽস্তি সত্যং তব রাক্ষসায়ং
অন্যো ব্যতিস্তে তু মমাপি ধর্ম্মঃ।
ব্রহ্মদ্বিষস্তে প্রণিহন্মি যেন
রাজন্যবৃত্তির্ধৃতভাস্বরাস্ত্রঃ॥

"ইহাতে দেখিতেছি যে, যে স্থানে যত উচ্চ অঙ্গের কর্ম্মবীর (men of action) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সমান অবস্থায় সংস্থাপিত হইলে সকলেরই একস্বরে 'রা' বাহির হয়। কোথায় ত্রেতাযুগের রামচন্দ্র, কোথায় স্যর চার্লস্ নেপিয়র! কিন্তু দেখ যেন দুজনে পরামর্শ করিয়া কথা কহিতেছেন।

"যখন লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে সতীদাহ উঠাইবার হুকুম প্রচারিত হইল, তখন না কি হিন্দুসমাজের চাঁইগণ ইংলণ্ডে সে বিষয়ের প্রতিবাদের জন্য আন্দোলন করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, এবং সেই উপলক্ষে তথায় একজন কৌন্সিলি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই কৌন্সিলি আর কেহ নহেন, আমাদিগের পরিচিত মিষ্টার বীটন (John Drinkwater Bethune), যিনি প্রায় ২২।২৩ বৎসর পরে এখানে আইনের সদস্য (Law Member) হইয়া আসেন। তিনি না কি যখন সতীদাহের স্বপক্ষে কৌন্সিলি হয়েন, তখন এই প্রথার বিশেষ বিবরণ, ইহার ঘোরতর অত্যাচারপূর্ণতা, ইহার লোমহর্ষণ নৃশংসতা ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। পরে এ দেশে আসিয়া এবং এস্থানের লোকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া তিনি সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন। তখন উহার স্বপক্ষে এক সময় কৌন্সিলি হইয়াছিলেন বলিয়া এরূপ দুর্ব্বিসহ অনুতাপযন্ত্রণা তাঁহার হৃদয়কে অভিভূত করিল যে, তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে দেশের নারীজাতির প্রতি এই প্রকার অত্যাচারপাতকে আমি লিপ্ত হইয়াছি, উহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য সেই

দেশের নারীজাতির কিঞ্চিৎ উপকারার্থ আমি আমার সর্ব্বস্ব দিয়া যাইব। তদনুসারেই তিনি বেথুন কলেজের প্রতিষ্ঠাকল্পে সর্ব্বস্ব দান করিয়া গিয়াছেন।

"আমি দেখিতেছি যে এখনও প্রাচীন ধর্ম্মানুরাগী কোনও কোনও মহাত্মা ব্যক্তি সতীদাহ-প্রথার প্রতি কিছু কিছু অনুরাগ প্রদর্শন করেন; এবং গায়ের জোরে উহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে ইহা ভাবিয়া তাঁহারা এখন পর্য্যন্ত যেন কিছু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েন। ইহাতে ততদূর আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কারণ নাই। Lecky's History of Rationalism পাঠ করিয়া দেখা যাইতেছে যে, ধর্ম্মের দোহাই দিয়া মানুষ-পোড়ান য়ুরোপেও বড় অধিক দিন উঠিয়া যায় নাই। এই সমস্ত ব্যাপার এবং য়ুরোপের ইতিহাসে ক্রুসেড নামক যুদ্ধ এবং ক্যাথলিক-প্রটেষ্ট্যাণ্টদিগের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী ঘোরতর রক্তারক্তি ব্যাপার, এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে মনোমধ্যে একটা বিষণ্ণভাব আসিয়া পড়ে এবং মনে হয়, How melancholy is the history of mankind when contemplated in connection with events like these! উন্নতি, উন্নতি বলিয়া আমরা যে বড়াই করিয়া থাকি তাহা কত সামান্য! এবং কি প্রকার অত্যাচার-পরম্পরার মধ্যে সেই যৎসামান্য উন্নতি লাভ করা গিয়াছে ভাবিলে এক প্রকার হতাশ্বাস হইতে হয়।

"এই প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত বিধবাবিবাহ সম্বন্ধেও দুই এক কথা বলা যায়। আমি দেখিতেছি, এক্ষণে উচ্চ শিক্ষিত দলের মধ্যেও সনাতন ধর্ম্মের দিকে যে একটা reaction আসিয়া জুটিয়াছে তাহার প্রভাবে বিধবা বিবাহের প্রতিও বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। আরও এক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোঁতের দলও সেই বিতৃষ্ণা প্রদর্শন করেন। এ স্থলে বক্তব্য যে কোঁতের বিবিধ apercu-র মধ্যে একটি apercu* আছে তাহার নাম তিনি দিয়াছেন বিশুদ্ধ বিবাহ—chaste marriage। তিনি বলেন যে, যদিও পুরাকালে প্রথম উদ্যমে বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সন্তান উৎপাদন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপে শারীরিক বৃত্তি চরিতার্থ করা, চরমাবস্থায় কিন্তু বিবাহের সেই উদ্দেশ্য স্বীকার করা যায় না। স্ত্রীজাতি ও পুরুষ জাতির স্বভাবগত অনেকগুলি বৈলক্ষণ্য আছে। এমন অনেকগুলি গুণ ও প্রকর্ষ (Perfection) স্ত্রীজাতিতে আছে, যথা, স্নেহ,

* কিছুকাল হইল ফরাসি ভাষায় দর্শন শাস্ত্রের মধ্যে এই একটি নূতন কথা প্রচলিত হইয়াছে। ইংরাজিতে এখনও পর্য্যন্ত ইহার অনুরূপ কোনও শব্দ বাহির হয় নাই। মোটামুটি apercu শব্দের অর্থ এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, যখন কোনও চিন্তয়িতা কোনও একটা গুরুতর এবং নানাবিষয়প্রসবী (prolific) idea উদ্ভাবিত করেন যাহার আন্দোলন দ্বারা অনেক অভিনব তত্ত্বকথা মনোমধ্যে উদিত হয়, তাদৃশ idea-কেই apercu কহে। কোঁতের গ্রন্থাবলীর মধ্যে এই প্রকার বিস্তর apercu লক্ষিত হয়, তাহার এক একটি অবলম্বন করিয়া এক একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ দেওয়া যাইতে পারে। কোঁৎ কিন্তু দুচারি কথায় ইঙ্গিত মাত্র করিয়াই সারিয়া দিয়া গিয়াছেন।

পরানুগ্রহ, কোমলতা, সন্তানপ্রতিপালনতৎপরতা, পরদুঃখকাতরতা, প্রভৃতি যেগুলি সেই পরিমাণে সাধারণতঃ পুরুষজাতিতে স্বাভাবিক বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে পুরুষজাতিরও এইরূপ কতকগুলি প্রকর্ষ আছে, যথা, সাহস, দৃঢ়তা, অধ্যবসায়, নাছোড়বান্দা এই বৃত্তি, যেগুলি সেই পরিমাণে স্ত্রীজাতির নাই। জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল হয় ত বলিবেন যে, স্ত্রী পুরুষজাতির এই স্বভাবগত বিভিন্নতা উভয়ের চিরন্তন প্রচলিত শিক্ষার ও অভ্যাসের বিভিন্নতা-বশতঃ ঘটিয়াছে এবং অভ্যাসের কিঞ্চিৎ অদল বদল করিয়া দিলে কয়েক পুরুষের মধ্যে সেই বৈসাদৃশ্য উঠিয়া যাইবে। কোঁতের মত কিন্তু তাহা নহে। যেমন স্ত্রীজাতির শ্মশ্রু উদ্ভেদ হয় না, চুল বড় হয়, স্তনদ্বয় বিবৃদ্ধ হয়, শরীরে লোম অল্প হয়, অস্থি কোমল থাকে, অধিকাংশই cartilage, স্বভাবের বিভিন্নতাও সেইরূপ Physiological। পুরুষেরও তদ্রূপ। এখন কোং বলেন যে, যখন বিবাহ দ্বারা দুই জাতি পরস্পর সর্ব্বদা কাছাকাছি থাকে, তখন একের দেখিয়া অন্যের হীনতাগুলি কতকদূর অপনীত হইতে থাকে। পুরুষের স্নেহবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, নারীর অধ্যবসায় প্রবল হয়, ইত্যাদি। এই সকল পরিবর্ত্তন অপ্রার্থনীয় নহে। ইহাতে সমাজের উপকারই আছে, এবং বিবাহ দ্বারা সেই অভিপ্রায়টি কিয়দংশে সিদ্ধ হয়। অতএব যদি বিবাহের প্রধান অভিপ্রায় ইহাই হইল, তবে রিপুর চরিতার্থতার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিশেষতঃ এরূপ অনেক রুগ্ন, শীর্ণ, জীর্ণ ব্যক্তি আছেন যাঁহাদিগের পক্ষে সন্তানের উদ্ভব উচিত নহে। আজিকার কালে একথা এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। রোগ যে পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হয়, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। স্বভাবের দোষও তদ্রূপ। কেবল আমরা অদ্যাপি চিত্তদৌর্ব্বল্য বশতঃ এই গুরুতর শারীরতত্ত্বানুসারে চলিতে পারি না। কিন্তু ইহা আমাদিগের বড়ই লজ্জার ও ঘৃণার কথা। আমি স্বয়ং পক্ষাঘাতগ্রস্ত বা মৃগীরোগগ্রস্ত, অথচ আরও অনেক সেই সেই রোগগ্রস্ত জীবকে পৃথিবীতে আনিবার উদ্যোগ করিতেছি, ইহা অপেক্ষা জঘন্য কাণ্ড আর কি হইতে পারে? কিন্তু এখন পর্য্যন্ত অতি অল্প লোকই ইহা ভাবিয়া থাকেন। বাপ-মা ছেলেপুলের বিবাহ দিবার সময়ে একটু ভাবেন বটে, কিন্তু বিবাহ একবার হইয়া গেলে দম্পতি আদৌ এদিকে লক্ষ্য করে না। আবার য়ুরোপে এতন্নিবারণার্থ যে সকল প্রথা প্রচলিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে ও হইতেছে, যাহাদিগের অন্তঃকরণে ভব্যতার লেশ আছে, তাঁহারা কেহই বোধ হয় সেগুলির অনুমোদন করিবেন না। কেহ কেহ এই উপলক্ষে ভ্রূণহত্যাপ্রথাও চালাইতে চাহে। তৎসম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উহা ভদ্রলোকের নিকটে নিতান্ত জুগুপ্সিত ব্যাপার। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া কোঁৎ বিশুদ্ধ বিবাহ নামে এক নূতন কাণ্ড চালাইতে চাহেন। তিনি বলেন—বিবাহ কর, কিন্তু শারীরিক

সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিও না। ইহার নাম chaste marriage। এই কথা শুনিবামাত্র বোধ হয় পনের আনা তিন পাই লোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিবেন এবং কোঁৎকে বদ্ধ পাগল বলিয়া বিদ্রূপ করিবেন। কিন্তু আমার মনে হয়, যদিচ কাম-রিপুর তুল্য প্রবল বৃত্তি আর নাই, তথাপি কোঁতের নূতন কাণ্ডটা একেবারে হাসিয়া উড়িয়া দিবার বিষয় বলিয়া বোধ হয় না। রোমান ক্যাথলিক পাদ্রিদিগের মধ্যে এ সম্বন্ধে বিস্তর ভণ্ডামি প্রকাশিত হইয়াছে বটে; কিন্তু তাহাই বলিয়া উহা একেবারে আদ্যোপান্ত ভণ্ডামি বলিয়া মনে হয় না। তাহা হইলে এতদিন সমাজ কখনই উহা সহ্য করিত না।

"এখন বলিতে চাহি যে, যেমন কোঁতের মতে বিশুদ্ধ বিবাহ এক নূতন কাণ্ড, সেইরূপ ধর্ম্মবিবাহ (religious marriage) আর একটি নূতন কাণ্ড। তিনি বলেন, ধর্ম্ম-বিবাহসূত্রে গ্রথিত হইলে এ জন্মে আর বিবাহ করা চলিবে না। পতিই মরুন, আর পত্নীই মরুন, উভয়কেই এ জন্মের মত মৃত পতি বা পত্নীর ধ্যানে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। যদি একবার পতির বা পত্নীর স্বভাবের সহিত কিঞ্চিৎ পরিচয় জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি অবর্ত্তমানে তাঁহার স্বভাবের ধ্যান করিয়াই বিশেষ আনন্দ সহকারে জীবন নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে। কোঁৎ এই নিয়ম কি স্ত্রী কি পুরুষ উভয়ের পক্ষেই একেবারে জারি করিতে চাহেন; এবং এখানকার কোঁতের দলও এই জন্য বোধ হয় বিধবাবিবাহের প্রতি বিরূপ হইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহারা বোধ হয় বলেন যে, পরিণামে যখন বিধবা-বিবাহ উঠাইয়া দিতে হইবে, তখন উহা আর চালান কেন?

"কিন্তু তাঁহারা ইহা ভাবিয়া দেখেন না যে, এখন যে অবস্থা আছে, তাহাতে স্ত্রী-জাতির প্রতি ঘোর অত্যাচার হইতেছে এবং পুরুষজাতির ঘোর স্বার্থপরতা প্রকটিত হইতেছে। পুরুষ ষাট বৎসরের বুড়ো হইলেও অনায়াসে আবার বিবাহ করিতে যান, কেহ টু শব্দটিও করে না; কিন্তু নারী ১২।১৩ বৎসরে বিধবা হইলেও বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করুন, এক সন্ধ্যা আহার করুন, সর্বপ্রকার সুখ-স্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করুন, ভ্রাতার সংসারে আধা দাসী হইয়া কাল যাপন করুন, ভাইপো ভাইঝিদিগকে মানুষ করুন, ইহাই তাঁহার প্রতি আদেশ। এখনকার সর্বসাধারণ 'এজু'র (Educated শব্দের এই সংক্ষেপ ব্যবহার করিলাম) দলও এই ব্যবস্থার পক্ষপাতী। আজকাল আধ্যাত্মিকতা বলিয়া একটা কথা বাহির হইয়াছে। 'এজু'রা বলেন, বিধবাবিবাহ চালাইলে নারীর আধ্যা-ত্মিকতার হ্রাস হইবে। এরূপ ব্যবস্থা মন্দ নহে বটে। আমরা পুরুষ, মেঠাই-মণ্ডার ভাগটা আমরাই সমস্ত গ্রহণ করি, আধ্যাত্মিকতা ওরফে কঠোর ব্রত পালন নারীর স্কন্ধেই চাপাইয়া দেওয়া যাউক। হ্যাম্‌লেটের ওফিলিয়া ভ্রাতা লেয়ার্টিসকে বলিতেছেন—'দাদা, কণ্টকাকীর্ণ পথে বিচরণ করিবার পরামর্শ আমাকে ত খুব দিলেন, কিন্তু নিজে যেন কেবল মেঠাই-মণ্ডা লইয়াই কাল যাপন করিবেন না, তাহাতে আপনারও চরিত্র-ভ্রংশ

হইবার সম্ভাবনা আছে।' মিল্টন বলিয়াছেন—Spare Fast that with the gods doth diet ;—মিল্টনের এই উক্তি অকপট বটে। ইহার মধ্যে তাঁহার মনে একখানা মুখে একখানা ছিল না। কিন্তু 'আইভানহো'তে বনবাসী সন্ন্যাসী (Monk) যখন রিচার্ড রাজাকে বলিতেছেন—আমার ঘরে ছোলা ভাজা ছাড়া অন্য কোনও ভাল খাদ্য দ্রব্য নাই —তখন রিচার্ড অনেক পীড়াপীড়ি করাতে পরিশেষে তাঁহার ভাড়ারের মধ্য হইতে কালিয়া, কাবাব, পুরি প্রভৃতি ভাল ভাল খাবার বাহির হইতে লাগিল। নারীর প্রতি আমাদের পুরুষজাতির উপদেশটা কিয়দংশে তদ্রূপ। পুরুষ বিধবাদিগকে বলেন—ওগো শ্রীমতীগণ, একাদশী কর, একসন্ধ্যা খাও, চুল মুড়াইয়া ফেল, সৌখীন খাওয়া দাওয়া এককালে ত্যাগ কর, শরীর খুব ভাল থাকিবে, দীর্ঘকাল নীরোগ জীবন কাটাইবে। পুরুষ নিজে কিন্তু চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ছাড়িবেন না। ইহারই নাম আধ্যাত্মিকতা। এই আধ্যাত্মিকতা বজায় রাখিবার জন্য আমরা পুরুষ রৌদ্রবৃষ্টিতে ছাতা মাথায় দিব, স্ত্রীলোক কিন্তু দিতে পারিবে না। শীতকালে জামাজুতা পরিব, নারী কিন্তু শীতে হি হি করুক আর ঠাণ্ডা মাটিতে চলিয়া বেড়াক। আমরা অগ্রে আহার করিব, নারী আমাদিগের ভুক্তাবশিষ্ট খাইয়া প্রাণধারণ করিবে।

"আমি এই সকল কথা বলাতে অনেকেই চটিয়া উঠিবেন, কিন্তু হক্ কথা না বলিয়াও থাকা যায় না। আজকাল অনেক পরিবারের মধ্যে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু হিন্দুর ঘরে গার্হস্থ্য জীবনের spirit (ভাবভঙ্গি) এইরূপ কিনা তাহা অপক্ষপাতী লোক মনে মনে বিবেচনা করিয়া দেখুন, ইহাই অনুরোধ।"

নয়

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—"তোমার মুখে আমি শুনিতেছি যে, কেহ কেহ বলিতেছেন, বিদ্যাসাগরের প্রতি আমার কিছু আন্তরিক আক্রোশ আছে; সেই কারণেই আমি তাঁহার সম্বন্ধে ২।১টি কথা এরূপ বলিয়াছি যাহাতে তাঁহার চরিত্রে কিঞ্চিৎ reflection হয়। আমি আপনি ত বুঝিতে পারি না, এমন কি কি কথা বলিয়াছি। আমি মনে মনে জানি যে, আমি তাঁহাব একান্ত ভক্ত, এবং তাঁহার চরিত্রেব মহত্ত্ব ও ঔদার্য্য সর্ব্বাঙ্গীন বলিয়া স্বীকার করি। তবে হয় ত দুই একবার তোমাকে বলিয়াছি যে, He could not bear a brother near the throne. কিন্তু এই সামান্য দুর্ব্বলতাটুকু পৃথিবীর বিস্তর বড় লোকের চরিত্রে দেখা যায়। বড লোকের স্বভাবে, বিশেষতঃ যাঁহারা বিশিষ্ট বড়লোক তাঁহাদিগের স্বভাবে এ দুর্ব্বলতাটুকু হইবে বলিয়া যেন বিধিনির্ব্বন্ধ আছে। যাঁহারা বিশিষ্ট বড় লোক, তাঁহারা নিজের ভাবভঙ্গি লইয়া এতই বিভোব হইযা পডেন যে, অন্য ধবণের ভাবভঙ্গি উৎকৃষ্ট হইলেও উহা appreciate করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের থাকে না। এই নিমিত্তই বোধ হয় মেকলে স্থলবিশেষে বলিয়াছেন যে, যাঁহাবা অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন লেখক তাঁহাবা পবের লেখা বিষয়ে ভাল সমালোচক হয়েন না—'Great authors are seldom good critics.' মাঝামাঝি গোছের বুঝদার লোক হইলে সমালোচক ভাল হয়। ইহা যেন হইবারই কথা। সুতরাং বিদ্যাসাগর মহাশয় একটা প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়ম যে উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই, ইহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? আর আক্রোশেব কথা যে বলিতেছ, সে বিষয়ে আমাব বক্তব্য এই যে, চল্লিশ বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে আমার জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহাতে নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ তফাৎ হইয়া পডিযাছিলাম এবং সেই বিপ্রকৃষ্ট ভাব (distance) নিজের দোষ বুঝিতে পারিয়াও ঘুচাইবার চেষ্টা করি নাই। কিন্তু তুমি জান, তোমাকেই আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি যে, আমার জীবনের পূর্ব্বোক্ত ঘটনা সম্বন্ধে আমাবই সম্পূর্ণ ভুল এবং তিনি সম্পূর্ণ ঠিক, ইহা আমি ঘটনার দুই এক বৎসর পরেই কথা উঠিলেই সকলের নিকট স্বীকার করিয়াছিলাম এবং এখনও করি। আমি কায়মনোবাক্যে বুঝি যে, তিনি আমার ভালই করিয়াছিলেন। সুতরাং সে আক্রোশের লেশমাত্র এক্ষণে আমার মনে নাই এবং তৎপ্রবর্ত্তিত হইয়া কিছুমাত্র মালিন্য মনে ধারণ করিও না এবং কোনও বিরুদ্ধ কথাও আমার মুখে আসে না।"

কথাটা অন্য দিকে ফিরাইবার জন্য আমি বলিলাম, "দেখুন, বৈশাখ মাসের 'ভারতী'তে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পয়ার ছন্দে একটি কবিতা লিখিয়াছেন। বহুকাল পরে মাসিক পত্রিকায় সাবেক ধরণের পয়ার পাইয়া আমার বড়ই ভাল লাগিল। আমার মনে হয় আবার কিছুদিন খাঁটি নিভাঁজ পয়ার যদি আমাদের কবিরা চালাইতে পারেন, তাহা হইলে অন্ততঃ আর কিছু না হউক, মুখ বদলান হয়।"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—"তোমার কথায় বিদ্যাসাগরকে মনে পড়িল। বিদ্যাসাগর ভারতচন্দ্রের বাঙ্গালা রচনা অতিশয় পছন্দ করিতেন। আমার বোধ হয়, যখন রসময় দত্তের সহিত অকৌশল হওয়াতে তিনি সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরির পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত একযোগে ছাপাখানার ব্যবসা আরম্ভ করেন, তখন ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থই তাঁহার ছাপাখানার সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। আমি তাঁহাকে কোনও কোনও সময়ে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলের' কবিতা গদগদভাবে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি। আমার বেশ মনে হইতেছে একদিন তিনি 'হেথায় ত্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া' ইত্যাদি কবিতাটি বিশেষ আনন্দের সহিত পড়িতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন,—'দেখ দেখি, কেমন পরিষ্কার ঝর্‌ঝরে ভাষা।'

"আমার বিশ্বাস মদনমোহনের 'বাসবদত্তা' তাঁহার পঠদ্দশায় বিরচিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি 'রসতরঙ্গিণী' নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থখানি বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন। পদ্য ও গদ্য লিখিবার ক্ষমতা তাঁহার অতি অদ্ভুত ছিল। আমি তোমাকে প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্বেই বলিয়াছি,[১] এবং এখনও বলিতেছি যে, আমার মনে হয়, তিনি যদি ডিপুটিগিরি চাকরি করিতে না গিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যসেবায় রত থাকিতেন তাহা হইলে এক্ষণে আমরা যে প্রশংসাপুষ্পাঞ্জলি কেবল বিদ্যাসাগরের চরণে অর্পণ করিতেছি তাহা অর্দ্ধেক ভাগ করিয়া দুই জনকে দিতে হইত। Genius অর্থাৎ প্রতিভা নামক যে পদার্থ আছে, মদনমোহনের স্বভাবসিদ্ধ তাহা ছিল বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু অনুশীলনের অভাবে উহার তাদৃশ খোল্‌তা হইতে পারিল না।

"বিদ্যাসাগর ও মদনমোহনের দৃষ্টান্ত দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে, ইহ সংসারে উন্নতিলাভের পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তির উপযোগিতা অপেক্ষা যাহাকে character (চরিত্র) কহে অর্থাৎ অধ্যবসায়, বিবেচকতা এবং অকুতোভয়তা এই সকল বৃত্তির উপযোগিতা অধিক। বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর দুইজনেই বোধ হয় কাছাকাছি ছিলেন, কিন্তু চরিত্র অংশে আস্‌মান জমিন্‌ প্রভেদ। যাহাকে

---

[১] পৃঃ ৭১-৭২ দ্রষ্টব্য। সং

backbone কহে, বিদ্যাসাগরের তাহা পূর্ণমাত্রায় ছিল, কিন্তু সে বিষয়ে তর্কালঙ্কার হয় ত Vertebrate শ্রেণীর অন্তর্গত হয়েন কি না সন্দেহ।

"বিদ্যাসাগর যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সিবিলিয়নদিগকে বাঙ্গালা পড়াইতেন, তখন তাঁহাকে 'বিদ্যাসুন্দর' পড়াইতে হইত। 'বিদ্যাসুন্দরের' খেউড় অংশ পড়াইবার সময় তিনি অত্যন্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিতভাব প্রদর্শন করিতেন; কিন্তু এক এক জন য়ুরোপীয় তাঁহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতেন, 'কেন তুমি কাতুমাতু করিতেছ? আমাদের ভাষাতে কি সেক্সপীয়রের Venus and Adonis, Rape of Lucrece, এবং পোপের January and May, এই সকল বহি নাই? আর আমরা কি ঐ সকল বহি আদবে পড়ি না; শিকায় তুলিয়া রাখিয়া দিয়াছি? অতএব ইহাতে আর লজ্জার বিষয় কি?' এই কথা আমি বিদ্যাসাগরের মুখে শুনিয়াছি।

"বিদ্যাসাগর এ দিকে পাকা ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু সাংসারিক লোকজ্ঞতা এবং সাধারণ বিষয়বুদ্ধি বড় কম ছিল না। একসময়ে শ্রীহট্ট জিলা নিবাসী কোনও এক ব্যক্তি চাকরির প্রার্থনায় তাঁহার শরণাগত হয়। অন্ততঃ তিনি সুপারিস দিয়া তাহাকে কোথাও একটা চাকরি করিয়া দেন, সে এ প্রকার বাঞ্ছাও প্রকাশ করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের বড় চাকরি ত্যাগ করিয়াছেন। নিজের চাকরি দিবার ক্ষমতা বিশেষ কিছু ছিল না, আর সুপারিসের দ্বারা যে চাকরি দিতে পারিবেন এ ভরসাও তিনি বড় করিতেন না। উমেদারটি নিজের কার্য্যসিদ্ধি ও বিদ্যাসাগরের মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহাকে একখানি উৎকৃষ্ট সিলেটী পাটি উপহার দিল। বিদ্যাসাগর প্রথমে কিন্তু উহা লইতে চাহেন নাই; উমেদারের পীড়াপীড়িতে শেষে লইলেন। আমার নিকট এই গল্প করিবার সময় বিদ্যাসাগর কহিলেন, 'আমি বেশ বুঝলুম যে, চাকরি না হোলে উমেদার পাটির দাম চা'বে। এই ভেবে আমি সে পাটি ব্যবহার করলুম না, তুলে রাখলুম। ফলে আমি যা ভেবেছিলুম তাই ঘট্‌ল। উমেদার যখন কিছুদিন হাঁটাহাঁটি করে চাকরির বিষয়ে হতাশ্বাস হোলো, তখন বিদায় নেবার সময় বল্লে, 'মশাই পাটির দামটা পেলে ভাল হয়।' আমি বল্লুম, বাপু, তোমার পাটি একদিনের জন্যে ব্যবহার করি নি; ঐ দেখ, তোলা রয়েছে; তুমি ফেরত নিয়ে যাও।' উমেদার কতকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে পাটি নিয়ে বিদেয় হোলো।

"সাধারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের প্রতি শেষাশেষি, বিশেষতঃ বিধবা-বিবাহ ব্যাপারের পর, বিদ্যাসাগরের বিলক্ষণ অশ্রদ্ধা হইয়া গিয়াছিল। আমি বড় বড় দিগ্‌গজ অধ্যাপকদিগের বিষয় বলিতেছি না; তাঁহাদিগকে তিনি যাবজ্জীবন পূজনীয় জ্ঞান

করিতেন, যথেষ্ট ভক্তি করিতেন এবং অকাতরে অর্থদানও করিতেন। কিন্তু যাঁহারা দু' দশ পাতা সংস্কৃত পড়িয়া ডেপোমি করিয়া বেড়ান, এবং বিদায়ের লোভে চারিদিকে হাঁটাহাঁটি করেন, তাঁহাদিগকে তিনি ইদানীং 'ল্যাজকাটা' বা 'টিকিদাস' এ ছাড়া অন্য নাম দিতেন না। চাণক্যের একটি শ্লোক আছে—'পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষাহি কেবলং'; এই শ্লোকটির প্রকৃত ব্যাখ্যা উল্টাইয়া দিয়া একটি পরিহাসের ব্যাখ্যা লালমোহন নামক এক ব্যক্তি বাহির করিয়াছিলেন। লালমোহন প্রসিদ্ধ দুর্গাচরণ ডাক্তারের ভ্রাতা ছিলেন, সহোদর কিনা ঠিক বলিতে পারি না। অর্থটা হইল এই—পণ্ডিতের সবই গুণ, দোষের মধ্যে খালি মূর্খ। বিদ্যাসাগর এই পরিহাসের ব্যাখ্যাটি লইয়া সর্ব্বদাই আমোদ করিতেন এবং বলিতেন যে, লালমোহন শ্লোকের অর্থটা ঠিকই করিয়াছে। বিধবা-বিবাহ ব্যাপারের পর অশ্রদ্ধা হইবার আরও কারণ এই যে, প্রথমে অনেকে তাঁহার পক্ষে সায় দিয়া শেষে অর্থলোভে স্বচ্ছন্দে বিপক্ষের দলে মিশিয়া গেল। ইহাতে তিনি ঐ পণ্ডিত-জাতির উপর হাড়ে চটিয়া গিয়াছিলেন।

"প্রথম বয়সে বিদ্যাসাগরের দেহটি বেশ মজবুত ছিল। আকার খর্ব্ব বটে, কিন্তু এ দিকে খুব গ্যাঁট্টাগোঁট্টা, যাহাকে সংস্কৃতে 'অবষ্টব্ধ' বলে, সেই গোছের ছিল। তিনি শারীরিক পরিশ্রমও খুব করিতে পারিতেন, এবং খুব পথ চলিতে পারিতেন। তাঁহার জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রাম কলিকাতা হইতে বিশ ক্রোশ দূরে; কিন্তু বিদ্যাসাগর প্রাতঃ-কালে যাত্রা করিয়া সদ্যই হাঁটাপথে বাড়ী পৌঁছিতেন। পায়ে কেবল এক চটি জুতা; হয় ত বার আনা পথ স্বধু পায়েই যাইতেন, গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নরৌদ্রও ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। এই হাঁটাপথে যাইবার সময়ে এক দিনের একটি বৃত্তান্তের গল্প অতি করুণভাবে তিনি বলিতেন। তিনি বলিতেন, 'আমি এক দিন বাড়ি যাবার সময় দুপুরের রোদে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের জন্যে একটি খোড়ো বাড়ীর বাহিরের রোয়াকে বোসে আছি, এমন সময়ে বাড়ীর ভেতরে থেকে গুটি দুই তিন ছেলে নাচতে নাচতে আর গানের স্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে বেরিয়ে এল। তাদের মুখে এই বুলি—আজ আমাদের ডাল হয়েছে, আজ আমাদের ডাল হয়েছে। আমি ত দেখে শুনে অবাক্। ভাবলুম যে, এদের এত দুরবস্থা যে বছরের মধ্যে পাল পার্ব্বণের মত দু' এক দিন ডাল রান্না খেতে পায়! আর বোধ হয় এমন অনেকেই আছে।' এই গল্প করিতে করিতে কখনও কখনও তাঁহার চক্ষুতে জল আসিত।

"তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন কালে বিদ্যাসাগরের উক্ত প্রকার গ্যাঁট্টাগোঁট্টা শরীরের জন্য তাঁহারা উঁহাকে 'টিপলে' বলিয়া ডাকিতেন; এবং বিদ্যাসাগর যখন কোনও একটা শাস্ত্রের—বিশেষতঃ স্মৃতি-

শাস্ত্রের ভালরূপ মীমাংসা করিয়া দিতেন, তখন তাঁহারা বলিতেন 'আমাদের টিপ্‌লে না হোলে এরকম আর কে করে দিতে পারে।'

"বিদ্যাসাগর যখন বহু বিবাহের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন তখন তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নিজের মুখে শুনিয়াছি যে, 'শূদ্রস্য ভার্য্যা শূদ্রৈব সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে' এই মনুবচনের বিদ্যাসাগর যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন,[১] তাহা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সম্পূর্ণ সম্মত। শেষে কিন্তু তর্কবাচস্পতি মহাশয় বহুবিবাহের সমর্থনপক্ষে লেখনী ধারণ করিলেন, এবং বিদ্যাসাগরের সহিত বাদানুবাদে (controversy) প্রবৃত্ত হইলেন!

"পদব্রজে পথপর্য্যটনে বিদ্যাসাগর কখনও ক্লান্তি বোধ করিতেন না। শেষাবস্থায় যখন তিনি অত্যন্ত কাহিল হইয়াছিলেন, কিছুই পরিপাক হইত না, তখন ডাক্তারদিগকে ইহার উপায় জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা কহিলেন, 'খুব হাঁটিতে আরম্ভ করুন।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কতক্ষণ করিয়া হাঁটিব?' ডাক্তার বলিলেন, 'যতক্ষণ না ক্লান্তি বোধ করেন।' বিদ্যাসাগর উত্তর দিলেন, 'তাহ'লে ত রাত্রি দিন হাঁটতে হয়, কারণ হেঁটে আমি কখনও ক্লান্তি বোধ করি না।'

"কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইবার পর তিনি কিছুদিন কলেজের ইমারতেই বাসা করিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। সেই সময়ে মালির ঘরের দিকে মাটি ফেলিয়া মস্ত একটা কুস্তির আখ্‌ড়া তৈয়ার করিয়াছিলেন। জীবহিংসা পরিহারের জন্য তিনি কিছুকাল মৎস্য-মাংস ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং বাছুরকে কষ্ট দিতে হয় বলিয়া দুগ্ধ পর্য্যন্ত বোধ হয় ছাড়িয়া ছিলেন। যাহা হউক এ বাতিক বোধ হয় অধিক দিন চলে নাই, নচেৎ বাঙ্গালা ভাষাকে তাঁহার লেখনীপ্রসূত অনেক অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইতে হয় ত বঞ্চিত হইতে হইত; তিনি কখনই বেশীদিন বাঁচিতে পারিতেন না। এ বিষয়ে কোঁৎ বলিয়া গিয়াছেন যে, সৃষ্টিকাণ্ডে ইহা একটি অসম্পূর্ণতা (imperfection) এবং সৃষ্টিকর্ত্তার অসীম করুণাময়ত্ব সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধযুক্তি যে, জীবহিংসা ব্যতীত মানুষের মস্তিষ্কের পুষ্টিসাধন হইবার যো নাই। অতএব পশুদিগকে যত কম হয় কষ্ট দিতে হইবে; যাবজ্জীবন তাহাদিগকে যথেষ্ট যত্ন করা উচিত; এবং সেই যে চরম মুহূর্ত্ত—যখন আমরা তাহাদিগকে বধ করিতে যাইতেছি, তখন যেন তাহারা মৃত্যুর বিভীষিকা আদৌ না টের পায়; এই চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; এবং প্রাণসংহার ব্যাপারও এরূপ অনিষ্ঠুর ও যন্ত্রণাশূন্য রীতিতে সম্পাদন করা উচিত যে, তাহাদিগের কিছুমাত্র ক্লেশ না হয়। আমি জানি যে, এখনকার উদ্ভিদভোজীর দল কোঁতের এই সিদ্ধান্ত হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু এখনও শরীরবিধান শাস্ত্র (Physiology) দ্বারা উদ্ভিজ্জভোজনের সর্ব্বাভিপ্রায়সাধনতা সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই।

[১] চোদ্দ অধ্যায়ে ব্যাখ্যাটি দেওয়া হইয়াছে।—সং

"এই প্রসঙ্গে সুরাপান সম্বন্ধে কোঁতের মত প্রকটন করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তিনি বলেন, alcohol-এর এমনই একটি ধর্ম্ম আছে, যে পেটে পড়িলেই পেট ও মস্তক উভয় সংযোজক ganglionic nerve-কে তৎক্ষণাৎ বিকৃত করিয়া দেয়, এবং সেই বিকার মস্তিষ্কে নীত হয়। এইরূপে পুনঃ পুনঃ alcohol সংযোগ ঘটিলে উহা স্থায়িভাবে বিকৃত হইয়া যায়। এই জন্য মহম্মদ সুরাপান তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বিদিগের পক্ষে ঐকান্তিক নিষিদ্ধ কার্য্য বলিয়া ব্যবস্থা করাতে কোঁৎ মহম্মদকে আকাশে তুলিয়া দিয়াছেন, এবং কথায় কথায় বলেন The incomparable Mohammad অর্থাৎ মহম্মদের জুড়ি নাই।

"আজকাল শুনিতেছি যে, ডাক্তার চুনিলাল বসু নাকি সবিস্তারে সেই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিতেছেন। তাঁহার মতে মস্তিষ্ক ও যকৃৎ এই উভয় করণই (organs) alcohol-এর দ্বারা উচ্ছন্ন যায়। এতদ্দেশে নব্য যুবকের দল কিন্তু আজও একথা বুঝিতেছেন না। য়ুরোপীয়দিগের মধ্যেও অনেকেই ইহা হাসিয়া উড়াইয়া দেন। তাঁহারা বলেন যে, পরিমিতমাত্রায় alcohol সেবার দ্বারা উপকার বৈ অপকার নাই।' তাঁহাদের মতে স্ত্রীপুরুষের শারীরিক সম্বন্ধও তদ্রূপ আবশ্যক। আমি কিন্তু এই দুইটি মতই ঘোরতর অপসিদ্ধান্ত বলিয়া জ্ঞান করি। শেষোক্তটি পরিহার করিলে যে শরীর ও মস্তিষ্কের উৎকর্ষই সাধিত হইবে এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে আমাদিগের প্রাচীন ঋষিদিগের স্নাতক-ব্রাহ্মণদিগের আচার। ইদানীন্তনকালে স্যর আইজাক্ নিউটনের মত মস্তিষ্কচালনা কে কবে করিয়াছেন? তিনি ৮৪ বৎসর জীবিত ছিলেন, বিবাহ করেন নাই। যতদূর জানা আছে তাঁহার চরিত্রও নিষ্কলঙ্ক ছিল।

"কোঁতের মতও ইহাই ছিল। ঐ শারীরিক সম্বন্ধ যাহাতে এককালেই উঠিয়া যায় ইহা বিজ্ঞানচর্চ্চাকারী ব্যক্তিমাত্রের visionary idea স্বরূপ মনে ধারণ করিয়া রাখা উচিৎ, তিনি এইরূপ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন; এবং সেই জন্য বিড়ম্বরসিকদিগের বিদ্রূপের পাত্র হইয়াছিলেন। এমন কি জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলও তাঁহার প্রতি একটু ঠাট্টার বারি বর্ষণ করিয়াছেন। মিল বলেন, 'এবিষয়ে কোঁৎ একটা কথা বলিয়া গিয়াছেন, সে যে কি তাহা আমি বলিতে চাহি না।' কোঁৎ বলেন, রোমান ক্যাথলিকদিগের কুমারী জননী (Virgin Mother) একটা Theological Conception বটে, কিন্তু জিনিষটা কি তাহা আমি Physiologist-দিগকে অনুসন্ধান করিতে বলি। নিষ্কলঙ্কচরিত্র কুমারীর সন্তান উৎপন্ন হয়, এ বিশ্বাসটি য়ুরোপে ত এক্ষণে হাস্যাস্পদ হইয়াছে এবং বিস্তর লোক এই কারণেই খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা করিতে শিক্ষা করিয়াছে। অশ্রদ্ধা আমি এই ভাবে বলিতেছি যে, খ্রীষ্টান ধর্ম্মের ধর্ম্মনীতির উপর কাহারও বিরাগ, ঘৃণা বা অবজ্ঞা হয় নাই; কিন্তু ঐ ধরণের মূলীভূত বিশ্বাসগুলির উপর—যথা কুমারীর সন্তান উৎপত্তি, একখানি রুটীতে বিস্তর লোক খাওয়ান, কথার দ্বারা উৎকট রোগ আরাম করা ইত্যাদি

বিষয়ে ক্রমেই লোকের অশ্রদ্ধা হইয়া আসিতেছে। হিউম এই অশ্রদ্ধা প্রথম তাঁহার রচনায় প্রকাশ করেন। তখন গোঁড়া খৃষ্টানদিগের তরফ হইতে তাঁহার উপর বিস্তর গালিগালাজ বর্ষণ হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমে দেখিতেছি যে, তাঁহার কথাই সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেছে। আমেরিকার কোনও এক মণ্ডলীতে বক্তৃতা দিবার সময় একজন পাদ্রি বলিয়া উঠিলেন, আজ ১৮০০ বৎসর হইল কেহ মরিয়া জীয়ন্ত হয় নাই। সেই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ শ্রোতৃবর্গের মধ্য হইতে আকাশবাণীর ন্যায় একজন আওয়াজ দিলেন, 'কখনও কেহ হয় নাই।' যীশুখৃষ্টের গোর হইতে উত্থান—ইহার প্রতি লোকের ত এইরূপ শ্রদ্ধা। আমাদের দেশে কিন্তু এরূপ সন্তান উৎপত্তির idea-টি ততদূর হাস্যাস্পদ হয় নাই। তাহার সাক্ষ্য ভগীরথের জন্মবৃত্তান্ত, মান্ধাতার জন্মবৃত্তান্ত, আর কাদম্বরী আখ্যায়িকাতে পুণ্ডরীকের জন্ম। ইহা ব্যতীত পুরাণের মধ্যে মানসপুত্র ত কথায় কথায় দেখা যায়।

"কোঁতের কথা এক্ষণকার দিগ্‌গজ শারীরবিধানবেত্তাদিগের নিকট কতদূর অনুমোদিত তাহা আমি জানি না, এবং সে মীমাংসা করিবার ক্ষমতাও আমার নাই। মানুষের দেহযন্ত্র (বা organism) একটি নানাব্যাপারসঙ্কুল অতি জটিল (complex) কাণ্ড; বহু সংখ্যক factor একত্র হইয়া ইহা চালিত হইতেছে। একটি factor বদল করিয়া দাও অমনি ইহার চলন ক্রিয়া বদলিয়া যাইবে। এইরূপ জটিল কাণ্ডের মধ্যে চেষ্টা করিলে অনেক প্রকারের অদল-বদল আনয়ন করা যাইতে পারে। আজ কাল surgery দ্বারা যে সকল অত্যদ্ভুত ব্যাপার সাধিত হইতেছে, সে গুলিই এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া কোঁৎ বলিয়া গিয়াছেন যে, কুমারীর সন্তান উৎপত্তি কেনই বা একেবারে ঐকান্তিক নিরবচ্ছিন্ন অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে করা যাইবে! যদি বল, সে চেষ্টার দরকার কি? উত্তর—দেহের ও মস্তিষ্কের ক্ষয় নিবারণ করা উচিত নহে কি? একজন ফরাসি ডাক্তার এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। আর এক উত্তর এই যে, সন্তান উৎপত্তি যদি আমাদিগের ইচ্ছার আয়ত্ত হয়, তাহা হইলে ম্যাল্‌থসের Population difficulty অনেকটা ঘুচাইয়া দিতে পারা যায়। কোঁৎ কিন্তু ম্যাল্‌থস্‌কে মানিতেন না। তিনি এক স্থলে বলিয়াছেন যে, ম্যাল্‌থসের সিদ্ধান্তে (Theory) গণনার ভুল (arithmetical mistake) আছে। এই অংশে অদ্যাপি আমি কোঁৎকে বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই; এবং কোন্ স্থানে যে ম্যাল্‌থসের গণনার ভুল আছে তাহাও ঠিক করিতে পারি নাই। ফলতঃ ম্যাল্‌থসের রচনার সহিত প্রথম পরিচয় হওয়া অবধি আমি যেন একটা নূতন আলো পাইয়াছি, মনে হইয়াছে; এবং তাঁহার সকল সিদ্ধান্তই অখণ্ডনীয় বলিয়া বোধ হয়। যাবৎ সাধারণে তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিতেছে, তাবৎ পৃথিবীর বিস্তর লোককে অর্দ্ধাশনের যন্ত্রণা ও

দুর্গতি ভোগ করিতেই হইবে। হয় ত শতকরা ১০ জন পেট ভরিয়া খাইতে পায়, আর ৯০ জন ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করে; এই যে বর্ত্তমান অবস্থা, ইহা ঘুচাইবার উপায়ান্তর নাই। অনেকে ভাবেন, বড় মানুষরা ঘরের টাকার থলি বাহির করিয়া দিলে এ যন্ত্রণা ঘুচিতে পারে; শুদ্ধ বড় মানুষদিগের স্বার্থপরতাবশতঃ এ অবস্থা বদ্ধমূল হইয়া আছে। কিন্তু এটা কাজের কথা নহে। বড় মানুষরা আপনাদের সমস্ত টাকা বাহির করিয়া দিলে হয় ত ৫।৭ বৎসর একটু স্বচ্ছল দেখা যাইবে। কিন্তু তাহার পরেই আবার যে কে সেই। এত সন্তান জন্মিবে, অল্প বয়সে মৃত্যুর সংখ্যা এত কমিয়া যাইবে, যে আবার খাদ্যদ্রব্যের পূর্ব্ববৎ টানাটানি আসিয়া উপস্থিত হইবে। এক্ষণে ভালরূপ না খাইতে পাওয়ার দরুণ বিস্তর শিশু এবং বিস্তব বয়স্ক ব্যক্তি পর্য্যন্ত কালগ্রাসে পতিত হয়। দিন কতক যদি এই অবস্থা বন্ধ হয়, তবে সেই সকল বয়স্ক ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিয়া আবার টান ধরাইবে এবং বড় মানুষদিগের টাকা অল্পকাল-মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যাইবে। এ কথা ম্যাল্‌থস্ এবং তাঁহার পরে ষ্টুয়ার্ট মিল অতি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। অতএব বড়মানুষদিগের উপর স্বার্থপরতাদোষ আরোপ কবা বৃথা।

"তবে কোঁৎ এ কথা বলেন বটে যে, পৃথিবীতে এখনও বিস্তর জমি পতিত রহিয়াছে। পাহাড় কাটিয়া জমি বাহির করা যাইতে পারে। সাহারা প্রভৃতি মরুভূমিকে উর্ব্বরা করা যাইতে পারে। সমুদ্রকে হটাইয়া দিয়া আবাদের জমি বাহির করা যাইতে পারে। মৎস্য-মাংসাদি খাদ্যের পরিমাণও অপরিসীমরূপে বাড়াইবার উপায় আছে। এই সমস্ত কার্য্য সমাধা করিবার জন্য বড় মানুষদিগের স্বার্থপরতা ত্যাগ করা আবশ্যক। হয় ত এখন হইতে দশ হাজার বৎসর পরে পৃথিবীর সমস্ত resource নিঃশেষিত হইবে এবং তখন এই জনসংখ্যার সমস্যা মালুম হইতে আরম্ভ হইবে। উপস্থিত কালে আমাদিগকে ও বিষয়ে মনোযোগ করিতে হইতেছে না।

"অতএব সাধারণ ধর্ম্মনীতির উন্নতি এখন আবশ্যক। কোঁতের অভিপ্রায় বোধ হয় এই প্রকার ছিল। আর সংযমের জন্য তিনি এক উপায় বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, আহারের খর্ব্বতা করিলেই রিপুর দমন হয়; যে পরিমাণ খাইতেছ, তাহার অর্দ্ধেক কর, না হয় সিকি কর, গায়ের জোরটুকু যাহাতে বজায় থাকে তাহার অতিরিক্ত খাইবে না এই নিয়ম কর, তাহা হইলে নিশ্চয় রিপুর দমন হইবে। এ কথা তাঁহার নিজের নহে। তিনি একখানি গ্রন্থ পড়িতে বড়ই ভাল বাসিতেন, নাম Imitation of Christ, ভাষা Latin, গ্রন্থকার Thomas à Kempis—লোকটা ভগবান লইয়া বিভোর হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থ হইতে কোঁৎ আহার-লাঘবের উপদেশটি সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐ

গ্রন্থে লেখা আছে, বুভুক্ষাবৃত্তিকে দমন কর, তাহা হইলে আর সকল দুর্দ্দান্ত রিপুরই দমন হইয়া আসিবে।

"এই উপলক্ষে বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, যে Thomas à Kempis গ্রন্থের যে যে স্থানে ভগবানের নাম করিয়াছেন, কোঁৎ সেই সেই স্থলে Humanity এই শব্দটি বসাইতে বলেন। তাহা হইলেই গ্রন্থের পূর্ব্বতন উপদেশপূর্ণতা বজায় থাকিবে। কোঁৎ এই ভাবেই গ্রন্থখানি লইয়া উন্মত্ত হইয়া থাকিতেন: Kempis যেমন ভগবানে বিভোর, কোঁৎ তেমনি Humanity লইয়া বিভোর। ভগবদ্ভক্ত যেমন ভগবানের হস্তচিহ্ন সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান দেখিতে পান, কোঁৎ তেমনি আহার, আচ্ছাদন, বাড়ী, ঘর, আইন, আদালত, হাসপাতাল, স্কুল ইত্যাদি সর্ব্বত্র Humanity-র হস্তচিহ্ন প্রত্যক্ষ করিয়া গদ্গদ হইয়া যাইতেন এবং আনন্দপরিপ্লুতভাবে তাহা কীর্ত্তন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকিতেন। স্থইডেনবর্গকে লোকে বলিত God-intoxicated man—ভগবান লইয়া মাতোয়ারা। কোঁৎকে তদ্রূপ বলা যাইতে পারে, Humanity-intoxicated man—humanity লইয়া মাতোয়ারা!

দশ

৭ঠা আষাঢ়, ১৩১৮

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় * মহাশয় গিল্যাণ্ডর্সের বাড়ী একশত ত্রিশ টাকা মাহিনায় কর্ম্ম করিতেন। অনেক দিন হইল তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়াছেন, এবং উক্ত হৌস্ হইতে মাসিক ১৩০৲ টাকা পেন্সন পাইতেছেন। এখন তাঁহার বয়স ৭২ বৎসর।

তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অমি বলিলাম—"অনেকবার আপনার মুখে কলিকাতায় পুরাতন থিয়েটরের গল্প শুনিয়াছি। আজ সেইগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার ইচ্ছা করিয়াছি। আপনি নিজে অভিনয় করিয়াছিলেন, বোধ হয় আপনার সমসাময়িক অভিনেতা আর কেহ জীবিত নাই।"

তিনি বলিলেন, "হাঁ, ঠিক বটে; যাঁহাদের সহিত আমি 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটক অভিনয় করিয়াছিলাম, তাঁহারা কেহই জীবিত নাই।

"তখন আমার বয়স ১৬।১৭ বৎসর মাত্র। চরকডাঙ্গা রোডে (বর্ত্তমান টেগোর কাস্‌ল রোড) রামজয় বসাকের বাড়ীর উঠানে ষ্টেজ বাঁধা হইয়াছিল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানীর এজেণ্টের অফিসের বড় বাবু রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত হইল। জগদ্দুর্লভ বসাক তাঁহাকে উক্ত কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। রঙ্গমঞ্চের ঠিক সম্মুখের দোতলায় আমাদের Rehearsal হইত, তালিম রাজেন্দ্রবাবুই আমাদিগকে শিক্ষা দিতেন। আমাদের এই Rehearsal প্রত্যহ হইত না, শুধু শনিবার ও বুধবার রাত্রিতে হইত। নাটকের রচয়িতা পণ্ডিত রামনারায়ণ কখনও তথায় আসিতেন না; একদিনমাত্র কেবল নাটকের অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন।

"আমাদের সেই 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটক অভিনয়ের পূর্ব্বে একটিবার মাত্র শ্যামবাজারে থিয়েটর হইয়াছিল। লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একজন ধনকুবের 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনয় করাইয়াছিলেন।[১] কিন্তু তখন আমি জন্মগ্রহণ করি নাই।

"'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটক এই বাড়ীতে চার বার অভিনীত হইয়াছিল। রাজেন্দ্রবাবু ও জগদ্দুর্লভবাবু দিব্য ভুঁড়ি লইয়া মাথায় লম্বা টিকি বিলম্বিত করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সাজিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রবাবুর হস্তে একটি শামুকের নস্যাধার। তাঁহারা দুইজনে যখন

* ২১ এ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০ সালে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

[১] নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ীতে ১৮৩৫ সালের ৬ই অক্টোবর অভিনীত হয়।—সং

তর্কবিতর্ক করিতেন, তখন শ্রোতৃবৃন্দ হাসিয়া এ উহার গায়ে পড়িত। একটি সখের দল বাজাইত। আমি কুলাচার্য্য সাজিতাম। আমার বক্তৃতা ছিল—'তাহার পর সেই আপন অভীষ্টদেবাভিনিবিষ্ট আদিশূর—' (ও কি ও, তুমি আমার বক্তৃতাটাও লিখিয়া লইতেছ যে ? ছাপাইবে না কি ?"—আমি বলিলাম, "আজ্ঞা হাঁ, আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া যাউন।")

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন—"তাহার পর সেই আপন অভীষ্টদেবাভিনিবিষ্ট আদিশূর রাজা কাণ্যকুব্জ হইতে সাগ্নিক বেদবিজ্ঞ পঞ্চ বিপ্রকে রাজধানীতে আনয়ন করেন। পরে তাঁহারা সদাব্রত হইয়া সমাগমন পূর্ব্বক যজ্ঞশীল আদিশূর মহারাজের আদেশানুসারে গৌড়ভূমিতে বসতি করিয়াছিলেন। পরে তাঁহাদিগের বংশপরম্পরা বিস্তৃত হওয়ায়, বল্লাল ভূপাল তন্মধ্যে এই অভিনব কুলপ্রথা প্রচার করেন। যথা শাণ্ডিল্য ভট্টনারায়ণ-বংশজাত আদি বরাহ বন্দ্য। কাশ্যপগোত্রে দক্ষবংশপ্রসূত সুলোচন ভট্ট, ভরদ্বাজগোত্রে শ্রীহর্ষবংশোৎপন্ন ধ্রুবন্ধব মুখোটি, সাবর্ণগোত্রে বেদগভবংশোদ্ভব বীরব্রত গাঙ্গুলী ও সুধীর কুন্দ, বাৎস্যগোত্রে ছান্দড়বংশপ্রসূত সুরভি ঘোষাল ও কবি কাঞ্জিলাল।'

"বক্তৃতাটা আর কত লিখিবে ? আমি তখন অল্পবয়স্ক, কিন্তু অভিনয় করিয়া সুখ্যাতি অর্জন করিযাছিলাম।

"থিয়েটরের দ্বিতীয় পর্ব্ব ছাতুবাবুর (৺আশুতোষ দেব) বাড়ীতে। 'শকুন্তলা'র * অভিনয় হইল। ছাতুবাবুর নাতি শরৎ বাবু শকুন্তলা সাজিয়াছিলেন। যখন Stage-এর উপরে বিশ হাজার টাকার অলঙ্কারে মণ্ডিত হইয়া শরৎবাবু দীপ্তিময়ী শকুন্তলার রাণী-বেশ দেখাইয়াছিলেন তখন দর্শকবৃন্দ চমৎকৃত হইয়াছিল। পাইকপাড়ার রাজারা—প্রতাপ নারায়ণ সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ তাঁহাদের নিজ বাটীতে একটি রঙ্গমঞ্চ বাঁধিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, এবং তাঁহাদের

* নাটকখানি 'পুরাতন প্রসঙ্গ' রচয়িতার মাতামহ ৺নন্দকুমার রায় প্রণীত। ১২৮৯ সালে দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপনে তিনি লিখিয়াছেন :—

"১২৬২ অব্দে যখন আমি এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করি, তখন বঙ্গভাষায় পাঠোপযুক্ত কোন নাটক ছিল না, সুতরাং ইহা সকলে আগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভাষা নাটক রচয়িতাদিগের পক্ষেও আদর্শ স্বরূপ হইয়াছিল এবং ইহাই অভিনয়োপযোগী বলিয়া সর্বপ্রথমে কলিকাতা নিবাসী ৺আশুতোষ বাবুর বাটীতে তৎপরে জনাইনিবাসী জমিদার মুখোপাধ্যায়দিগের ভবনে অভিনীত হয়।

"ইদানীং পরম সম্মানভাজন শ্রীল শ্রীযুক্ত গর্ভনর জেনরল লিটন সাহেব বাহাদুর ও তৎপারিষদবৃন্দ বেঙ্গল থিয়েটরের কর্তৃপক্ষকে ইহার অভিনয় প্রকাশ করিতে আদেশ করেন, তদনুসারে উক্ত নাট্যালয়ে ইহার অভিনয় হয় ; অভিনয় কালে তাঁহারা উপস্থিত থাকিয়া হর্ষলাভ করিয়াছিলেন। সে দিন তথায় বিস্তর লোকের সমাগম হইয়াছিল।"

রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণ পণ্ডিতের 'রত্নাবলী'[১] ও মাইকেল মধুর 'শর্ম্মিষ্ঠা'[২] অভিনীত হইল। কিন্তু সে কথা পরে বলিতেছি।

"শকুন্তলা সাজিলেন শরৎবাবু। দুষ্মন্ত—প্রিয়মাধব মল্লিক। ইনি রালিমেত্রো-জানির বাড়ী কর্ম্ম করিতেন, Cashier ছিলেন। দুর্ব্বাসা—গ্রে ষ্ট্রীটের অন্নদা মুখোপাধ্যায়, বেশ সুপুরুষ, পরে পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর হইয়াছিলেন। অনসূয়া—অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, ইনি পরে হাইকোর্টের Interpreter হইয়াছিলেন। প্রিয়ম্বদা—ভুবনমোহন ঘোষ, স্কুল মাষ্টার। আমি হইতাম কণ্বমুনির আশ্রমের এক ঋষিকুমার। শরৎবাবুর ভগিনীপতি উমেশচন্দ্র দত্ত (Mr. O. C. Dutt) Stage-manager ছিলেন। তখনও তিনি খ্রীষ্টান হয়েন নাই। তাঁহার কাজ ছিল whistle দেওয়া, পটক্ষেপণ ও উত্তোলন ইত্যাদি।

"একটি কৌতুককর ব্যাপার লইয়া সংবাদপত্রে তীব্র সমালোচনা হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণ যখন টিকিট দেখাইয়া উঠানে নাটমন্দিরে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন এক ব্যক্তি অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের পোষাক দেখিয়া, 'মহাশয়, Front seat,' 'মহাশয় Side seat' বলিয়া চিৎকার করিতে থাকেন। অবশ্যই বাড়ীব কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এই ব্যাপারের জন্য মোটেই দায়ী ছিলেন না।

"একব্যক্তি 'শকুন্তলা'ব গান বাঁধিয়া দিয়াছিল, তাঁহাকে আমরা কবিচন্দ্র বলিয়া ডাকিতাম। ভাল নামটি কি, তাহা আমি এখন ভুলিয়া গিয়াছি। ঐ রকম দেখ, ধীরাজের সঙ্গে অনেকদিন একত্র নিমন্ত্রণপার্টিতে ও বড়লোকদিগের আসরে ফুর্ত্তি করিয়াছি ও গান গাহিয়াছি, কিন্তু ধীরাজের আসল নামটা কি তাহা জানি না; কখনও জানিতাম কি না, তাহা বলিতে পাবি না।

"কবিচন্দ্র ছাতুবাবুর নিকটে আসিলে বাবু বলিলেন—'দেখ কবিচন্দ্র, গানগুলি যেন সুন্দর সুরুচিসঙ্গত হয়।' কবিচন্দ্র বলিল—'জয় জয় রাম সীতারাম,' (এই বুলি তাহার মুখে চব্বিশ ঘণ্টাই ছিল) 'আমি কি জানি না যে, আপনি সপরিবারে এখানে বাস করেন? এমন গান গাহিব যে মেয়েরা উঠিয়া যাইবেন?'

"৩।৪ বৎসর পবে ছাতুবাবুর বাড়ী আমরা 'মহাশ্বেতা' অভিনয় করি।[৩] অন্নদা বন্দ্যোপাধ্যায় নায়ক এবং ক্ষেত্রমোহন সিংহ নায়িকা হইয়াছিলেন।

---

[১] "......শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' নাটক অবলম্বনে রামনারায়ণ তর্করত্ন উহা প্রণয়ন করেন।...এই অভিনয়ের তারিখ ১৮৫৮ সনের ৩১শে জুলাই, শনিবাব।" (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস')—সং

[২] ১৮৫৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর অভিনীত হয়। (ঐ)—সং

[৩] মনিমোহন সরকার রচিত এই নাটকটি ১৮৫৭ সনের ৫ই সেপ্টেম্বর অভিনীত হয়। (ঐ)—সং

"থিয়েটরের তৃতীয় পর্ব্ব—পাইকপাড়ার বাড়ীতে। 'রত্নাবলী' ও 'শর্ম্মিষ্ঠা' অভিনীত হইল। আমি দর্শক হিসাবে গিয়াছিলাম। দৈত্য সাজিয়াছিলেন তারাচাঁদ গুহ, শিবচন্দ্র গুহের পুত্র। বাগ্‌বাজারের যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় যযাতি সাজিয়াছিলেন। গায়ক কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি পরে কুচবিহার-রাজে একটা বড় চাকরি পাইয়াছিলেন, সাজিয়াছিলেন শর্ম্মিষ্ঠা। মাইকেল মধুর নাম তখন খুব জাহির হইয়াছিল।

"চতুর্থ পর্ব্ব—কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়ী। ক্ষেত্রমোহন সিংহ ও মণিমোহন সরকার ওরফে 'মণিলাড্' অভিনয়ে বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। রামনারায়ণ পণ্ডিতের 'বেণীসংহার' নাটক অভিনীত হয়।[১] আমি কর্ণ সাজিয়া ছিলাম। দুর্য্যোধনের স্ত্রী ভানুমতীর রূপ যেন Stage-এর উপর ঝল্‌মল করিতে লাগিল। পট উত্তোলিত হইলে যখন ভানুমতীকে দণ্ডায়মানা দেখা যাইত, সমগ্র দর্শকমণ্ডলী আনন্দে হাততালি দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিত। তেমন Applause আর কেহ কখনও পাইয়াছে কি না, জানি না।

"এইস্থানে একটি কথা, মজার কথা বলি শুন। কালীসিংহ একটি ভদ্রলোকের ছেলেকে এমন স্নেহ করিতেন যে, তাহাতে সাধারণ মোসাহেবের দল ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল। সেইজন্য ঝাল ঝাড়িবার ব্যবস্থা করা হইল এই অভিনয়ের দিনে। যখন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণ টিকিট দিয়া একে একে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের সকলকেই এক এক খণ্ড মুদ্রিত কাগজ দেওয়া হইল। তাহাতে লেখা ছিল—

'আর না পাইব যেতে,
না পাব Lemon খেতে,
তুমি ত এ সব সাধে
বিসম্বাদ ঘটালে।
পেয়েছ ইংরাজি জুতো,
মনোমত মজবুত,
আমার কপালে জুতো
আর নাহি ঘটালে॥
বিলাতি এসেন্স নানা,
দেখেনি তোর নানী নানা,
আপনি মেখছ কত,
আমারে না মাখালে।

---

১ ১৮৫৬ সনের ১১ই এপ্রিল অভিনীত হয়।—সং

পুরাতন মদ যত
সব তব বাসগত,
আপনি খেয়েছ দাদা,
আমারে না খাওয়ালে ॥

"কে লিখিয়াছে এবং কাহাকে উদ্দেশ করিয়া লেখা হইয়াছে তাহা কাহারও জানিতে বাকি রহিল না।

"পঞ্চম পর্ব্ব—সিঁদুরিয়া পটিতে মেট্রোপলিটান কলেজে 'বিধবা বিবাহ' নাটক অভিনীত হইল।[১] বিহারী চট্টোপাধ্যায় নায়িকা হইয়াছিলেন। পরে বিহারীবাবু বেঙ্গল থিয়েটরে খুব যশস্বী হইয়াছিলেন।

"ষষ্ঠ পর্ব্ব—ঠাকুরবাড়ী।

(ক) "প্রথম গোপীমোহন ঠাকুরের পুরাতন বাড়ীব দোতালার নাচঘরে ষ্টেজ বাঁধা হইল। রামনারায়ণ পণ্ডিত মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে (তখনও তিনি মহারাজা হয়েন নাই) বলিলেন—'আমি আপনাকে ঠিক 'রত্নাবলী'র মত একখানা নাটক লিখিয়া দিব।' তাঁহার রচিত 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক আমরা প্রথম অভিনয় করিয়াছিলাম।[২] ছোটরাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সেই একবার মাত্র Stage-এ অভিনয় করিয়াছিলেন; বড় রাজার অনুরোধে তিনি 'কঞ্চুকী' সাজিয়াছিলেন; দৌড়িয়া Stage-এ আসিয়া করযোড়ে তিনি বলিলেন—'মহারাজ, মহারাজ, বড় বিপদ! ছোটরাণী নীলবাঁদর দেখে মূর্চ্ছা গিয়াছেন, আপনি শীঘ্র অন্তঃপুরে আসুন।'

"আমি বিদূষক সাজিয়াছিলাম, শরৎবাবু ছিলেন আমার Understudy। আমার অভিনয় দেখিয়া রাজা প্রতাপ নারায়ণ সিংহ এত প্রীত হইলেন যে, তিনি গ্রীন্ রুমে আসিয়া আমাকে কোলে করিয়া লইয়াছিলেন। বড় রাজাও খুসী হইয়া আমাকে বলিলেন—"Mohendra Babu, you are the second best বিদূষক I have seen." কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী, ফিনান্স আপিসের কর্ম্মচারী, বড় রাজার বিশিষ্ট বন্ধু, তখনকার দিনে সব চেয়ে সেরা বিদূষক ছিলেন। পাইকপাড়ায় 'শর্ম্মিষ্ঠা' ও 'রত্নাবলী'র অভিনয়ে তিনি বিদূষক হইয়া বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তিনি আমাদের শিক্ষাগুরু ছিলেন,—Motion, স্বগতঃ, চমকে ওঠা ইত্যাদি বিষয়ে আমাদিগকে শিক্ষা দিতেন।

[১] উমেশচন্দ্র মিত্র রচিত এই নাটকটি কেশবচন্দ্র সেন ও তাঁহার দলীয় যুবকদের উৎসাহে ১৮৫৯ সনের ২৩শে এপ্রিল মেট্রপলিটান থিয়েটারে অভিনীত হয়। (দ্রঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'বঙ্গীয় নাট্যশালা'।)—সং

[২] ১৮৫৯।—সং

"ফিনান্স্ আপিসের দীননাথ ঘোষ ছিলেন Stage Manager; শরৎ বাবু Prompter। তিনি Stage-এর ভিতর হইতে বাঁয়াতবলা বাজাইতেন। এইস্থানে বলিয়া রাখি যে, শরৎবাবুর মত পাখোয়াজ বাজাইতে সে সময়ে খুব কম লোক পারিত; বরোদা হইতে আগত পাখোয়াজের ওস্তাদ মৌলা বক্স ঠাকুরবাড়ীতে শরৎবাবুর বাজনা শুনিয়া তারিফ করিয়াছিলেন।

"ঠাকুরবাড়ীতে থিয়েটারের জন্য একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাহার সভ্য ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়, মাইকেল মধুসূদন, কেশব গাঙ্গুলী, দীন ঘোষ। এই কমিটি বাছাই করিয়া দিত, আমাদের মধ্যে কে কি সাজিবে।

(খ) "ঠাকুরবাড়ীর দ্বিতীয় পর্ব্ব—মহারাজা (তখন তাঁহাকে আমরা বড় রাজা বলিতাম) নিজ বাড়ীতে রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করাইলেন। তথায় তাঁহার স্বরচিত 'বিদ্যাসুন্দর' প্রথম অভিনীত হইল।[১] কমিটি বাছাই করিলেন;—বিখ্যাত ধ্রুপদ খেয়ালের ওস্তাদ মদনমোহন বর্ম্মন হইলেন 'বিদ্যা', আমি হইলাম 'সুন্দর'।

"তৎপরে 'রুক্মিণী-হরণ'[২] ও 'মালতীমাধব'[৩] অভিনীত হইল। মালতীমাধবে আমি 'মকরন্দ' সাজিয়াছিলাম। ক্ষেত্র সেন 'মালতী' ও যদু চাটুয্যে 'মাধব' সাজিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে কৌতুকনাট্যও অভিনীত হইত, যথা,—'উভয় সঙ্কট',[৪] 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'[৫], 'বুঝলে কি না'[৬]। শেষোক্ত নাটিকা মহারাজের স্বরচিত। একটিকে লক্ষ্য করিয়া একটা ছোকরা দুষ্টুমি করিয়া একখানা কেতাব লিখিল, 'কিছু কিছু বুঝি',—তাহার নাম ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়।

(গ) "মহারাজের বাগানে—'মালতীমাধব' অভিনীত হইল। এইবার আমি 'মাধব' সাজিয়াছিলাম। 'মালতী' ক্ষেত্র সেন, আর হরি বন্দ্যোপাধ্যায় 'অঘোরঘণ্ট যোগী'। বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক্ অভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন; ইহার পূর্ব্বে রাজবাড়ীতেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। পালা শেষ হইলে আমরা বেশ পরিবর্ত্তন করিতে যাইতেছি, এমন সময় মহারাজা বলিলেন—'পোষাক ছাড়িবেন না, লাট সাহেব তলব দিবেন। কথা কহিতে হইলে খবরদার Sir বলিবেন না, My Lord বলিবেন।' মাইকেল মধুও খুব করিয়া আমাকে শিখাইলেন, My Lord বলায় ভুল না হয়।

---

[১] ৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৬৫।—সং

[২] রামনারায়ণ তর্করত্ন—১৩ই জানুয়ারী ১৮৭২।—সং

[৩] ঐ —১৪ই জানুয়ারী, ১৮৬৯।—সং

[৪] ঐ —১৩ই জানুয়ারী, ১৮৭২।—সং

[৫] মধুসূদন দত্ত—৮ই মার্চ, ১৮৭৩।—সং

[৬] ১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৬৬।—সং

"হঠাৎ আমাকেই ডাকা হইল। বড়লাট ডাকিতেছেন! মাথা ঘুরিয়া গেল। স্বপ্নাবিষ্টের মত চলিলাম। যাইবার সময় মনে হইল, যেন কাণের কাছে বড় রাজা বলিলেন, 'My Lord ভুলিবেন না;' মনে হইল যেন মাইকেল মধু বলিয়া দিলেন, 'সাবধান! My Lord।' লাট সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'Were you the hero when I came to his residence?' কম্পিতকণ্ঠে উত্তর হইল, 'Yes, Sir!' তৎক্ষণাৎ মহারাজ বলিয়া উঠিলেন Yes, my Lord; there were two heroes, he was one of them.' বস্! সব মাটি! সহস্র দর্শকের সম্মুখে দীপালোকিত রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়া মনে বড় সাহস হইয়াছিল। এই লাট সাহেবের সম্মুখেও ত দুইবার অভিনয় করিলাম। তবে কেন এমন হইল? এমন না হইলে গিল্যাণ্ডর্স হৌসে কেরাণীগিরি করিব কেন?

"আর একটি ব্যাপার বলি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, আমার বামুনে কপাল কত মন্দ। দর্শকবৃন্দের মধ্যে রেওয়ার মহারাজা ছিলেন। তিনি দু' গাঁটরি কাশ্মীরি শাল ও এক থান মোহর আনিয়া বড় রাজাকে বলিলেন—'আপনি যদি কিছু মনে না করেন, এইগুলি আমি অভিনেতৃগণের মধ্যে বিতরণ করি।' বড়রাজা বলিলেন, 'ও কথা মনেও আনিবেন না উহারা সকলেই আমারই মত ভদ্রলোক, উহারা কখনই এরূপ দান গ্রহণ করিবেন না।' আমরা সকলেই বড় রাজার সমকক্ষ। দান গ্রহণে অসমর্থ! ওগো বিদেশী রাজা! কেমন করিয়া তোমায় বুঝাইব যে আমি ঠাকুরবাড়ীর বড় রাজাবাহাদুরের সমকক্ষ নই, নই, নই! আমি অত্যন্ত দীন হীন ব্রাহ্মণ, গিল্যাণ্ডর্স হৌসের সামান্য কেরাণী মাত্র। ব্রাহ্মণ-সন্তান আমি, রাজার দান গ্রহণে অসমর্থ হইব কেন?

"লাট সাহেবের কাছে মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। কাশ্মীরি শাল ও মোহরের থান বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটাইয়া দিল। বড়রাজার Prestige অক্ষুণ্ণ রহিল। সমস্ত আকাশ জুড়িয়া নক্ষত্রপুঞ্জ আমার দুঃখে হাসিতে লাগিল।

"ইহার অল্পকাল পরেই যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর রাজা হইলেন, এবং তদুপলক্ষে আমাদিগের প্রত্যেককেই এক এক যোড়া গঙ্গাজলে শাল উপহার দিলেন।

"সপ্তম পর্ব্ব। অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি সান্যালদিগের বাড়ীতে[১] পেশাদারি থিয়েটর খুলিলেন। 'নীলদর্পণ' অভিনীত হইল।[২] তখনও পুরুষে স্ত্রীলোক সাজিত।

আমরা retire করিলাম।

[১] "চিৎপুরে 'ঘড়িওয়ালা বাড়ী' নামে খ্যাত মধুসূদন সান্যালের" বাড়ীতে। (দ্রঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস')—সং।

[২] ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭২।—সং

৭ই আষাঢ়, ১৩১৮

মহেন্দ্রবাবুকে বলিলাম "মুখুয্যে মহাশয়, আজ এই প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপিখানি পূজ্যপাদ পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পড়িয়া শুনাইলাম। তিনি অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলিলেন, 'মহেন্দ্র বাবু আমার বাল্যবন্ধু, বোধ হয় আমার চেয়ে এক বৎসরের বড। তিনি তোমাকে যে বাঙ্গালা Stage-এর ইতিহাস দিয়াছেন, এমনটি আর কেহ দিতে পারিবে না। তাঁহার যখন ১৪ বৎসর বয়স, তখন তিনি 'চার এয়ারের তীর্থযাত্রা' নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন।[১] আমার দাদা সেই পুস্তক পাঠ করিয়া বলিলেন, 'মহেন্দ্র যে এমন বই লিখিতে পারে, তাহা কে জানিত? বাস্তবিক ছেলেটি একটি genius।' 'কুলীন কুলসর্ব্বস্ব' নাটকের অভিনয় যখন দেখিতে গিয়াছিলাম, তখন ধরিতে পারি নাই যে মহেন্দ্র অভিনয় করিল।'

"মুখুয্যে মহাশয়, আপনার সেই পুস্তক একখানি দেখিতে পাই কি?"

তিনি বলিলেন—"দুঃখের বিষয়, আমার নিকট একখণ্ডও নাই। আর যে থিয়েটরে মাতিয়াছিলাম, তখন আর ওসব খেয়াল করি নাই। শনিবারে প্রায়ই বড রাজার Emerald Bower-এ কিম্বা ছোট রাজার 'প্রমোদ-কাননে' কিম্বা ছাতুবাবুর পেনিটির[২] বাগানবাডীতে গান, বাজনা, আনন্দ উৎসবে কাটাইতাম। বড রাজার জন্মদিন অক্ষয় তৃতীয়া। ঐ উপলক্ষে কিছু বেশী ধূমধাম হইত। ধীরাজ (ও ইদানীং প্যারীমোহন কবিরত্ন) গান বাঁধিতেন, আমি তাঁহাদের সহিত গাহিতাম। ছাতুবাবুর বাগানে নীলমাধব ডাক্তার আমার সাকৃরেদ ছিলেন।

"এক এক দিন ছোট রাজা আসিয়া আমাদের গানে যোগ দিতেন। এক দিন তিনি বলিলেন, 'ধীরাজের সেই গানটার অর্থ আমি আজ নিশ্চয়ই বাহির করিব, তোমরা সেই গানটা গাও ত?' আমরা গান ধরিলাম—

আমায় হের হর-অঙ্গনা
আমি ফলার করব না,
তুমি কালশশী, গোকুলবাসী
ঘরে চাল বাড়ন্ত ঘুচ্‌লো না।
গেল ভজার মার কাঁথা,
মোলো রাজা মান্ধাতা,
ইচ্ছের আরম্ভ হবে ওষধ পাই কোথা?
আবার নদের রাজার রাজ্য গেল,
আমার আইবুড় নাম ঘুচ্‌ল না।
আমি ফলার করব না।

---

[১] ১৮৫৮।—সং [২] পাণিহাটি।—সং

কাগে নিয়ে গেল কাণ,
তোমায় দিব খইয়েন ধান,
আউটে ক্ষীর কোরো,
না হয় পেতে শুয়ো প্রাণ।
আবার শিবে শুঁড়ি কাটা গেল,
আমার খেউরি হওয়া হোলো না।
আমি ফলার করব না।

"দেখ, যাহার মাথামুণ্ড কোনও অর্থই করা যায় না, ছোট রাজা তাহার একটা সোজা মানে বাহির করিবেন কি করিয়া?

"ধীরাজ আবার গান ধরিত (এই স্থানে বলিয়া রাখি যে, কোনও একটি ব্যক্তি-বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া এই গান রচিত হইয়াছিল); ধীরাজ গান ধরিত—

কোম্পানীব চাকরি গেছে, আ মরি,
নাই সে শবীর
রাই কিশোরীর,
আগে পৃথিবীতে পা দিতেন না,
এম্নি ছিলেন অহঙ্কারী।
পিরু গরু নাই বিচার,
চপ্ কটলেট অনিবার,
আহার হোতো না বাবুর
বিনে সে 'ফাউল করি'।
বোমাযের Beer যেতো,
Moselle এতে মাথা ধর্তো,
বাজে লোকের বরাদ্দ ছিল ব্রাণ্ডি।
এখন dish হয়েছে কলাপাত,
চাম্‌চে হয়েছে হাত,
ব্রাণ্ডির বদলে এখন
যা করেন মা ধান্যেশ্বরী।

"আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ, কিন্তু এই সকল গান যখন আমার মাথার মধ্যে গুঞ্জরিয়া উঠে, তখন আমারও দেহে চাঞ্চল্য অনুভূত হয়। Auld Lang Syne-এর মাহাত্ম্য তোমরা কি বুঝিবে? কিন্তু যদি আমার কথায় সে সময়কার একটি চিত্রও তোমাদের মনোমধ্যে পরিস্ফুট হয়, তাহা হইলে কৃতার্থ হইব।"

এপার

১লা আশ্বিন, ১৩১৮

পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলাম, "আজ আপনি অনুগ্রহ করিয়া কবি বিহারীলালের কথা বলুন।"

তিনি বলিলেন—

"বিহারীলাল আমার খুব বাল্যকালের বন্ধু ছিলেন। আমা অপেক্ষা তিনি ৩।৪ বৎসরের বড় ছিলেন, কিন্তু সে কারণে আমাদের উভয়ের গলায় গলায় ভাব হইবার পক্ষে ব্যাঘাত হয় নাই। তিনি দীর্ঘাকৃতি, সবলকায়, তেজীয়ান্ ও অকুতোভয় ছিলেন। আমি চিরকালই ক্ষীণজীবী, তাঁহার প্রতি আমার বিশেষ শ্রদ্ধা, এমন কি ভক্তি বলিলেও হয়, ছিল। সাংসারিক অভিজ্ঞতা, লোকজ্ঞতা, আমা অপেক্ষা তাঁহার অনেক অধিক ছিল; কিন্তু আমার এই সকল হীনতাসত্ত্বেও আমি লেখা-পড়ায় অগ্রসর থাকাতে উভয়ের শ্রেষ্ঠতা ও হীনতা ঢেক ফাজিল হইয়া পরস্পর অনেকটা পোষাইয়া গিয়াছিল এবং উভয়ের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ও স্নেহানুগত্য ঘটিয়াছিল।

"বিহারী বাল্যকালে একটু দাঙ্গাবাজ গোছ ছিলেন। আহিরীটোলাব নিকটে তাঁহার বাটী, এবং অহিরীটোলার ছোকরারা দাঙ্গাবাজির জন্য কতকটা প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, কোনও এক বালক বাল্যকালোচিত বিবাদকলহপ্রসঙ্গে, লাঠির মধ্যে গোপন করা থাকে যে গুপ্তি তদ্দ্বারা তাঁহার মস্তকে এরূপ আঘাত করিয়াছিল যে, রক্তে তাঁহার মুখ ভাসিয়া গিয়াছিল। সন্নিকটে একজন পাহারাওয়ালা ছিল; সে রক্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবু কি হইয়াছে? কে আপনাকে মারিয়াছে?' বিহারী পুলিসে জানান কাপুরুষতার কার্য্য বিবেচনা করিয়া কহিল, 'কেহ আমাকে মারে নাই, চৌকাটে মাথায় চোট লাগিয়াছে।' আঘাতকর্ত্তা বালক তখনও পালায় নাই, নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল, এবং বিহারীর কথা শুনিতে পাইল। বিহারী পুলিসে জানাইতেছে না দেখিয়া তাহার হৃদয় একটা উৎকট ভয় জন্মিল; সে ভাবিল, বিহারী নিজেই তাহাকে খুন করিবে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া পুলিসের কাছে গোপন করিয়াছে। এই ভয়ে সে এতদূর অভিভূত হইল যে, সেই দিনই হউক বা তাহার পরদিনই হউক, নিজে আসিয়া বিহারীর পায়ে ধরিয়া দাঙ্গা মিটাইয়া ফেলিল।

"বিহারীর লেখাপড়ার সম্বন্ধে বলিতে হয় যে, দিনকতক সে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইয়া মুগ্ধবোধ পড়িতে গিয়াছিল। কিন্তু ইস্কুল কলেজে বাঁধাবাঁধি

নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া থাকা তাহার স্বভাবের সহিত মিলিল না। তাহার individuality (ব্যক্তি-বৈশিষ্ট) এতই তীব্র ছিল। অল্পকালমধ্যেই সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিয়া সে বাড়ীতে পণ্ডিতের নিকট মুগ্ধবোধ কিছুদিন পড়িয়াছিল; সাঙ্গ করা হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না। তাহার বাড়ীর শিক্ষকও বড় 'কেও কেটা' ছিলেন না। তিনি আমাদের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভাইস চেয়ারম্যান নীলাম্বর বাবুর পিতা। তিনি ঐ পাড়ায় অনেক বালককে মুগ্ধবোধ পড়াইয়াছিলেন। মুগ্ধবোধ সাঙ্গ হউক আর না-ই হউক, বিহারীর সংস্কৃত ব্যাকরণে এতটুকু অধিকার জন্মিয়াছিল যে, তিনি সাহিত্য-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সাহিত্য-শাস্ত্রের কয়েক খানি গ্রন্থ যথা,—রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, আর বোধ হয় ভারবি, মুদ্রারাক্ষস, উত্তরচরিত এবং শকুন্তলা আমি তাঁহাকে পড়াইয়াছিলাম। তিনি আমার কাছে সকালে বৈকালে পড়িতে আসিতেন। এই সময়ে Monier Williams শকুন্তলার এক অপূর্ব্ব সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন; নাটকের প্রাকৃত ভাষা লাল অক্ষরে, তাহার ঠিক নীচেই প্রাকৃতের সংস্কৃত-অনুবাদ কাল অক্ষরে, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় হদ্দ ৫।৬ ছত্র মূল সংস্কৃত, বাকি অংশ ইংরাজি ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। ইংরাজি ব্যাখ্যার মধ্যে আবার স্থানে স্থানে তিন জন টীকাকারের সংস্কৃত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত ছিল। কিন্তু এই সংস্কৃত ব্যাখ্যাগুলি ইংরাজি অক্ষরে ছাপা ছিল। কালিদাসের শকুন্তলার প্রতি মুদ্রণকার্য্যে কেহ কখনও এরূপ সম্মান প্রদর্শন করেন নাই; বইখানির দাম হইয়াছিল উনিশ টাকা। বিহারীদের যদিও অন্নকষ্ট ছিল না, তথাপি ১৯৲ টাকা দামের একখানি শকুন্তলা কিনেন এরূপ সঙ্গতিপন্নও তাঁহারা ছিলেন না। বিহারীর পিতা যাজ্যক্রিয়া করিতেন, অনেকগুলি ধনবান্ স্বুবর্ণবনিক্ তাঁহাব যজমান ছিল। অন্যান্য জাতির পুরোহিতদিগের অপেক্ষা স্বুবর্ণবনিক জাতির পুরোহিতদিগের আয় অনেক অধিক। বিহারী পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। তাই তাঁহার আব্দার অগ্রাহ্য হয় নাই; পিতা ১৯৲ দিয়া পুত্রকে 'শকুন্তলা' কিনিয়া দিয়াছিলেন। আমিও বড়ই আনন্দের সহিত বিহারীর সঙ্গে সেই শকুন্তলা একত্রে পড়িলাম। বোধহয় বিহারীর তখন ইংরাজি ব্যাখ্যা বুঝিবার ক্ষমতা হয় নাই, কিন্তু পরে হইয়াছিল। ইংরাজীও তিনি কতক দূর আমার কাছেই পড়িয়াছিলেন। আমার মনে আছে, বায়রণের Childe Harold, এবং সেক্সপীয়রের ওথেলো, ম্যকবেথ, লীয়র প্রভৃতি দু'পাঁচ খানি নাটক একত্রে পাঠ করা হইয়াছিল। বিহারীর ধীশক্তি এতই তীক্ষ্ণ ছিল, বিশেষতঃ কাব্যশাস্ত্র পর্য্যালোচনাতে এরূপ একটি স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল যে অতি সামান্য সাহায্যেই তিনি ভালরূপ ভাবগ্রহ করিতে পারিতেন। ইহার আরও এক কারণ ছিল; বাঙ্গালাসাহিত্যটা তিনি

অতি উত্তমরূপ আয়ত্ত করিয়াছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত, ঈশ্বরগুপ্ত, দাশুরায় ইত্যাদি তৎকাল-প্রচলিত অনেক বাঙ্গালা গ্রন্থ তাঁহার ভালরূপ পড়া ছিল। তিনি অল্প বয়সেই পদ্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই পদ্যগুলিতে প্রথমাবধিই আমি একটি নূতন 'ধর্ত্তা' লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তাহা আমার খুবই ভাল লাগিত; এবং সেই 'ধর্ত্তা' উত্তরকালে তাঁহার সমস্ত লেখাতেই লক্ষিত হয়। আমার জ্যেষ্ঠ তাঁহার পদ্যরচনার বিশেষ প্রশংসা করিতেন এবং উল্লিখিত নূতনত্বের জন্য বিহারীকে উৎসাহ দিতেন। সেই নূতনত্ব আমি কিরূপে বুঝাইয়া দিব, তাহা ঠাওরাইতে পারিতেছি না। বোধ হয় ইংরাজিতে পোপ ও তাঁহার অনুগামী কবিদিগের পর ক্র্যাব, কাউপার, বায়রণ যে এক নবীনতা আনিয়াছিলেন, বিহারীর নবীনতা কতকটা সে প্রকারের ছিল। ভাবব্যঞ্জক কোনও প্রচলিত শব্দই প্রয়োগ করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না; এবং সেকেলে ভাব সকল লইয়াই নাড়াচাড়া করিতেন।

"তাঁহার সর্ব্বপ্রথম রচনা 'সঙ্গীতশতক'[১] পাঠ করিলে ইহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে। এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালা পাঠক-সমাজে যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু এই অপ্রতিষ্ঠা গ্রন্থরচনার দোষে নহে, পাঠকদিগের সহৃদয়তার অসদ্ভাবে। 'সঙ্গীতশতক' গ্রন্থ এক শত বাঙ্গালা গানে গ্রথিত। গানগুলি 'কানু ছাড়া গীত নাই' সে ধরণের গান নহে। কোনটিতে তাঁহার নিজের মনোভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে, কোনটিতে একটি সুন্দর বর্ণনা বা একটি চমৎকার সন্ধ্যার আকাশের বর্ণবৈচিত্র্য বা একটি ফুলের বাগানের কথা ইত্যাদি। সর্ব্বত্রই রচনা এরূপ সুললিত ও হৃদয়গ্রাহী যে, পড়িতে পরম আপ্যায়িত হইতে হয়। বিহারীব গলার সুর ছিল না বিন্তু সুরবোধ ছিল, এবং অনেকগুলি সুর তিনি আমাকে শিখাইয়াছিলেন। অনেক গান আমার নিজে নিজে গাহিয়া মুখস্থ হইয়াছে। একটি গান—

(সুর বেহাগ)

নধর নূতন তরুবর কিবা সুশোভন
সাদরে দিয়েছে এসে লতাবধূ আলিঙ্গন।
উভয় উভয় পাশে, বাঁধা বাহু-শাখা-পাশে
কুসুম বিকাশি হাসে ভাসে ভ্রমর-গুঞ্জন।
মিলায়ে বায়ুব স্বরে, কুহুস্বরে গান করে
নাচে আনন্দের ভরে ক'রে বাহু প্রকম্পন।

[১] ১২৬৯ সালে প্রকাশিত।—সং

আর একটি গান—

(পূরবী)

আজি সন্ধ্যা সাজিয়াছে অতি মনোহর
পরিয়াছে পাঁচরঙ্গা সুন্দর অম্বর।
হাসি হাসি চন্দ্রানন, আধ ঘন আবরণ
আধ প্রকাশিত আভা কিবা শোভাকর।
কালো মেঘ কেশমাঝে, সাদা মেঘ সিঁথি সাজে,
তার মাঝে জ্বলে মণি তারকাসুন্দর।
নীলজলধর পরে, যেন নীল গিরিবরে,
দাড়ায়ে রয়েছে রূপে উজলি অম্বর।

এরূপ মূর্ত্তিমান সন্ধ্যা-বর্ণনা আমার অতি অপূর্ব্ব বোধ হয়। আর একটি গান—

(সোহিনী)

কোথায় রয়েছ, প্রেম, দাও দরশন
কাতর হয়েছি আমি করি অন্বেষণ।
কপটতা ক্রূরমতি, বিষময়ী বক্রগতি
দংশিয়ে তোমারে বুঝি করেছে নিধন।

আর একটি গান—

(ঝিঁঝিট)

প্রাণ প্রেয়সী আমার,
হৃদয়-ভূষণ কত যতনের হার।
হেরিলে তব বদন, যেন পাই ত্রিভুবন
অন্তরে উছলি উঠে আনন্দ অপার।

আবার—

(বাহার)

হায়, সুখময় ফুলবন হয়েছে দাহন।
নীরব এখন কোকিলের কুহুরব অলির গুঞ্জন।
আজ পূর্ণিমার ভাষে, ফুল ফুটে নাহি হাসে,
করে না মধুর বাসে প্রমোদিত বন।

একশতটি গানের প্রত্যেকটির মধ্যে এক একটি অপূর্ব্বতা আছে। বিহারী বিশেষ

যত্ন করিয়া উত্তম অক্ষরে উত্তম কাগজে কিছু অর্থব্যয় করিয়া গানগুলি ছাপাইয়াছিলেন। But the book fell still-born from the press. পঞ্চাশখানিও বিক্রীত হইয়াছিল কি না সন্দেহ। এইত বাঙ্গালা পাঠকসমাজের সহৃদয়তা! কিন্তু বিহারী নিরুৎসাহ হয়েন নাই। তাঁহার বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার রচনাতে পদার্থ আছে। এই বিশ্বাসে ভর করিয়া তিনি কবিতা রচনা ছাড়েন নাই।

"ইহার পর তিনি 'বঙ্গসুন্দরী', 'সুরবালা কাব্য', 'সাধের আসন', 'সারদা মঙ্গল' এই কয়েকখানি অত্যুৎকৃষ্ট অতি চমৎকার গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ধ্রুব জ্ঞান ছিল যে, আপাততঃ লোকে যতই অগ্রাহ্য করুক, কোনও না কোনও সময়ে তাঁহার রচনার প্রতি পাঁচজনের লক্ষ্য পড়িবে এবং তাহা সাধারণের নিকট সমাদৃত হইবে। অধিক দিন হয় নাই, তাঁহার পুত্ররা তাঁহার গ্রন্থাবলি ছাপাইয়াছেন। আজকাল বাজারে সেগুলির কাটতি কিরূপ আমি জানি না, এবং বিহারীর উল্লিখিত ধ্রুব জ্ঞান সত্যে পরিণত হইয়াছে কি না তাহাও বলিতে পারি না। তবে তাঁহার রচনার প্রতি আমার সেই প্রকার admiration এখনও জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, এবং একটি সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকের হৃদয়েও সেই admiration প্রস্ফুরিত হইয়াছে দেখিতেছি। ইনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'সাধনা' নামক মাসিক পত্রিকায় তিনি বিহারীর বিষয়ে এত প্রশংসাপূর্ণ এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন যে, তাহা আমি হেন বিহারীর ভক্তও যথেষ্ট হইয়াছে বিবেচনা করি। এমন কি রবি ঠাকুর এক প্রকার নিজমুখেই স্বীকার করিয়াছেন যে, পদ্যরচনা বিষয়ে তিনি বিহারীর ছাত্র, তাঁহার লেখা হইতে অনেক hint পাইয়াছেন।

'বঙ্গসুন্দরী' একখানি অতি সুললিত পদ্যগ্রন্থ। ইহাতে নারীজাতির সুকোমল চরিত্র পরিপাটিরূপে প্রকটিত হইয়াছে। বিহারী কোঁতের বিষয় যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা বড়ই সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং 'বঙ্গসুন্দরী'র মধ্যে কোঁতের ভাব অনেক স্থলে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। নারীজাতিকে বিহারী কোমলতা, করুণাপরায়ণতা এই সকল গুণে পুরুষ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ভাবিতেন, এবং সেই অভিপ্রায় উক্ত কাব্যে সুচারুরূপে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

'সুরবালা' কাব্যের চমৎকারিতা সমালোচনা দ্বারা বুঝাইবার বিষয় নহে। স্বয়ং পাঠ করিয়া ইহার সৌন্দর্য্য যিনি অনুভব করিতে না পারেন, কাব্যের ভাবগ্রহ করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

'সাধের আসন' ও 'সারদামঙ্গলের' বিষয়েও ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা যাইতে পারে। তবে আমার নিজের মত বলিতে গেলে, বলিতে হয় যে, 'সারদামঙ্গল' বিহারীর শেষাশেষি সময়ের রচনা। আমার বোধ হয়, তাঁহার জীবনের এই অংশে

তাঁহার হৃদয়ে জর্ম্মাণধরণের একটু অস্ফুটতার ভাব (Vagueness) আসিয়াছিল। কিন্তু এ কথা আমি অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে বলিতেছি। আমার নিকট যাহা অস্ফুট বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ভাবগ্রাহী ব্যক্তির নিকট তাহা সেরূপ না বলিয়া বোধ হইতেও পারে। ভাবগ্রাহিতা-বিষয়ে আমার আত্মশ্লাঘা নাই। বিজ্ঞানের পরিস্ফুটতা আমার চিত্ত কিছু পছন্দ করে, সুতরাং আমি যাহা অস্ফুট বলিব, তাহার মধ্যে হয়ত সুগভীর তত্ত্ববিশেষ নিহিত আছে। আমি ত কোন কীটাণুকীট— নিউটনের মত মহীয়ান্ পুরুষ মিল্‌টনের Paradise Lost পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, What does it prove? ইহাতে প্রমাণ হইল কি? কিন্তু তাহা বলিয়া Paradise Lost কেহ অনাদর করে না। লোকে কেবল এই মাত্র স্থির করিয়া রাখিয়াছে যে, নিউটন বিজ্ঞানে বডলোক হইলেও কাব্যশাস্ত্রে বালকের ন্যায় ছিলেন।

"যোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে বিহারীর বিশেষ আদর ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন; দ্বিজেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার ভ্রাতৃবৎ ভাব ছিল। সে পরিবারের মহিলারাও বিহারীকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী তাঁহাকে স্বহস্ত-রচিত একখানি আসন উপহার দিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে বিহারী 'সাধের আসন' লিখেন।

"বিহারীর স্বভাবচরিত্র অতি নির্ম্মল ছিল। নিতান্ত শৈশবে কিম্বা প্রথম উঠ্‌তি বয়সে যৎসামান্য কিঞ্চিৎ চরিত্রস্খলন হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু আমি যতদিন দেখিয়াছি, এরূপ সচ্চরিত্র, সদাশয়, নির্ম্মলস্বভাব ব্যক্তি আমি দেখি নাই। তজ্জন্য আমি যে তাঁহাকে কতদূর শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতাম, তাহা বাক্‌পথাতীত। আমার নিজের চেয়ে এ বিষয়ে তাঁহাকে যে কতদূর শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিতাম তাহা বলিয়া কি জানাইব। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, ইহা আমি অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয় ভাবিতাম। একবার মাত্র তাঁহার সহিত আমার কিঞ্চিৎ মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল কিন্তু অল্পকাল পরেই আমি বুঝিয়াছিলাম যে, সে আমারই সম্পূর্ণ দোষ। তাহাতে আবার পূর্ব্বতন সদ্ভাব পুনরুজ্জীবিত হইল এবং আমি দেখিলাম যে, আমার প্রতি বিহারীর স্নেহের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই।

"তাঁহার রচনাগুলি সর্ব্বত্র সমাদৃত ও পরিগৃহীত হইলে আমি যে কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হই বলিতে পারি না।

"দেখিতে বিহারী প্রথমে যে প্রকার বলিয়াছি, যাবজ্জীবন সেই রকমই ছিলেন, দীর্ঘাকৃতি, সবলকায়, খাড়াদেহ ও হৃষ্টপুষ্ট। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, যে, বাল্যকালে তিনি কতকটা ছিপ্‌ছিপে ও কাহিল ছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার একবার শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ-যাত্রাপ্রসঙ্গে তৎকাল প্রচলিত নিয়মানুসারে হাঁটাপথে যাওয়া হইয়াছিল।

প্রত্যহ ১০।১২ ক্রোশ হাঁটিয়া এবং চিড়া, মুড়কি, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য ক্ষুধার উপর প্রচুর পরিমাণে আহার করিয়া তাঁহার শরীর গঠিত হইয়া গেল। সেই অবধি তিনি বরাবর হৃষ্টপুষ্ট ছিলেন এবং বিলক্ষণ আহার করিতে পারিতেন। সাহস ও অকুতোভয়তা তাঁহার যে প্রকার ছিল, বাঙ্গালীজাতির সেরূপ খুব কমই আছে।

"একবার তাঁহার সহিত গঙ্গাতীরে ষ্ট্রাণ্ড পথ দিয়া আসিতেছিলাম। এক জন গোরা আমাদিগের সামনা সামনি হইল। এরূপ স্থলে প্রায় বাঙ্গালীকেই পথ ছাড়িয়া দিতে হয়, গোরা সোজা চলিয়া যায়। কিন্তু আমি দেখিলাম যে, গোরাটি বিহারীর মূর্তি দেখিয়া এবং তাঁহার মুখপানে একবার তাকাইয়া আপনা হইতেই পাশ কাটাইল; আমরা দু'জনে সোজা চলিয়া আসিলাম।

"আর একবার, বিহারীর মুখে শুনিয়াছি যে, বড়বাজারের বাঁশতলার গলির ভিতর দিয়া মহাসমারোহে বর যাইতেছিল। অত্যন্ত ভিড় হইয়াছিল। রাস্তার দুই ধারে বিস্তর লোক বর দেখিবার জন্য গোলমাল ও হুটোপাটি করিতেছিল। এরূপ স্থলে যাহা হইয়া থাকে তাহাই হইতেছিল; পুলিশের লোক দু'ধারে ডাণ্ডা চালাইতেছিল তাহার মধ্যে একজন গোরা কনষ্টেবল ছিল, সে আবার একটু অধিক মাত্রায় ঐ কাজ করিতেছিল। বিহারী সেই সময়ে পথের ধারে এক রোয়াকের উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন। গোরা তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার দিকে ডাণ্ডা উত্তোলন করিল। গোরা রাস্তায়, বিহারী একটু উচ্চ স্থানে; কিন্তু তিনি দেখিলেন যে, গোরার মার খাইতে হয়। তখন তিনি আর কিছু না করিয়া অম্লানবদনে গোরার বুকের উপর এমনই সজোরে এক লাথি হাঁকড়াইলেন যে তাহাকে চিৎপাত হইতে হইল। সেই সময়ে ভিড় ভয়ানক বাড়িয়া গেল। গোরাটি উঠিয়া অত ভিড়ের মধ্যে বিহারীকে ঠাহর করিতে পারিল না। বিহারীও পুলিশের হাতে পড়িবার ভয়ে পশ্চাদ্‌পদে সে স্থান হইতে সরিয়া গেলেন।"

বার

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আবার তাঁহার পূর্ব্ব-স্মৃতির কথা জিজ্ঞাসা করায় পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, "দ্বারি বাবুর মৃত্যুর অনেক দিন পরে তালতলায় নীলমণি কুমারের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে একটি Positivist Club স্থাপিত হয়। সে সময়ে কয়েকজন ইংরাজ Positivist আমাদের দেশে ছিলেন; সিভিলিয়ন গেডিজ (Geddes I. C. S.) খুব পণ্ডিত ছিলেন, বসন্তরোগে তাঁহার মৃত্যু হইল। কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ লব কিছুকাল প্রেসিডেন্সি কলেজে কাজ করিয়াছিলেন; কিন্তু সে সময়ে তাঁহার সহিত positivism সম্বন্ধে আমার আলাপ হইয়াছিল কি না স্মরণ হয় না। কটন, বেভরিজ, হ্যাগার্ড এবং আরও ২।১ জন ছোকরা সিভিলিয়ন positivist বলিয়া পরিচিত ছিলেন। সেই ছোকরা সিভিলিয়ন দুইজন বিশেষ কোনও অপকর্ম্ম করায় সার্ব্বিস্ হইতে বহিস্কৃত হয়েন। ইংরাজরা আমাদের ক্লাবে আসিতেন না। বাঙ্গালী সভ্যদিগের মধ্যে ছিলেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnerjee), ছোট আদালতের জজ K. M. Chatterjee, হাইকোর্টের অনুবাদক কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়, আমার ছাত্র নীলকণ্ঠ মজুমদার ও নীলমণি কুমার।

"ইঁহারা সকলেই যে পুরা কোঁতের শিষ্য ছিলেন তাহা বলা যায় না; কিন্তু Humanity-র কার্য্যে জীবনকে পর্য্যবসিত করা আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যকর্ম্ম এই মতটি সকলেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র সম্পূর্ণ কোঁতের মতাবলম্বী ছিলেন। শেষাশেষি তাঁহার ঝোঁক হইয়াছিল যে, আমাদের দেশের লোকের পক্ষে উপযুক্ত করিবার নিমিত্ত কোঁতের মত কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত করা আবশ্যক। এই প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তিনি Humanity-র নাম দিতে চাহিয়াছিলেন, 'নারায়ণী'। এতদ্ব্যতীত কোঁতের অভিপ্রায় ছিল যে Humanity-র মূর্ত্তি যিশু খৃষ্টের জননী Madonna-র প্রতিকৃতির অনুরূপ করিতে হইবে। ম্যাডোনা যেন একটি দুগ্ধপোষ্য বালক ক্রোড়ে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, ইহাই ভবিষ্যতে visible representation of Humanity বলিয়া পরিগৃহীত হইবে। কিন্তু যোগেন্দ্র বলিতেন যে, ঘাগ্‌রাপরা মূর্ত্তি আমাদের দেশের লোকের ভাল লাগিবে না। সেই জন্য তিনি নারায়ণীর একটি ছবি প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন, কস্তাপেড়ে শাড়ী পরা ও কপালে সিন্দুর দেওয়া নারী একটি শিশুকে স্তন্যপান করাইতেছেন। এতদ্ব্যতীত যোগেন্দ্র শেষাশেষি কোঁৎকে ঋষি নাম দিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে আমার সহিত তাঁহার একটু

বাদানুবাদও হইয়াছিল। আমি দেখিলাম, অমরকোষে লিখিতেছে, ঋষয়ঃ সত্যবচসঃ অর্থাৎ ঋষিরা সত্যভাষী; ইহার অর্থ সাধারণ সত্যবাদী নহে, ইহার অর্থ বাক্‌সিদ্ধ; যে ব্যক্তির এমন ক্ষমতা আছে যে, যাহা বলিবেন তাহাই ফলিবে, যেমন শাপ দেওয়া ও বর দেওয়া, তিনিই প্রকৃত ঋষিপদ-বাচ্য। ঋষি শব্দের প্রাথমিক অর্থ যে এই প্রকার সঙ্কীর্ণ (limited) তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। যোগেন্দ্রের সহিত বাদানুবাদ প্রসঙ্গেই সর্ব্বপ্রথম আমার মনে এই অর্থের স্ফূর্ত্তি হইল। এ কথা আমি যোগেন্দ্রকে জানাইয়াছিলাম; এবং সেই নিমিত্ত কোঁৎকে ঋষি নাম দেওয়ার বিষয়ে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম। যোগেন্দ্র কিন্তু আমার এই পরাঙ্মুখতাদর্শনে কতকটা বিরক্ত হইয়াছিলেন। প্রকৃত কথা এই যে, যোগেন্দ্র কোঁতের যে হিন্দুয়ানি সংস্করণ করিতে চাহিয়াছিলেন সেটা আমি বিশেষ পছন্দ করিতে পারি নাই। কটন প্রভৃতি ইংরাজ Positivist-রাও যোগেন্দ্রের নারায়ণীমূর্ত্তির বড একটা অনুমোদন করিতে পারেন নাই। উক্তপ্রকার প্রবণতার বশবর্ত্তী হইয়া যোগেন্দ্র আরও অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি জবাকুসুমসঙ্কাশং প্রভৃতি সূর্য্যের স্তব পর্য্যন্ত Positivism ধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সমস্ত উদ্যম দেখিয়া আমি বড়ই শঙ্কিত হইয়াছিলাম, পাছে জিনিষটা বিবেচক লোকদিগের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া পড়ে। যাহা হউক, ইহার পর অল্পকাল মধ্যেই যোগেন্দ্র লোকলীলা সম্বরণ করিলেন; সুতরাং এই সকল উদ্যমও বন্ধ হইয়া গেল।

"যোগেন্দ্রের মৃত্যুর পরে এ দেশে Positivism-এর আর কেহ পাণ্ডা রহিল না। এখন ত ইহা এক প্রকার নিদ্রাবস্থায় রহিয়াছে। যদিও অবিদিত ভাবে কোনও কোনও ব্যক্তির ইহার দিকে ঝোঁক থাকে, তাহার প্রকাশ নাই; পাঁচ জন একত্র হইয়া সমালোচনা করিবারও কোনও ব্যবস্থা নাই। ফলতঃ আমার বোধ হয় যে, এ দেশে এখনও কোঁতের ধর্ম্মের জন্য পরিপক্ক হয় নাই; কখনও যে হইবে তাহারও কিছু স্থিরতা নাই। যখন য়ুরোপেই উহা প্রাধান্য লাভ করিতে পারিবে কি না এ বিষয়ে সন্দেহ হয়, তখন এ দেশের কথা ত অনেক দূরে। কোঁতের উৎসাহী শিষ্যেরা খুব বিশ্বাস করিয়া বসিয়া আছেন বটে যে, কালসহকারে তাঁহার ধর্ম্মের প্রাধান্য হইবেই হইবে; কিন্তু আমি সে ভরসা তত দূর করি না। এত বড় বড় লোককে হার্বার্ট, স্পেন্সার ও মিলের এত গোঁড়া দেখিতে পাই যে, সেই স্রোত কোন দিক দিয়া বন্ধ হইবে তাহা কিছুতেই ঠাহরাইতে পারি না।

"তালতলায় আমাদের ক্লাবের যে অধিবেশন হইত, তথায় কোঁতের কোন এক গ্রন্থের কোনও কোনও অংশ প্রথমে পাঠ করা হইত; পরে তৎসম্বন্ধে যাহার যাহা মন্তব্য উপস্থিত হইত, তিনি তাহা প্রকাশ করিতেন। সভার অধিবেশন দুই এক বার

কে. এম. চ্যাটার্জ্জির বাড়ীতেও হইয়াছিল। সেই সময়ে চ্যাটার্জ্জি এক একটি বক্তৃতা দিতেন। ডবলিউ. সি. ব্যানার্জ্জি, যিশু খৃষ্ট ও তাঁহার দ্বাদশ শিষ্য যে জ্যোতিষশাস্ত্রের রূপান্তর বিশেষ, এ idea-টি কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা আমি জানিতে পারি নাই; কোনও কোনও য়ুরোপীয় চিন্তয়িতা ইহা প্রথম প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়া থাকিবেন। খৃষ্ট ধর্ম্মের সাংঘাতিক বিরোধী এই প্রকার কতকগুলি মত সময়ে সময়ে য়ুরোপে দেখা দিয়াছে। দেখ, Strauss নামক পণ্ডিত কর্ত্তৃক প্রণীত Leben Jesu নামক গ্রন্থের প্রথম আবির্ভাব হইবা মাত্র খৃষ্টানমণ্ডলি স্তম্ভিত, হতবুদ্ধি ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়াছিল; কিন্তু অল্পকাল গতেই খৃষ্টানেরা এরূপ প্রক্রিয়া করিয়াছে যে, ঐ গ্রন্থখানি এখন কোথাও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। কোঁৎও একস্থানে লিখিয়াছেন যে, যীশুখৃষ্ট খৃষ্টান ধর্ম্মের নামমাত্র প্রবর্ত্তক; প্রকৃত প্রবর্ত্তক সেণ্ট্ পল। যেমন বুদ্ধের বিষয়, তেমনই কোনও কোনও ব্যক্তি যীশুখৃষ্টের বিষয়েও সন্দেহ করেন যে, ঐ নামে কেহ কখনও ছিল কি না। কিন্তু এই সকল ধারণার বনিয়াদ কিছুই উপলব্ধি হয় না। হয় ত খৃষ্টানদিগের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপদ্বারা সে সকল জব্দ হইয়া গিয়াছে। মিল কিন্তু বলেন, Bless them that curse you, Love them that hate you, Do good to them that spitefully use you—এ প্রকার কথা বলিবার লোক কল্পনার দ্বারা নির্ম্মিত হইবার নহে। সত্য সত্য তেমন মানুষ অবশ্যই জন্মিয়া থাকিবে। মিলের এই কথাটা অনেকাংশে মনে লাগে বটে; কারণ কল্পনা যতই স্বাধীন হউক, তথাপি উহা সীমাবদ্ধ। এ দিকে প্রকৃতির ক্ষমতা এত বেশী যে সময়ে সময়ে এমন এক একটা সত্য ঘটনা ঘটিয়া উঠে যাহার নিকট কল্পনা অপদস্থ হইয়া যায়, যথা হানিবল, নেপোলিয়ন, জোন অব্ আর্ক্, শার্লটি কর্ড্ে।"

পণ্ডিত মহাশয় চুপ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত আপনার কখনও positivism সম্বন্ধে আলাপ হইয়াছিল?" তিনি বলিলেন "না—না। তবে ঘটনা চক্রে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন যে, আমি কোঁতের শিষ্য। আমার দাদার মৃত্যু হইলে আমি যেন সমস্ত সংসার অন্ধকার দেখিলাম। হৃদয়ের আবেগে একখানা খুব উচ্ছ্বাসপূর্ণ চিঠি কোঁৎকে প্যারিসের ঠিকানায় লিখিলাম; আমার নিজের ঠিকানা দিয়াছিলাম Care of Iswar Chandra Vidyasagar। কোঁৎ যে তখন জীবিত নাই তাহা জানিতাম না। চিঠিখানা dead letter আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিদ্যাসাগরের হাতে পড়িল। আমাকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, 'প্যারিস থেকে তোর একখানা চিঠি ফিরে এসেছে। তোর এ আবার কি পাগলামি?' বুঝিলাম, তিনি ঐ খোলা চিঠিখানা পড়িয়া আমাকে পাগল ঠাহরাইয়াছেন। আমাকে তিনি কিসে পাগল সাব্যস্ত করিয়াছেন এ কথা আমি

তাঁহাকে একদিন অভিমান করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, 'আরে না, না, সে রকমের পাগল নয়, তুই একটু বেশী romantio।'

"তুমি বোধ হয় জান না, বিদ্যাসাগর মহাশয় একটু তোৎলা ছিলেন; কেহ তাহা টের পাইত না। তোৎলার প্রধান ঔষধ আস্তে কথা কহা। বিদ্যাসাগর এরূপ অভ্যাস করিয়াছিলেন যে, কখনও জোরে কথা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইত না। ইহাতে কথা কহিবার সময় কখনও প্রকাশ পাইত না যে তিনি তোৎলা। সংস্কৃত কলেজের সহিত তিনি ত অনেক কাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন; কখনও ক্লাস পড়ান নাই। একবার শুনিয়াছিলাম তিনি 'উত্তরচরিত' ও 'শকুন্তলা' ক্লাসে পড়াইবেন, কিন্তু বস্তুগত্যা তাহা ঘটে নাই। আমার বোধ হয়, পূর্ব্বোক্ত কারণ বশতঃই তিনি ক্লাস পড়ান ব্যাপারে অগ্রসর হইতেন না। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যখন চাকরি করিতেন তখন বোধ হয় সময়ে সময়ে তাঁহাকে এক এক জন সিভিলিয়ন ছাত্র লইয়া বাঙ্গালা পড়াইতে হইত। কারণ তিনি নিজেই গল্প করিয়াছেন যে তিনি বিদ্যাসুন্দরের অশ্লীল অংশ পড়াইতে সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ছাত্র তাঁহাকে সে বিষয়ে অভয় দান করেন। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' বাহির হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় 'পুরুষ পরীক্ষা'[১] ও 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'[২] নামক দুইখানি পুস্তক প্রচলিত ছিল। সিভিলিয়নরা তাহাই পাঠ করিত। এখনকার রীতি অনুসারে ঐ দুখানি গ্রন্থ পছন্দ হইবার কথা নহে। সেই জন্যই বিদ্যাসাগর 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' রচনা করেন। 'পুরুষ পরীক্ষা' গ্রন্থেব মধ্যে একটি সন্দর্ভ লইয়া পূর্ব্বে খুব হাস্যপরিহাস চলিত। এই সন্দর্ভের মধ্যে লেখা আছে যে, বুদ্ধি চারি প্রকার বেগবেগা, বেগচিরা, চিরবেগা, চিরচিরা। বেগবেগার অর্থ, যে শীঘ্র বুঝিতে পারে, অথচ শীঘ্রই ভুলিয়া যায়; বেগচিরা শীঘ্র বুঝে, অনেক দিন মনে রাখে; চিরবেগা বুঝিতে দেরী হয় অথচ শীঘ্র ভুলিয়া যায়; চিরচিরা বুঝিতে দেরী হয়, কিন্তু অনেক কাল মনে থাকে। এই চিরচিরা লইয়া লোকে বিস্তর আমোদ করিত। যাহা হউক সে গ্রন্থ দুখানি একেবারে লুপ্ত হওয়া ভাল নহে; কারণ বিদ্যাসাগরের প্রবর্ত্তিত রীতির পূর্ব্বে কি প্রকার রীতি প্রচলিত ছিল, বিশেষতঃ ডেপো পণ্ডিতদিগের মধ্যে, তাহার অতিসুন্দর নমুনা ঐ দুই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থ পড়াইবার সময় বিদ্যাসাগর বোধ হয় হাড়ে চটিয়া যাইতেন; বোধ হয় তাঁহার শয্যাকণ্টক বোধ হইত; তাই তিনি অত উৎসাহের সহিত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' রচনা করেন। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' নামে যে হিন্দি বহি আছে, বিদ্যাসাগরের গ্রন্থখানি উহার নামমাত্র অনুবাদ। হিন্দিতে তিনি কেবল কঙ্কাল খানি পাইয়া ছিলেন; রক্ত মাংস ইত্যাদি সকলই

হরপ্রসাদ রায় কর্ত্তৃক অনূদিত এবং ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত।—সং

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার—১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত।—সং

তিনি আপনা হইতে যোজনা করিয়া দিয়াছেন তাই বাঙ্গালায় অমন সুন্দর একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে।

"১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' বোধ হয় প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে মদনমোহন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া মুর্শিদাবাদে যান। আমি তখন বোধ হয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ক্লাসে পড়ি। রামকমল সেনের বাড়ীর উপরে এক হলের ভিতর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের, ও দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ক্লাস বসিত। ১৮৫০ সাল হইতে মদনমোহনের সহিত বিদ্যাসাগরের উৎকট মনোমালিন্য কেন জন্মিল, কেন বিদ্যাসাগর তর্কালঙ্কারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক জোব করিয়া বিচ্ছিন্ন করিলেন, সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে চাহিনা। কালক্রমে যাহা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, তাহার উপর হইতে আবরণ উন্মোচন করিবার আবশ্যকতা দেখি না। বিদ্যাসাগর যখন তাঁহার 'নিষ্কৃতিলাভ প্রয়াস' গ্রন্থে এই মনোমালিন্যের কারণ সম্বন্ধে নিজে চুপ করিয়া গিয়াছেন, তখন যবনিকার অন্তরালে কি রহস্য নিহিত আছে, তাহা উদ্ঘাটিত করিবার প্রয়াস পাইব না।

"তর্কালঙ্কাবের এক খুড়া ছিলেন, সেটি একটি character। বিদ্যাসাগর তাঁহাকে কলেজে সংস্কৃত পুঁথির scribe নিযুক্ত করিয়াছিলেন; তাঁহার হাতের লেখা মুক্তার মত ঝলমল করিত। লোকটি কিন্তু সংস্কৃত লেখাপড়া জানিত না। তাহা হইলে কি হয়, সে অনর্গল যা তা সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিত। একবার Librarian-এর নামে শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে এক প্রকাণ্ড শ্লোক রচনা করিল; সে কবিতার আর কিছুই আমার এখন মনে নাই, কেবল 'লাইব্রেরিয়ান গরীয়ান্' এই দুটি কথা যেন কাণে বাজিতেছে। পুনশ্চ,

তারাশঙ্কর শঙ্কর সদয়া
বিদ্যাসাগর সাগর কৃপয়া
বিদ্যামন্দির মধ্য বিরাজে
পুস্তকধক্ষ্যক লাইব্রেরিকাজে।

'পুস্তকাধ্যক্ষ' লিখিলে ছন্দ ঠিক থাকিবে না তাই কথাটা পরিবর্ত্তিত হইল। তারাশঙ্কর, তথা বিদ্যাসাগব, খুব আমোদ পাইয়াছিলেন।

"আবাব রসময় দত্ত চলিয়া যাইবার পর বিদ্যাসাগর যখন কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়া আসিলেন, খুড়ো ঝাঁ করিয়া শ্লোক রচনা করিয়া দিলেন,

যঃ ঈশ্বরো নিম্নগতঃ করস্তি
সঃ ঈশ্বরো নিজালয়ং নয়ন্তি।

"লোকটির impudence আবার এত ছিল যে, পুঁথি নকল করিবার সময় আদর্শ

পুঁথিতে কাটকুট করিত। আদর্শ পুঁথিতে আছে 'সঙ্কর', খুড়ো ভাবিলেন দন্ত্য স ভুল; লিখিলেন তালব্য 'শ' এবং আদর্শ পুঁথিতে 'স' কাটিয়া 'শ' করিয়া দিলেন।

"মদনমোহন চলিয়া গেলেন। কিছু দিন পরেই বিদ্যাসাগর বীটন মেমোরিয়ালের (Bethune memorial) জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। বীটনকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার মৃত্যু কবে হইল ঠিক আমার মনে পড়ে না; কিন্তু বেশ মনে পড়ে, যে দিন বেথুন কলেজগৃহ খোলা হইল। সংস্কৃত কলেজে আমি তখন মাসিক আট টাকা বৃত্তি পাই। বিদ্যাসাগর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তোদের scholarship থেকে এ মাসে দু'টাকা কেটে নিচ্চি, বীটন মেমোরিয়ালের জন্যে। কি বলিস?' বিদ্যাসাগর যখন বলিলেন, ব্যাপারটা বুঝি আর নাই বুঝি, তাঁহার কথার কি প্রতিবাদ করা চলে?

"Law Member ও শিক্ষাসমিতির সভাপতি বীটন সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিতেন। প্রতি বৎসর সব কলেজের ছাত্রদিগকে একত্র করিয়া কলিকাতা টাউন হলে পারিতোষিক দেওয়া হইত; সেই সময়ে তিনি বক্তৃতা করিতেন। একবার আমি বিদ্যাভূষণের ক্লাসের পারিতোষিক লইতে টাউন হলে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, dais-এর উপর অনেক য়ুরোপীয় উপবিষ্ট। নিম্নে আলাহিদা আলাহিদা জায়গায় সংস্কৃত, হিন্দু, কৃষ্ণনগর, হুগলি ও ঢাকা কলেজের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'কাদম্বরী'র অনুবাদক তারাশঙ্কর ও আমার দাদা সংস্কৃত কলেজের front bench-এ উপবিষ্ট। সভাপতি ছিলেন বাঙ্গালার ডেপুটি গবর্ণর Sir John Littler। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে বীটন উপবিষ্ট। স্থূর জন বেঁটে ছিলেন, পেটটি মোটা। বীটন বক্তৃতা করিতে উঠিলেন। প্রসন্নবাবুর মুখে শুনিয়াছি (কারণ, তখন তাঁহার ইংরাজি বক্তৃতার রসগ্রহণ করিবার সামর্থ্য আমার ছিল না,) বীটন সভাপতির দিকে ফিরিয়া 'Sir John'—বলিয়া সহসা পুরা নামটি উচ্চারণ না করিয়া পুনরায় শুধু Sir বলিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। প্রসন্ন বাবু বলিলেন যে, বেশ বুঝা গেল, ডেপুটি গবর্ণরের সেই খর্ব্বাকৃতি, বর্ত্তুলোদর মূর্ত্তিটির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া Sir John বলিতে গিয়া বীটনের মনে Falstaff-এর স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাই তিনি সামলাইয়া লইয়া শুধু Sir দিয়া বক্তৃতার গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে, কলেজগুলি পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল; বক্তৃতায় ছেলেদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দেখ পরস্পরের প্রতি এই রেষারেষির আবশ্যকতা আছে কি? শিকারের সময় এক প্যাক কুকুর অগ্রসর হইয়া যদি খরগোসটাকে ধরিয়া ফেলে, তাহা হইলে অন্য প্যাকগুলির বিশেষ লজ্জার কারণ কি?

"বীটনের নাম করিতে গিয়া কাপ্তেন রিচার্ড্‌সনের নাম স্মৃতিপথে উদিত হয়। তাঁহার সম্বন্ধে পূর্ব্বে তোমাকে কিছু বলিয়াছি[১]; বীটন তাঁহাকে কর্ম্মত্যাগ করিতে

[১] পৃ ৬৯-৭০ দ্রষ্টব্য—সং

বাধ্য করেন, তাহাও বোধ হয় তোমাকে বলিয়াছি। চাকরি গেল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি surrender at discretion কাহাকে বলে জানিতেন না। যখন তিনি অধ্যাপনা করিতেন, একদিন একজন ভদ্রলোক তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'আপনি surrender at discretion-এর ভুল অর্থ গতকল্য ক্লাসে বলিয়া দিয়াছেন, আপনি কি উহার প্রকৃত অর্থ জানেন না?' কাপ্তেন উত্তর করিলেন—'I never surrendered at discretion, and therefore, it is possible I do not know what it exactly means.' কেন তাঁহার চাকরি গেল সে কথা তোমাকে প্রকাশ করিতে বারণ করিয়াছিলাম; কিন্তু এখন শুনিতেছি, রাজনারায়ণ বাবু কাপ্তেনের চরিত্র-দোষের কথার উল্লেখ করিয়াছেন। বীটন বক্তৃতায় কাহাকে উদ্দেশ করিয়া hoary libertine আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা জানিতে কাহারও বাকি ছিল না। কিন্তু তোমায় বলিয়াছি, কাপ্তেন surrender at discretion কাহাকে বলে জানিতেন না। তিনি বিদ্রূপ করিয়া লিখিলেন—'There was a man who was *little* and he was *beaten* (বিটন), and there was a man who was *littler* (Sir John Littler) and he was * * !' একজন Law Member, লর্ড মেকলে, কাপ্তেনকে হিন্দু কলেজের অধ্যাপনায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন; আর এক জন Law Member তাঁহাকে কর্ম্মত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন।"

তের

১৩ই কার্ত্তিক, ১৩১৯

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিতের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পনের লক্ষ টাকা দানের কথার উত্থাপন করাতে আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "আমার মত তারককে যাহারা বিশেষ ভাবে জানে, তাহারা তারকের এই দানে বিস্মিত হইবে না।

"আমার যখন ১৫।১৬ বৎসর বয়স, সেই সময় হইতে তারকের সহিত আমার বন্ধুত্ব। আমরা প্রায় সমবয়সী। বোধ হয় তারক আমার চেয়ে বছর খানেকের ছোট হইবেন। তিনি পড়িতেন হিন্দু কলেজে জুনিয়ার ডিপার্টমেণ্টে; আমি পড়িতাম সংস্কৃত কলেজে; আলাপ পরিচয়ের সম্ভাবনা ত বড় কিছু ছিল না, কি গতিকে যে হইল তাহা আমার স্মরণ নাই। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যে গতিকেই হউক, আলাপ পরিচয়ের পর হইতেই তারকের প্রতি আমার একটু বিশেষ আকর্ষণ জন্মিয়াছিল। ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, স্বভাবের অকুতোভয়তা, অল্প বয়সে ইংরাজি ভাষাতে বিশেষ দখল, এই সব কারণে আমি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। আমি ছিলাম সংস্কৃত কলেজেব ছাত্র; সংস্কৃত সাহিত্যেই বিশেষ আগ্রহের সহিত অধ্যয়ন করিতাম; অল্পবয়স হইতেই কলেজের লাইব্রেরীতে বসিয়া হস্তলিখিত পুঁথিগুলি একাগ্রচিত্তে পাঠ করিতাম। বিদ্যাসাগর কখনও কখনও লাইব্রেবীতে আসিয়া হাসিয়া আমাকে দুই একটি কথা বলিয়া আমার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইতেন। আমার দাদাকে তিনি চারি খণ্ড folio মহাভারত পুরস্কার দিয়াছিলেন। সেই সংস্কৃত মহাভারতের সমস্ত খণ্ডগুলি আমি দশ এগার বৎসর বয়সের মধ্যে পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। সংস্কৃত সাহিত্য-চর্চ্চায় রত থাকিয়া ইংরাজিতে পারিপাট্য লাভ করিবাব অবসর তখন হয় নাই; সেই অল্প বয়সে তারক যেরূপ ইংরাজী কহিতে পারিতেন, সেরূপ পারিপাট্য আর কাহারও দেখি নাই। আমাদের উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিল।

"সে আজ পঞ্চান্ন ছাপান্ন বৎসরেরও অধিক দিনের কথা। সেই সময় অবধি এ পর্য্যন্ত এক দিনের তরেও আমাদের উভয়ের মনোমালিন্য জন্মে নাই। আমরা 'সখা' শব্দের অর্থ মোটামুটি সহচর বা বন্ধু বুঝিয়া থাকি; কিন্তু টীকাকার মল্লিনাথ স্থলবিশেষে সখা শব্দের বিশিষ্ট অর্থ দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি কোথা হইতে একটা শ্লোকখণ্ডও উদ্ধৃত করিয়াছেন 'একপ্রাণঃ সখা প্রোক্তঃ' অর্থাৎ প্রাণে প্রাণে মিল হইলে সখা হয়।

তাহার মানে এই যে, তুমিও সেক্সপীয়র ভালবাস আমিও সেক্সপীয়র ভালবাসি, তোমারও যাহাতে হাসি পায় আমারও তাহাতে হাসি পায়, তুমিও যাহা ঘৃণা কর আমিও তাহা ঘৃণা করি, এইরূপ নানা প্রকার মিল থাকিলে দুইজনে পরস্পর সখা হয়। তারকের সঙ্গে আমার অনেক বিষয়ে মিল আছে; বিশেষতঃ হাসির কথা সম্বন্ধে। আমরা উভয়েই এক্ষণে রুগ্ন ও জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছি; দেখা সাক্ষাৎ বড় কম; তথাপি এখন পর্য্যন্ত একলা বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে যদি কোনও হাসির কথা আমার মনে আসে, তৎক্ষণাৎ তারককে মনে হয়; ভাবি যে, সে এ কথাটা শুনিলে খুবই হাসিত।

"তারকের মত বিমল বুদ্ধি আমি খুবই কম দেখিয়াছি। অল্প-বয়স হইতেই তাহার ইংরাজি দর্শন শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ ঝোঁক ছিল। তৎকালে স্যর উইলিয়ম হ্যামিল্টনের নূতন চলন হইয়াছিল; তারক তাঁহার গ্রন্থ খুব পাঠ করিতেন ও তাঁহার খুব ভক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কয়েক বৎসর গতে তিনি মিল ও স্পেন্সারের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। আমি যদিও দর্শন শাস্ত্র কতক কতক পড়িতাম বটে, কিন্তু তারকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া অনেক বিষয়ে আমার অভূতপূর্ব্ব চক্ষুরুন্মীলন হইয়াছে। একটা বিষয় অদ্যাপি আমার স্মরণ আছে; আমার একটি বিশেষ অসুস্থতা আছে; সে অসুস্থতাটির বাহ্যিক কোনও লক্ষণ স্পষ্টতঃ প্রকাশ পায় না; কিন্তু আমি নিজের ভিতরে ভিতরে দুরন্ত অস্বচ্ছন্দতা অনুভব করি। একদিন তারকের সহিত এই বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে আমি বলিলাম যে, অনেকে ইহা imaginary (কাল্পনিক) বলিয়া আমাকে উপহাস করেন; তারক কিন্তু তৎক্ষণাৎ তদুত্তরে বলিলেন, 'the imaginary is not the less real!' এ কথাটি আমার বড়ই ভাল লাগিল, এবং তদবধি আমার মানসক্ষেত্রে উহা উৎকীর্ণ হইয়া আছে।

"ইংরাজী ভাষার উচ্চারণ, শব্দপ্রয়োগ ইত্যাদি সম্বন্ধে তারকের নিকট আমি যে কত জিনিষ শিক্ষা করিয়াছি তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না; তারকের ইংরাজি গদ্য কি পদ্য আবৃত্তি যেরূপ মিষ্ট, আমার কাছে আর কাহারও আবৃত্তি কখনও সেরূপ মিষ্ট লাগে নাই। ইংরাজি গদ্য-পদ্যের আবৃত্তি মোটামুটি বলিতে গেলে দুই প্রকারের আছে বলা যায়। এক প্রকার আবৃত্তি খুব demonstrative; চীৎকার, হাতপা নাড়া, ইত্যাদি। আর এক প্রকার আবৃত্তি তরঙ্গবিহীন, একঘেয়ে। তারকের রীতি এই দুইয়ের বহির্ভূত; ঠিক বুঝাইতে গেলে বোধ হয় তাহাকে Serene বলা যাইতে পারে।

তাঁহার বিমলবুদ্ধিতা সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, Reason নামে আমাদিগের যে একটা attribute আছে উহার বশবর্ত্তী হইয়া সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করা, এই বৃত্তি তারকের যে প্রকার বলবতী দেখিয়াছি এরূপ কাহারও দেখি নাই। কিন্তু তাই বলিয়া মনে করা

উচিত নহে যে, Sentiment বা Impulse তাঁহার স্বভাবে কিছু মাত্র নাই। এতকালের সংসর্গের দ্বারা আমি ভালরূপই জানি, তাঁহার মধ্যে Sentiment কত প্রবল। একদিনের কথা মনে পড়ে। চা বাগানের এক 'সাহেব' একজন কুলীরমণীর প্রতি এরূপ পাশব বলপ্রয়োগ করে যে, উহাতে স্ত্রীলোকটির মৃত্যু হয়। সেই সময় সর্ব্বত্রই এ বিষয়ের আন্দোলন হইতেছিল। আমি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিলাম যে আমার কাছে ঐ কথা বলিতে বলিতে তারকের দুই চক্ষু অশ্রুজলে পরিপ্লুত হইল। Impulse-এর বিষয় অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই। অনেকেই বোধ হয় জানেন যে, তাঁহার মেজাজ কিছু গরম, তিনি অল্পেই চটিয়া উঠেন, ইহা নিতান্ত অমূলক নহে। সেরূপ মেজাজ গরম না হইলে বোধ হয় তিনি রাজপুরুষদিগের নিকট সমধিক সম্মানিত হইতে পারিতেন এবং তাঁহার ব্যবসা সম্বন্ধে আরও উন্নতি লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু স্বভাবের দোষই বল আর গুণই বল, কোন রূপ অন্যায় তিনি সহ্য করিতে পারেন না; অন্যায় ছোটই হউক আর বড়ই হউক, দেখিলেই তিনি আগুন হইয়া উঠেন। ঠাণ্ডা মেজাজের লোকেরা হয় ত অনেক সময়ে মনের ভাব চাপিয়া যায়; তারক সেইটি আদৌ পারেন না।

"তিনি এককালে এত লক্ষ টাকা সাধারণের হিতার্থে দান করাতে আবালবৃদ্ধ-বনিতা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে। কিন্তু আমি তাঁহাকে বরাবর জানি; এ দান তাঁহার পক্ষে খুবই সম্ভব। বন্ধুবান্ধব বিপন্ন হইলে এ প্রকার কত টাকা যে তিনি চিরকাল ব্যয় করিয়া আসিয়াছেন, বাহিরের লোক ত তাহা জানে না। কিন্তু বিশেষ দায়ে পড়িলে পুনঃপ্রাপ্তির আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া তিনি চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা একেবারে দান করিয়াছেন, এ কথা কেহ কেহ জানেন।

"বদান্যতা বা দানশৌণ্ডতা তারকের পুরুষানুক্রমিক। তাঁহার পিতা ৺কালীকিঙ্কর পালিত যেমন কলিকাতায় একজন ক্রোরপতি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, বদান্যতা সম্বন্ধেও তাঁহার সেইরূপ যশ ছিল। তাঁহার নিজ বাসস্থান অমরপুর গ্রামের[১] সন্নিধান-বাসী বিস্তর গৃহস্থ ব্রাহ্মণের তিনি বসতবাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত কলিকাতা সহরেও তাঁহার পরোপকারবৃত্তি প্রবল ছিল। প্রসিদ্ধ ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক সময় কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'You are the architect of many a man's fortune in town. কিন্তু তিনি কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। এক্ষণে মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার বাটী বলিয়া যাহা বিদিত আছে, ঐ বাটী ৺কালীকিঙ্কর পালিত নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

"কালীকিঙ্কর কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তোমাদের রিপণ কলেজের পুরাতন বাড়ীটির ঠিক পশ্চিম অংশে তারকের মাতামহপ্রদত্ত একখানি একতালা বাড়ী

[১] হুগলী জেলার পোলবা থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম।—সং

ছিল। কতদিন সেই বাড়ীতে তারকের সহিত দেখা করিতে গিয়াছি ; তাহার বসিবার ক্ষুদ্র কক্ষটিতে কত নিভৃত বিশ্রব্ধ আলাপ, কত ভবিষ্যতের আশার কথা, দুইটি অশান্ত ক্ষুব্ধ হৃদয়ের কত ব্যাকুল স্পন্দন !

"তারকের যাহা কিছু সম্পত্তি সমস্তই স্বোপার্জ্জিত, এবং অক্লিষ্ট পরিশ্রমের ফল স্বরূপ। এই অর্থ উপার্জ্জন করিতে তাঁহাকে যে কিরূপ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তাহা তাঁহার বন্ধুবান্ধবরাই জানেন। এত পরিশ্রমের ধন অম্লানবদনে অকাতরে দান করা অসামান্য মহানুভাবতাসূচক এ বিষয়ে দুই মত হইতে পারে না।

"কলেজের পাঠ সাঙ্গ করিয়া তারক যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করিবেন তাহা প্রথমে ঠিক হয় নাই। তিনি প্রথম উদ্যমে একবার মুৎসুদ্দিগিরির চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু জুয়াচোরের হস্তে পড়িয়া তাঁহার কিছু টাকা লোকসান হইল। সেই উপলক্ষে তাঁহাকে সুপ্রীম কোর্টে স্যর মর্ডণ্ট ওয়েলস নামক দুর্দ্ধর্ষ জজের সমক্ষে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল। তারকের অকুতোভয়তা, ইংরাজি বলিবার পারিপাট্য, straight-forwardness ইত্যাদি দর্শন করিয়া জজ এরূপ impressed হইয়াছিলেন যে, তাঁহার রায়ের মধ্যে এই বাক্যটি তিনি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, Here is a young man fresh from college who straightforwardly answers questions put to him, ইহাকে বিশ্বাস না করিয়া কাহার কথা বিশ্বাস করিব ? ইহার পর তাঁহার ব্যারিষ্টার হইবার নিমিত্ত বিলাত যাইবার বাসনা উপস্থিত হয়। তিন চারি বৎসর পরে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি যখন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তখন প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। কিন্তু অসামান্য বুদ্ধিমত্তা, অধ্যবসায়, কার্য্যাভিনিবেশ, অনন্যমনস্কতা ও অক্লিষ্ট পরিশ্রমের গুণের অল্পকালের মধ্যেই তিনি যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিলেন।

"তোমরা বোধ হয় জান না যে, তারক কলেজ ছাড়িবার পর প্রথম প্রথম বাঙ্গালা ভাষার এক জন লেখক হইবেন এ প্রকার প্রবণতা কিছু কিছু দেখাইয়াছিলেন। তিনি জগমোহন তর্কালঙ্কারের সহিত 'ভ্রমভঞ্জিনী' নাম্নী একখানি পত্রিকা সংস্থাপিত করিয়া তাহাতে লিখিতে আরম্ভ করেন। তদ্ব্যতীত কেশবচন্দ্র সেন কর্তৃক সংস্থাপিত একটি ইংরাজি বিদ্যালয়ে তিনি বিনা বেতনে কিছু দিন শিক্ষকতাও করিয়াছিলেন।"

পণ্ডিত মহাশয় চুপ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে আমি বলিলাম—"আপনার নিকট হইতে ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর বিষয় কিছু শুনিতে ইচ্ছা হয়।" তিনি বলিলেন—

"প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী এক উচ্চবংশের কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্ব্বাধিকারী এই নামটা কোন এক সময়ে বোধ হয় Prime Minister এই প্রকার এক উন্নত রাজপুরুষকে বুঝাইত। সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে মাঘ কবি আত্মপরিচয় প্রদানকালে

এই শব্দটা প্রয়োগ করিয়াছেন ; 'অধিকার' শব্দটা সংস্কৃত শাস্ত্রে বিলক্ষণ প্রচলিত আছে। ইহার অর্থ State function ; সেই অর্থ ধরিলে সর্ব্বাধিকারী বলিতে a state functionary who looked after the departments of a state এইরূপ বুঝাইতে পারে। ইংলণ্ড রাজ্যের Prime Minister বলিতে যদিও ঠিক তাহা বুঝায় না, তথাপি তিনি প্রধান অমাত্য এই অংশে সর্ব্বাধিকারীর পদের সহিত কিছু সাদৃশ্য আছে।

"প্রসন্নবাবু বংশজ ছিলেন। বোধ হয় তাঁহার কোনও পূর্ব্বপুরুষ এক সময়ে স্থানীয় সামন্ত রাজা বিশেষের রাজ্যে ঐ পদ পাইয়াছিলেন ; তদবধি তাঁহাদের বংশে নামটা স্থায়ী হইয়া আসিয়াছে। যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, হাবড়ার সন্নিহিত শিবপুর সহরে একটি মুসলমান বংশ আছে, তাহারা অদ্যাপি 'কাজী' নামে অভিহিত হয়, যদি চ এক্ষণে তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই কাজী পদস্থ নহেন।

"প্রসন্নবাবুর জন্মস্থান খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাধানগর নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামটি হুগলী জিলার অন্তর্গত, এবং এক সময়ে বিলক্ষণ স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল ; কিন্তু সম্প্রতি বাঙ্গালা দেশের অপরাপর অনেক স্থানের মত ম্যালেরিয়া দোষে নিতান্ত অভিভূত হইয়া গিয়াছে। প্রসন্নবাবুর কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ছিল বোধ হয় ; কিন্তু তাঁহার নিজমুখে শুনিয়াছি যে, কলিকাতায় থাকিয়া হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালে টাকা-কড়ির অভাবে তাঁহাকে অনেক সময়ে বিলক্ষণ কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল, এমন কি রাত্রিতে পাঠ করিবার জন্যে প্রদীপের তৈল পর্য্যন্ত জুটিত না। তিনি রাস্তার লণ্ঠনের নিম্নে দাঁড়াইয়া পাঠ্য গ্রন্থের অনুশীলন করিতেন। এই সমস্ত বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও তিনি বুদ্ধিমত্তা ও অধ্যবসায়গুণে এক জন সুপ্রতিষ্ঠিত ছাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিন চারি বৎসর চল্লিশ টাকা ছাত্রবৃত্তি ভোগ করিয়াছিলেন, এবং ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকবার সর্ব্বোচ্চ পদ পাইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে কলিকাতা, ঢাকা, কৃষ্ণনগর, এই তিন কলেজের বাৎসরিক পরীক্ষা এক সঙ্গে হইত ; সুতরাং সে সময়ে সর্ব্বোচ্চ পদ লাভ করা কম সুখ্যাতির কথা নহে। তখন যে সকল ছাত্রের পরীক্ষার উত্তরগুলি অতি উৎকৃষ্ট হইত সেগুলি বাৎসরিক রিপোর্টে ছাপাইয়া শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষগণ সাধারণের গোচর করাইয়া দিতেন। আমার মনে আছে, ইংরাজী সাহিত্যশাস্ত্রের একটি উত্তর প্রসন্ন বাবু লিখিয়াছিলেন ; তাহা আমি রিপোর্টে দেখিয়াছিলাম। সেবার সেক্সপীয়ারের টেম্পেষ্ট নামক নাটক পরীক্ষার পুস্তক ছিল, প্রসন্নবাবু তাহারই উত্তর লিখিয়াছিলেন ; এবং তৎসম্বন্ধে ইংরাজী সাহিত্যশাস্ত্রে বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ফলতঃ তিনি ইংরাজী সাহিত্যেই প্রধানতঃ যশস্বী ছিলেন ; কিন্তু তাহা বলিয়া গণিতশাস্ত্রেও তাঁহার অল্প অধিকার ছিল না। তাঁহার প্রণীত বাঙ্গালা পাটীগণিত ও বীজগণিত সে বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিবে। বাঙ্গালা পাটীগণিত প্রসন্নবাবুর চিরস্থায়ী কীর্ত্তি।

যখন শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষগণ বাঙ্গালার মফঃস্বলপ্রদেশে বিদ্যাচর্চার জন্য ইন্‌স্পেক্টর, ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর প্রভৃতি নিয়োগের ব্যবস্থা করিলেন এবং বিস্তর নূতন বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিলেন,—আন্দাজ ১৮৫৪, ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে,—সেই সময়ে বাঙ্গালা ভাষাতে ইংরাজী ধরণের কতকগুলি নূতন গ্রন্থ শিশুদিগের পাঠোপযোগী করিয়া প্রণয়ন করিবার আবশুক হইয়া উঠিল। পাটীগণিত রচনা করিবার ভার প্রসন্নবাবু গ্রহণ করিলেন। এই গুরুতর কার্য্য তিনি কি প্রকার সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন তাহার বিস্তারিত পরিচয় বোধ হয় দিতে হইবে না। তাঁহার পরিগৃহীত পারিভাষিক শব্দগুলি এক্ষণে বাঙ্গালা পাটীগণিত শাস্ত্রে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। তাঁহার গ্রন্থ দেখিয়াই তাঁহার পরের সমস্ত পাটীগণিত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সে সাহায্য না পাইলে অদ্যাবধি কেহ এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। এক্ষণে তাঁহার গ্রন্থের তাদৃশ চলন নাই ; কারণ বোধ হয় সে গ্রন্থখানি অতি বিস্তৃত। এবং আমাদিগেব দেশে সকল কার্য্যই সুপারিশের দ্বারা চলে, এই জন্য তাঁহার গ্রন্থ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইলেও অর্থলোলুপ অন্যান্য গ্রন্থকার-গণ তাঁহার সাহায্য লইয়াই তাহার গ্রন্থকে পদচ্যুত করিয়াছে। একটা প্রবাদ আছে,

তোর শিল, তোর নোড়া,
তোরই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।

প্রসন্নবাবুর পাটীগণিতেব পদচ্যুতি ইহারই একটি দৃষ্টান্তস্থল! বাঙ্গালা পাটীগণিতের প্রবর্ত্তয়িতা বলিযা প্রসন্নবাবুকে সকলেই জানেন। কিন্তু তিনি যে দুই খণ্ড বহুবিস্তৃত বীজগণিত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অনেকেই অবগত নহেন। তাহার কারণ, বাঙ্গালাতে গণিতশাস্ত্রের অধ্যয়ন বীজগণিত পর্য্যন্ত অগ্রসর হয় নাই। সুতরাং সেই দুই খণ্ড এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে ; কিন্তু থাকিলে, গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধে ভাষার প্রতিষ্ঠা বিলক্ষণ বৃদ্ধি করিতে পারিত।"

পণ্ডিত মহাশয় থামিলেন। আমি বলিলাম, "আপনার মুখে পূর্ব্বে শুনিয়াছি যে, পাটীগণিত রচনা করিবার সময় প্রসন্নবাবু আপনার জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺রামকমল ভট্টাচার্য্যের নিকট পরিভাষা সম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটেও কি তিনি পাটীগণিত ও বীজগণিতের পরিভাষা সম্বন্ধে ঋণী ছিলেন ?"

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন—"না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'লীলাবতী' প্রভৃতি ভাল পড়া ছিল না।[১] তিনি নূতন ধরণে ইংরাজী প্রণালীতে অধ্যাপনার প্রবর্ত্তন করিবার

[১] 'পাটিগণিতে "ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দগুলির বিষয়ে প্রসন্নকুমার লিখিয়াছেন : 'এই সকল শব্দের সঙ্কলন বিষয়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অনেক সাহায্য করিয়াছেন।' সংস্কৃত কলেজের গণিতের অধ্যাপক শ্রীনাথ দাস ও প্রাক্তন ছাত্র রামকমল ভট্টাচার্য্যও গ্রন্থটি ছাত্রোপযোগী করার জন্য সহায়তা করেন।"......বীজগণিতের মুখবন্ধে "গ্রন্থকার নিজেই লিখিয়াছেন : 'আমার প্রিয় ছাত্র ও বন্ধু নর্মালস্কুলের প্রধান শিক্ষক পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত রামকমল ভট্টাচার্য্য অনেক সাহায্য করিয়াছেন।'" (সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, ২য় খণ্ড—ডঃ গোপিকামোহন ভট্টাচার্য্য)—সং

পূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজে 'লীলাবতী' প্রভৃতি রীতিমত পড়ান হইত। আমি পণ্ডিত প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্যের নিকট 'লীলাবতী' পড়ি; বিদ্যাসাগর ইহাকে পরে মুন্সেফ করাইয়া দেন। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর 'লীলাবতী' পড়েন কলেজের এক খোট্টা পণ্ডিতের কাছে তাঁহার নাম পণ্ডিত যোগধ্যান। পণ্ডিত যোগধ্যান প্রত্যহ নিজের ব্যবহারের জন্য কলস ভরিয়া গঙ্গাজল নিজে স্কন্ধে করিয়া বহন করিয়া আনিতেন। সংস্কৃত কলেজে খোট্টা পণ্ডিত এক জন না এক জন বড় গোছের বরাবরই প্রায় নিযুক্ত হইতেন। খোট্টা পণ্ডিত নাথুরাম[১] এক জন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন নাথুরামের ছাত্র। বিদ্যাসাগর জয়নারায়ণের ছাত্র। শুনিয়াছি, তারানাথের চাঞ্চল্য দেখিয়া নাথুরাম বলিতেন—'তারা তু পবন এব।' যখন মল্লিনাথের টীকার কোনও manuscript বাঙ্গালাদেশে প্রবেশলাভ করে নাই তখন সংস্কৃত কলেজের যে তিনজন পণ্ডিত মিলিয়া একখানা চলনসই টীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, নাথুরাম তাঁহাদিগের অন্যতম। আমরা সেই টীকা পাঠ করিতাম। তাঁহাদিগের নাম একটি শ্লোকে গ্রথিত হইয়াছিল:

কৃত্বা কিঞ্চিৎ রামগোবিন্দসূরৌ
নাথুরামো প্রাজ্ঞ বর্জ্জেপ্যনল্পং।
যাতে স্বর্গং প্রেমচন্দ্রো মনীষী
টীকামেতাং পূর্ণতাং সংনীনায়॥

"পণ্ডিত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সর্ব্বপ্রথম মল্লিনাথের টীকা সম্বলিত 'শকুন্তলা' প্রকাশিত করেন। পণ্ডিত জয়নারায়ণ সম্পূর্ণ Epicurean ছিলেন। কেশব সেনকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিতেন—'কেশব কেন ঈশ্বর ঈশ্বর করে বেড়ায়? ও সব এ দেশে ঢের হয়ে গেছে। যদি বিলাতী কলকব্জা এখানে করবার চেষ্টা করে, তা হোলে উপকার হতে পারে।'

"এক হিসাবে তখনকার দিনে সংস্কৃত কলেজের Moral atmosphere খুব ভাল ছিল। বিদ্যাসাগর, বিদ্যাভূষণ, গিরিশ বিদ্যারত্ন কখনও কোনও বিষয়ে কথার নড়চড় করিতেন না; পয়সার লোভে সৎপথ হইতে এক চুলও বিচলিত হইতেন না। বোধ হয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের এ গুণটা সাধারণতঃ আছে। তবে জজ পণ্ডিতেরা সকলে টাকার লোভ সামলাইতে পারিত না, ঘুষ লইত।"

[১] নাথুরাম শাস্ত্রী গুজরাটী ছিলেন। (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস ১ম খণ্ড' দ্রষ্টব্য)—সং।

চৌদ্দ

১২ই চৈত্র ১৩১৯

আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "সম্প্রতি একটি লোকের মুখে শুনিলাম যে, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' নামক একখানি গ্রন্থের আলোচনা উপলক্ষে লিখিয়াছেন যে, বঙ্কিমবাবুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে ঐ ধরণের রচনা কিছু কিছু দেখা গিয়াছিল ; এই বিষয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপ সরকার মহাশয় ঐ গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন উহাতে গ্রন্থকারের নাম ছিল না। তিনি কাহার মুখে অবগত হইয়াছেন যে, উহা আমার জ্যেষ্ঠ রামকমলের রচনা। আমার এক্ষণে বলিতে বাধা নাই যে, বাস্তবিক তাহা নহে। উহা আমারই রচনা। কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি আমার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব তাহা জানিতেন। বোধ হয়, সংবাদটি এক মুখ হইতে অন্য মুখে কিঞ্চিৎ অন্যথাভূত হইয়া তাঁহার নিকট পৌছিয়াছে, এবং তাঁহার ধারণা হইয়াছে যে, উহা রামকমলের। ঐ গ্রন্থ সিপাহী-বিদ্রোহের সময় প্রকাশিত হইয়াছিল। সে সময়ে বাঙ্গালা রচনার দিকে আমার কিছু ঝোঁক ছিল। 'বিচারক' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র তৎকালে আমি বাহির করিয়াছিলাম। ইহা অ্যাডিসনের Spectator-এর ধরণে গঠিত হইয়াছিল। একটি সন্দর্ভে সমস্ত কাগজ পূর্ণ হইত। সর্ব্বোপরি একটি করিয়া সংস্কৃত motto থাকিত। কি কারণে, মনে নাই, পাঁচ ছয় সংখ্যা বাহির হইয়াই উহা কিন্তু বন্ধ হইয়া যায়। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের জ্ঞাতিভ্রাতা তারাধন ভট্টাচার্য্য পত্রিকার ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন।

"বিচারক বন্ধ হইয়া গেল। অনতিবিলম্বে সুহৃদ্বর কবি বিহারীলাল 'পূর্ণিমা' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। আমি তাহার অন্যতম লেখক হইলাম। তুমি হয় ত শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ করিবে যে, ঐ পত্রিকায় আমার দুইটি শ্লোকখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল,—'জুঁইফুলের গাছ' ও 'তাঁতিয়া টোপি।' কবিতা দুইটি কোনও কোনও ব্যক্তির নিতান্ত মন্দ লাগে নাই। ৺কামাখ্যাচরণ ঘোষ, স্বপ্রণীত 'রত্নসার' নামক বাল্যপাঠ্য সংগ্রহগ্রন্থে ঐ দুইটি সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন ; পরে কিন্তু 'তাঁতিয়া টোপি' কবিতাটি পাছে রাজভক্তির বিরুদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হয়, এই ভয়ে সেটিকে বাদ দিয়াছিলেন। 'পূর্ণিমাতে' আর কি কি লিখিয়াছিলাম, এক্ষণে মনে নাই। এ পত্রিকাখানিও অধিক দিন স্থায়ী হইল না।

"কিছুদিন পরে বিহারীলাল ও যোগীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (ইনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক) প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধু একত্র হইয়া 'অবোধ বন্ধু' নামক একখানি মাসিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। এই পত্রিকা খানি বোধ হয়, ইংরাজি ১৮৭১ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। ইহাতে আমি অনেক বিষয়ে লিখিয়াছিলাম; সমগ্র 'পল-বর্জ্জিনিয়া' গ্রন্থ ফরাসী ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল; নেপোলিয়নের একটি জীবনবৃত্তান্ত বহুবিস্তারিতভাবে লোডির যুদ্ধ পর্য্যন্ত বাহির করা হইয়াছিল। অনেক প্রবন্ধও লিখিয়াছিলাম। মনে পড়ে, একটি প্রবন্ধে য়ুরোপের duel (অর্থাৎ য়ুরোপীয়েরা অপমানিত হইলে পরস্পর প্রাণান্ত পর্য্যন্ত যে মারামারিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারই) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। একটি ক্ষুদ্র গল্প লিখিয়াছিলাম—তাহার নাম 'উজ্জ্বল'। চিঠিপত্রের প্রণালীতে লেখা। কিন্তু কোনও কারণবশতঃ আমি ইহা মুদ্রিত হইতে দিই নাই। এমন কি, সমস্ত টাইপযোজনা হইয়াছিল; আমি বিহারী লালের অজ্ঞাতে সেই টাইপযোজনা ভাঙ্গিয়া দিয়া আসি। ঐ রচনা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু বিহারীলাল উহা পাঠ করিয়া এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, যখন শুনিলেন যে, আমি গল্পটি চিরকালের জন্য নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি, তখন তিনি আমাকে কেবল মারিতে বাকী রাখিয়াছিলেন।[১]

"ইহার পর 'ভারতী' পত্রিকায় আমি কয়েকঠি বড় বড় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম; সকলগুলিই আমার নামসম্বলিত বাহির হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বায়রণের English Bards and Scotch Reviewers-এর অনুকরণে যে পদ্যগ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহার বিবরণ তুমি পূর্ব্বেই একটি প্রসঙ্গে কতকটা লিপিবদ্ধ করিয়াছ।[২] এই গ্রন্থখানিও মুদ্রিত হয় নাই। এতদ্ব্যতীত 'বিচিত্রবীর্য্য' নামক একখানি গ্রন্থ ও একখানি ক্ষুদ্র ইংলণ্ডের ইতিহাস[৩] রচনা করিয়াছিলাম। 'বিচিত্রবীর্য্য' হস্তলিখিত অবস্থায় পাঠ করিয়া আমার জ্যেষ্ঠ রামকমল বলিরাছিলেন,—It would do credit to a veteran writer',—বোধ হয়, ইহা ভ্রাতৃস্নেহের অত্যুক্তি। পুস্তকখানি আমি সতের আঠার বৎসর বয়সে রচনা করি, কিন্তু পাঁচ সাত বৎসর ছাপান হয় নাই; পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হইয়া আন্দাজ ইংরাজি ১৮৬৪ সালে উহা মুদ্রিত করিয়াছিলাম[৪]

[১] পৃঃ ১৪ দ্রষ্টব্য।—সং [২] পৃঃ ২২-২৪ দ্রষ্টব্য।—সং

[৩] প্রকৃত পক্ষে 'ইংলণ্ডের ইতিহাস' কৃষ্ণকমলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকমল ভট্টাচার্য্যের রচনা। (দ্রঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য')—সং।

[৪] প্রকৃত পক্ষে ইহা ১৮৬২ সালে প্রকাশিত হয়। (ঐ)

"কখনও গ্রন্থকার বা লেখক হইবার সাধ আমার বড় একটা তীব্র ছিল না। এক্ষণে কেহ কেহ আমার লেখার বিষয়ে অনুসন্ধান করাতে আমি এই বিবরণটি সঙ্কলন করিলাম। লেখাগুলি একত্র মুদ্রিত করিলে বাঙ্গালা ভাষার, কি আমার নিজের, কোনও উপকার হইবে কি না, তাহা বলিতে পারি না। এক্ষণে আমি এত প্রাচীন ও অথর্ব্ব হইয়াছি যে, নিজে তদ্বিষয়ে কোনও সাহায্য করিতে পারি বোধ হয় না; কিন্তু যদি সংগ্রহ হয় এবং ছাপাইবার আয়োজন হয়, আমার তাহাতে কোনও আপত্তি নাই।

"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাময়িক সাহিত্যে লিখিবার অবসর বড় একটা ছিল না। বোধ হয়, মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'সর্ব্বশুভকরী' পত্রিকায় কিছু কিছু লিখিতেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যয়ন প্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন করিতে এবং বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্কে তাঁহার অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইয়াছিল। তারানাথ তর্কবাচস্পতি কোনও পত্রিকায় কখনও লেখেন নাই।

"তারানাথ তর্কবাচস্পতি একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী এরূপ আর কেহ ছিলেন কি না, সন্দেহ। তিনি সংস্কৃতকলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং কাশীতে পাণিনি ব্যাকরণ ইত্যাদি অধ্যয়ন করেন। সংস্কৃত ব্যাকরণই তাঁহার speciality (বৈশিষ্ট) ছিল, এবং তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যুৎপত্তি ছিল। এতদ্দেশে দুর্গাদাস, রাম তর্কবাগীশ প্রভৃতি মুগ্ধবোধ ব্যবসায়ীদিগকে তিনি বড়ই অবজ্ঞা করিতেন; কিন্তু মুগ্ধবোধ ও বোপদেবের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার মতে পাণিনি না জানিলে সংস্কৃত শিক্ষা হইতেই পারে না। ব্যাকরণ সম্বন্ধে 'শব্দার্থরত্ন' নামক একখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছিলেন। বহুকাল পূর্ব্বে উহা মুদ্রিত হইয়াছিল; পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে কি না এবং অদ্যাপি ঐ গ্রন্থের অনুশীলন হয় কি না, বলিতে পারি না। আমার বোধ হয়, উহাতে বাক্যপদীয় অথবা হরিকারিকা নামক অত্যুৎকৃষ্ট ভর্তৃহরি-প্রণীত গ্রন্থের সারাংশসকল সন্নিবেশিত হইয়াছে। বাক্যপদীয় একখানি সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রের অত্যাশ্চর্য্য পুস্তক। ইহাতে যে কি প্রকার কল্পনাচাতুর্য্য (speculative ingenuity) প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। এই গ্রন্থখানি আমি যে ভালরূপ জানি, এ অভিমান আমার নাই; অতি যৎসামান্য আভাস পাইয়াছি মাত্র। তাহাতেই আমার উহার প্রতি এতটা শ্রদ্ধার ও ভক্তির উদয় হইয়াছে। তারানাথ বোধ হয়, ঐ গ্রন্থখানি ভালরূপ অনুশীলন করিয়াছিলেন। আমার মনে হয় গোল্‌ড্‌ষ্টুকার পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি সম্বন্ধে অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনিও বাক্যপদীয় ভালরূপ দেখেন নাই। বাক্যপদীয় পদ্যে লিখিত; উহার অনেকগুলি কারিকা এখনও আমার মুখস্থ আছে। একটিতে নিম্ন-

লিখিত প্রশ্নের মীমাংসা আছে ঃ—যদি কোনও একটা জিনিষ হইতে আর পাঁচটা জিনিষ প্রস্তুত হয়, তবে সেই বিষয়ের সংস্কৃত বাক্য রচনা করিতে গেলে ক্রিয়াতে কোন্ বচন দিতে হইবে, একবচন না বহুবচন? যেমন মনে কর, একটা বৃক্ষ হইতে পাঁচ খানা নৌকা প্রস্তুত হইতেছে; এখন এখানে কিরূপ বাক্য রচনা করিবে? "একো বৃক্ষঃ পঞ্চ নৌকাঃ ভবতি" বলিবে না "ভবন্তি" বলিবে? আমার যেন মনে আছে "ভবন্তি"। কিন্তু যে হরিকারিকাটি মুখস্থ আছে, সেটি তদ্বিপরীত। কারিকাটি এই—

প্রকৃতের্বিকৃতের্বাপি যত্রোক্তত্বং দ্বয়োরপি।
বাচকঃ প্রকৃতেঃ সংখ্যাং গৃহ্ণাতি বিকৃতের্ন তু॥'

অর্থাৎ যে জিনিষটা হইতে তৈয়ারী হয়, আর যেটা তৈয়ারী হয়, দুইটাই যে স্থলে উল্লিখিত হইতেছে, সে স্থলে ক্রিয়াতে প্রথমটার যে বচন, সেই বচনই দিতে হইবে, দ্বিতীয়টার বচন দিতে হইবে না। তদনুসারে।

একো বৃক্ষঃ পঞ্চ নৌকাঃ ভবতি

এইরূপ বলিতে হয়। এ বিষয়ের মীমাংসা আমি ত এখন কিছুই দিতে পারি না; তর্কবাচস্পতি মহাশয় তৎক্ষণাৎ বলিতে পারিতেন। আর একটা প্রশ্ন আছে। পাণিনি অপাদান কারক define করিতে গিয়া লিখিয়াছেন

'ধ্রুবমপায়ে অপাদানং'

অর্থাৎ দুইটা বস্তু পরস্পর পৃথক হইবার স্থলে যেটা স্থির থাকে, সেইটা অপাদান। যেমন বৃক্ষাৎ পত্রং পততি; অর্থাৎ পাতাটাই সরিয়া গেল, বৃক্ষ স্থিরই আছে; সুতরাং বৃক্ষই অপাদান। কিন্তু পাণিনিকৃত এই defination-এর উপর ফাঁকি উঠিল; 'ধাবতো অশ্বাৎ পততি' ঘোড়া দৌড়িতেছে, তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে সওয়ার পড়িয়া গেল, এ স্থলে অশ্ব ত স্থির নহে, কিন্তু তাই বলিয়া সওয়ারের পক্ষে অশ্ব কি অপাদান হইবে না? প্লেটো কোনও এক সময়ে মানুষকে define করিয়াছিলেন a biped without wings ডানাবিহীন দ্বিপদ; তাহাতে কোনও এক ব্যক্তি একটা মোরগের দুই ডানা কাটিয়া হাটের মাঝে টাঙ্গাইয়া দিয়া তলায় লিখিয়া রাখিল,—এই দেখ, প্লেটোর মানুষ! পাণিনির অপাদানবিষয়েও পূর্ব্বোক্ত অনুপপত্তির (difficulty) কি প্রকার মীমাংসা হইয়াছে, তাহা আমি এখন বলিতে পারিতেছি না। কিন্তু এ সকল বিষয়ে তর্কবাচস্পতি মহাশয় এক প্রকার সিদ্ধহস্ত ছিলেন; তাঁহার অজ্ঞাত কিছুই ছিল না।

"এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ, 'হরিকারিকা'তে কি প্রকার বিষয়ের আন্দোলন করা হইয়াছে। আর একটি কারিকা শুন; বোধ হয়, এটিও হরিকারিকা হইবে। কারিকাটি এই—

যান্যুজ্জহার মাহেশাৎ ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাৎ।
তানি কিং পদরত্নানি সন্তি পাণিনিগোষ্পদে ॥

অর্থাৎ, 'মাহেশ' নামে এক ব্যাকরণ আছে, সমুদ্রতুল্য; পাণিনি তাহার নিকট গোষ্পদতুল্য; ব্যাসের প্রণীত পুরাণাদিতে যে সকল পদ আমরা আর্ষ বলিয়া থাকি, সেগুলি 'মাহেশ' ব্যাকরণ হইতে পাওয়া যায়, অতি ক্ষুদ্র পাণিনিতে কোথায় পাইবে? 'মাহেশ' ব্যাকরণ অদ্যাপি আছে, কি লুপ্ত হইয়াছে, জানি না; কিন্তু যদি থাকে, সংস্কৃতানুশীলনকারীদিগের অনুসন্ধান করা উচিত। তর্কবাচস্পতি মহাশয় জীবিত থাকিলে ইহার কোনও না কোনও সংবাদ পাওয়া যাইত।

"আমি তাঁহার নিকট সংস্কৃত কলেজে ভট্টি ও অভিধান পড়িয়াছি। তাঁহার শ্রেণী প্রথম শ্রেণী বলিয়া অভিহিত ছিল। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, রামগোবিন্দ গোস্বামী ও প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, ও চতুর্থ শ্রেণীর পণ্ডিত ছিলেন। আমি চতুর্থ শ্রেণীতে দুই বৎসর থাকিয়া মুগ্ধবোধের সন্ধি ও শব্দ শেষ করি; গোস্বামী মহাশয়ের ঘরে এক বৎসর থাকিয়া ধাতুপ্রকরণ শেষ করি; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে এক বৎসর থাকিয়া মুগ্ধবোধের অবশিষ্টাংশ শেষ করিয়া প্রথম শ্রেণীতে পূজ্যপাদ তারানাথের ছাত্র হই। এই সময়ে মতিলাল নামে আমার এক সহাধ্যায়ী ছিলেন। তিনি মুগ্ধবোধের কূট কথা লইয়া খুব নাড়চাড়া করিতেন। মুগ্ধবোধের বিষয়ে একটা প্রবাদ আছে যে, বোপদেব সূত্রগুলি যতদূর পারেন অল্পাক্ষর করিয়া গিয়াছেন; কাহারও সাধ্য নাই, কোনও একটি সূত্রের একটিও অক্ষর কমাইয়া গঠন করিতে পারেন। যদি কেহ ভাবেন, তিনি অক্ষর কমাইতে পারেন, তবে তিনি দেখিবেন যে, কোথাও না কোথাও ঠেকিয়া যাইবেন। মতিলাল প্রত্যহ এক একটি ঐ প্রকারের ফাঁকি আনিয়া দিতেন। পণ্ডিত মহাশয় কখনও এক দিন, দুই দিন বা তিন দিন চিন্তা করিয়া সমাধা করিয়া দিতেন। ইহাতে তাঁহাকে বিস্তর মাথা ঘামাইতে হইত। কিন্তু তিনি বোপদেবকে এত শ্রদ্ধা করিতেন যে, তাঁহার মানরক্ষার জন্য কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না।

"সংস্কৃত syntax-এর (শব্দযোজনারীতির) উপর 'বাক্যমঞ্জরী' নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক তিনি বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত বিদ্যার্থীদিগের উহা পাঠ করা উচিত।

"শুধু ব্যাকরণ নহে, তারানাথ স্মৃতি ও জ্যোতিষ ভালরূপ জানিতেন। 'বাচস্পত্য অভিধানে' ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত তিনি দুইখানি প্রয়োগগ্রন্থ (rituals) লিখিয়া গিয়াছেন—'তুলাদানপদ্ধতি' ও 'গয়াশ্রাদ্ধপদ্ধতি'। এই দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিতে তাঁহাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। পুস্তক

দুইখানি লোপ হওয়া উচিত নহে; ঐ ঐ বিষয়ের তাবৎ বিবরণ ঐ দুই পুস্তকে পাওয়া যাইবে।

"'বাচস্পত্য অভিধান' প্রথমে তর্কবাচস্পতি মহাশয়, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও আমি, এই তিন জনে প্রস্তুত করিব বলিয়া কথা হয়, বোধ হয় ১৮৬৫-৬৬ সালে; কিন্তু কার্য্যকালে ন্যায়রত্ন ও অমি সরিয়া পড়িলাম। তর্কবাচস্পতি মহাশয় সঙ্কল্পিত কার্য্য ত্যাগ করিবার লোক নহেন। তিনি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে দশ হাজার টাকা সাহায্য পাইলেন। ইনস্পেক্টর উড্রো 'সাহেব' আমাকে বড় স্নেহ করিতেন, সে কথা তোমায় পূর্ব্বে বলিয়াছি; তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে গভর্ণমেণ্ট যাহাতে অর্থসাহায্য করেন, সেই সম্বন্ধে তাঁহাকে আমি বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলাম। মহামতি উড্রো সাহেব, তারানাথের অদ্বিতীয় বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়া উক্ত সাহায্য ঘটাইয়া দিলেন। পণ্ডিত মহাশয় একাকী ঐ গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্তি হইলেন; দশ বৎসরের অধিক কাল পরিশ্রম করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তুলিলেন।[১] আমার বিশ্বাস, এই অতিরিক্ত পরিশ্রমের দ্বারাই তাঁহার আয়ুঃশেষ হইল। তিনি কাশীতে দেহত্যাগ করিলেন। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ও প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের তাঁহার ন্যায় কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছিল।

"আমাদের দেশের লোকের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের, যে একটা অসম্পূর্ণতা আছে, অর্থাৎ Versatility-র অভাব, তারানাথের তাহা ছিল না। এত শাস্ত্রচর্চ্চার মধ্যেও তিনি সময়ে সময়ে ব্যবসার দিকে মনোনিবেশ করিতেন। কখনও বা শালের কারবার, কখনও বা নিজ গ্রাম অম্বিকাকালনায় সুরকি প্রস্তুত করিবার কারবারের চেষ্টা করিয়াছিলেন; তবে বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই উপলক্ষে একটি হাসির কথা মনে পড়ে। এক দিন এক সভায় বিচার করিতে করিতে তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রৌঢ়িপূর্ব্বক (with haughty assurance) বলিয়া উঠিলেন—'এ কথা যদি না হয় ত আমি ব্যবসা ছাড়িয়া দিব।' প্রতিদ্বন্দ্বী তৎক্ষণাৎ পরিহাস করিয়া বলিয়া উঠিলেন—'কোন ব্যবসা মশাই? শালের ব্যবসা, না শাস্ত্রচর্চ্চার ব্যবসা?'

"পরিশেষে তিনি অর্থোপার্জ্জনের সঙ্কল্প কতকটা সিদ্ধ করিয়াছিলেন; বিস্তর সংস্কৃত গ্রন্থ নিজকৃত টীকা সহিত মুদ্রিত করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র জীবানন্দও সেই কার্য্য চালাইয়া যে বিশেষরূপ সফলপ্রয়াস হইয়াছিলেন তাহা অনেকেই জানেন।

"বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বহুবিবাহের অবৈধতার বিষয়ে বাদানুবাদ আরম্ভ

[১] ১৮৭৩-৮৪। —সং

করেন, সে সময়ে তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, তর্কবাচস্পতি মহাশয় প্রথমে তাঁহার মতের অনুমোদন করিতে উদ্যত ছিলেন। বহুবিবাহ যে অবৈধ, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বিদ্যাসাগর একটি সুপরিচিত মনুবচনের নূতন প্রকার ব্যাখ্যা করেন। সে বচনটি এই—

'সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীণাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানাং ইমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরাঃ॥
শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রাণাং সা চ স্বাচ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা ক্ষত্রিয়স্যোক্তাস্তাশ্চ স্বা ব্রহ্মণঃ স্মৃতাঃ॥'

পূর্ব্বে এই শ্লোকের মোটামুটি এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইত যে, প্রত্যেক জাতির পক্ষে প্রথমে স্বজাতীয়া কন্যা বিবাহ করা অত্যাবশ্যক ও অবশ্যকর্ত্তব্য; পরে ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করিবার জন্য ইচ্ছা হইলে স্বজাতীয়া বা ভিন্নজাতীয়া কন্যা বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় অতি সূক্ষ্মবিবেচনা প্রয়োগ পূর্ব্বক মনুবচনদ্বয়ের এইরূপ অর্থ স্থির করিলেন যে, ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য স্বজাতীয়া পত্নীর একান্ত আবশ্যক; কিন্তু ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জন্য স্বজাতীয়া পত্নী হইতেই পারে না, ভিন্নজাতীয়া পত্নী চাহি। কিন্তু মনু প্রতিলোম-বিবাহের একান্ত বিদ্বেষী ছিলেন; অতএব তিনি অনুলোম-রীতিতেই ভিন্নজাতীয়া পত্নীর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। বহুবিবাহসম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের যুক্তি এই ছিল যে, যখন মনুর মতে কাম্যবিবাহ ভিন্নজাতীয়া কন্যা ব্যতীত হইতেই পাবে না, এবং যখন কলিতে জাত্যন্তরবিবাহ উঠিয়া গিয়াছে, তখন কলিতে বহুবিবাহ অবশ্যই অশাস্ত্রীয় হইতেছে।

"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই ব্যাখ্যা বিলক্ষণ সূক্ষ্মদর্শিতার দ্বারা উদ্ভাবিত হইয়াছে। বিশেষ প্রণিধানেব সহিত বচন দুইটির পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আমারও অনেক সময়ে বোধ হয় যে, মনুর অভিপ্রায় বা ইহাই ছিল। তবে একটা গোল এই থাকে যে, শূদ্রের পক্ষে কি কাম্যবিবাহ ঘটিবে না? কারণ শূদ্রের চেয়ে ছোট জাতি আর নাই; এবং মনুর মতে কাম্যবিবাহ আপন অপেক্ষা ছোট জাতির কন্যার সহিতই শাস্ত্রানুমোদিত। যাহা হউক, বিদ্যাসাগরের মুখে শুনিয়াছি, তারানাথ তাঁহার ঐ ব্যাখ্যা শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং আদর করিয়া বলিয়াছিলেন,—'আমাদের ঢিপ্‌লে না হোলে এমন সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা কে বার করতে পারে?' বিদ্যাসাগরের গ্যাঁট্টা গোঁট্টা খর্ব্বাকৃতি দেহ ছিল; এই জন্য তাবানাথ প্রভৃতি কয়েকজন তাঁহার সমসাময়িক এবং তাঁহার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ শ্রেণীস্থ সংস্কৃত কলেজের ছাত্র আদর করিয়া তাঁহাকে 'ঢিপ্‌লে' বলিয়া ডাকিতেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মুখে এই আদরের ডাকনাম আমি অনেকবার শুনিয়াছি।

"বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব মুদ্রিত হইল। কিছু দিন পরে দেখিলাম তারানাথ উহার প্রতিবাদ করিয়া পুস্তক লিখিলেন। অগত্যা বিদ্যাসাগর বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। তারানাথের যে প্রকার সর্ব্বসংগ্রাহী শাস্ত্রজ্ঞান ছিল, তাহাতে কোনও একটি সিদ্ধান্তে স্থায়ী ভাবে উপনীত হওয়া তাঁহার পক্ষে কিছু অসাধ্য ছিল। তিনি প্রত্যেক সিদ্ধান্তের অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তি সকল সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাইতেন। দুই প্রকারের যুক্তিই তাঁহার চক্ষুর উপরে সর্ব্বদা জাজ্বল্যমান থাকিত। সকল দেশের শাস্ত্রেই প্রায় প্রত্যেক সিদ্ধান্তের অনুকূল ও প্রতিকূল যুক্তি বিদ্যমান থাকে। কেবল Positive Science অর্থাৎ জ্যামিতি, জ্যোতিষ, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্রে যে সকল সিদ্ধান্ত স্থির হইয়া গিয়াছে, তাহা আর উল্টাইবার জো নাই। পৃথিবী ঘুরিতেছে; পৃথিবীর আকর্ষণের পরিমাণ বত্রিশ ফুট; ২১২ ডিগ্রি উত্তাপে জল ফোটে; এই সকল কথার প্রতিবাদ করিতে গেলে পাগলামি করা হয় মাত্র। নতুবা বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ কি না; কলিতে ভিন্নজাতীয় বিবাহ হইতে পারে কি না; ক্ষত্রিয় জাতি অদ্যাপি আছে, কি লোপ পাইয়াছে, এ সকল বিষয়ে মতামত চিরকালই আছে ও থাকিবে। তারানাথ যদিও প্রথমে বহুবিবাহের অবৈধতার প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে আমার বোধ হয়, কোনও ব্যক্তির অনুরোধে তদ্বিরুদ্ধমত অবলম্বন করিলেন। তাঁহার নিজের মুখেই শুনিয়াছি যে, যদিও তিনি বিধবাবিবাহে মত দিয়াছিলেন, তথাপি তিনি বেশ জানিতেন যে, সে মতের বিপরীতে বিস্তর কথা বলা যাইতে পারে।

"বিদ্যাসাগরের প্রবল যুক্তিতে কাহারও মন আর্দ্র হইল না। যাঁহারা য়ুরোপীয় শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া একাধিক বিবাহ বিদ্বেষী হইতে শিখিয়াছিলেন, তাঁহারাই কেবল বিদ্যাসাগরের মত সমর্থন করিলেন। কিন্তু কোনও ফল হইল না। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট বহুবিবাহনিষেধক আইনের দিকে অগ্রসর হইতে সাহস পাইলেন না। বিধবাবিবাহের বৈধতাসম্পাদক আইন তাঁহারা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহার কথা স্বতন্ত্র। কারণ বিধবাবিবাহে কোনও জবরদস্তি নাই, কেবল অনুমতি দেওয়া মাত্র (Permissive—not coercive)। আইন বিধবাকে বলিতেছে—'ইচ্ছা হয়, বিবাহ কর; না হয়, না কর; কিন্তু যদি কর, তোমার সন্তান আইনমতে জারজ বলিয়া পরিগণিত হইবে না।' পক্ষান্তরে বহুবিবাহ নিষেধ করিতে গেলে জবরদস্তি করা হয়; এই জবরদস্তি করিতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ভরসা হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যে অনেকের ধারণা হইয়াছিল যে, বিধবাবিবাহের আইন সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। সুতরাং এরূপ আইন বিষয়ে ইংরাজের আতঙ্ক জন্মিয়াছিল। বিদ্যাসাগরের চেষ্টা বিফল হইল।

"কিন্তু একটি নূতন কাণ্ড দেখা গেল। বিধবাবিবাহসংক্রান্ত বাদানুবাদের সময়ে বিদ্যাসাগরের বয়স অনেক কম ছিল; কিন্তু তখন কুত্রাপি তিনি পরিহাস-রসিকতা প্রদর্শন করেন নাই। বহু-বিবাহের সময়ে প্রাচীন হইয়াও তিনি সেই রসিকতা বিস্তর প্রদর্শন করিয়াছেন। 'ব্রজবিলাস,' 'রত্ন-পরীক্ষা,' 'কস্যচিত ভাইপোস্য' এই সকল গ্রন্থে যে সকল হাসি-তামাসার অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা অতীব কৌতুকাবহ। এই রসিকতা সে কালের ঈশ্বর গুপ্ত বা গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্যের মত গ্রাম্যতাদোষে দূষিত নহে; ইহা ভদ্রলোকের, সুসভ্য সমাজেব যোগ্য; এবং পিতা পুত্রের একত্র উপভোগ্য। এরূপ উচ্চ অঙ্গেব রসিকতা বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্পই আছে, এবং ইহার গুণগ্রাহী পাঠকও বেশী নাই। যাঁহারা বিষয়ী লোক, তাঁহারা সংস্কৃতশাস্ত্রের কথা বড একটা বুঝেন না; সুতরাং তাঁহাবা বিদ্যাসাগরের এই রসিকতায় আমোদ পাইবেন না। আর ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ বিদায় আদায় লইয়া এত ব্যস্ত যে, শাস্ত্রীয় রসিকতায় আমোদ করিবাব সময়ই তাঁহাদিগেব নাই। সুতরাং এ দেশে এই সকল গ্রন্থ রচনা করা বিদ্যাসাগরের একপ্রকার কচুবনে মুক্তা ছড়ান হইয়াছে; যদি য়ুরোপে হইত, তাহা হইলে এ প্রকারের গ্রন্থ পাঠ করিয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা হাস্য-পরিহাসের তরঙ্গ বহিয়া যাইত, এবং বিদ্যাসাগরের নাম এক্ষণে বিদ্যাবত্তাব জন্য যে প্রকাব উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে, রসিকতার জন্যও তদ্রূপ উচ্চ স্থান অধিকার করিত, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, বিদ্যাসাগর এ দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া এই সমস্ত পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন; কারণ, তিনি বাঙ্গালা ভাষার বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন; কেহ পড়ুক আর না পড়ুক, আনন্দ করুক আর না করুক, বাঙ্গালা লিখিতে তাহার নিজের এত আমোদ বোধ হইত যে, সেই আনন্দে আকৃষ্ট হইয়াই তিনি লিখিয়া গিয়াছেন।

"বিদ্যাসাগরকে সকলেই দিগ্‌গজ পণ্ডিত বলিয়াই জানেন; কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সহিত মিশিতে পাইয়াছিলেন, তাঁহারা জানেন যে, তাঁহার কথাবার্ত্তায় হাসি-তামাসার কি একটি অদ্ভুত শক্তি ছিল। সে সকল রসিকতার কথা মনে করিয়া লিখিতে পারিলে বোধ হয়, বেশ একখানি গ্রন্থ হইতে পারে; কিন্তু সেরূপ শক্তি এখন কাহারও আছে কি না, বলিতে পারি না। আমার কিছু কিছু সময়ে সময়ে মনে পড়ে। বীটন কলেজ বরাবরই কোনও না কোনও কমিটীর শাসনাধীনে চলিয়া আসিয়াছে। এক সময়ে বিদ্যাসাগর সেক্রেটারী ছিলেন, তখন অনেক উচ্চপদস্থ 'সাহেব' কমিটীর মেম্বর ছিলেন। একটি ফিরিঙ্গী স্ত্রীলোক প্রধান শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। কি কারণে জানি না, একজন স্কুলের পণ্ডিতের উপর তাঁহার কিছু আক্রোশ জন্মিয়াছিল; তিনি তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার জন্য কমিটীকে অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগর সেক্রেটারী; তদন্ত করিবার ভার

তাঁহাকেই দেওয়া হইল। তিনি বিশেষ অনুসন্ধানের পর বুঝিলেন, পণ্ডিতের কোনও দোষই নাই। পরে এই বিষয়ের বিচারের জন্য একদিন কমিটীর বৈঠক হইল। সেই বৈঠকে বিদ্যাসাগর সকলকে পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, পণ্ডিতটি নিরপরাধ। কিন্তু কমিটীর মেম্বর অধিকাংশ য়ুরোপীয়; প্রধান শিক্ষয়িত্রী ফিরিঙ্গী; কমিটী ভাবিল, পণ্ডিতকে একেবারে নির্দ্দোষ বলিয়া ছাড়িয়া দিলে শিক্ষয়িত্রীর অপমান করা হয়; তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল. 'তবে না হয়, দু'এক মাসের জন্য পণ্ডিতকে suspend করা যাক্; কেমন, বিদ্যাসাগর, তুমি কি বল?' বিদ্যাসাগর গত্যন্তর না দেখিয়া কেবল এইমাত্র বলিলেন, Yes, do it, if you think some sacrifice is necessary to appease her. আচ্ছা,—তবে তাই কর, যদি তোমরা ভাব যে, কিছু বলিদান না করিলে দেবী সন্তুষ্ট হইবেন না। ইংরাজরা আর যাহাই হোক, প্রকৃত রসিকতা (Wit) পাইলে গুণগ্রহণ করিতে পারে। বিদ্যাসাগরের appease শুনিয়া সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পণ্ডিত বাঁচিয়া গেলেন। একবার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা গবর্ণমেণ্টের কাছে কোনও এক বিষয়ে দরখাস্ত করিয়া বিলক্ষণ অপমানিত হইয়াছিল; বিদ্যাসাগর তাঁহাদের বিষম বিমর্ষভাব দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—'ওহে, আজকে political world-এ যে বড়ই gloom দেখে এলুম।' এই gloom কথাটা তিনি এমন মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার শ্রোতৃবর্গ হাসিয়া উঠিল। বিদ্যাসাগর একবার তাঁহার কোনও এক বিশেষ আত্মীয় বন্ধুর বাটীতে গিয়াছিলেন; বন্ধুটি কিছু অধিক বয়সে দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ করিয়াছিলেন। আমিও সেখানে গিয়াছিলাম। বিদ্যাসাগর আসাতে তিনি বাহিরে আসিলেন বটে, কিন্তু অন্যমনস্কভাবে তাঁহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ এই প্রকার ভাবগতিক দেখিয়া বিদ্যাসাগর অবশেষে বলিয়া উঠিলেন, 'যাও, আর উস্‌খুস্ কোর্‌চ কেন? বাড়ীর ভেতরেই যাও।' এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। তাঁহার এই বন্ধুটি অবসর পাইলেই শ্বশুরবাড়ী যাইতেন; এবং তাঁহার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তিনিও প্রায় শ্বশুরবাড়ীতে থাকিতেন। বিদ্যাসাগর এক দিন একত্রে দু'জনের সাক্ষাৎ পাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—'হিমালয়ে হরঃ শেতে হরিঃ শেতে মহোদধৌ'।

পনের

১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০

আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "বিদ্যাসাগরের একটা চিরকালের অভ্যাস ছিল যে প্রায় ছোকরা দলের সকলকেই তিনি কখনও 'তুই' ছাড়া 'তুমি' বলিতে পারিতেন না। তিনি আমাকে যে 'তুই' বলিতেন তাহার যথেষ্ট কারণ ছিল। আমি যখন ৬।৭ বৎসর বয়সে কেবল আব্দার করিয়া আমার দাদার সঙ্গে কলেজে যাইতাম, প্রত্যহ তাঁহাদের ক্লাসের ঘরের এক পাশে সমস্ত দিন বেঞ্চের উপর গড়াগড়ি দিয়া বৈকালে তাঁহার সঙ্গে বাড়ী আসিতাম, তখন বিদ্যাসাগর এক দিন (তিনি তখন সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক ছিলেন) আমাকে লইয়া নিম্নতম শ্রেণীতে প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরের ঘরে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। সেই অবধি প্রায় আমার চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার কাছে যাতায়াত করিয়াছি, কখনও 'তুই' ব্যতীত 'তুমি' সম্বোধন পাই নাই। ইহা যে কখনও আমার মন্দ লাগিয়াছিল এমন কথা আমি বলি না ; আমি বরং ভাবিতাম যে, তিনি যেরূপ বয়োজ্যেষ্ঠ ও আমাকে যে স্নেহ করেন, 'তুই' সম্বোধন তাহারই পরিচায়ক মাত্র। কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিতাম যে ইহা সকলের ভাল লাগিত না। সংস্কৃত কলেজের একজন লাইব্রেরিয়ান ছিলেন ; তাঁহার নাম উমেশচন্দ্র গুপ্ত *। বিদ্যাচর্চ্চা সম্বন্ধে আমা অপেক্ষা তিনি অনেক junior ছিলেন ; এক দিন তিনি কথা প্রসঙ্গে বলিলেন, 'তুই বলিতে যতক্ষণ, তুমি বলিতেও ততক্ষণ ; তবে যে বিদ্যাসাগর মহাশয় যাহাকে তাহাকে তুই বলিয়া বসেন, তুমি বলিতে বড়ই বিমুখ, ইহার মানে বুঝা যায় না।' উমেশ গুপ্ত এই কথা বিরক্তির ভাবেই বলিয়াছিলেন। কিন্তু সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আমার এই বোধ হয় যে, এই অভ্যাসটি বিদ্যাসাগবের সারল্যগুণের পরাকাষ্ঠার পরিচায়ক মাত্র। ইংরাজিতে যাহাকে affectation বলে, বিদ্যাসাগরের সেটি আদৌ ছিল না ; যাহাকে যে ভাবে একবার দেখিয়াছেন, বাহ্যিক লোক দেখান বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া সেটা পরিবর্ত্তন করিতে তাঁহার যেন ভাল লাগিত না। তিনি আপনার মা'কে ছেলেবেলা হইতে যে 'তুই' সম্বোধন করিতেন, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাহার পরিবর্ত্তন করেন নাই। ইহা আমি তাঁহার নিজের মুখে শুনিয়াছি। বিধবা-বিবাহের গল্প করিতে বসিয়া একদিন তিনি বলিলেন,—যখন আমি বিধবাবিবাহের বৈধতা বিষয়ে আপনার মত স্থির করিয়া বসিয়াছি, তখন ভাবিলাম যে,

---

* কবিরাজ উমেশ চন্দ্র গুপ্ত কবিরত্ন "অষ্টবৈদ্যক" নামক গ্রন্থ টীকা করিয়া edit করেন, ও "রসেন্দ্র চিন্তামণি" "গৌরীকাঞ্চনিকাতন্ত্র" "কথাসরিৎসাগর" প্রভৃতি বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন।

মা'কে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি না, তিনি কি বলেন? আমাকে এ বিষয়ে বদ্ধপরিকর হইতে বলেন, কি মানা করেন? এই অভিপ্রায়ে এক দিন তাঁহার কাছে গিয়া বলিলাম, 'মা, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কোর্ব্ব (আমি মাকে চিরকালই 'তুই' বলে ডাকি ; ছেলেবেলার অভ্যাস কখনও ছাড়িনি) আমি ত বিধবা বিবাহ চালাব স্থির করেছি, এতে তোর মত কি? মা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, এটা যে শাস্ত্রের যথার্থ মত, তোর কি তা নিশ্চয় বোধ হয়েছে? আমি বলিলাম, হাঁ আমার তা নিশ্চয় বোধ হয়েছে। তখন তিনি বলিলেন, তবে তুই চালাগে যা, আমার তা'তে অমত নেই।'

"এখনকার দিনে আমি দেখিতেছি যে, পুত্র একটু বড় হইলে এবং রোজগারী হইলে, পিতা তাহাকে 'তুই' বলা দূরে থাকুক, পরোক্ষে 'তিনি' বলিয়া থাকেন! আমি অনেক পিতার মুখে এইরূপ শুনিয়াছি ; এবং আমার এটা যেন কেমন কেমন লাগে। কোনও কোনও পরিবারের মধ্যে এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় বটে যে, বাল্যকালেও পিতা পুত্রকে 'তুমি' বৈ 'তুই' বলেন না ; পুত্রও পিতাকে শৈশবাবস্থা হইতে 'আপনি' 'মহাশয়' বলিতে অভ্যাস করে। ইহার একটা মানেও আছে। সেই সকল পরিবারের কর্ত্তারা বিবেচনা করেন যে, সভ্যতার সমুদাচার (কথাবার্ত্তা আদবকায়দা ইত্যাদি) শিক্ষা করা বালকের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য, এবং খুব অল্প বয়সেই অভ্যাস করা ভাল।

"বিদ্যাসাগর যে সকল ছোকরাকেই 'তুই' বলিতেন, আমি এমন কথা বলিতে চাহি না। আমাব মনে হয় না যে তিনি আমার জ্যেষ্ঠ রামকমলকে 'তুমি' ছাড়া 'তুই' কখনও বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমার নিজের কথা আমি জানি ; রাজকুমার সর্ব্বাধিকারীর কথা জানি ; ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারীর কথাও জানি। কলিকাতায় একবার হোসেন খাঁ নামক বাজীকরের দিনকতক প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল; সূর্য্যবাবু তাহার দু'চারিটা ভেল্কি দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া এক দিন বিদ্যাসাগরের কাছে গল্প করিতেছিলেন। বিদ্যাসাগর বলিলেন, 'আরে আমি তোর কথা শুনিনে। তোকে আমি জানি, তুই কতকটা আহ্লাদে। আমি আমার হাতে আংটি মুঠো করে ধরে থাকি ; যদি আমার হাত থেকে হোসেন খাঁ আংটি উড়িয়ে দিতে পারে, তা হোলে বুঝব যে, তার অলৌকিক ক্ষমতা আছে।' শ্রীমান্ নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় যখন কাশ্মীরের দেওয়ানী করিয়া মাসে সাড়ে তিন হাজার টাকা বেতন ভোগ করিয়া ফিরিয়া আসেন, তখনও বিদ্যাসাগরের কাছে সেই সাবেক 'তুই' সম্বোধন পাইলেন, ভুলেও একবার 'তুমি' নহে। কিন্তু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, প্রসন্নকুমার রায় (মেট্রোপলিটান কলেজের প্রথম হেডমাষ্টার) ইঁহাদের কাহাকেও কখনও তিনি 'তুই' বলেন নাই। অথচ প্রসন্নবাবুর দুই এক

বৎসরের ছোট তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা সূর্য্যবাবুকে তিনি 'তুই' বলিতেন। এই বিষয়ে তিনি যে কি পার্থক্যের নিয়ম ধরিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা ত আমি বুঝিতে পারি না। ইদানীন্তন বালকদিগের মধ্যে তাঁহার অপরিচিত একটি এম. এ. চাকরীর প্রার্থনায় তাঁহার নিকট গিয়াছিল। ছোকরাটি থিয়সফিষ্ট; লম্বা চুল রাখিয়াছিল। বিদ্যাসাগর তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, 'আরে তোকে মাষ্টারি কর্ম্ম দোবো কি! তুই মেয়েমানুষ কি পুরুষমানুষ আগে বিবেচনা করে বুঝি।' এরূপ অপরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেও তিনি কাহাকেও বা 'তুমি' কাহাকেও বা 'তুই' বলিতেন।

"শেষাশেষি বিদ্যাসাগর কতকটা misanthrope নরজাতিদ্বেষী হইয়াছিলেন। বিস্তর লোকের ব্যবহার তাঁহার প্রতি এরূপ কদর্য্য হইয়াছিল যে অনেক সহ্য করিয়া শেষটা তিনি অসংযতবাক্ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, অধিকাংশ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এরূপ অসার যে, অর্থলোভে তাহারা না পারে এমন কাজ নাই। আবার ইংরাজি শিক্ষিতাভিমানীকেও তিনি যেন ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। কোনও বিধবাবিবাহদ্বেষী তার্কিক তর্কস্থলে এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন যে, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির সংখ্যা অনেক বেশী, যদি বিধবাদিগের বিবাহ দেওয়া হয় তাহা হইলে অনেক অপরিণীতা কুমারীর বিবাহ হওয়া ভার হইবে; সেটা কি মঙ্গলকর? এই আপত্তির কথা উত্থাপন করিয়া তিনি এক দিন বলিলেন,—'ছেলেপুলেকে আর যা করি আর না করি, ইংরাজি ত কখনও শেখাবো না; অসার ও ডেঁপো হবার এমন পথ আর নাই।'

"এইরূপ মনের ভাব লইয়া তিনি শেষাশেষি সভ্যজাতি ও সভ্যতাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ অসভ্যজাতিদিগের সরলতা ও অকপটতার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। কর্ম্মটাড়ে বাস করিয়া তিনি সাঁওতাল জাতির বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, এবং সর্ব্বদাই তাহাদের সরলতার প্রশংসা করিতেন। একটা গল্প তাঁহার মুখে প্রায়ই শুনা যাইত। একবার একজন চতুর বাঙ্গালী সাঁওতাল পরগণায় কিছু জমি খরিদ করিয়া কাছাকাছি পাঁচজনের জমি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তদুপলক্ষে সীমাসহরদ্দ লইয়া এক মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। বাঙ্গালীটি অনেক প্রলোভন দেখাইয়া একজন বৃদ্ধ সাঁওতালকে আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য দাঁড় করাইল; তাহাকে শিখাইয়া রাখিল যে, সে বলিবে যে অমুক শিমুল গাছ হইতে সীমানার আরম্ভ। সাঁওতাল রাজী হইল। মোকদ্দমার সময়ে যখন হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সাঁওতাল প্রথমে মিথ্যা কথা বলিল—অমুক শিমুল গাছটা বটে; পরক্ষণেই আসল কথাটি আর চাপিয়া রাখিতে পারিল না; আপনা হইতে বলিয়া উঠিল, কিন্তু ঐ গাছটি বটে, বলিয়া

আর একটি গাছ দেখাইয়া দিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই গল্পটি করিতেন আর হাসিতেন; বলিতেন, 'দেখ, ইহারা এখনও কেমন সাদসিধে আছে; সত্যটা কোনও রকমেই গোপন রাখিতে পারে না।'

"আমার এই পুরাতন প্রসঙ্গের মধ্যে বিদ্যাসাগর কতখানি স্থান অধিকার করিয়া আছেন, তাহা বোধ হয় বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছ; কিন্তু যখন তিনি তাঁহার মেছোবাজার স্ট্রীটের ছোট একতালা বাসাবাড়ীর একটি কক্ষে বসিয়া তাঁহার স্মৃতিকথা শুনাইতেন, তখন আমার অন্তরে যে পুলক সঞ্চারিত হইত, তাহার ক্ষীণ আভাসটুকুও বোধ হয় তোমরা এখন উপলব্ধি করিতে পারিবে না। তখন আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হইয়াছি; বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছেন; আসবাববিহীন ক্ষুদ্র কক্ষটিতে কেদারায় হেলান দিয়া একখানি বহি হাতে করিয়া বিদ্যাসাগর নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতেছেন; কলেজ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম; বলিলাম, 'শম্ভুনাথ পণ্ডিত তাঁহার বাড়ীতে এক ডিনার-পার্টিতে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন; কিন্তু আমার ত তাঁহার সঙ্গে আলাপ নাই, সেখানে আমি যাই কি করিয়া?' বিদ্যাসাগর বলিলেন, 'তাই ত; এটা বেশ বিবেচনার কাজ হয় নি।' আমিও আর নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে গেলাম না। এম্নিতর কত ছোট বড় কথা লইয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইতাম। তাম্রকূট সেবন করিতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন; সটকা নল লাগাইয়া নহে, হুঁকা চব্বিশ ঘণ্টাই তাঁহার হাতে থাকিত। তিনি নস্যও লইতেন; তারানাথ তর্কবাচস্পতি কিন্তু নস্য কিংবা তামাক কিছুই সেবন করিতেন না।

"বিদ্যাসাগর নিজের ছাত্রাবস্থায় কত গল্পই করিতেন। যখন তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন, তখন সাহিত্যের অধ্যাপনাকার্য্য জয়গোপাল তর্কালঙ্কার নির্ব্বাহ করিতেন। ইনি অতি সুরসিক, সুলেখক, ভাবগ্রাহী ও সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন বটে, কিন্তু পড়া শুনা বড় একটা তাঁহার কাছে কিছু হইত না। শ্লোকটা আবৃত্তি করিলেন; ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু অর্দ্ধেক ব্যাখ্যা হইতে না হইতেই তাঁহার 'ভাব লাগিয়া' গেল, গলার স্বর গদগদ হইয়া উঠিল, 'আহা, হা, দেখ দেখি, কেমন লিখেছে।' এই বলিয়া তিনি কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার গণ্ডস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া গেল; সেদিনকার মত পড়া এই স্থানেই সমাপ্ত হইল। কিন্তু সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে তাঁহার একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল; আমার বোধ হয়, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের পর প্রকৃত কবিতা পদবাচ্য সংস্কৃত শ্লোকরচনা এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের দুইটি কবিতা আমার মুখস্থ আছে। বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া তিনি লিখিতেছেন,—

ত্বৎকীর্ত্তিচন্দ্রমুদিতং গগনে নিশাম্য
রোহিণ্যপি স্বপতিসংশয়জাতশঙ্কা।
শ্রীকীর্ত্তিচন্দ্রনৃপ কজ্জললাঞ্ছনেন
প্রেয়াংসমঙ্কয়দসৌ ন বিধৌ কলঙ্কঃ ॥

হে কীর্ত্তিচন্দ্র মহারাজ। তোমার কীর্ত্তি চন্দ্রের ন্যায় আকাশে উদিত হইয়াছে; ইহা দেখিয়া চন্দ্রের পতিব্রতা পত্নী রোহিণীরও মনে শঙ্কা হইল যে, পাছে তাঁহার স্বামীকে তিনি চিনিতে না পারেন; এই ভাবিয়া তিনি আপনার স্বামীর গায়ে একটি দাগ দিলেন, তাহাই আমরা চন্দ্রের কলঙ্ক বলিয়া থাকি।

"দ্বিতীয় শ্লোকটি রচিত হয়, যখন মেকলে প্রভৃতি যুরোপীয়েরা সংস্কৃত কলেজ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কলেজের মুরুব্বি হরেস্ হেম্যান উইলসন তৎকালে বিলাতে অবস্থান করিতেছিলেন; তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কবিতাটি রচিত হইয়াছিল,—

অস্মিন্ সংস্কৃতপাঠসদ্মসরসি ত্বৎস্থাপিতা যে সুধী-
হংসাঃ কালবশেন পক্ষরহিতা দূরং গতে তে ত্বয়ি।
তত্তীরে নিবসন্তি সংপ্রতি পুনর্ব্যাধাস্তদুচ্ছিত্তয়ে
তেভ্যস্তান্ যদি পাসি পালক তদা কীর্ত্তিশ্চিরং স্থাস্যতি ॥

এই সংস্কৃত পাঠশালাটি একটি সরোবর তুল্য; ইহাতে যে সকল বিদ্বান্ লোককে আপনি অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া আশ্রয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা হংসের তুল্য। এক্ষণে সেই সরোবরের নিকটে কয়েকজন ব্যাধ আসিয়া সেই হংসবংশ ধ্বংশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। সেই ব্যাধের হস্ত হইতে আপনি যদি তাহাদিগকে পরিত্রাণ করেন, তবেই আপনার কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হইবে।

"সুকবি জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কাশীরামদাসের মহাভারত edit করিয়া কিন্তু অখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

"অধ্যাপনার সময় জয়গোপালের যে ভাবোচ্ছ্বাসের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাঁহার ছাত্র প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশকেও আমি সময়ে সময়ে তদবস্থ দেখিয়াছি। তিনি কুমারসম্ভবে যখন পড়িতেন—

ত্রিভাগশেষাসু নিশাসু চ ক্ষণং
নিমীল্য নেত্রে সহসা ব্যবুধ্যত।
ক্ব নীলকণ্ঠ ব্রজসীত্যলক্ষ্যবাক্
অসত্যকণ্ঠার্পিতবাহুবন্ধনা ॥[১]

---

[১] 'রাত্রির তিনভাগের একভাগ মাত্র অবশিষ্ট আছে এমন সময়ে পার্বতী, ক্ষণকালমাত্র নয়নযুগল

তখনই আহা, হা, করিয়া উঠিতেন, তাঁহার ভাব লাগিয়া যাইত, আমাদেরও সেদিনকার মত পাঠ বন্ধ হইত।

"ঐ ভাবটি আমিও যে উত্তরাধিকারসূত্রে আমার শিক্ষাগুরু প্রেমচাঁদের নিকট হইতে পাই নাই, এমন কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না। বায়রণের 'চাইল্ড্ হ্যারল্ড' পড়িতে পড়িতে অনেক সময়ে এমন ভাবোন্মত্ত হইতাম যে, আহা, হা, করিয়া বইখানি বন্ধ করিতে হইত।

"বিদ্যাসাগর বরাবরই চেয়ারে বসিতেন; কখনও ফরাসে বিছানায় বসিতে তাঁহাকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার মেছোবাজারের সেই ছোট বাড়ীটিতে ত ফরাসের ব্যবস্থা ছিল না; কিন্তু সুকিয়া স্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায় সুন্দর ফরাসের বিছানা ছিল; বিদ্যাসাগর কখনও সেখানে বসিয়া গল্প করিতেন না; সন্নিকটবর্ত্তী একখানি চেয়ারে হেলান দিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন, আমরা বিছানায় উপবেশন করিতাম। বিদ্যাসাগরের সহিত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব বহুকালস্থায়ী। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈত্রিক বাড়ি বৌবাজারে ছিল; তাহারই সন্নিকটে বিদ্যাসাগর বাসা করিয়াছিলেন; ক্রমে বিদ্যাসাগর নিজের বাসা পরিত্যাগ করিয়া রাজকৃষ্ণের বাড়িতে থাকিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার নিজের বাসায় কিন্তু তাঁহারই আত্মীয় দশ-বার জন লোক সদাসর্ব্বদা থাকিত; তিনি তাহাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যয়ভার বরাবর বহন করিতেন। পরে বিদ্যাসাগর যখন মেছোবাজারে বাসা করিলেন, তখনও বৌবাজারে তাঁহার এই বাসা ছিল; তাঁহার গ্রামের লোক আসা যাওয়া করিত, এবং সেইখানেই থাকিত। যখন তিনি সুকিয়া স্ট্রীটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তখনও বৌবাজারের বাসা ছিল।

"বিদ্যাসাগরের চটিজুতার কথা শুনিয়াছ, তিনি চটিজুতা ব্যতীত আর কিছু পায়ে দিতেন না; তাঁহাকে কখনও খড়ম পায়ে দিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না; কখনও কখনও তিনি সখ করিয়া তালতলার চটি বিলাতি বার্ণিশের মত ঝক্‌ঝকে কালো করিয়া বুরুষ করাইয়া লইতেন; এই চটিজুতা পায়ে দিয়া তিনি খুব হাঁটিতে পারিতেন।

"দেখ, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী আমাকে বলিয়াছিলেন যে, বেশী দূর হাঁটিতে হইলে চটিজুতা পরাই ভাল, পায়ের গোড়ালিতে ফোস্কা পড়ে না। আমি কিন্তু তাহা পারিতাম না। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হইয়া আমি একবার গ্রীষ্মাবকাশে পদব্রজে হাবড়া হইতে খানাকুল কৃষ্ণনগরে প্রসন্নবাবুর বাড়িতে গিয়াছিলাম। শুধু

মুদ্রিত করিয়া, কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া, 'হে নীলকণ্ঠ! তুমি কোথায় চলিয়াছ?' এইরূপ বাক্য বলিয়া কাহারও কণ্ঠালিঙ্গন করিতেছেন এইরূপ ভাণ করিয়া হঠাৎ জাগরিত হইতেন।' (৫।৫৭)—(হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য কৃত অনুবাদ)—সং

পায়ে পনের ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়াছিলাম, চটিজুতা হাতে ছিল! সেখানকার জল হাওয়া তখন খুব ভাল ছিল। সেবার বন্যায় নিকটবর্ত্তী তিন চারিটা গ্রাম ডুবিয়া গিয়াছিল, আমার অসংযত, উদ্দাম প্রবৃত্তি আমাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। নিশীথে যখন গ্রাম সুপ্ত, প্রসন্নবাবুর কোনও সাড়াশব্দ নাই, আমি নিঃশব্দে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া নদী অভিমুখে চলিলাম; নদীর কুল কিনারা দেখা যায় না। সেই জলরাশির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য মন আকুল। জলের ভিতর দিয়া খানিকদূর অগ্রসর হইয়া এক বৃহৎ বটগাছের উপর উঠিলাম। নীচে চাহিয়া দেখি, গ্রামের কয়েকজন লোক আমাকে অনুসরণ করিয়া সেখানে আসিয়াছে; তাহারা আমাকে তদবস্থ দেখিয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে বারম্বার অনুনয় করিল; তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিলাম না; বৃক্ষশাখা হইতে জলরাশির মধ্যে লাফাইয়া পড়িলাম। এপার ওপার সন্তরণ করিয়া আমার ক্লান্তিবোধ হইল না। বিদ্যাসাগরের দামোদর নদীবক্ষে সন্তরণের কথায় বিস্ময়ের কিছু আছে কি?

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Act-এতেই বিদ্যাসাগরের নাম আছে, কিন্তু তিনি যে কখনও সেনেটের কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন তাহা ত আমার স্মরণ হয় না। অবশ্যই ১৮৭২ সালের পূর্ব্বের কথা আমি ঠিক জানি না, ঐ বৎসর হইতে আমি সেনেটের মেম্বর হইয়া আসিতেছি। ধুতি ও চটিজুতা ব্যতীত আর কিছু পরিধান করিতেন না বলিয়া যে তিনি সেনেটে যাইতেন না, এমন আমার মনে হয় না।

"বিদ্যাসাগর নাস্তিক ছিলেন, এ কথা বোধ হয় তোমরা জান না; যাহারা জানিতেন, তাঁহারা কিন্তু সে বিষয় লইয়া তাঁহার সঙ্গে কখনও বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না; কেবল রাজা রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের দৌহিত্র ললিত চাটুয্যের সহিত তিনি পরকালতত্ত্ব লইয়া হাস্য পরিহাস করিতেন; ললিত সে সময়ে যেন কতকটা যোগসাধনপথে অগ্রসর হইয়াছেন এইরূপ লোকে বলাবলি করিত। বিদ্যাসাগর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'হাঁ রে, ললিত, আমারও পরকাল আছে না কি?' ললিত উত্তর দিতেন, 'আছে বৈ কি! আপনার এত দান, এত দয়া, আপনার পরকাল থাকিবে না ত থাকিবে কা'র?' বিদ্যাসাগর হাসিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমাদের দেশে যখন ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্ত্তন আরম্ভ হয়, তখন আমাদের সমাজের অনেকের ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া গিয়াছিল; যে সকল বিদেশীয় পণ্ডিত বাঙ্গালাদেশে শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহাদেরও অনেকের নিজ নিজ ধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল না। ডেভিড হেয়ার নাস্তিক ছিলেন, এ কথা তিনি কখনও গোপন করেন নাই; ডিরোজিও ফরাসি রাষ্ট্রবিপ্লবের সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতার

ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া ভগবানকে সরাইয়া দিয়া Reason-এর পূজা করিতেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ভাব বন্যায় এ দেশীয় ছাত্রের ধর্ম্মবিশ্বাস টলিল; চিরকালপোষিত হিন্দুর ভগবান সেই বন্যায় ভাসিয়া গেলেন; বিদ্যাসাগরও নাস্তিক হইলেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

"আমার এই পূর্ব্বস্মৃতিবিবৃতি করিতে বসিয়া যাহাদের কথা তোমাকে বলিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন নাস্তিক ছিলেন। আমার জ্যেষ্ঠ রামকমল, কবি বিহারিলাল, জজ দ্বারকানাথ। আমার দাদা সংস্কৃত ন্যায়শাস্ত্রে ও ইংরাজী দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন; 'কুসুমাঞ্জলি' ও হবস্, দুইই তাঁহার আয়ত্ত ছিল। 'কুসুমাঞ্জলি'র এত খ্যাতি ছিল যে, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ কাউয়েল 'সাহেব' গ্রন্থখানিকে ইংরাজিতে অনুবাদ করেন; গ্রন্থকার উদয়নাচার্য্য সম্বন্ধে 'সাহেব' তাঁহার পুস্তকের মুখবন্ধে লিখিয়াছেন, Udayana-charya is a fixed star of which neither the distance nor the dimensions can be ascertained, তিনি কোন্ দেশে কোন্ সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কাহার কাছে অধ্যয়ন করিলেন, ইত্যাদি কিছুই জানা যায় না। সেই গ্রন্থের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বপ্রতিপাদক syllogism,—ক্ষিত্যাদিকং সকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বাৎ অর্থাৎ the five elements earth, water, etc. must have had some author or creator, because they are the result of some activity (কার্য্য) like all artificial objects। এই সৃষ্টিতত্ত্বে বিদ্যাসাগর প্রভৃতি কয়েকজন মনীষী তৃপ্ত হইতে পারিলেন না।

"আমি Positivist; আমি নাস্তিক। যে কথা লইয়া এই পুরাতন প্রসঙ্গ বিবৃতির সূত্রপাত হয়, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই কথাটি আজ এতদিন পরে মনে পড়িতেছে,—'কৃষ্ণকমল is no যে সে লোক; he can write and he can fight, and he can slight all things divine.'[১]"

[১] ১১ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

পরিশিষ্ট

আলোচনা

আজ পণ্ডিত মহাশয়কে বলিলাম, "আমার গোটা দুই কথা নিবেদন করিবার আছে, অনুগ্রহ করিয়া শ্রবণ করুন।

"প্রথম কথা,—'নিষ্ক' শব্দের কনিষ্ক হইতে উৎপত্তি * সন্দেহ জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে এই গাথাটি আমাকে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন—

'দেশাদ্দেশাৎ সমোঢ়ানাঃ সর্ব্বাসামাঢ্যদুহিতৄণাং
দশাদদাৎ সহস্রাণ্যাত্রেয়ো নিষ্ককণ্ঠ্যঃ॥' (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ)।

আমাদের কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি অধিকারী নিম্নলিখিত শ্লোকটি মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন—

'শতং দাসীসহস্রাণি কৌন্তেয়স্য মহাত্মনঃ।
কম্বুকেয়ূরধারিণ্যো নিষ্ককণ্ঠ্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ॥'

(মহাভারত। বনপর্ব্ব, ২৩২।৪৬)

"দ্বিতীয় কথা, যুধিষ্ঠিরাব্দ সম্বন্ধে আলোচনাটা যেরূপ দাঁড়াইল তাহা আপনাকে শুনাইতে চাহি। সে দিন রামেন্দ্রবাবুর মত আপনাকে শুনাইয়াছি। আপনার বক্তব্যটুকুও রামেন্দ্রবাবুকে শুনাইয়াছি; তাঁহার শেষ বক্তব্যও লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছি। এখন কি দাঁড়াইল শুনুন।

"রামেন্দ্রবাবু বলেন, যুধিষ্ঠিরাব্দ সম্বন্ধে তিন রকম tradition আছে। (১) বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতের,—পরীক্ষিতের জন্ম ও নন্দাভিষেকের মধ্যে এক হাজার বৎসরের কিছু অধিক ব্যবধান; এই হিসাবের ফলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ প্রায় খৃঃ পূঃ দেড় হাজার বৎসর দাঁড়ায় (round numbers দেওয়া গেল, দু'শ' এক'শ বৎসর ধর্ত্তব্য নহে)। (২) শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের সঙ্গে কলির আবির্ভাব। এই হিসাবে যুধিষ্ঠিরের সময় খৃঃ পূঃ তিন হাজার বৎসরের কিছু বেশী দাঁড়ায় (কলি ৫০০০ বৎসরের কিছু উপর, এখন খৃষ্টাব্দ ১৯১১, বাদ আন্দাজ ৩১০০)। (৩) কলির আরম্ভের আন্দাজ পাঁচ ছয় শত বৎসর পরে। বোধ হয় এইটি বরাহমিহিরের theory, বৃহৎসংহিতায় দেখিয়াছি। তাহা হইলে খৃঃ পূঃ ২৫০০ বৎসর দাঁড়ায়।

---

* ৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

"বেদের ব্রাহ্মণের মধ্যে কৃত্তিকাকে নক্ষত্রচক্রের প্রথম নক্ষত্র বলিয়া গণনা করা হইত। তাহার একমাত্র অর্থ এই যে, সেই সময়ে কিম্বা তাহার কিছু দিন পূর্ব্বে, সূর্য্য কৃত্তিকা নক্ষত্রে উপস্থিত হইলে Vernal Equinox মহাবিষুব সংক্রান্তি হইত, এবং সেই সময়ে বৎসরারম্ভ হইত। আজকাল পঞ্জিকায় অশ্বিনী নক্ষত্র নক্ষত্রচক্রের প্রথম নক্ষত্র বলিয়া গৃহীত হয়, এবং সূর্য্য অশ্বিনী নক্ষত্রে উপস্থিত হইলে বৎসরারম্ভ হয়। পঞ্জিকা ১লা বৈশাখের পূর্ব্বদিন মহাবিষুব সংক্রান্তি লিখে, কিন্তু আজকাল বিষুবসংক্রমণ তাহার ২১ দিন পূর্ব্বে, ৯ই চৈত্র হয়। ঐ বিষুব-সংক্রমণের দিনই দিবারাত্রি সমান হইয়া থাকে। পঞ্জিকাগণনার বর্ত্তমান পদ্ধতি প্রায় পনের শত বৎসর পূর্ব্বে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেই সময়ে চৈত্র মাসের শেষ তারিখে বিষুবসংক্রমণ হইত, এবং ১লা বৈশাখ বৎসরারম্ভের এবং অশ্বিনীকে নক্ষত্রচক্রের প্রথম নক্ষত্র গ্রহণের সার্থকতা ছিল। প্রায় বায়াত্তর বৎসরে বিষুব-সংক্রমণ একদিন করিয়া পিছাইয়া আইসে। এইরূপে দেড় হাজার বৎসরের মধ্যে ২১ দিন পিছাইয়া আসিয়াছে। পঞ্জিকার যদি আর সংশোধন করা না হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে শীতকালে দিন রাত্রি সমান হইবে।

"এখন বেদের ব্রাহ্মণ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বৈদিক কালে সূর্য্য কৃত্তিকানক্ষত্রে উপস্থিত হইলে বিষুবসংক্রমণ এবং বৎসরাম্ভ হইত। নক্ষত্রচক্রের এক এক নক্ষত্র তের ডিগ্রির কিছু অধিক স্থান ব্যাপিয়া আছে। সেই নক্ষত্রের আদি, মধ্য, অন্ত, কোন্ খানে বিষুবসংক্রমণ ঘটিত তাহা না জানিলে সুক্ষ্মরূপ কালনির্দ্দেশ চলিতে পারে না। কেন না বিষুবসংক্রমণ এই সমস্ত স্থানটা পার হইতে প্রায় হাজার বৎসর লাগে। শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক তাঁহার Orion নামক গ্রন্থে এ বিষয়ের সম্যক আলোচনা করিয়াছেন। মন্ত্রযুগের শেষ এবং ব্রাহ্মণযুগের আরম্ভ খ্রীষ্টের ২৫০০ বৎসর অথবা আরও কিছু পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। তিনি এই মতেরই পক্ষপাতী।

"যুধিষ্ঠিরের প্রপিতামহ শান্তনুর ভ্রাতা দেবাপি রাজ্যগ্রহণ না করিয়া বনে যাওয়ায় শান্তনু রাজ্যপ্রাপ্ত হয়েন। ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলে একটি সূক্তের ঋষি দেবাপি। ঐ সূক্তে শান্তনুর নাম আছে। বেদের শন্তনু মহাভারতের শান্তনু। শান্তনুর রাজত্বকালে অনাবৃষ্টি ঘটায় দেবাপি আসিয়া অনাবৃষ্টি নিবারণের জন্য যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। ঐ সূক্ত সেই উপলক্ষে দেবাপিকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিল। বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে এই উপাখ্যান আছে। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, যুধিষ্ঠির বেদের মন্ত্রযুগের শেষকালে বর্ত্তমান ছিলেন।

"অন্যদিক হইতেও এই অনুমান সমর্থিত হয়। বশিষ্ঠ, তাঁহার পুত্র শক্তি,

এবং পৌত্র পরাশর, ঋগ্বেদসংহিতার বহু মন্ত্রের ঋষি। পরাশরের পুত্র কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিয়া সেরূপ প্রসিদ্ধ নহেন, কিন্তু তিনি বেদের সঙ্কলন ও বিভাগদ্বারা বেদব্যাস আখ্যা পাইয়াছিলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে যুধিষ্ঠিরের সমকালবর্ত্তী এবং মহাভারতের রচনাকর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করিলে যুধিষ্ঠিরকে মন্ত্রযুগের শেষভাগে আবির্ভূত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। তাহা হইলে উল্লিখিত গণনানুসারে খৃঃ পূঃ ২৫০০ বা তাহার কিছু পূর্ব্বকালকে যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাবকাল বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

"বৈদিকযুগের কৃত্তিকা নক্ষত্র ঠিক পূর্ব্বদিকে উদিত হইত এরূপ প্রমাণ বেদের মধ্যেই আছে। বিষুবসংক্রমণের কাল ক্রমশঃ সরিয়া যাওয়ায় কৃত্তিকা এখন ঠিক পূর্ব্বে উদিত না হইয়া একটু উত্তর-পূর্ব্বে উদিত হয়। এই উদয়স্থান কতটুকু সরিয়া গিয়াছে তাহা দেখিয়াও বেদের কালনিরূপণের কতকটা সাহায্য হয়। এতদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত অনুমানই অনেকটা সমর্থিত হয়।

"তাহারপর 'আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ' এই উক্তি সম্বন্ধে রামেন্দ্রবাবু বলেন, 'কৃষ্ণকমলবাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা ঠিক। মঘা ও সপ্তর্ষি Fixed Stars তাহাদের relative positions বদলায় না। এই জন্য আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ কথাটার কোন সঙ্গত অর্থ হয় না। তদ্ব্যতীত ঐ বচনের সঙ্গে যে ধরা হয় যে মুনিগণ এক এক নক্ষত্রে একশত বৎসর করিয়া থাকেন, ইহারও কোনও সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় না। যুধিষ্ঠিরের সময় মুনিগণ মঘানক্ষত্রে ছিলেন; তাহার পর ক্রমশঃ একশ' বৎসরে এক এক নক্ষত্র সরিয়া গিয়া এখন অন্যত্র উপস্থিত হইয়াছেন, এই জ্যোতিষ-বাক্য অনুসারে যুধিষ্ঠিরের কালগণনার চেষ্টা নিষ্ফল; কেন না, ঐ জ্যোতিষবাক্যের কোনও সঙ্গত অর্থই পাওয়া যায় না। তবে আমি একটা মানে দিতে পারি। আমার ব্যাখ্যা এই:—

The Ecliptic is a fixed circle in the celestial sphere, and it makes the plane of the earth's orbit round the sun. Its axis passes through a fixed point on the celestial sphere which is called the Pole of the Ecliptic. The earth's equator does not lie in the plane of the ecliptic, but is inclined to it by about twenty three and a half degrees; so the earth's axis of rotation, instead of passing through the Pole of the Ecliptic, passes through another point in the celestial sphere which is twenty three and a half degrees distant from the Pole of the Ecliptic. This latter point is called the Pole of the Equator. This point however, is not fixed. It revolves round the fixed Pole of the Ecliptic once in about 26,000 years. What is called the Precession of the Equinox is a consequence

of this motion of revolution of one Pole round the other. The solstitial colure is a line joining the two poles, one of which is thus fixed and the other moving. This line, therefore, makes a similar revolution round the fixed pole of the Ecliptic ; and the end of the line where it cuts the Ecliptic moves along the Ecliptic once in 26,000 years.

The lunar asterisms, which are twenty seven in number, are star-groups roughly distributed along the Ecliptic ; and as the solstitial colure revolves, it passes from asterism to asterism, crossing each asterism in 26,000/27 or roughly 1000 years. At present the colure passes through the asterism *Ardra* ; but between 2500 B. C. and 1500 B. C. it passed through the asterism *Magha.*

Now if a line be drawn from the Pole of the Ecliptic to a point in the asterism *Magha*, this line will be found to pass through the constellation Great Bear. which is the same as the constellation of seven *Rishis* ; and if we will call this the *Rishi* line, it will be readily seen that this *Rishi* line was very close to, and at times almost identical with the solstitial colure between the years 2500 B. C. and 1500 B. C. During the period the colure passed through the *Rishis* and through the asterism *Magha* as well. The only rational interpretation that can be given to the text আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ যুধিষ্ঠিরে শাসতি পৃথ্বীং is that when Judisthira lived, the solstitial colure passed through the constellation of *Rishis* and the asterism *Magha.* In that case Judisthira lived sometime between 2500 B. C. and and 1500 B. C.

"The *Rishis* form a fixed group of stars in the heavens, and they can have no motion relative either to the Pole of the Ecliptic or to the lunar asterisms which are also fixed. It is the line of the colure and not the *Rishi* line that moves across the asterisms. But the two lines were coincident in some past epoch ; and by a confusion of thought what was really a motion of the colure was taken to be a motion of the *Rishis* themselves. Even so the duration of motion through an asterism would be about a thousand years, and not a hundred years only, as is assumed in the Sanskrit astronomical texts.

অর্থাৎ এক হাজারে কোনও রূপে শূন্য ভুল হইয়া একশতে দাঁড়াইয়াছে, এইরূপ মনে করিতে হয়। মুনিগণ অর্থাৎ সপ্তর্ষি নক্ষত্রচক্রে ভ্রমণ করেন, এবং যুধিষ্ঠিরের সময় তাঁহারা মঘা নক্ষত্রে ছিলেন; এখন সরিয়া অন্য নক্ষত্রে আসিয়াছেন, এই যে প্রচলিত জ্যোতিষ বচন, ইহার অন্য কোনও রূপ সঙ্গত অর্থ পাওয়া যায় না।"

নাকে খৎ

ইহা কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা। ইহার ইতিহাস সম্বন্ধে আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন :—

হাইকোর্টের উকিলদিগের প্রতি বৎসর আদালতে পঞ্চাশ টাকা জমা দিতে হয়। আমি একবার ভুলক্রমে পঞ্চাশ টাকার পরিবর্ত্তে একখানা পাঁচশত টাকার নোট জমা দিবার জন্য উমাকালীর (উমাকালী মুখোপাধ্যায়) হস্তে দিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস আমি পঞ্চাশ টাকাই দিয়াছি। উমাকালী খুব সাকুব লোক, সে তৎক্ষণাৎ আমার ভুল বুঝিতে পারিয়া, আমাকে কিছু না বলিয়া, সেই নোটখানি লইয়া হেমবাবুর নিকটে যায়। হেমবাবু এই ব্যাপারটি অবলম্বন করিয়া একখানি নাটক রচনা করিয়া ফেলেন। এই নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে একটু টীকা বোধ হয় আবশ্যক।

কষ্টকল্প বিদ্যেনিধি ওরফে মিষ্ট অমল বিদ্যাম্বুধি।	আমি
ধনুদ্ধর ওরফে 'গুণেন্দর' ...	যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
অগ্নিভট্ট ওরফে 'ধুম্‌খালি' ...	উমাকালী
চাঁদকবি ...	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
রত্নসভা ...	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কাব্যোক্ত পাত্র

পুরুষ

কষ্টকল্প বিদ্যেনিধি [বন্ধুসমাজে, মিষ্ট অমল বিদ্যাম্বুধি নামে পরিচিত]	একজন নানাশাস্ত্রবিশারদ বহুভাষাজ্ঞ-পণ্ডিত, কিন্তু বিষয়বুদ্ধি প্রায় নাই। সম্প্রতি রত্নসভা* ইঁহাকে অনেক টাকার বৃত্তি দিয়া অধ্যাপকত্বে বরণ করিয়াছেন।
ধনঞ্জয় [বন্ধু সমাজে "গুণেন্দর"]	একজন ব্যবসাদার বড় মানুষ ; বিদ্যেনিধির বন্ধু।
অগ্নিভট্ট [বন্ধুসমাজে "ধূম্‌খালি"]	উকীল, বিদ্যেনিধির ছাত্র, পূর্ব্বোক্ত উভয়ের বন্ধু।
চাঁদকবি	একজন কিম্ভূতকিমাকার কবি। পূর্ব্বোক্ত সকলের বন্ধু।
বাপ্‌পা পাঁড়ে	বিদ্যেনিধির দ্বারবান।

স্ত্রী

রাঙা বৌ	বিদ্যেনিধির বর্ষীয়সী গৃহিণী ; স্বভাব কিছু অধিক ঋজু।
সতিন্ বৌ	বিদ্যেনিধির যুবতী স্ত্রী।
মোক্ষদা	রাঙাবৌএর দাসী।
গুঞ্জ	সতিন্‌বৌএর দাসী।
সর্ব্বরী সন্ধ্যাবালা	রাঙাবৌএর কন্যাদ্বয়।

* "রত্নসভা" নানা জাতীয় পণ্ডিতের একটী বৃহৎ সভা ; কোন ধনশালী রাজা প্রতি বৎসর এক এক জন অধ্যাপককে মনোনীত পূর্ব্বক অনেক টাকা বৃত্তি দিবার ভার এই সভার প্রতি সমর্পণ করিয়াছেন।

নাকে খৎ

(হাস্য-কাব্য)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কষ্টকল্প বিদ্যেনিধি। (Seated,—a quantity of bank-notes scattered before him)

বিদ্যেনিধি। (Solos স্বগত)

ঢের্ টাকা !—উঃ ঢের্ heaps of'em ;
জয়্ জয়্কার রত্নসভার ! well, that's a name !
অনেক শর্ম্মা—বিদ্যেনিধি, বিদ্যেবুধি ভায়া
বেঁচে যান—(বড নয় !) আমারি যা হওয়া !
"একাদশ বৃহস্পতি"—বচনটা ত ঠিক !
ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র—শাস্ত্র কি অলীক ?
নিদেন্ অনেক্ দুখ্‌খী প্রাণী (নামের পিঠে ছালা)
রত্নসভার্ দোহাই দিয়ে জুড়োন্ পেটের জ্বালা !
(নোট্‌গুলো নেড়ে চেড়ে)
তা, এই গ্যালো—এক্‌শো একশো—আর এক্‌শো এই ;
(এ মাস্‌টা চলবে ভালো, ভাব্‌না বড় নেই !)
আর চার্‌শো—ওতে, শুধ্‌বো অম্বা ভায়ার দেনা ;
অঋণী মানবো শ্লাঘ্য—পরেও যদি ট্যানা।
এই পাশ্‌শো—বড় গিন্নির হাতে দেবো ফেলে ;
বাগ্‌দান্‌টা অনেক্ দিনের, আর চলে না ঠেলে।
(আ গ্যালো যা, তবু ফুরোয় না !)—বাকি এ পঞ্চাশ
(সব্ টাকা এক্‌বারে কি না !) এ পঞ্চাশ,—ও সর্ব্বনাশ,
এ বছরের্ লাইসেনি যে আজো নিতে বাকি !
(বেওসাদারি মন্দ নয়, সেটাও হাতে রাখি,)
ও টাকাটা, পাঠাই তবে অগ্নিভট্রের কাছে,
শুভস্য শীঘ্রং যুক্তি ;—কে ওখানে আছে ?

(বাপ্পা পাঁড়ের প্রবেশ)

এক জেরা ঠহ্‌রো—

(দুইখানি চিঠির মোড়কে শিরনামা লিখিয়া)

দো খৎ লেকে যাও ;

ইয়েঃঠো কাশ্মীরি ঠাকুর্—লেও হাঁত্‌মে উঠাও,

ঠীকানা মালুম্ ? ইয়েঃ খাম্ উন্‌হিকো দেনা।—

দোস্‌রা ইয়েঃঠো ভট্টজী (হ্যায় তো পহ্চানা ?)—

লম্বাসা মুরদ্, গোরা, বেল্‌কা তৌঅর্ সীব—

উন্‌কা পাস্ লে জানা।

বাপ্পা।— হাঁ মালুম কিয়া, মীর।

(বাপ্পা পাঁড়ে চিঠি লইয়া নিষ্ক্রান্ত।)

বি। ও সর্ব্বরি। আয়, হেথা।—

(সর্ব্বরীর প্রবেশ)

ঠাকুর মা কোথায় র‍্যা ?

সব্ব। পূজো কচ্চে ঠাকুর ঘরে ; আমি যাই—অ্যাঁ—অ্যাঁ—(পালাবার চেষ্টা।)

বি। শোন্না বলি, ফুল তুলেছে কে র‍্যা আজ তাঁর ?

তুই তুলিচিস্ ?

সব্ব। না বাবা না, আজ যে সোঁদির * ভার।

বি। যেই তুলিস্, তা অতো কেন ? আদ্ সাজিটাক্ দিবি,

পূজোয়-পূজোয় মলো মাগী !—বলি শোন্ সবি :

বলো গে তো রাঙা বৌকে আমার ঘরে যেতে।'

সব্ব। কেন বাবা ? তাকে কি তুই সন্দেশ দিবি খেতে ?

আমায় দে না—

বি। দেবো এখন্, আগে গিয়ে বল্ ;

লক্ষ্মী মেয়ে সবি আমাব, চল্ মা, ঘরে চল্।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।)

* সন্ধ্যাবালা

প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

(পাশের ঘর)

(রাঙা বৌ এবং বিদ্যেনিধির প্রবেশ।)

রাং বৌ। কেন ডাকলে?

বি। আর কিছু না, এই কখানা নোট
(তিন্‌শো টাকা) মাকে দিও,—মাস্‌খরচের মোট;
উপ্‌রি অতিথ্‌ যত কিছুত, সবই এতে সারা—

রাং বৌ। আর হতভাগীর হলো বুঝি কথাই আশার ঝারা?
দেবো—দেবো, হচ্চে-হবে, কতই এলাকাটি!
মিছে খালি কেঁদে মলুম ভিজ্‌য়ে আচোট মাটি।
বল্লে দেবে এক্‌খানা—তা সেই বা এত কি?
চাট্টে মেয়ে পেটে হলো—ন্যাড়া গলা ছি!
মুখ দেখাতে লজ্জা করে, লোকে কতই বলে;
আমার বেলায় শুকনো হাঁড়ী—সবার বেলায় চলে!
এদ্দিন কিছু বলি নাই—ভালো, টানাটানি,
এখন কি যে—ঐ কি বল্যো—শুনচি কাণাকাণি
রত্নসভার কি নচ্ছারি—কি একটা ভাবি
পদ হয়েছে—তবু কেন এখন মারামারি?
না যদি দেও, বলুই না হয়—ভাঁড়াভাঁড়ি কেনো?
মন ঠাণ্ডায় প্রাণ ঠাণ্ডা আসল কথা জেনো।
এদের্—ওদের—তাদের্ বেলায় কতই শুন্তে পাই;
ধম্ম ভেবে দেওত দিও, এখন আমি যাই।

বি। চটুই কেন? শোনো বলি—

রাং বৌ। শুনে শুনে কালা!

বি। সত্যি বল্‌ছি এবার তোমার পোহাবারোর পালা।

রাং বৌ। (থম্‌কে) তিন সত্যি কর।

বি। তিন সত্যি?—মেয়েয়্‌ পড়ে!
মর্দ্‌ কি বাং হ্যায় হাত্তী কি দাঁং—কব্‌ভি না তোড়ে,
ইয়াদ্‌ রাক্‌হো জী!

রাং বৌ। ও আবার কি? কি দেবে দেও।

(বিজ্ঞে হস্ত প্রসার)

দেখি—দেখি, কত ভরী?

বি। ধরো, এই নেও।

রাং বৌ। (গালে হাত)

ও পোড়া ছাই! কি অভাগগি!—এতেই ঝাঁপাই এত?

ছেঁড়া কাগজ একটুকরো—মেতি পাতের মত!

কাজ নি—রাখো—

বি। আ আবাগী, পাঁশশো টাকার নোট!

ঐ ভাঙালিই দশনলী হয়—আর এক ছড়া গোট।

রাং বৌ। (আঁচলে বেঁধে)

জিগ্‌গুসবো—ঠাকরুণকে—

বি! দিব্বি—বিলক্ষণ!

(মুখরা প্রখরা ভার্য্যা তথাপি কাঞ্চন)

দাঁড়াও—শোনো, বলি শোনো—

রাং বৌ। শুন্‌বো, তা এখন

মিটুই আগে সন্দে'টা।

(প্রস্থান)

বি। আ তোমার মরণ্‌!

প্রথম অঙ্ক

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

(ধনুদ্ধরের বৈঠকখানা।)

(অগ্নি এবং ধনুদ্ধর আসীন।)

অগ্নি। হরে কিষ্ট! হরে কিষ্ট! রাধামাধব, ছি!

ধনু। (XIX Century মুড়ে)

অ্যাঁ,—কিহে, ও অগ্নিভট্ট? কও ব্যাপারটা কি?

অগ্নি। (ধনুর হাতে দিয়ে)

এই নেও পড়ো চিঠি খানি—এই নেও ধরো নোট,

রত্নসভার অধ্যেপক—কেবল ভোটের ঘোট!

ধনু। (নোট ও চিঠি হাতে—অবাক!)
আঃ গ্যালো যা! রওত দেখি;
(উল্‌টে পাল্‌টে)
—না পাঁশ্‌শোই বটে!
বেশ পঞ্চাশ, বিদ্যেনিধি!

অগ্নি। ল্যাজ বেঁধে দাও জটে।
চাঁচা ছোলা বুদ্ধিখানি গুরুর আমার বেশ;
দিনকাণাটা মাঝে মাঝে—ঐটে দোষের শেষ!
অনেক জানে, অনেক পড়ে, অনেক ভাষায় জ্ঞান,
বিষয় কাজে এই খান্‌টা (কপালে হাত দিয়ে)—
আঁদারে ল্যাণ্ঠ্যান্!
তাঁর আবার গে বেওসাদারি—লাইসেনির পাস!
মরুন্ গিয়ে ভট্টি পড়ে—নয় করুন্ গে চাষ!

ধনু। চটো কেন?

অগ্নি। দেখো দেখি—চট্‌বো না ত কি?
পঞ্চাশে—পাঁশশোর ফের—তার্ টিকি কেটে দি।

ধনু। থাক্‌লে ত?

অগ্নি। কি বল্‌বো ছাই—চাঁদ কবি যে নাই!

ধনু। না, বেচারা—ভাবে কত!—ফেরোৎ দেওয়া চাই।

অগ্নি। তুমি দেখ্‌ছি আর্ একটা! রগড় করে কে?
সাধে খুঁজি চাঁদ দাদাকে,—থাকতো যদি সে—

ধনু। তাই বলো না—রগড় খোঁজো?

অগ্নি। বল্‌বে ঘোড়ার ডিম্!
টাকা ফেরৎ দেবে তাকে? থাক্ আগে হিমসীম্!

ধনু। তবে চলো বড্ডীর হাতে দিয়ে আসি তাঁর,
বাড়তি থেটা সাড়ে চাশ্‌শো—বেশ হবে পয়জার!
ঘরে ঘরে বাধ্‌বে ভালো—জল্‌টা উচুনীচু!
ভাল মানুষের মেয়ে না হয় পেয়ে যাবে কিছু।

অগ্নি। বেশ কথা এ,—চলো তবে—খাবার খেয়ে আসি,
শীগ্‌গির বলো গাড়ী জুতে। (প্রস্থান)

ধনু। কোন্ হ্যায় রে? ঘাঁসী,
কোচ্‌মানকে ভেজো ইঁহা।—না, দিব্বি পীরের খাসী!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

(বিত্তেনিধির বাটী)

(ধন্বন্তর ও অগ্নিভট্টের প্রবেশ।)

ধন্ব। বিত্তেনিধি মহাশয়, বাড়ী আছেন গো?

অগ্নি। কারুই যে সাড়া নাই—

ধন্ব। ও বিত্তেনিধি,—ও—ও—

না, ঘরে নাই।—ও সব্বরি,—ও নিশি—ও সন্ধেবালা,

নিঝ্‌ঝুম যে, সাড়া শব্দ বন্ধ—একি জ্বালা!

ও গো, কে আছ গো?

অগ্নি। গ্যালো বা বাড়ী শুদ্ধ কালা?

রাং বৌ। (পরদার ভিতর হইতে মৃদুস্বরে)

ও মোক্ষদা, জিগগোস্ না, কে?

মো। হ্যাঁ গা, কে তোমরা গা?

কাকে খোঁজো?—কত্তা বাড়ী নেই।

ধন্ব। কত্তার মা?

তিনি কোথা?—আর মেয়ে সব্ যত কুঁচো কাঁচা?

মো। ও গো, সবাই গ্যাছে—সে বাড়ীতে।

ধন্ব। বাইরে এসো বাছা।

(মোক্ষদার প্রবেশ।)

হ্যাঁ গা, একাই তুমি আছ?—বৌও নেই ঘরে?

মো। কোন্ বৌ গো, রাঙা বৌ?—বাড়ী মাথায় করে

তিনিই কেবল আছেন একা।

ধন্ব। (অগ্নিকে) কর্ত্তব্য কি পরে?

অগ্নি। গুরু-পত্নী—হান্ কি তাতে?—ওগো বাছা শোনো।

ধন্ব। করিস্ কি,—ও মিন্‌সে?

অগ্নি। তুমি গাছের পাতা গোণো,

একাই আমি যাবো না হয়। ও ঝি, তাঁকে বলো,

বাবু একটি মোটা সোটা—গণেশ পেটা, ধলো,

ধীরপুরে ঘর, বড় দরকার—দেখা কত্তে চান।

আর—পড়ো আমি গুরুঠাকুরের—আমাত্তরে পান

এনো দুটো হাতে করো।

মো। (অগ্নির প্রতি তীব্রদৃষ্টি করিয়া)

আপনারা দাঁড়ান।

(প্রস্থান)

মো। (পরদার পশ্চাৎ ভাগে)

ও রাঙাবৌ, খড়কি তুলে দেখদেখি চেয়ে
বাবু দুটি, কে ওনারা ? চিন্তে পার মেয়ে ?
একটি ওদেব গেরস্থারি, একটি কিছু কাঁচা
(জানিনে মা আজকাল্‌কাব কল্‌কাতার কি ঢ্যাঁচা)
পান খেতে চায় ! আবার বলে আস্‌বে তোমার ঠাঁই ;
চেনা শুনো হবে বুঝি ! দরোয়ানটাও নাই ?

রাং বৌ। ও ঝি, ওদের আস্‌তে বল্‌, বস্‌তে জায়গা দে।

মো। (দুইখানি আসন পাতিয়া)

আসুন তবে।

রাং বৌ। ও মখি, ও পোড়ারমুখী কপাট টেনে দে।

(কপাট অর্দ্ধবদ্ধ করণ)

(ধনুঃ ও অগ্নি অন্দরে প্রবেশ।)

ধনু। দরকাবী কাজ তাই আজকে এতো বাড়াবাড়ি,
কত্তাটি কি গাঁজা টানেন ! টাকার ছড়াছড়ি ?
পঞ্চাশেতে পাশ্‌শো দেন্‌—হিসেব আঁটাআঁটি !
রাখো তুলে, ধরো এখন সাড়ে চাশ্‌শো খাঁটি।
পাশ আপিসে পঞ্চাশ দিতে পাশ্‌শো দেছে ফেলে,
মাথা খুঁড়্‌লেও দিওনা তাঁয়, দেখ্‌বো কেমন ছেলে !
ও টাকাতে গয়না করো—না হয় যদি পারো
কোম্পানীর কাগোজ কিনে আখের সুসোর করো
দাঁতে কুটী নিলেও তবু দিও না এ তায়,
কোথা পেলে এখন্‌ যেন সন্ধান না পায়।

মো (রাঙা বৌএর হইয়া) উনি বল্‌চেন—
আপনিই রাখুন, কাজ কি হাতের ফেরে ;
গয়নাত্তরে পাশ্‌শো টাকার নোট দিয়েছেন ধরো
আজ সকালে ; তাই ভাব্‌চেন আবার কেমন করো
নেবেন এটা ?

ধনু। (মোক্ষদার প্রতি) কই, দেখি ? নেও ত চেয়ে।
(অগ্নিকে) ওহে শর্ম্মা—বুঝেছ ত ?

অগ্নি। তোমার আগে—all bright as day.
(ভিতরে বাক্স টানার ও চাবি খোলার শব্দ)

মো। (ধনুর প্রতি)
এই নিন, এই কাগজখানি আজ সকালে দিয়া
নিরুদ্দেশ সেই অবধি। (নোট প্রদান)

ধনু। (নোটখানি দেখিয়া)
ও শর্ম্মা ভায়া,
দেখো দেখো, যা ভেবেছি, ঠিকঠাক এ তাই।
(নোট দেখাইয়া)

অগ্নি। হৃদ্দ কল্লে বিদ্যেনিধি "ড্যাম his আই !"

ধনু। (৫০০ টাকার নোট দিয়া)
এখন তুলুন সবগুলি এ সিন্দুকটা খুলে ;
আ-হাবা, বামুনের মেয়ে, এতেই গেচেন ভুলে ?
পাঁশ্শো নয়ত ! পঞ্চাশ যে তোমার যা তা হেথা,
এখন কি আর এ সব নিতে ধম্মাধম্মির কথা ?
পাঁশ্শো দেছে পাঁশ্শোই ওর। কসে বাঁধুন গিরে
পরশু দিনে বিকেল বেলা আসব আবার ফিরে।
আমরা এলে পরে যেনো—দেছেলো যে খানি,
সেইখানিকে দেখিয়ে তাঁকে, করেন টানাটানি।
ঘোরফের সব মিটে যাবে মিলবো যখন সবে ;
ভালমানুষের মেয়ে তোমার পুরো পাঁশ্শোই হবে
(আসন হইতে উত্থান।)

রাং বৌ। ও মোক্ষদা, বসতে বল্, খাবার তৈয়ের্ করি।

ধনু। আজ্ থাক্, সে পরশুই হবে, আগে চুরি ধরি।
(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বিদ্যেনিধির অন্য স্ত্রীর বাটী

(সতিন বৌ ও কুঞ্জর প্রবেশ।)

স। কি লো কুঞ্জ—দেখা হোলো ?

কু। না, সত্যই মা, না।

স। ও বাড়ী নেই,—গেছে কোথা ?

কু। তোমার মাথা!—ভেঙ্গে বল্!

তোর আজকে নতুন কেতা।

কু। সবই নতুন—একলাই কোন থাক্‌বে ছেঁড়া ন্যাতা ?

স। তুই যে দাস্থরায়কে টেক্কা দিলি ? ও কুঞ্জ ঝি।

কু। সত্যই মা, শুনলুম গিয়ে ও বাড়ীতে

স। (সাগ্রহে) কি শুন্‌লি, কি ?

কু। শুনে এলুম কাণাঘুষো পাঁশ্‌শো টাকার নোট,
তিনশো ভরির চন্দ্রহার একশো ভরির গোট ;
রাঙা বৌয়ের ভাঙ্গা কপাল শুয় গ্যাছে ফিরে !
তখন ভাগ্যবতীর পেস্তাবাদাম—সতীনমায়ের জিরে !

স। রাখ্ তোর ছড়াকাটা—কে বল্লে তোকে ?

কু। ওরাই বলে—তারাই বলে—পাড়াশুদ্ধ লোকে।

স। কুঞ্জ, আমার মাথা খাস্‌লো, আন্‌গে তাকে ডেকে।

কু। (জিব কেটে)
ছি কি কথা ? আন্‌বো তো গা নাগাল পেলে তায় ?
চৌপাহারা চাদ্দিকে যার তায় কি ধরা যায় ?
কাটলে শেকল আর কি পাখী দাঁড়ের পানে চায় ?
এখন্ রাঙা বৌয়ের খাঁচায় পোরা, আর্ কে তাকে পায় !

স। পোষা যে না ? অনেকদিনে অনেক্ ছাতু গুলে
সিটী দিতে শিখিয়েছি তায় সেও কি যাবে ভুলে ?
যা কুঞ্জ যা, যেখানে পাস্, আ—ঐ যে গুণমণি।
(দূরে বিদ্যেনিধিকে দেখিয়া)
যা, সরে যা—ঐ ঘরে থাক্ ; আজকে খুনোখুনি !

(বিদ্যেনিধির প্রবেশ)

স। (তাহার নিকটে গিয়া)
আমার কিছু চাই।
বি। হাতে কিছু নাই।
স। ওদের, ওদের বেলা
তবে টাকার কেন খেলা?
রাঙা ডোবার জলে
শুনি, ছি নী নি চলে।
ঢাকাই জালা পেট,
চন্দ্রহারে সেট!
কাঁকাল গাদা বোট
তাইতে সোণার গোট!
আমার বেলা যেই,
অমনি হলো নেই!
বি। কে বলেছে এ সব কথা?
স। কেন?—একি সব উচ্ছে নতা?
বি। দি, দিয়েছি ইচ্ছে আমাব।
স। কে তোলাবে—আমাব—?
বি। যা ছিল তা সব গিযেছে।
স। কতো ছিল?—কে নিযেছে?
বি। তোমায় বলে তা—হবে কি?
স। শুভঙ্করী আঁক্ শিখ্ছি।
বি। ক্ষ্যামা কর—ক্ষ্যামা কর—সত্যি হাতে নাই।
সর্বৌ। একাদশ বৃহস্পতি—কি তবে সে ছাই!
শনিবারে জেবে পূরে এলো এতো গুলো—
মার্কামারা—"ভেলম-পেপার"—সে গুলো কি ধূলো?
ভাঙ্গ বটে নাগরালি কারো মুখে খাজা!
তারি যেনো আট্টা মেয়ে—আমি কি তা বাঁজা?
বি। ক্ষেমঙ্করী ক্ষ্যামা কর—হিসেব শোণো বলি;
ধূলিগুঁড়ি সবই গ্যাছে—শূন্য এখন থলি।
দিব্যি করি পায়ে ছুঁয়ে (জানুপাতপূর্ব্বক)

—চার্‌শো মহাজনে,
তিন্‌শো গেল পেটে খেতে—পঞ্চাশ লাইসেনে;
আর পাঁশ্‌শো—আর পাঁশ্‌শো রাখ্‌তে দিয়াছি,
ভাল মন্দ আখের ভেবে—

স। আমিই তবে কি
ছাই ফেল্‌তে ভাঙা কুলো ও বিদ্যেনিধি?

বি। ফিরে বারে যত পাবো, তোমায় দেবো সব,
শুরু হাঁড়ি—পায়ে নেড়ে—কেন কর'রব?

স। লেখো তবে লেখো খত—(আন্‌তো ঝি ইংষ্ট্যাগু)
সুদশুদ্ধ লিখে দেও—"প্রমিসরি বণ্ড"
আমি নাকি বোকা মেয়ে—আমায় দেবেন ফাকি?
গুণনিধি, গুণীন্ আমি, চিনি ভালো—চাকি।

বি। (খত লিখিয়া পাঠ করণ)
"I O U—আই প্রমিস্"—সাতশো টাকা সাড়ে,
"অন্ ডিমাণ্ডে" দেবো আমি সুদে যত বাড়ে;
মাসে মাসে—টাকায় টাকা সুদ দিতে স্বীকার;
না যদি দি—সতীন বৌএর শ্রীপদ-প্রহার।

স। এখন—সে বাড়ী যাও বিদ্যেনিধি!—করো গে আহার।

সঃ বৌ। (প্রস্থান)
(ভাবিতে ভাবিতে বিদ্যেনিধির প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

(বিদ্যেনিধির গৃহ)

(আসীন তক্তপোষে—)

বিদ্যেনিধি, ধনুদ্ধর ও অগ্নিভট্ট।

ধনু। আজ্জে বড় ব্যাজার ব্যাজার?

বি। এমন কিছু নয়।

ধনু। তবু—তবু?

বি। মাথা মুণ্ডু—

ধনু। বল্‌তে লজ্জা হয়?
বি। আর জালিও না,—ঢের জলেছি!
অগ্নি। সে কেমন আবার?
কি জ্বালাতন গুরুঠাকুর?
(সন্ধ্যাবালার প্রবেশ।)
সন্ধ্যা। ও বাবা, একবার
বাড়ীর ভেতর মা ডাকৃচে
বি। যা যা—এখন যা।
সন্ধ্যা। আয় শীগ্‌গির শীগ্‌রি করে—ডাকচে তোকে মা।
বি। সেও মরুক—তুইও মর্, দে—কাপড় ছেড়ে দে।
যাবো এখন—যখন খুসী।
ধনু। ভারী গরম যে?
যাও না কেনো, একটিবার শুনেই না হয় এলে;
আমরাও ত বস্‌বো, খাবো—দোষটা কি তা গেলে?
বি। বড় জ্বালালে চল্ যাচ্চি। (সন্ধ্যার সহিত প্রস্থান।)
অগ্নি। আমরাও গুড়ি গুড়ি
চলো না কেন পেছু ধরি।
ধনু। আ বিদ্যের ঝুড়ি!
টের পাবে যে—সব ফাঁস্‌বে—তুমি কি পাগল?
হেথা বসেই সব শুন্‌বে;—ভাবনাটা কেবল
পার্‌বে কি না তার রাখ্‌তে;—নয় কুঁতুলে খল।
অগ্নি। ঐ বেধেছে—নারোদ নারোদ!—পারবে না কোঁদল?
কোঁদল ছাড়া মেয়ে মানুষ কে দেখেছে কবে?
ধনু। শোণো—শোণো—হচ্চে কি।
রাং বৌ। হ্যাগা নাকি তবে
পাঁশ্‌শো টাকার একখানা নোট গয়নাত্তরে দেছ?
জুয়োচুরি এমনতরো কদ্দিন শিখেছ?
তাই বুঝি, তা—ঠাকৃরুণকে দেখ্‌তে দিতে মানা?
ভেল্কি খেলার চোখে ধূলো—যায় পাছে বা জানা!
নেই বা দিতে;—এ ভাড়ামি এ বয়সে—ধিক!
গলায় দড়ি! বিদ্যেনিধি উপেধটাতেও ধিক্!

আর একটা—কি ঐ যে—রত্ন কিসের পায়া—
তাতেও ধিক্—ধীক্—ধীক্—বড়ই বেহায়া!
মাথা খুঁড়ে মরবো আমি—ঘর সংসারে ছাই,
এই নাও সেই জালী কাগোজ—

(৫০ টাকার নোট ফেলিয়া দিয়া)

বি। কি জ্বালা—বালাই।
এই খানা কি সেই খানা?

রাং বৌ। না, অনেক স্যাণ্ডাং ভাই
আছে কি না—দিচ্চে আমার হাতে গুণে গুণে?
বলতেও লাজ নাই কি মুখে?—পোড়াও গে উনুনে!

বি। তাইতো—তবে কেমন্ হোলো! কাকে দিনু ভুলে?

বা'বৌ। হয় তো তাকেই দেছ—যার পাধ্ধুলো খাও গুলে!

বি। (ক্রুদ্ধ হইয়া)
মুখ সাম্‌লে কথা বলিস—বড্ড বাড়াবাড়ী?
শিকেব তুল্লে এমনিই হয় ভাঙা ছড়ার হাঁড়ী!

ধনু। (বাহিব হইতে)
বিদ্যেনিধি, বলি ওকি?—কি হয়েছে অ্যা?
ভদ্রলোকেব কথার কেতা এমনিই বটে, ছ্যা!

বি। (হতবুদ্ধিভাবে নোটখানি দেখিতে দেখিতে প্রবেশ)
তাইত!—তবে এ কি হলো?

ধনু। কি হয়েছে বলো।

বি। (হবে আব কি মাথা মুণ্ডু!—এদিক ওদিক গ্যালো।)
শম্মাভায়া, হ্যাঁ হে, তোমাব চিঠির ভেতর মোড়া
নোটখানা সে কত টাকাব?

অগ্নি। না, দিব্বি শালের যোড়া
পুরস্কার হলো শেষে! এ নৈলে কি হয়?
গুরুর মত গুরু বটে—বিদ্যেনিধির জয়!
হুকুম যেমন—তেম্‌নি দিছি সরকারি-আপীসে
চাওরটিকে এখন্ দেখি জেলে পাঠাও শেষে!

বি। আরে চটো কেন? আমার হেথা—বেম্মোতেলো জলে

ধনু। চটবার তো কথাই বটে—

বি। বাঁচি আমি ম'লে।

ধনু। কি হয়েছে, বলুই ছাই—বুঝতে তবে পারি।

বি। মাথা মুণ্ড বলবো কি আর—করিছি ঝকমারি
রত্নসভার টাকার পিণ্ডি—হাতে নিয়ে তুলে।
পাঁশ্‌শো টাকার একখানা নোট—কাকে দিছি ভুলে!
ঠিক মিলুতে ঘাম ছুটেছে—নাকে দিনু খৎ
এ ঝকমারি আর করবো না—দেখবো অন্য পথ।

ধনু। জানো আমার ঠিক ঠাকে আছে লেখাকৎ।

বি। হ্যাঁ তা জানি।

ধনু। চলো—তবে, নাকে দেবে খৎ
রাঙাবৌএর চরণতলে,—মিলিয়ে দেবো তবে।
আর্ এক কথা—একটা ভালো ফলার দিতে হবে!
থাক্‌বো তাতে আমরা দুজন্—ইয়ার বক্‌স আর্;
চাঁদ্‌কবিকে হবে দিতে কথকতার ভাব!
আগাগোড়া সভার মাঝে ভাংবে তোমার ভুর্।
রাজী হওত, ভ্রমটা তবে করি এখন দূর।

বি। তাই সই,—আর সয় না প্রাণে! যেথা সেথা জ্বালা,
দিবা রাত্তির ঝগ্‌ড়া কোঁদল—কাণ্‌টা ঝালা পালা!
এক জায়গায় দাসের খৎ—এক জায়গায় নাকে;
অধ্যেপকি কন্নু ভালো—চরকার পাকে পাকে!!

ধনু। চল এখন বৌয়ের কাছে।

বি। আজকে না হয় থাক।

ধনু। না না,—না তা হবে না—ছেঁচ্‌তে হবে নাক্!
পঞ্চাশ্‌ দিতে পাঁশ্‌শো দিলে—পাঁশ্‌শোতে পঞ্চাশ;
ঠিকেঠাকে মিলে গ্যালো—মিট্‌লো দশের আশ্!!

(সকলের অন্দরমহলে প্রবেশ)

সমাপ্ত।

দ্বিতীয় পর্য্যায়

এক

১৩ই কার্ত্তিক, ১৩২০।

অপরাহ্নে কৃষ্ণনগর রেলষ্টেশনে অবতরণ করিয়া দেখি যে, আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র, কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক, শ্রীমান্ হেমচন্দ্র দত্ত গুপ্ত গাড়ি লইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাদের গৃহে পৌঁছিয়া প্রথমেই তাঁহার পিতা পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের চরণবন্দনা করিলাম। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ; শ্রবণেন্দ্রিয়ও পূর্ব্বের মত সবল নহে; দেহ কৃশ, কিন্তু সতেজ।

কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর আমি বলিলাম—"আপনার স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিতে আমার বড় ইচ্ছা হয়। সম্প্রতি আমি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্মৃতিকথা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিয়াছি; শিক্ষিত-সমাজে তাহা অনাদৃত হয় নাই; কিন্তু আপনি যে সকল কথা বলিতে পারেন, তাহা আর কেহ পারিবেন না!" কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ থাকিয়া তিনি বলিলেন—"আমার পূর্ব্বস্মৃতি শুনিতে চাও? বহু পুরাতন কথা আমার বেশ মনে আছে বটে, একটিও বিস্মৃত হই নাই। তবে শোন।

"১৮২৯ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে আমি জন্মগ্রহণ করি; ১৮৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমার পিতার পরলোক প্রাপ্তি হয়। তিনি কলিকাতায় চাকরি করিতেন; পীড়িত হইয়া কৃষ্ণনগরে আসিলেন,—মরিবার জন্য। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি একবার আমাকে বুকে ধরিয়া লইয়াছিলেন; সেই নিবিড় আলিঙ্গনের স্মৃতি আমার চিরজীবনের সাথী হইয়া আছে। এত ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে আমার জীবন আবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু অতি শৈশবের এই স্মৃতিটুকু মুছিয়া যায় নাই।

"কৃষ্ণনগর একটা নগর নহে; অনেকগুলি গ্রামের সমষ্টি। গোবিন্দ সড়ক, বৈকুণ্ঠ সড়ক, নতুন সড়ক, চাঁদ সড়ক, হটুনগর, আমিন বাজার, গোয়াড়ি, সোন্দা, ঘুর্ণী, মালোপাড়া, পাত্রালা, নেদেরপাড়া, বেলেডাঙ্গা, রুইপুকুর, বাঘাডাঙ্গা প্রভৃতি ৩০।৪০টি স্বতন্ত্র স্বাধীন গ্রাম ছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী ছিল—শিবনিবাস; সেখান হইতে আসিয়া তিনি এই সমস্ত গ্রাম একত্র করিয়া একটি বড় নগর স্থাপিত করিলেন, তাহার নাম হইল কৃষ্ণনগর। আমাদের এই পাড়ার নাম নেদেরপাড়া কেন হ'ল জান? হটুনগরের দত্তরা মহারাজার কর্ম্মচারী ছিলেন; সমাজে তাঁহারা "হটু দত্ত" বলিয়া পরিচিত; মহারাজের নিকট হইতে তাঁহারা এই গ্রামটি বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন; অনেকগুলি ব্রাহ্মণ আনাইয়া এখানে একটি ব্রাহ্মণ-উপনিবেশ স্থাপিত

করিলেন; রাজকোষে কিন্তু একটি পয়সাও দিতেন না; ক্রমে ইহার "না দেয়ার পাড়া" নাম জাহির হইল; অল্প রূপান্তরিত হইয়া উহা 'নেদের পাড়ায়,' দাঁড়াইল। ক্রমে হটু দত্তদিগের বংশলোপের উপক্রম হইল; নিকটস্থ পান্নালা গ্রামের গুপ্ত-বংশ হইতে একটি ছেলেকে আনিয়া পোষ্যপুত্র গ্রহণের আয়োজন করা হইল; কিন্তু adoption-এর অব্যবহিত পূর্ব্বেই ভদ্রলোকটির স্ত্রীবিয়োগ হয়; সুতরাং ছেলেটি পোষ্যপুত্র হইল না বটে, কিন্তু হটুদত্তদিগের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইল। তদবধি সে "দত্ত" উপাধি গ্রহণ করিল। ইনিই আমার পূর্ব্বপুরুষ। এই জন্যই আমরা "দত্ত" বলিয়া পরিচিত; বস্তুতঃ আমরা পান্নালার গুপ্ত।

"পিতার মৃত্যুর পর জ্যাঠামহাশয় চার পাঁচ বৎসর আমাদিগকে ভরণ-পোষণ করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বে নীলকুঠির দেওয়ান ছিলেন; পরে মোক্তারী করিতেন। বাল্যকালেই আমাব struggle আরম্ভ হইল।

"পাঁচ বৎসর বয়সে পুরোহিত ঠাকুব আমার হাতে খড়ি দিলেন। মেজদাদা আমাকে পাঠশালায় লইয়া গেলেন, বলিয়া দিলেন যে, আট বাব দাগা বুলাইতে হইবে, নহিলে বাড়ি আসা হইবে না। দুর্গানন্দ রায়ের বাটীতে পাঠশালা ছিল; চার পাঁচ বছর পড়িতে হইত। প্রথম বৎসব, খড়িতে লেখা; দ্বিতীয় বৎসব, তালপাত; তৃতীয় বৎসব, কলাপাত; চতুর্থ বৎসব, কাগজে লেখা। তখন আমি পাঠশালার "সর্দ্দার পোড়ো", নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদিগকে পডাইতাম। গুরুমহাশয়ের নাম রঘুনাথ রায়; তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন; আমাকে বড় ভালবাসিতেন। প্রতি বৎসর বর্ষাকালে আমাদের কুটীরের চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমি অনেকদূব পর্য্যন্ত জলে ডুবিয়া যাইত; গুরুমহাশয় আমাকে কাঁধে করিয়া পাঠশালায় লইয়া যাইতেন, ও অপরাহ্নে পাঠশালা হইতে গৃহে লইয়া আসিতেন। দরিদ্র বিধবার এই পঞ্চমবর্ষীয় শিশুপুত্রটি পাঠশালায় উপস্থিত না থাকিলে, গুরুমহাশয়ের অধ্যাপনায় মন লাগিত না। তাঁহার বংশে এখন কেহই জীবিত নাই। তাঁহার সেই প্রগাঢ় স্নেহের কথা স্মরণ করিলে আমার হৃদয় ভক্তি-রসে আপ্লুত হইয়া উঠে। গুরুমহাশয়কে স্বচ্ছল গৃহস্থের ছেলেরা পূজা-পার্ব্বণে কাপড় চোপড় দিত; কিন্তু সাধারণতঃ বেতন-স্বরূপ এক আনা, দুই আনা, চার আনা পর্য্যন্ত দিতে হইত।

"পাঠশালায় প্রথম দুই তিন বৎসর কেবল লেখা হইত; মুদ্রিত পুস্তকের সহিত আমাদের পরিচয় ছিল না বলিলেই চলে; "আমড়াতলার ছাপা" বলিয়া পরিচিত দাতাকর্ণ, প্রহ্লাদচরিত্র, চাণক্যের শ্লোক, গুরুমহাশয় মুখে মুখে আবৃত্তি করিয়া বলিতেন; আমরা শুনিয়া মুখস্থ করিতাম; হয় ত চারি জন ছাত্র বইগুলি ক্রয় করিত। খাতা পত্র লেখা; জরিপ চিঠে; জমাখরচ; জমাওয়াশিল বাকি;

এই সমস্ত আমরা শিখিতাম। কাহাকে কি "পাঠ" লিখিতে হইবে, তাহা আমাদের মুখস্থ ছিল। একটু আধটু এখনও স্মরণ আছে।

গাঁয়ের জমিদার যদি হয় মুসলমান,
বন্দের সেলাম বলে' লিখিবে তখন।

"সমস্ত "পাঠ" শ্লোকের মধ্যে গ্রথিত ছিল। লিখিবার জন্য কলাপাত চাই; কাহারও বাগানে প্রবেশ করিয়া কলাপাত কাটিয়া আনা হইত; এ সম্বন্ধে কাহারও কোনও নিষেধ ছিল না; ইহাই প্রচলিত পদ্ধতি ছিল। এক রকম পাটী (মাতুর) তৈয়ারী হইত, তাহার নাম "পড়ো পাটী" (পাঠশালার পড়ুয়ারা এই সব ছোট ছোট মাতুরে বসিত); সমস্ত গ্রামেই খুব বেশী বিক্রয় হইত, গত পঞ্চাশ বৎসরে বোধ হয় এ ব্যবসাটি লুপ্ত হইয়াছে। শরের বা কঞ্চির বা কলমির (শাক নহে) কলম ব্যবহৃত হইত। লেখাপড়ার খরচ কত কম ছিল, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ; অথচ ইহাই যথার্থ Mass Education ছিল।

"মুখে মুখে নাম্‌তা পড়ান হইত; অঙ্কের বই ছিল না; tables গুলা, কাঠাকালি, কুড়োকালি মুখে মুখে হইত। তখনকার লেখাপড়ার ব্যবস্থা এই রকম ছিল। বৈদ্যসন্তান হাতের লেখা পুঁথি পাঠ করিয়া কবিরাজি শিক্ষা করিতেন; সকলেই হাতের লেখা ব্যাকরণ মুখস্থ করিতেন। একখানি বই সাধারণতঃ গৃহস্থের কুটিরে প্রবেশ লাভ করিত,—সেটি পঞ্জিকা। পাঁজি দেখিয়া সব কাজ করা হইত; এমন কি ঘর ছাইবার জন্য ঘরামি লাগাইতে কবে হইবে, তাহাও পাঁজি দেখিয়া স্থির করা হইত। দোকানদারের ছেলে,—মালীর, তেলীর, কামারের, ছুতারের ছেলে আমার সহপাঠী ছিল; অল্প লেখা পড়া শিখিয়াই তাহারা পাঠশালা পরিত্যাগ করিত। বড় বড় রাজমিস্ত্রীরা লিখিতে পারিত না, হিসাব করিতে পারিত না, পাঠশালায় আসিয়া দু'এক বৎসর অধ্যয়ন করিত।

"১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় মিশনরি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করি। বিদ্যালয়টি ঐ বৎসরেই স্থাপিত হইয়াছিল। তৎপূর্ব্বে খৃষ্টান মিশনরিরা গুরুমহাশয়দের পাঠশালাগুলি দেখিয়া বেড়াইত। এ পরিদর্শন অবশ্যই গভর্মেণ্টের অনুমোদিত ছিল না। কলিকাতার 'মিশনরি সোসাইটি' হইতে তাঁহাদের উপর এই আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল যে, তাঁহারা যেন দেশীয় পাঠশালাগুলির শিক্ষাপ্রণালী ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করেন। পাদরী সাহেবেরা দরিদ্র গুরুমহাশয়দিগকে কিছু অর্থদানে আপ্যায়িত করিয়া সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া যাইতেন। কিছুদিন পরে তাঁহারা ঐ বিদ্যালয় স্থাপিত করিলেন। দশ বৎসর পরে একটি মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল; মিশনরিরা চিন্তামণি সরকার নামক একটি

ছাত্রকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিল। সেই স্কুলের শিক্ষক ব্রজবাবু * তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করিলেন। কালীচরণবাবু ও আমি তাঁহার সহিত যোগ দিয়া একটি নূতন বিদ্যালয় স্থাপিত করিলাম। এই জন্য ইহাকে সাধারনতঃ ব্রজবাবুর স্কুল বলে। আজ প্রায় ৬৫ বৎসর ধরিয়া সেই A. V. School বেশ চলিয়া আসিতেছে। সে যাহা হউক, আমি দশম বর্ষে সেই পাদরীদের স্কুলে প্রবেশ করিলাম। অধ্যক্ষ C. H. Blumhardt 'ট' বলিতে পারিতেন না, 'ত' বলিতেন। ডিয়ার সাহেব আমাদের সেই গুরুমহাশয়ের পাঠশালা পরিদর্শন করিতে আসিতেন। পাদরী সাহেবের একখানা বই পাঠশালায় পড়া হইত; বইখানি একটি অভিধান-বিশেষ। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ছেলেরা উহা মুখস্থ করিত; আমি তখন খড়ি লিখি, বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র; তাঁহাদের আবৃত্তি শুনিয়া আমারও মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। আমিও আবৃত্তি করিতাম—

অংশ = ভাগ
অঙ্ক = চিহ্ন
অন্য = পর

"ডিয়ার সাহেব পাঠশালা পরিদর্শন করিতে আসিয়া সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদিগকে ঐ বই হইতে প্রশ্ন করিলেন; তাঁহারা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে পারিলেন না। আমি অগ্রসর হইয়া সাহেবকে বলিলাম. "আমি বলিতে পারি।" সন্তোষজনক উত্তর পাইয়া সাহেব আমার পিঠ চাপড়াইয়া আমাকে একটি পয়সা পুরস্কার দিয়া গেলেন।

"মিশনরি বিদ্যালয়ে পড়াশুনা ভাল হইত না। ইংরাজি First Reader পুস্তকখানি পড়িলাম; বিশেষ কিছু সুবিধা হইল না দেখিয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলাম। সেই সময়ে ৺রামকৃষ্ণ লাহিড়ীর পঞ্চম পুত্র শ্রীপ্রসাদ লাহিড়ী তাঁহাদের বাড়ীর দালানে আমাদিগকে ইংরাজি পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। রামকৃষ্ণ লাহিড়ীর ছয় ছেলে; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ কেশব দ্বিতীয় পুত্রের নাম তারাবিলাস, তৃতীয় পুত্রের নাম রামতনু। শ্রীপ্রসাদ কালেক্টরের মুহুরি ছিলেন, Hobhouse সাহেবের কাছে যাইতেন; তিনি আমাকে যেটুকু ইংরাজি শিখাইয়া ছিলেন, তাহা আমার বড় কাজে লাগিল। কিন্তু সে কথা পরে বলিতেছি।

"লাহিড়ী মহাশয়েরা জাত্যংশে শ্রেষ্ঠ কুলিন; ছ'ঘরের মধ্যে বংশমর্য্যাদায় উচ্চতম। কলিকাতার হিন্দুকলেজে যখন De Rozio শিক্ষকতা করিতেন তখন রামতনু লাহিড়ী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ তাঁহার ছাত্র ছিলেন। কলিকাতায় পঠদ্দশায় শ্যামাচরণ সরকার ও রামতনু বাবু

* এই ব্রজবাবু (৺ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। ইনিই সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারীর স্বত্বাধিকারী।

একটি ছোট বাসায় মেস করিয়া থাকিতেন। বহুদিন পরে শ্যামাচরণ সরকারের একটি ছোটখাটো জীবনচরিত প্রকাশিত হয়। লেখক তাঁহার পুস্তকের একস্থানে উচ্ছ্বাসের সহিত বলিয়াছিলেন যে, শ্যামাচরণ এক সময়ে সামান্য পাচক (cook) ছিলেন। রামতনুবাবু ইহা contradict করিয়া বলেন—আমরা কলেজে পড়িবার সময়ে বাসায় থাকিতাম। মাঝে মাঝে যখন পাচক থাকিত না, আমরা দুজনে পালাক্রমে রাঁধিতাম; বোধ হয় সেই জন্যই লেখক স্থির করিয়া লইয়াছেন যে, শ্যামাচরণ cook ছিলেন। রামতনুবাবু রসিককৃষ্ণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন; রসিককৃষ্ণের নাম করিবার সময় তাঁহার চোখে জল আসিত। তিনি বলিতেন রসিকের মত thoughtful মানুষ আমি দেখি নাই; রসিক dared to think for himself। রামগোপাল ঘোষকেও তিনি খুব শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি জানিতেন যে, রামগোপালের চরিত্র-দৌর্ব্বল্য ছিল; তথাপি রামগোপাল তাঁহার শ্রদ্ধার পাত্র ছিল। শেষ পর্য্যন্ত রামতনুবাবুর বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার শিক্ষক ডি, রোজিও তাঁহার নৈতিক চরিত্র গঠিত করিয়া দিয়াছিলেন। সাহেব নিজে Free-thinker ছিলেন; ছাত্রগুলিও সেই রকম দাঁড়াইল। ঐ একমাত্র দোষে সাহেবের চাকরি গেল। কালক্রমে রামতনুবাবু ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের স্থাপয়িতা রামমোহন রায় যখন খৃষ্টীয় মিশনরিদিগের সহিত বাদানুবাদ করিতেছিলেন; তর্ক করিয়া Dr Adams কে পরাজিত করিলেন; তখন রামতনুবাবু তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইলেন। তিনি তাঁহার মায়ের শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, বাপের শ্রাদ্ধ করেন নাই।

"আমার এক আত্মীয় রেজেষ্টরি আপিসের মুন্সী ছিলেন; আমি তাঁহার নিকটে নকল-নবিসি কাজ করিতে লাগিলাম; কৃষ্ণনগরের ডাক্তার সাহেব (Civil Surgeon) ডাক্তার ফুলার তখন রেজিষ্ট্রার। ১৮৪৬ সালের ১লা জানুয়ারি ডাক্তার সাহেব বিলাত চলিয়া গেলেন। তদবধি ঐ ডিপার্টমেণ্ট্‌টা অ্যাসিষ্টেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে আসিল। তখন চার্লস্ প্যারি হব্‌হাউস্ (Charles Parry Hobhouse) জেলার অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত, লর্ড ব্রাউটন (Lord Broughton) পরে President of the Board of Control হন। চার্লস্ পরে—স্যার চার্লস্ হবহাউস্ হইয়াছিলেন; আমাদের Court Fees Act-এর ইনি জনক। এই সাহেবই আমার ভাগ্যবিধাতা হইলেন। আমার সহিত একটি আধটি কথা কহিতেন; আমি শ্রীপ্রসাদ বাবুর আশীর্ব্বাদে যেটুকু ইংরাজি আয়ত্ত করিয়াছিলাম, তাহাতেই তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিতাম। সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া আমার সেই আত্মীয় মুন্সী মহাশয়কে বলিলেন, "আমার ইচ্ছা এ ছেলেটি পড়া শুনা করে।" তখন সবে মাত্র কৃষ্ণনগর কলেজ স্থাপিত হইয়াছে; তাঁহার ইচ্ছা আমি সেই কলেজে ভর্ত্তি হই। আমি কলেজে

অধ্যয়নের ব্যয়নির্ব্বাহে অসমর্থ শুনিয়া তিনি নিজে টাকা দিয়া আমাকে কলেজে পাঠাইয়া দিলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর কৃষ্ণনগর কলেজ স্থাপিত হয়; ১৮৪৬ সালের ১লা জানুয়ারি আমি কলেজে ভর্ত্তি হই।

"এখন যে স্থানটি 'পুরাণো কলেজের হাতা' নামে পরিচিত উহার একটু ইতিহাস আছে। ঐ অঞ্চলে পূর্ব্বে বড় ডাকাতি হইত; পুলিশ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিত না। একজন ম্যাজিষ্ট্রেট আসিলেন, তাঁহার নাম এলিয়ট্। তিনি ভবানীপুরের চট্টোপাধ্যায়-বংশীয় একজন ধনাঢ্য ভদ্রলোককে বলিলেন, 'তুমি যদি ঐ খানে একখানি বাড়ি করিয়া দিতে পার, উহা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের আবাসগৃহ হইবে; একদিনও খালি থাকিবে না; তুমি উপযুক্ত ভাড়া পাইবে।' ভদ্রলোক বাড়ি তৈয়ার করাইয়া দিলেন। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সেই গৃহে অবস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন। বাড়ির সম্মুখেই বড় রাস্তা; রাস্তার অপর পার্শ্বে পুলিশের থানা বসিল। অল্পদিনের মধ্যেই ডাকাতি বন্ধ হইয়া গেল। তখন গোয়াড়ি অঞ্চলে লোকে বাস করিতে আরম্ভ করিল; নূতন নূতন বসতবাটি নির্ম্মিত হইল। কিছুকাল পরে কৃষ্ণনগরে কলেজ স্থাপনার প্রস্তাব হইল। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কলিকাতার সমস্ত সাহেব মত প্রকাশ করিলেন। একা বীডন সাহেব (মিঃ সেসিল বীডন) প্রস্তাবের স্বপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। কলেজ স্থাপন করা যখন স্থির হইল, তখন ম্যাজিষ্ট্রেট ট্রেভর (Trevor) কলেজের জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ঐ বাড়িটি ছাড়িয়া দিলেন। কৃষ্ণনগর কলেজ স্থাপিত হইল।

"কলেজ চালাইবার জন্য একটি স্থানীয় কাউন্সিল গঠিত হইল; তাহার সদস্য হইলেন—কৃষ্ণনগরের মহারাজ, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ডাক্তার সাহেব। যে নূতন সিভিল সার্জ্জন আসিলেন, তাঁহার নাম ডাক্তার চার্ল্স আর্চার (Dr Charles Archer); তিনি মহাপণ্ডিত ছিলেন; পরে ইনি 'Opthalmic Surgery'-র অধ্যাপক হইয়াছিলেন। বহুকাল পরে যখন হাওড়ায় ও অন্যত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি, তিনি দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া কেবলই সাহিত্যিক আলোচনা করিতেন। নবপ্রতিষ্ঠিত কলেজের উন্নতি-কল্পে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। দশ বারটি ছেলের মাসিক বেতন তিনি নিজের পকেট হইতে দিতেন; সন্ধ্যার পর 'Natural Philosophy'-র উপর বক্তৃতা দিতেন; আমরা সেই বক্তৃতা শুনিতাম। তিনি আমাদিগকে পরীক্ষা করিলেন; আমাদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিলেন,—আমার সতীর্থ বন্ধু অম্বিকাচরণ ঘোষ; আমি দ্বিতীয় স্থান পাইলাম। উভয়েই তাঁহার নিকট হইতে পুস্তক উপহার পাইলাম। অম্বিকা Whewell's History of the Physical Sciences পাইলেন; আমি পাইলাম Arnold's History of Rome। ম্যাজিষ্ট্রেট E. T. Trevor অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন; আমাদের অঙ্কের পরীক্ষা লইতেন; আমাকে তিনি একখানি

প্রেফেয়ারের 'ইউক্লিড্' কিনিয়া দিয়াছিলেন; প্রত্যহ প্রাতঃকালে আমি তাঁহার বাড়িতে যাইতাম, তিনি আমাকে ইউক্লিড্ পড়াইতেন; তিনি আমার জ্যামিতির সর্ব্বপ্রথম শিক্ষক; ১৮৪৮ সালে আমাকে তিনি Mitford's History of Greece প্রাইজ দেন। তাঁহার বাড়িতে একটা প্রকাণ্ড লাইব্রেরী ছিল; সেই লাইব্রেরী-ঘরে সকাল বেলায় আমি ইউক্লিড্ পড়িতাম। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চার্লস্ বিনি ট্রেভর (Charles Binny Trevor) বারাসতে জজ ছিলেন; রোজ সকালে পকেটে টাকা লইয়া বাহির হইতেন; যত ছেলে দেখিতে পাইতেন, তাহাদিগকে খাবার কিনিয়া দিতেন।

"কৃষ্ণনগরে ট্রেভর সাহেব যে বাংলায় বাস করিতেন, তাহার এক অংশে হব্‌হাউস্ থাকিতেন। তিনি প্রাতঃকালে একাগ্রচিত্তে পুস্তক পাঠ করিতেন। তাঁহাদের একটি Book Club ছিল; নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইলেই তাঁহারা কিনিয়া আনিতেন। হব্‌হাউস আমার চেয়ে এক বছরের বড় ছিলেন। কাপ্তেন প্যারীর (Captain Parry) কথা শুনিয়াছ কি? লেখাপড়া খুব জানিত; সাগরবক্ষে দেশ-বিদেশে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইত। Prescott তাঁহার Essay on Lockhart's Life of Scott-এর একস্থলে কাপ্তেন প্যারীকে Literary Sindbad আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। সেই কাপ্তেন প্যারী আমাদের অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হব্‌হাউসের পিসেমহাশয় ছিলেন; হব্‌হাউসের নামকরণের সময় তিনি baptismal font-এ Sponsor হইয়াছিলেন; তাই উহার নাম হইল প্যারী হব্‌হাউস্ (Parry Hobhouse)।

"আমি ত একেবারে কলেজের জুনিয়র ডিপার্টমেণ্টের প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম। লর্ড মেকলের মন্তব্যানুযায়ী কার্য্যারম্ভের পর School Book Society স্থাপিত হইয়াছিল। তাহারা অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তক ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত করিয়াছিল; সেইগুলিই সর্ব্বত্র পঠিত হইত। আমরা কি কি বই পড়িতাম শুনিবে?

১। Fifth Number Reader—(School Book Society's Publication).

২। Second Number Reader—(ইহার মধ্যে Miss Edgeworth-এর কয়েকটি গল্প ছিল)।

৩। Stewart's Geography.

৪। Chamier's Arithmetic.

৫। Gay's Fables.

৬। Goldsmith's History of Rome.

৭। Third Number Prose Reader—(ইহাতে Æsop's Fables ছিল)।

৮। জ্ঞানার্ণব—ইয়েটস্ সাহেব (Rev. W. Yates D. D.) কর্তৃক বিরচিত।

৯। সারসংগ্রহ— ঐ (বিলাতী রীতিনীতি সম্বন্ধে পাঠ সন্নিবেশিত ছিল)।

"প্রথমে আমরা পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের নিকট বাঙ্গালা সাহিত্য অধ্যয়ন করি; পরে পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার আমাদের বাঙ্গালার অধ্যাপক হইলেন। খড়িয়ার ওপারে বিল্বগ্রাম তাঁহার জন্মভূমি; মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রথমে কবিরত্ন উপাধি লাভ করেন; পরে তর্কালঙ্কার উপাধিতে ভূষিত হ'ন। তিনি আমাদিগকে কোন্ পুস্তক পড়াইয়াছিলেন, ঠিক তাহা আমার স্মরণ নাই। গল্প করিতে তিনি খুব ভালবাসিতেন। মুখে মুখে আমাদিগকে বাঙ্গালা ব্যাকরণ শিখাইতেন; বড় কড়া লোক ছিলেন, ছেলেদের পলায়ন নিবারণ করিবার জন্য তিনি নিজের একটি স্বতন্ত্র রেজিষ্টর খাতা করিয়াছিলেন। পরে যখন বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকাশিত হইল, তিনি ঐ পুস্তক খানি আমাদিগকে পড়াইতেন।

"মদনমোহন খুব তেজস্বী ছিলেন। একদিন একজন বড় সাহেব কর্ম্মচারী পরিহাসচ্ছলে তাঁহাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া আহ্বান করিয়াছিল; পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, 'খবরদার, ভদ্রলোকের মত আমার সঙ্গে ব্যবহার করিবেন।' সাহেব তৎক্ষণাৎ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

"তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, একবার ইয়েটস্ সাহেবের সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার বচসা হইয়াছিল। সাহেব একটু উত্তেজিতভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কোথায় বাঙ্গালা শিখেছেন?' পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, 'বিলাতে।' তর্কালঙ্কারের বিদ্রূপে তর্ক বন্ধ হইয়া গেল।

"ট্রেভর ও হব্ হাউস সাহেব অনেক সময় বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন; তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহাদিগকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙ্গালা পড়াইয়াছিলেন।

"আমাদের প্রথম জুনিয়র ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় (First Junior Scholarship Examination) বাঙ্গালায় অনুবাদের পরীক্ষক ছিলেন—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রিন্সিপ্যাল Major G. T. Marshall। জুনিয়র পরীক্ষা পাঁচ দিন ধরিয়া হইত। ইংরাজি সাহিত্যের পরীক্ষা হইত না। ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, ইংরাজি-বাঙ্গালা অনুবাদ, এই পাঁচ দফা পরীক্ষা হইত। বিলাতের হেলিবেরি হইতে যত সিভিলিয়ন এখানে আসিতেন, সকলকেই দু' তিন বৎসর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙ্গালা পড়িতে হইত।

"কৃষ্ণনগর কলেজের উন্নতির জন্য সাহেবদের একাগ্র চেষ্টা ত ছিলই, মহারাজ শ্রীশচন্দ্রও যথেষ্ট শ্রমস্বীকার করিতেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডাক্তার সাহেবের মত তিনিও আমাদের পরীক্ষক ছিলেন।

"তখন সর্ব্বশুদ্ধ চারিটি কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল,—হুগলি, কৃষ্ণনগর, ঢাকা ও কলিকাতার হিন্দু কলেজ।[১] প্রশ্ন-পত্রিকা কলিকাতা হইতে সর্ব্বত্র স্থানীয় কমিটির নিকট প্রেরিত হইত। হুগলির ম্যাজিষ্ট্রেট সামুয়েল সাহেব 'Friend of Education' খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কলিকাতার ছোট আদালতের জজ কৃহন গিডিয়ন স্কন্স্ (Colquhon Gideon Sconce)—Crimean War-এর সময়ে তিনি জজ ছিলেন—ও চট্টগ্রামের কমিশনর আর্চিবল্ড্ স্কন্স্ (Archibald Sconce)—পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রচারে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন; সর্ব্বত্রই স্থানীয় কমিটির যাহাতে কোনও ত্রুটি না হয়, সে বিষয়ে গভর্মেণ্টের খুব নজর ছিল। রামতনুবাবুর মুখে শুনিয়াছি যে, উত্তরপাড়া ও হাবড়ার Salt চৌকির কমিশনর কোবার্ণ্ (Cockburn) সাহেব স্কুল কমিটির দুইটা মিটিং-এ উপস্থিত হইতে পারেন নাই। লর্ড ডালহৌসি স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়া এই বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন তুমি উপস্থিত হইতে পার নাই?' Cockburn সাহেব উত্তর করিলেন যে, তাঁহার ডিপার্টমেণ্টের কাজ সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তাই স্কুল কমিটির মিটিং-এ আসা ঘটে নাই। লাট সাহেব বলিলেন, 'স্কুল কমিটির মিটিং-এ তুমি যে অজুহাতে দুইবার উপস্থিত হইতে পার নাই সেই Substantive post-এর পদ তোমাকে ত্যাগ করিতে হইবে।'"

[১] হুগলী মহম্মদ মহসীন কলেজ—১লা আগস্ট, ১৮৩৬, কৃষ্ণনগর কলেজ—১লা জানুয়ারি, ১৮৪৬; ঢাকা কলেজ—২০শে নভেম্বর, ১৮৪১, হিন্দু কলেজ—২০শে জানুয়ারি, ১৮১৭। (দ্রঃ 'বাংলার উচ্চ শিক্ষা' —যোগেশচন্দ্র বাগল)—সং।

দুই

১৪ই কার্ত্তিক, ১৩২০

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি যখন কলেজে ভর্ত্তি হইলেন, তখন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কে ছিলেন ?" উমেশবাবু বলিলেন—"কাপ্তেন ডি. এল. রিচার্ডসন্। আর হেডমাষ্টার ছিলেন—এফ্. ডব্লইউ. ব্র্যাড্‌বেরি (F. W. Bradbury)। কাপ্তেন রিচার্ড্‌সন্ কলিকাতার হিন্দু কলেজে দশ বৎসর অধ্যাপনা করিয়া কৃষ্ণনগরে আসিয়াছিলেন।

"লর্ড মেকলের শিক্ষাসম্বন্ধীয় মন্তব্যের পর যখন ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করাই সাব্যস্ত হইল, তখন কলিকাতায় একটি শিক্ষাসমিতি গঠিত করা হইল; সভাপতি হইলেন স্বয়ং মেকলে—President of the General Committee of Public Instruction. লর্ড হার্ডিঙ্গ্ (Lord Hardinge) ভারতবর্ষে আসিবার বহু পূর্ব্বে সার জন্ মুওরের (Sir John Moore) সহচর (Aide de camp) ছিলেন; কিন্তু এদেশে তিনি ইংরাজি শিক্ষাপ্রবর্ত্তনেয থেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। কলিকাতাব কমিটিতে ছিলেন—রামকমল সেন, রসময় দত্ত, কাপ্তেন রিচার্ডসন, কাপ্তেন হেস্ (Captain Hayes), ডাক্তার মৌয়াট্ (Doctor Mouat)। কাপ্তেন হেস্, মিলিটারি ইঞ্জিনিয়র ছিলেন; সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তাঁহাকে সৈনিক বিভাগে কাজ করিতে হইয়াছিল। বীটন্ (Bethune), বীডন্ (Beadon), হ্যালিডে (Halliday), ও রামগোপাল ঘোষ কৃষ্ণনগর কলেজ পরিদর্শন কবিতে আসিতেন। পূর্ব্বেই বলিযাছি যে, প্রথমতঃ যে চাবিটি কলেজ স্থাপিত হইযাছিল, সেগুলি দুইটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল। কৃষ্ণনগর ও ঢাকা কলেজের জন্য অপেক্ষাকৃত সহজ প্রশ্নেব ব্যবস্থা ছিল; হুগলি ও হিন্দু কলেজের জন্য স্বতন্ত্র প্রশ্ন করা হইত। ইহাদিগকে এক সূত্রে গ্রথিত করার বিরুদ্ধে প্রায় সকলেই ছিলেন; একা বীডন্ সাহেব জোর করিয়া উহা সম্পাদিত করিয়াছিলেন; তখন তিনি গভর্মেণ্টের সেক্রেটরি; তিনি বলিলেন, মফঃস্বলের কলেজে ভাল ছেলে আছে, হিন্দু কলেজের ছেলেদের সঙ্গে তাহাবা পাল্লা দিতে পারিবে। তাঁহার জিদ্ বজায় রহিল। ১৮৪৮ সালে একই প্রশ্নপত্র হইতে সমস্ত কলেজগুলির পরীক্ষা করা হইল। আমি General list-এ পঞ্চম স্থান অধিকার করিলাম; একটি পদক (Rochfort Medal) পাইলাম। বীটন্ সাহেবের আনন্দের সীমা রহিল না; তিনি, বীডন্ ও মৌয়াট্ সাহেবকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রদিগকে পারিতোষিক দিতে আসিলেন; বক্তৃতায় আমাকে যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছিলেন—("Though

fifth in order, the number of marks gained by him is within 22 of the highest number of marks gained by the first scholar of the Hindu College.") ; আমি যেন কলেজকে গৌরবান্বিত করিয়াছি, ইহাই তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, "Not only on the individual honour he had achieved for himself, but also on the honour he had reflected on his college." কলিকাতা হইতে কিন্তু তখনও প্রাইজগুলি আসিয়া পৌছায় নাই। স্থানীয় কলেজ কমিটির সদস্য মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রায় বাহাদুর ইহার কয়েকদিন পূর্ব্বে নিজের ব্যবহারের জন্য একখানি বহুমূল্য শাল ক্রয় করিয়াছিলেন ; সেই শালখানি তিনি আমাকে পুরস্কার দিলেন। বীটন্ সাহেব বেশ বক্তৃতা করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার গলা শুকাইয়া আসিত ; তিনি দুই তিন বার জল পান করিতেন।

"পরবৎসর আমি সীনিয়র্ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় (Senior Scholarship Examination) General list-এ প্রথম স্থান অধিকার করিলাম। এবারও বীডন্ ও মৌয়াট্ সাহেবকে সঙ্গে করিয়া বীটন্ সাহেব পারিতোষিক বিতরণ করিতে আসিলেন। বক্তৃতার রিপোর্ট হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতে পার,—

"A year has elapsed since I last visited this college. I told you then that I had just come from warning the students of the Metropolitan college that they must expect soon to find formidable rivals in the mofussil institutions and must exert themselves to the utmost, if they wished to keep their old pre-eminence. I congratulate this college of Krishnagar on having so speedily verified my prediction. Last year the foremost man among you occupied the fifth place in the comparative list......this year your leader is at the head of all the colleges."

"বীডন সাহেব আরও অনেক কথা বলিলেন। প্রাইজ দেওয়া হইয়া গেলে পর আমাকে তাঁহার নিকটে ডাকিলেন ; সস্নেহে তিনি আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—'যখনই তুমি কলিকাতায় যাইবে, আমার সহিত দেখা করিও।' পরে যখন তিনি বঙ্গের ছোট লাট হইলেন, তখন স্যর সেসিল্ বীডন্ কৃষ্ণনগরে আসিয়া কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিলেন ; যতক্ষণ ছিলেন আমার সহিতই আলাপ করিলেন ; তজ্জন্য প্রিন্সিপ্যালের একটু ঈর্ষা হইয়াছিল। স্যর সেসিল্ আমাকে বলিলেন—'Do you know what is the first question I put to the gentlemen here ?' আমি বলিলাম—'How should I know ?' তিনি হাসিয়া বলিলেন—'I asked about you ; they gave you a very high character.'

স্তর সেসিল্ বরাবরই আমাকে স্নেহ করিতেন। ঢাকা হইতে আসিয়া একবার তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন 'কিহে, কি চাই বল?' আমি বলিলাম,—'তাহা বলিবার নয়।' প্রশ্ন হইল—'কেন?' উত্তর—'মা অগঙ্গার দেশে যাইবেন না।' তিনি স্মিতমুখে—'আচ্ছা, এই মাত্র!' কৃষ্ণনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখি যে ডাইরেক্টর অ্যাট্‌কিন্‌সন্ (Atkinson) সাহেব আমাকে ঢাকা হইতে বদলি করিয়া দিয়াছেন।

"কলেজের প্রিন্সিপ্যাল কাপ্তেন রিচার্ডসন্ আমার মুখে সেক্ষপীয়রের আবৃত্তি শুনিয়া বড়ই প্রীত হইয়া আমাকে পঞ্চাশের মধ্যে (!) ষাট নম্বর দিলেন। 'মার্চ্যাণ্ট্ অভ্ ভেনিস্' আবৃত্তি করিতে দিয়াছিলেন। আমার মনে আছে, আমি 'In sooth' কথাটার অর্থ করিতে পারি নাই; আমার সতীর্থ বামাচরণ বলিতে পারিয়াছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রিন্সিপ্যাল কলেজের পূর্ব্বদিকের বারাণ্ডায় বসিয়া সেক্ষপীয়র পড়িতেন; ফল্‌ষ্টাফের বক্তৃতা পাঠ করিতে তিনি বড় ভাল বাসিতেন।"

উমেশবাবু একটু চুপ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিললাম—"তাঁহার চরিত্র কেমন ছিল?" দত্ত মহাশয় বলিলেন—"কাপ্তেন রিচার্ডসনের চরিত্রদোষ ছিল; তাঁহার রক্ষিতা এক বাঙ্গালিনী একটা স্বতন্ত্র বাড়ীতে ছিল; এ ব্যাপার চাপা রহিল না; বীটন্ সাহেব স্পষ্টই তাঁহাকে 'hoary-headed libertine' আখ্যা প্রদান করিলেন।

"কলেজে রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নিকটে দিন কতক 'Paradise Lost' পড়িয়াছিলাম। তাঁহার পড়াইবার ধরণ ছিল এক রকমের। কেতাবের ভাষা ব্যাখ্যা করার দিকে তাঁহার আদৌ লক্ষ্য ছিল না। কোনও একটা text অবলম্বন করিয়া তিনি বক্তৃতা দিয়া যাইতেন। যাহাতে ছেলেরা সুচরিত্র হইয়া উঠে, সেইরূপ উপদেশ তিনি দিতেন। তাঁহার অধ্যাপনায় তখন freethinking-এর ভাব খুব প্রকাশ পাইত। তাঁহার কথায় একজন বিচলিত হইয়াছিলেন,—তাহার নাম নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; বহুদিন পরে নগেনবাবু একজন ব্রাহ্ম প্রচারক হইয়াছিলেন। রামতনুবাবুর ভাই শ্রীপ্রসাদবাবু ইংরাজি reading পড়িতেন খুব ভাল; তিনি কলেজে কাপ্তেন রিচার্ডসনের আবৃত্তি শুনিতে যাইতেন। রামতনুবাবু যখন আমাদের শিক্ষক হইয়া আসিলেন, তখন প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন—রচ্‌ফোর্ট্ (Rochfort); হেড্‌মাষ্টার ছিলেন —হ্যারিসন্ (Harrison); গণিতের অধ্যাপক ছিলেন—ব্রাড্‌বেরি (Bradbury); সেক্ষপীয়র পড়াইতেন—বীন্‌ল্যাণ্ড সাহেব; একটি শ্লোকে ছেলেরা অধিকাংশ শিক্ষকের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল—

সেক্ষপীয়র পড়াতে বীন্‌ল্যাণ্ড।
বীট্‌সনের নাই জ্ঞানকাণ্ড॥
বীন্‌ল্যাণ্ডের লম্বা দাড়ি।
তা'র নীচে রামতনু লাহিড়ী॥
রামতনু লাহিড়ী সদাশয়।
তা'র নীচে দয়াল রায়॥
দয়াল রায়ের নাড়ী পট্‌কা।
তা'র নীচে গুরো হট্‌কা॥
গুরো হট্‌কার সদাই রোষ।
তা'র নীচে বেণী বোস॥
বেণী বোসের সদাচার।
তা'র নীচে গোবিন্দ কোঙার॥
গোবিন্দ কোঙারের মোটা বুদ্ধি।
তা'র নীচে গদাই চক্রবর্ত্তী॥
গদাই চক্রবর্ত্তীর পেটটা মোটা।
তা'র নীচে হরনাথ জ্যাঠা॥

"বীন্‌ল্যাণ্ড সাহেব দিব্য কলম কাটিতে পারিতেন। দয়াল রায় খুব মদ খাইতেন; গুরুচরণ চট্টোপাধ্যায় বেজায় লম্বা (হট্‌কা) ছিলেন। শ্লোকের শেষোক্ত শিক্ষকটির পূরা নাম ছিল হরনাথ মিত্র।

"কাপ্তেন রিচার্ড্‌সন্ ইংরাজি কাব্য খুব ভাল পড়াইতেন; Bacon's Essays-এর একটি সংস্করণ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। Kerr সাহেব বেকনের Novum Organum অনুবাদ করিয়াছিলেন। কলিকাতার ডফ্ কলেজের একজন অধ্যাপকও Bacon's Novum Organum অনুবাদ করিয়াছিলেন; কার্ সাহেবের চেয়ে তাঁহার অনুবাদ ভাল হইয়াছিল।

"গ্রীষ্মকালে আমাদের কলেজ বন্ধ হইত না; প্রাতে স্কুল বসিত। পূজার সময় ছুটি হইত; ছুটির পূর্ব্বেই পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ছেলেরা কলেজ পরিত্যাগের পরেও ৩।৪ বৎসর সিনিয়র্ বৃত্তি ভোগ করিত। হুগলি কলেজের একটি ছেলে একাদিক্রমে ছয় বৎসর উক্ত বৃত্তি ভোগ করিয়াছিলেন। বীটন্ সাহেব বলিতেন,—এভাবে বৃত্তি দেওয়া অনুচিত।

"সীনিয়র্ পরীক্ষার জন্য আমরা পড়িতাম—

Mill's Logic.

Adam Smith's Theory of Moral Sentiments.

Reid's Inquiry.

Arnold's History of Rome.

Elphinstone's History of India.

History of England. (কোনও পুস্তকের নাম করা ছিল না ; কোনও একটা period নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইত।)

Mathematics-Arithmetic হইতে Integral calculus পর্য্যন্ত (Pure and Mixed)

Richardson's Selections.—ড্রাইডেন, পোপ প্রভৃতি কবির অধিকাংশ রচনাই পড়িতে হইত।

"সংস্কৃত পড়িবার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু তাহা অবশ্যপঠিতব্য নহে,—optional। গণিতশাস্ত্রে আমার সতীর্থ অম্বিকাচরণ ঘোষ সর্ব্বাপেক্ষা পারদর্শী ছিলেন ; আমাদের গণিতের অধ্যাপক হ্যারিসন্ সাহেব খুব পাকা লোক ছিলেন। সীনিয়র্ পরীক্ষায় মৌলিক ইংরাজি রচনায় আমি ৫০-এর মধ্যে ৪৭ পাইয়াছিলাম। আমার প্রশ্নোত্তরগুলি শিক্ষাসমিতির বাৎসরিক রিপোর্টেও (Principal Kerr's Reports of Public Instruction in Bengal 1831-1850) কিছু কিছু আছে।

"সে সময়ে আর একটা পরীক্ষা ছিল, তাহার নাম লাইব্রেরী-পরীক্ষা। সীনিয়র্ পরীক্ষার জন্য যে সকল পুস্তক পাঠ করিতে হইত, তদতিরিক্ত বহু গ্রন্থ লাইব্রেরী হইতে বাছাই করিয়া লইয়া আয়ত্ত করিতে হইত। ১৮৫০ সালে আমি দর্শন শাস্ত্রে লাইব্রেরী-পরীক্ষা দিলাম ; শতকরা এক শত নম্বর আদায় করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিলাম ; স্বর্ণপদকও পাইলাম। কলেজে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন—অম্বিকাচরণ ঘোষ ও রাসবিহারী বসু। রাসবিহারী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া অনেকদিন কাজ করিয়াছিলেন ; তাঁহার মত নির্ভীক ডেপুটি প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। যখন তিনি কটকে ছিলেন, তত্রত্য কলেক্টর মেট্কাফ সাহেবের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য হয় ; কলেক্টর সাহেব তাঁহার বিরুদ্ধে বোর্ডের নিকট রিপোর্ট করেন ; রাসবিহারীর কৈফিয়ৎ তলব করা হয় ; তাঁহার বক্তব্য পাঠ করিয়া বোর্ড স্বীকার করিল যে কলেক্টরই অন্যায় করিয়াছেন। রাসবিহারীর ভ্রাতুষ্পুত্র রায় বাহাদুর প্রসন্নকুমার বসু স্বনামধন্য হইয়াছেন।

"আর অম্বিকাচরণ? লাইব্রেরী-পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

তিনি যে আমার জীবনে কতখানি স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা আর তোমায় কি বলিব! আমি তাঁহাকে বড় ভালবাসিতাম। পরীক্ষার কিছু পূর্ব্বে বসন্তরোগে তিনি শয্যাগত হইলেন। এখানে তাঁহার আত্মীয় পরিজন ছিল বটে, কিন্তু আমি সমস্ত রাত্রি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিতাম। আমার শুভানুধ্যায়ী আত্মীয়গণ অনেক নিষেধ করিতেন; আমি তাহাতে কর্ণপাত করিতাম না। শেষে তাঁহারা আমাকে আমাদের ক্ষুদ্র কুঁড়ে ঘরে বন্দী করিয়া রাখিলেন। আমি উন্মত্তের মত সেই ঘরের অপেক্ষাকৃত একটা জীর্ণ অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া অম্বিকার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। অম্বিকাচরণকে সেবা করিবার অধিকার হইতে আমাকে বঞ্চিত করিবার সাধ্য কাহারও ছিল না। কিন্তু তাঁহাকে বাঁচান গেল না। প্রাণপণ প্রয়াস ব্যর্থ হইল। আমার খুব জ্বর হইল। লোকে ভাবিল আমারও বসন্ত হইল। আমি কিন্তু সে যাত্রা রক্ষা পাইলাম।

"১৮৫৬ সালে মহারাজের দত্ত ভূমির উপরে কলেজের নূতন বাড়ী নির্ম্মিত হইবার কালে আমরা অম্বিকাচরণের স্মৃতিরক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইলাম। তাঁহার সতীর্থ ছাত্রেরা চাঁদা তুলিল। একটি tablet-এ কত খরচ হইবে, তাহা আমরা জানিতাম না। শিক্ষাসমিতির সভাপতি বীটন্ (Bethune) সাহেবকে জানাইলাম। তিনি বলিলেন, 'তোমরা যে টাকা তুলিয়াছ তাহা আমাকে পাঠাইয়া দাও; অকুলান হইলে আমি বুঝিব।' (I will see; send what you have raised.) বাহিরের লোকেও চাঁদা দিয়াছিল। আমার মনে আছে ডাক্তার আর্চার দশ টাকা দিয়াছিলেন। তাঁহার এবং বীটন্ সাহেবের ইচ্ছা ছিল, ভাষাটা একটু পরিবর্ত্তন করিয়া—'fellow students of the Krishnagar College'-এর পরে 'and admirers' এই দুটি শব্দ বসাইয়া দেওয়া হয়; কিন্তু তাহাতে খরচ আরো বেশী হইবার ভয়ে আমরা রাজী হইলাম না। সকলের শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ এই tablet-টি প্রাচীরগাত্রে বসান হইল—

"This tablet is erected to the memory of Ombica Charan Ghose by his fellow students of the Krishnagar College as mark of their respect for his character and regret for his untimely death.

Died 26th March 1850, aged 20 years."

"অম্বিকাচরণের সহিত আমার নিবিড় সখ্যভাবের কথা পূর্ব্বেই বীটন্ সাহেবের কর্ণগোচর হইয়াছিল। এডুকেশন কাউন্সিলের রিপোর্টে দেখিতে পাইবে, তিনি বক্তৃতা করিতে করিতে আমাকে বলিলেন—'And you, Omesh Chunder Dutt, whom I have so often had occasion to mark out for praise, be assured of this, that not even in that moment, which you probably thought the proudest in your life, when from this place I hailed you as the

first scholar of your year throughout Bengal, not even then did I look on you with so kindly a feeling or so hearty a desire to serve you, as when I heard of your affectionate kindness to your dying friend and competitor; when I learned how carefully you had tended him in his malignant disorder, undeterred by the terror of contagion, which is so often powerful enough to break through stronger natural ties than those which bound you to your departed friend. I doubt not that your own approving censcience has already amply rewarded you; for it is in the plan of the Allwise contriver of the world that every sincere act of kindness to a fellow-creature carries with it its own peculiar inimitable joy; but it is also my pleasing right to tell you that your behaviour in this matter has not been unobserved, and that by it you have raised yourself higher in the good opinion of those whose good opinion I believe you are deisrous of deserving. May such examples multiply among us! May we have such students as Ombica Charan Ghose! May your conduct, one towards another, be so marked with brotherly love that it shall cease to call for particular notice or special commendation. Let these be the fruits of knowledge, and who shall then venture to say that a blessing is not upon the tree.'*

"অম্বিকার ও আমার নাম আমাদের এ অঞ্চলের অনেক কবিতায় গ্রথিত হইয়া গিয়াছিল। দ্বারকানাথ অধিকারীর 'সুধীরঞ্জন' নামক কবিতাপুস্তকের একটা লাইনে অম্বিকা উমেশ নাম দুটি পাশাপাশি বসান ছিল।

"যশোহর জেলার চৌগাছায় অম্বিকার বাড়ী ছিল। চৌগাছার ঘোষেদের অনেকেই তখন এখানে থাকিতেন। অম্বিকা ঈশ্বর ঘোষের বাড়ীতে থাকিতেন। ঈশ্বর ঘোষ গোবরডাঙ্গার কালীপ্রসন্নবাবুর কৃষ্ণনগরের মোক্তার ছিলেম। তাঁহার বাড়ীতে ২৪।২৫ জন লোক দুই বেলা আহার করিত। গোবরডাঙ্গার বাবুদের দেওয়ান ছিলেন—রাধাকৃষ্ণ ঘোষ। কৃষ্ণনগরের সরকারী উকিল ছিলেন—তারিণীপ্রসাদ ঘোষ। তারিণীপ্রসাদ বেশ বুদ্ধিমান ছিলেন; বেশ বক্তৃতা করিতে পারিতেন; মাঝে মাঝে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য আমি আদালতে যাইতাম। তাঁহার পুত্র গিরীন্দ্রপ্রসাদ দুটি শিশু সন্তান রাখিয়া অল্প বয়সেই মারা যান। সেই দুটি ছেলে,

* মাইকেল মধুসূদনের জীবন-চরিত-রচয়িতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু তাঁহার কবিতাপ্রসঙ্গ দ্বিতীয় ভাগের মুখবন্ধে এই আদর্শ বন্ধুত্বের কথা আলোচনা করিয়া এডুকেশন রিপোর্টের এই অংশটি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন।

দেবেন্দ্রপ্রসাদ ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ, কলিকাতাতে থাকে। অম্বিকার দুইটি সহোদর ও একটি বৈমাত্রেয় ভাই ছিল—উমাচরণ, কালীচরণ, শ্যামাচরণ। উমাচরণ জমিদারি বিষয়কর্ম্ম দেখিতেন! কালীচরণ প্রথমে ওকালতি করিয়া পরে অনেকদিন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়াছিলেন।

"অম্বিকার মৃত্যুর পর তাঁহার দিদি আমাকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, 'অম্বিকা নাই ; তুমি এস ; তোমাকে দেখিলেই আমি ভাইয়ের শোক ভুলিতে পারিব।' চৌগাছায় গিয়া আমি দিনকতক কাটাইলাম। আর একবার চট্টগ্রাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় সেখানে গিয়াছিলাম। কপোতাক্ষীর জল কত স্বচ্ছ ও নির্ম্মল ছিল তাহা তোমরা কল্পনা করিতে পারিবে না। একদিন এপার ওপার সাঁতার দিতেছিলাম ; আমার পায়ে শৈবালদাম এমন ভাবে জড়াইয়া গেল যে আমার ডুবিয়া যাইবার আশঙ্কা হইল ; কালীচরণ একখানা নৌকা আনিয়া আমাকে উঠাইয়া লইলেন। এখন আর সে চৌগাছা নাই। চৌগাছার কথা ভাবিলে একটা বৈষ্ণব গান মনে আসে—

আমি দেখে এলাম শ্যাম,
তোমাব বৃন্দাবন ধাম,
কেবল নামটি আছে।

"আমার জীবনের এই সমস্ত পুরাতন কাহিনী দেশের লোককে শুনাইতে আমার বড় একটা ইচ্ছা হয় না। আমার সমবয়স্ক কেহ বোধ হয় এখন জীবিত নাই। আমার মনে হয় আমি একটা মস্ত anachronism। যে কয়টা দিন বাঁচি the world forgetting and by the world forgot হইয়া বাঁচিতে ইচ্ছা হয়।

"আমার পূর্ব্বে ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, চুণীলাল গুপ্ত, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর গুপ্ত (বরদার দেওয়ান শ্রীযুক্ত বিহারিলাল গুপ্তের পিতা) ও প্রসন্নকুমাব সর্ব্বাধিকাবী (১৮৪৮) সীনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন। আমার পরবৎসব, ১৮৫০ সালে শ্রীনাথ দাস প্রথমস্থান অধিকার করেন। আমার দু'তিন বৎসর পবে দ্বারকানাথ মিত্র ও পূর্ণচন্দ্র সোম (হুগলি কলেজে ইহারা সতীর্থ ছিলেন) উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

"এতদিন জুনিয়র ও সিনিয়র বৃত্তির টাকায় সংসার চালাইতে হইতেছিল ; এখন চাকরি অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। তখনকার Council of Education-এর সেক্রেটারি কাপ্তেন হেস্ (Captain Hayes) ১৮৫১ সালে চট্টগ্রামের স্কুলে একশত টাকা বেতনে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে আমাকে নিযুক্ত করিলেন। শিক্ষাবিভাগে মদ্যপান অতীব গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইত। চট্টগ্রাম স্কুলের শিক্ষক M'C Carthy সাহেব

মদ খাইয়া স্কুলে আসিতেন ; বিভাগীয় কমিশনর Sconce সাহেব তাঁহার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিলেন ; M'C Carthy পদচ্যুত হইলেন ; আমি তাঁহার পদ অধিকার করিয়া বসিলাম।

"ইংরাজ অধ্যাপকদিগের নৈতিক দৌর্ব্বল্যের একটু কারণ ছিল ; তাঁহারা প্রায় সকলেই অবিবাহিত ছিলেন ; Nesfield সাহেব বিবাহ করেন—অনেক দিন পরে।

"স্কুল গুলির উপর গভর্মেণ্টের খুব দৃষ্টি ছিল, তাহা তুমি বেশ বুঝিতে পারিতেছ। অনেক সরকারী স্কুলে খুব ধুমধামের সহিত সরস্বতী পূজা হইত ; গভর্মেণ্টের আপত্তি ছিল না। কৃষ্ণনগর কলেজে হইত না বটে, কিন্তু দুর্গাদাস চৌধুরীর মুখে শুনিয়াছি যে রামপুর বোয়ালিয়ার হেড্‌মাষ্টার সারদা চরণ মিত্র, স্কুলের মধ্যেই খুব জাঁকজমক করিয়া সরস্বতী পূজা করিতেন ; শেষাশেষি স্থানান্তরে পূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

"চট্টগ্রামে কয়েক মাস কাজ করিয়া আমি এখানে বদলি হইয়া আসি। কিছু দিন পরে আমার বেতন দেড়শত টাকা হইল। একদিন আমার উপর আদেশ হইল যে, হুগলিতে ভূদেববাবুর নর্ম্যাল স্কুল পরীক্ষা করিতে হইবে। ভূদেববাবু ইন্‌স্পেক্টর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি আমার স্কুল পরীক্ষা করিবেন?' লজ্ সাহেব বলিলেন, 'না ; আমি উমেশচন্দ্র দত্তকে পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করিব।' আমি যথারীতি পরীক্ষা ব্যাপার সম্পাদিত করিলাম। শুনিলাম যে সেই সময়ে সেখানে Teachership পরীক্ষা হইবে। একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে, Sutcliffe সাহেব তাহার প্রেসিডেণ্ট ; ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, Lodge ও Thwayte সাহেব পরীক্ষক। আমি ভাবিলাম মন্দ কি? পরীক্ষাটা দেওয়া যাউক। আরও ৫০।৬০ জন পরীক্ষার্থী ছিলেন। কাগজে-কলমে ও মৌখিক পরীক্ষার পর আমাকে একটা ক্লাস পড়াইতে দেওয়া হইল। কুড়ি একুশ বৎসর বয়সের কতকগুলা দুষ্ট ছেলেকে একত্র করিয়া একটা ক্লাস গঠিত করা হইল। ঘরে প্রবেশ করিবার পর তাহারা খুব গোলমাল করিতে লাগিল ; সট্‌ক্লিফ সাহেব তাহাদিকে চুপ করিতে বলিলেন। আমি সাহেবকে বলিলাম—'আপনি কথা কহিলেন কেন? আমাকে নিযুক্ত করিবার সময় গভর্মেণ্ট ত একজন পুলিশ সার্জ্জেণ্ট আমাকে দেন নাই ; গোলমাল আমাকেই থামাইতে হইবে।' কিছুক্ষণ পরে ক্লাসটা নিস্তব্ধ হইল ; আমার অধ্যাপনায় সটক্লিফ-প্রমুখ পরীক্ষক মণ্ডলী খুসী হইলেন।

"হুগলি হইতে নৌকাযোগে কলিকাতায় গিয়া তদানীন্তন শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর ইয়ং সাহেবের সহিত দেখা করিলাম। তিনি বলিলেন—'তোমার পরীক্ষার ফল কি?' আমি উত্তর দিলাম, 'জানিনা ; তবে বোধ হইল পরীক্ষকগণ

খুসী হইয়াছেন।' তিনি বলিলেন—'তুমি হুগলিতে ফিরিয়া যাও; তোমার পরীক্ষার ফল আমাকে শীঘ্র অবগত করাইবে।' হুগলিতে ইন্‌স্পেক্টর লজকে সকল কথা বলিয়া আমি দেশে ফিরিয়া আসিলাম।

"সেই সময়ে ক্লার্মণ্ট (Clermont) নামক একজন ইংরাজ শিক্ষক তিন শত টাকা বেতন পাইতেন; তাঁহার একটু পানদোষ ছিল; প্রায়ই সোমবার দিন যথাসময়ে তাঁহার স্কুলে আসা ঘটিয়া উঠিত না। তাঁহার বিরুদ্ধে রিপোর্ট হইল। তিনি বলিলেন যে শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন স্কুলে আসিতে পারেন নাই। ডাক্তারের সার্টিফিকেট লইতে আদেশ হইল। তাঁহার স্ত্রী ডাক্তার সাহেবকে (Dr Palmer) সার্টিফিকেটের জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। ডাক্তার মিথ্যা সার্টিফিকেট দিতে রাজি হইলেন না। ক্লার্মণ্টের পদাবনতি ঘটিল। ফলে বীটসন্ সাহেব ২০০৲ টাকা হইতে ৩০০৲ টাকায় উন্নীত হইলেন; আমি বীটসন্ সাহেবের পদে উন্নীত হইলাম।"

তিন

আজ প্রাতে চা খাওয়ার পর আচার্য্য দত্ত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তখনকার দিনে কলিকাতা যাওয়াআসা আপনাদের নৌকাযোগে হইত?" তিনি বলিলেন, "হাঁ। আমরা নৌকায় আনাগোনা করিতাম। নাকাশিপাড়ার বাবুদের বাড়িতে এক চাকর ছিল; সে পদব্রজে কলিকাতায় যাইত। ভোর বেলায় রওনা হইয়া সন্ধ্যার পর কলিকাতায় পৌঁছিত; পরদিন ফিরিয়া আসিত। তাহার পর পাঁচ ছয় দিন সে আর বাড়ি হইতে বাহির হইতে পারিত না। এখান হইতে নৌকাযোগে শান্তিপুরে যাইতে দেড় দিন লাগিত; নৌকায় চার পাঁচবার শান্তিপুরে গিয়াছি; পদব্রজে যাওয়াই আমাদিগের অভ্যাস ছিল; দিগ্‌নগরে তামাকু সেবনের একটা আড্ডা ছিল। অনেকে নবদ্বীপে গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়িতে আসিয়া পূজা করিত। কোনও বৈদ্যসন্তান ত্রিসন্ধ্যা না করিয়া জলস্পর্শ করিত না; সকলেই টিকি রাখিত। প্রত্যেক গৃহস্থের গরু ছিল; গোয়ালাকে মাসে এক আনা দিলে মাঠে গরু চরাইয়া লইয়া আসিত; চাউল কেনা হইত; আউস ধান এখানকার কেহ খাইত না। আট দশ জন ব্রাহ্মণ প্রত্যহ আনন্দময়ীর ভোগ খাইতে পাইতেন। তখনকার দিনে কেবল মাত্র কবিরাজি চিকিৎসাই প্রচলিত ছিল; নাপিতে ফোড়া কাটিত। তখনকার প্রধান রোগ ছিল জ্বর। কবিরাজ জ্বরকে সহজে জব্দ করিতে পারিতেন না; কেবলই লঙ্ঘন[১] ও খই-বাতাসা পথ্যের ব্যবস্থা করিতেন। প্রায় ৪০ বৎসর হইল, এখানে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। যে বৎসরে প্রথম ম্যালেরিয়া দেখা দিল, সে বৎসরে ইহার প্রকোপ বড় বেশী হয় নাই; পর বৎসরে অত্যন্ত ভীষণ হইয়াছিল; ১৮৮০ সাল হইতে ক্রমাগত চলিয়াছে; তবে ১৮৬০-৬৫ মধ্যে এক বছর ম্যালেরিয়া দেখা দিয়াছিল।"

আচার্য্য মহাশয় চুপ করিলেন। ......পরদিন আমি বলিলাম—"বীট্‌সনের পদে আপনি উন্নীত হইলেন, এই পর্য্যন্ত কাল বলিয়াছেন তার পরে?" তিনি ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—"১৮৬৪ সালে বীট্‌সনের মৃত্যু হইল; আমার তিন শত টাকা বেতন হইল। ১৮৬৬ সালে আমি ঢাকা কলেজের হেড মাষ্টার হইয়া তথায় বদলি হইয়া গেলাম। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' তৎপূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল; বইখানির আবির্ভাবে সর্ব্বত্রই একটা চাঞ্চল্যের লক্ষণ দেখা গিয়াছিল! ভাষার জন্য নহে। ভাষা হিসাবে 'আলালের ঘরে দুলাল' খুব ভাল বই ছিল।

---

[১] উপবাস।—সং

"ঢাকায় আমি প্রায় এক বৎসর ছিলাম। সে বৎসর উড়িষ্যায় বিষম দুর্ভিক্ষ। কলেজের প্রিন্সিপাল ব্রেন্নাণ্ড্ (Brennand) সাহেব লেখা-পড়া বেশী জানিতেন না; গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। শাসনটা তাঁহার কিন্তু খুব কড়া ছিল। তাঁহার মত কৃপণ প্রায় সচরাচর দেখা যায় না; কলেজের বাবদে খরচ করিতে তিনি সম্পূর্ণ নারাজ ছিলেন। আমাকে ইংরাজি সাহিত্য পড়াইতে হইত; কিন্তু লাইব্রেরিতে একখানিও Reference বই খুঁজিয়া পাইতাম না; যতদিন আমি ছিলাম, একখানিও পুস্তক কেনা হইল না; পরে শুনিলাম যে, ক্রফ্‌ট্ (Croft) সাহেব লাইব্রেরির আমূল সংস্কার সংসাধিত করেন। আমি যে চেয়ারে বসিতাম, সেটি ভাঙ্গা ছিল; সাহেব কিছুতেই একটা নূতন চেয়ার ক্রয় করিলেন না, মিস্ত্রী আনাইয়া অল্প খরচে এক রকম সারাইয়া লইলেন। তিনি নিজে খুব শারীরিক পরিশ্রম করিতে পারিতেন, সর্ব্বদাই মজুরের মত খাটিতেন। তাঁহার পরিবার তখন বিলাতে; আমি ঢাকা হইতে চলিয়া আসিবার কিছু পরেই তিনিও বিলাতে চলিয়া গেলেন।

"ইংরাজি সাহিত্যের একজন ইংরাজ অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহার নাম জর্জ্জ বেলেট্ (George Bellet)। তিনি খুব পণ্ডিত ছিলেন; মেজাজটা কিছু গরম; কিন্তু স্বভাবটা যেন একটু ফচ্‌কে গোছের ছিল। আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতে যখন পড়াইতাম, তিনি একটা পাসের ঘর হইতে আড়ি পাতিয়া শুনিতেন। অনেক দিন পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন ভূতপূর্ব্ব ছাত্র—চণ্ডীচরণ চট্টপাধ্যায়ের মুখে শুনিয়াছি যে বেলেট তাহাকে বলিয়াছিলেন—'সেক্ষপীয়র বাঙ্গালীর মধ্যে উমেশচন্দ্র দত্ত জানে, আর কেহ জানে না।' চণ্ডীচরণ তখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। ঢাকায় আমার বাসা তত্রত্য Law Lecturer উপেন্দ্র মিত্রের বাড়ির পাশে ছিল। সে সময়ে গোয়ালন্দ হইতে ষ্টীমার যাইত না; কুষ্টিয়া হইতে ঢাকা অভিমুখে যাত্রা করিতে হইত।

আমি কৃষ্ণনগরে ফিরিয়া আসিলাম। লেথব্রিজ,—Roper Lethbridge সাহেব তখন প্রিন্সিপ্যাল। কলিকাতা হইতে অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার Lethbridge সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন; আমার বাড়িতে আসিয়া আমার সহিত দেখা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর উড্রো (Woodrow) সাহেব তাঁহার পদে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন; লালবিহারী দেকে দিলেন না। সেপ্টেম্বর মাসে প্যারীচরণের মৃত্যু হয়; নবেম্বর মাসে আমি তাঁহার পদে উন্নীত হই। লেথব্রিজ সাহেব ছয় মাসের ছুটি লইলেন; আমি তাঁহার স্থানে officiate করিতে আরম্ভ করিলাম; তিনি নিজে জোর করিয়া আমাকে ধরিয়া বসিলেন যে, তাঁহার অনুপস্থিতিতে আমি যেন প্রিন্সিপ্যালের কাজ করি। বাহির হইতে আর কেহ আসিয়া

officiate করেন, ইহা তাঁহার আদৌও ইচ্ছা নহে; সুতরাং ডাইরেক্টরকেও তাঁহার অনুমোদন করিতে হইল। এমন সময় প্যারীচরণ সরকারের পদ খালি হইল। সট্‌ক্লিফ (Sutcliffe) সাহেব এক জন ইংরেজের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন; লেথব্রিজ আমার জন্য জিদ করিয়া বসিলেন; উড্রো সাহেবেরও ঝোঁক আমার দিকে। তিনি আমাকে বলিলেন—What is Lal Behari De's qualification? He has written one book; You could write twenty books. লর্ড ইউলিক্ ব্রাউন (Lord Ulick Brown) তখন মুস্থরি পাহাড়ে ছিলেন; পূর্ব্বে মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে অনেকবার তাঁহার সহিত বাদানুবাদ করিয়াছি; তিনি আমাকে লিখিলেন,—'শুনিলাম তুমি কলেজে প্রিন্সিপ্যালের কাজ করিতেছ, তোমার বেতন বৃদ্ধি হইল কি?' উত্তরে আমি লিখিলাম, 'উক্ত পদে আমি ছয় মাসের জন্য অস্থায়ী ভাবে কাজ করিতেছি, বেতন বৃদ্ধি হয় নাই; কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজে একটা পদ খালি হইয়াছে, সেটার জন্য আপনি বোধ হয় কিছু চেষ্টা করিতে পারেন।' তিনি একেবারে স্যার রিচার্ড টেম্পল্‌কে আমার জন্য লিখিলেন। আমার বেতন বৃদ্ধি হইল; কিন্তু আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে গেলাম না। লালবেহারী দে ও মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন হটিয়া গেলেন। ন্যায়রত্নের জন্য কলিকাতার কয়েকটি সাহেব চেষ্টা করিয়াছিলেন।

"সটক্লিফ সাহেব কৃষ্ণনগর কলেজের উপর বেজায় চটা ছিলেন। হিন্দু কলেজের প্রতিদ্বন্দ্বী আর কোনও ভাল কলেজ থাকিতে পারে, ইহা তাঁহার সহ্য হইত না; অনেক সময়ে আমাদিগকে লজ্জা দিবার চেষ্টা করিতেন। একবার ডাইরেক্টর ইয়ং (Young) সাহেব প্রিন্সিপ্যাল লজ্‌কে (Lodge) জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন—'আপনার কলেজের পরীক্ষার ফল ভাল হয় নাই; ইহার কারণ কি?' সাহেব আমাকে ডাইরেক্টরের পত্র খানি দেখাইয়া বলিলেন—'ইহার উত্তরে কি লিখিয়াছি দেখিবে?' দেখিলাম তিনি লিখিয়াছেন—'আমি কাহারও নিকট হইতে কিছুমাত্র অনুগ্রহ চাহি না; আমি চাহি fair play; আমি আর উমেশ দত্ত থাকিলে কিছু ভয় করি না। আমার ছাত্র যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় ও কালিদাস দত্তকে দশ টাকা বৃত্তি ঘুস দিয়া আমার কলেজ হইতে তোমাদের কলিকাতার কলেজে লইয়া গেলে; আগামী বৎসরে তাহাদের নিকটে আমাদের কলেজ পরাজিত হইবে।'"

আচার্য্য দত্ত মহাশয় একটু চুপ করিলেন; পরক্ষণেই উত্তেজিত স্বরে বলিলেন,—"আজ কাল কৃষ্ণনগর কলেজের বিরুদ্ধে অনেকেই অনেক কথা বলিয়া থাকেন; কিন্তু একবার কেহ ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি, যে এই দুর্গতির জন্য কে দায়ী? কেন কলেজের এই দুরবস্থা হইল? এ অঞ্চলের লোক কি

পূর্ব্বাপেক্ষা লেখাপড়ার জন্য কম আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন? কলিকাতার Council of Education-এর অধিকাংশ সদস্যের মতের বিরুদ্ধে যে কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল যে কলেজ কলিকাতার হিন্দু কলেজের এক মাত্র প্রবল ও প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও কাউন্সিল অব্ এডুকেশনের সদস্য সটক্লিফ সাহেবের চক্ষুশূল হইয়াছিল; সে কলেজ এখন উঠাইয়া দিতে পারিলেই যেন একটা অনাবশ্যক ব্যয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়!" একটু সামলাইয়া লইয়া দত্ত মহাশয় বলিতে লাগিলেন—"Lodge আমাকে বড় খাতির করিতেন। একবার তিনি শুনিলেন যে আমার অসুখ হইয়াছে; তখনও ছুটির জন্য দরখাস্ত কবি নাই; তিনি আমাকে লিখিয়া পাঠাইলেন—'শুনিলাম তোমার অসুখ হইয়াছে; কলেজে এস না, আমি রীতিমত বন্দোবস্ত করিয়া লইব।' তিনি প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত অশ্রান্তভাবে কলেজের কাজ করিতেন।

"ছয় মাস বিদায়ের পব বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া লেথব্রিজ সাহেব কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন; আমি তাঁহার আসিষ্ট্যাণ্ট হইলাম। হেডমাষ্টার হইলেন বীরেশ্বর মিত্র। বীরেশ্বর বহরমপুব হইতে আসিয়াছিলেন। একটা বিশেষ কারণে তিনি অকালে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। লব (Lobb) সাহেব যখন প্রিন্সিপ্যাল, তখন আমাকে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে লইয়া যাইবাব প্রস্তাব হয়; লব বলিলেন—'উমেশ দত্তকে এখান হইতে লইয়া গেলে আমার একজন ইংরাজ অধ্যাপক চাই, নইলে আমি তাহাকে ছাড়িতে পারি না।' লব Positivist ছিলেন; তাঁহার পাণ্ডিত্যও প্রগাঢ় ছিল; বাইবেল তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল; কিন্তু সেক্ষপীয়বে দখল তাঁহার তাদৃশ ছিল না। একদিন আমাকে বলিলেন—'দেখ, এই জায়গাটায় "so" শব্দটার অর্থ যদি "if" করা যায়, তাহা হইলেই একটা মানে দাঁড় করান যাইতে পারে; "So" শব্দের if অর্থে ব্যবহার সেক্ষপীয়র কোথাও করিয়াছেন কি?' আমি তৎক্ষণাৎ সেক্ষপীয়রের কাব্য হইতে কয়েকটি passage আবৃত্তি করিয়া দিলাম। তিনি খুব খুসী হইলেন। পরে যখনই আট্‌কাইত, তখনই আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন।

"১৮৭৪ সালে আমি আবার প্রিন্সিপ্যালের পদে officiate করিলাম। লেথব্রিজ সাহেব আমাকে বলিলেন, 'I will resist your being superseded unless it is by a Cambridge man;' তিনি কেম্ব্রিজ হইতে এখানে আসিয়াছিলেন; ইতিহাসের চর্চ্চা করিতেন, গণিত শাস্ত্রে অজ্ঞ ছিলেন; এক ঘণ্টা কেবল দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়াইতেন; ইংরাজি সাহিত্য অধিকাংশ আমাকেই অধ্যাপনা করিতে হইত; সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন। যখন তিনি এখানে আসিলেন, তখন

তাঁহার নাম Ebenezzar Lethbridge ; তাঁহার স্ত্রীর কাকা Roper মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে যান ; সেই সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া তাঁহার নাম হইল Roper Lethbridge ; ঐ সম্পত্তির জন্য তাঁহাকে প্রতি বৎসর বিলাত যাইতে হইত। স্যর রিচার্ড টেম্পলের তিনি বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন ; স্যর রিচার্ড তাঁহার গোপনীয় চিঠিপত্রগুলিও স্যর রোপারকে দেখাইতেন। কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করার পর বিলাত হইতে তিনি বরাবর আমাকে চিঠি লেখেন, Christmas Card পাঠান ; কেবল ১৯১২ সালে তাঁহার নিকট হইতে বড়দিনে কার্ড পাই নাই।"

অধ্যাপক দত্ত মহাশয় একটু চুপ করিলেন। আমি বলিলাম—"ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতে বাঙ্গালীর সহিত সাহেবদের ব্যবহার বেশ ভাল ছিল বলিয়াই ত বোধ হয়।" তিনি বলিলেন—"তখনকার সাহেবেরা খুব উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। একটা বিষয় আমি লক্ষ্য করিয়াছি,—কোম্পানির আমলের সাহেব কর্ম্মচারী ও Crown-এর আমলের সাহেব কর্ম্মচারী যেন সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির বলিয়া মনে হয়।"

প্রশ্ন করিলাম—"কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায়ের[১] সহিত আপনার আলাপ ছিল কি ?" দত্ত মহাশয় বলিলেন—"কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আমার আলাপ পরিচয় ছিল না ; আমি তাঁহার একখানি বই কিনিবার জন্য একবার তাঁহার বাড়িতে গিয়াছিলাম। তিনি খুব পণ্ডিত ছিলেন ত বটেই, খুব স্বদেশহিতৈষীও ছিলেন। Black Act-এর[২] গোলোযোগের সময় তিনি নির্ভীকভাবে রামগোপাল ঘোষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। রামগোপাল ঘোষের সহিত আমার আলাপ পরিচয় ছিল। তিনি রামতনুবাবুর বন্ধু ; বীটন্ সাহেবের বাড়িতে তাঁহার সহিত আমার দেখা হয়। রামগোপাল বিরাট সভায় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদিগকে খুব দুকথা শুনাইয়া দেন। Dr Mouat সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন, 'It is a proud day for your country men.' কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায় খৃষ্টান পাদরি হইলেও ইংরাজের গির্জ্জায় বক্তৃতা করিতে পারিতেন না। তাঁহার

[১] রেভঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।—সং

[২] "১৮৪৯-৫০ সালে গবর্ণর জেনারালের ব্যবস্থাপক সভাতে কয়েকখানি আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হয়। ভারতবাসী ইংরাজদিগকে এদেশীয়দিগের সহিত বিরোধস্থলে কোম্পানির ফৌজদারী আদালতেরও দণ্ডবিধির অধীন করাই ঐ সকল পাণ্ডুলিপির উদ্দেশ্য ছিল। এদেশীয়দিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা ঐ আইনের লক্ষ্য ছিল। ইহাতে কলিকাতাবাসী ইংরাজগণ ঐ সকল পাণ্ডুলিপির 'কালা কানুন' (Black Acts) নাম দিয়া তদ্বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন করেন।" (শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ') —সং

জন্য হেদুয়ার নিকটে স্বতন্ত্র গির্জ্জাঘর নির্ম্মিত হইল। অধ্যাপক রচফোর্ট (Rochfort)
একদিন আমাকে বলিলেন—'বিলাতে আমি কে, এম, ব্যানার্জ্জির নাম শুনিয়াছিলাম।
এখানে আসিয়া আমার বড় ইচ্ছা হইল যে, কলিকাতায় তাঁহার চর্চ্চে গিয়া তাঁহার
বক্তৃতা শুনিয়া আসি। রবিবারে তাঁহার চর্চ্চে গিয়া বসিলাম; চক্ষু মুদ্রিত করিলাম,
পাছে বক্তার কালো রংটায় আমার মনে ভাবান্তর উপস্থিত করে। যাহা শুনিলাম,
তাহা ইংরাজের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর Sermon অপেক্ষা কম উপাদেয় বলিয়া বোধ হইল না।'

"রামতনুবাবুকে আমি খুব শ্রদ্ধা করিতাম। পেন্সন্ লইয়া যতদিন তিনি
এখানে ছিলেন, আমার বাড়িতে প্রায়ই আসিতেন। তাঁহার পিতা পূজা-আহ্নিক
লইয়াই থাকিতেন। রামতনুবাবু কাশী গিয়া পৈতাগাছটি ফেলিয়া দিয়া আসেন।
বাপ পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন; তিনি বাপের সহিত তর্ক করিতে লাগিলেন।
দেশে ফিরিয়া আসিলে তিনি পৈত্রিক বাড়িতে স্থান পাইলেন না; আলাদা বাড়িতে
তাঁহাকে থাকিতে হইল; সে সময়ে তাঁহার খুব কষ্ট হইয়াছিল। চাকর মিলিত না;
কলেজের ছেলেরা তাঁহার সেবা পরিচর্য্যা করিত। এই পৈতাত্যাগ প্রসঙ্গে একদিন
তাঁহার সহিত আমার খুব তর্ক হইয়াছিল। তিনি বলিলেন,—'আমার conviction-এর
বিরুদ্ধে আমি কাজ করিতে পারি না।' আমি বলিলাম—'বাপ আপনাকে শুধু
পৈতাটা রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন বৈ ত নয়! conviction-এর নিকটে
natural tenderness-কে sacrifice করায় কতটা পৌরুষ আছে বলা যায় না।'
পৈতাত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু অনেকদিন পরে তাঁহার প্রথমা কন্যার বিবাহ দেন
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ঘরে।"

আচার্য্য দত্ত মহাশয় একটু চুপ করিলেন। আমি বলিলাম—"কৃষ্ণকমলবাবুর
মুখে একটি চমৎকার গল্প শুনিয়াছি। একদিন রামতনুবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে
বলিলেন—'ওহে, আমাকে একটি রাঁধুনি বামুন যোগাড় করে দিতে পার?'
বিদ্যাসাগর বলিলেন,—'কেন হে, আবার বামুনের দরকার কি? বাবুর্চ্চি খানসামা
হোলেই ত চলে।' রামতনুবাবু ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—'হাঁ আমার কোনও
আপত্তি নাই বটে, কিন্তু বাড়ির ভেতরে যে বামুন ছাড়া চল্‌বে না।' বিদ্যাসাগর
হাসিয়া বলিলেন—'বাপের কথায় পৈতাগাছটি রাখ্‌তে পারলে না; এখন পরিবারের
কথায় বামুন খুঁজ্‌তে বেরিয়েছ!' রামতনুবাবু মাথা চুলকাইতে লাগিলেন।"

উমেশবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন—"দেখিলে ত?
শুধু conviction সব সময়ে বজায় রাখা চলে কি? রামতনুবাবু দেখিয়া শুনিয়া
বড় মেয়েটিকে ব্রাহ্মণের ঘরে দিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরেরও ব্রাহ্মণ্য অহঙ্কার খুব
প্রবল ছিল। আমি জানি কোনও বৈদ্য তাঁহার কাছে সহজে যাইত না। বৈদ্য

জাতটা বড় অহঙ্কারী। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বামুন বলিয়া অহঙ্কার এত উৎকট, এত aggressive ছিল যে বৈদ্যরা তাঁহাকে দূরে পরিহার করিতেন; কিন্তু তাঁহার রংপুরের মোক্তার একজন বৈদ্য ছিল। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর বলিতেন—'I am a Brahmin Christian!' Conviction রোজ রোজ বদলাইতে পারে; কিন্তু ব্রাহ্মণের জাত্যভিমান সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়া যায় কি?

"রামতনুবাবু প্রত্যহ প্রাতঃকালে বেড়াইতে বাহির হইতেন। একদিন পথে সরকারী উকিল তারিণীবাবুর সহিত তাঁহার দেখা হইল। তারিণীবাবু তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। রামতনুবাবু বলিলেন, 'ও কি, প্রণাম করেন কেন?' তারিণীবাবু উত্তর করিলেন, 'আপনি যে ব্রাহ্মণ!' রামতনুবাবু বলিলেন, 'না, আমি ত ব্রাহ্মণ নই'। উত্তর হইল,—'আপনি 'নই' বল্লেই কি হয়?' কাশীশ্বর মিত্র মুন্সেফ ছিলেন। তিনি ব্রাহ্ম; কিন্তু ব্রাহ্মণ দেখিলেই প্রণাম করিতেন। ব্রাহ্মরা তাঁহার এই ব্যবহারে আপত্তি করিলে তিনি বলিতেন, 'এ courtesy আমি কেন দেখাব না!' রেভারেণ্ড লালবিহারী দে খৃষ্টান ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জাত্যভিমান ছিল। তিনি জাতিতে সুবর্ণবণিক; কিন্তু তিনি বলিতেন যে সুবর্ণবণিক মাত্রই বৈশ্যজাতি। তিনি নিজেকে বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করিতেন। আমার কাছে গল্প করিতেন যে, বল্লাল সেন তাঁহাদের অধঃপাতের কারণ। সাহেবদের মধ্যেও উৎকট জাত্যভিমান আছে। পূর্ব্বে তোমাকে লর্ড ইউলিক ব্রাউনের কথা বলিয়াছি; তিনি আইরিস লর্ড। যখন তিনি এখানে ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তখনও তিনি লর্ড হন নাই; তাঁহার দাদা জীবিত ছিলেন। সেই সময়ে টাউয়ার্স (Towers) নামে আর একজন আইরিশম্যান এখানকার জজ ছিলেন। ইউলিক ব্রাউনের দাদার জমিদারিতে টাউয়ার্স বংশ বাস করিত। সেই জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট ব্রাউন জজ টাউয়ার্সের সঙ্গে কখনও খাইতেন না।

"ভূদেববাবু একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন—'ইংরাজ যদি বাঙ্গালীর মেয়ে বিয়ে করে ত ভাল হয়।' আমি কিন্তু দেখিতেছি ভাল হয় না। বরিশালে কেম্প (Kemp) সাহেব সকলের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন; একটি এদেশীয়া মহিলাকে বিবাহ করিয়া একঘরে হইলেন। মনমোহন ঘোষের কন্যাকে তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটরি বিবাহ করিয়া সমাজে প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন কি না, সন্দেহ হয়। Queen's Proclamation-এর সময়ে এখানে ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন ষ্টীভেন্‌স্ (Stevens) তিনি আমাকে বলিলেন,—'আমরা স্থির করিয়াছি যে একদিন আমরা সকলে তোমার বাড়ী যাইব; তুমি আমাদিগকে নিমন্ত্রণ কর, একটা সখের যাত্রা দাও, কাহাকে কাহাকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে তাহার তালিকা দিতেছি।' সেই তালিকার মধ্যে

জজ রিচার্ডসন, পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গর্ডন ও আর আর খাঁটি সাহেবের নাম ছিল; কিন্তু ফিরিঙ্গি সিভিল সার্জ্জন বেন্সলির (Bensley) নাম ছিল না। অগত্যা সেই রকমই নিমন্ত্রণ করিতে হইল। সাহেবেরা সস্ত্রীক আসিয়াছিলেন; ঘরে কিছু খাবার প্রস্তুত করিয়াছিলাম, তাহাতেই তাঁহারা খুব আপ্যায়িত হইলেন।

"রামতনুবাবুকে আমি খুব ভক্তি করিতাম। আমার এই শয়নঘরের দেওয়ালে তাঁহার ছবি বরাবর এমন ভাবে রক্ষিত ছিল যে, ভোরে নিদ্রাভঙ্গ হইলেই তাঁহার প্রতিকৃতি প্রথমেই আমার নয়নগোচর হইত। তাঁহার চরিত্র অত্যন্ত নির্ম্মল ছিল। কলেজে তিনি দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। অঙ্কশাস্ত্র ভাল জানিতেন না। Campbell-এর 'PLEASURES OF HOPE' অতি সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিতেন। বরাবরই Deist ছিলেন; কিন্তু ব্রাহ্ম হইবার পূর্ব্বে হিন্দুসামাজিক ক্রিয়াকর্ম্ম নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিতেন। বরাবর মদ খাইতেন। আমরা কিন্তু 'Cato of Utica'-র কথা স্মরণ করিতাম;—'It will be easier to prove that drinking is a virtue than that Cato could be guilty of a vice.'"

চার

আচার্য্য দত্ত মহাশয় বলিতে লাগিলেন :—

"রামতনু বাবুর পিতা রামকৃষ্ণ লাহিড়ী রাজবাড়ীতে কাজ করিতেন। কিছু জমি ছিল; বারুইহুদা গ্রামে তাঁহার প্রজা ছিল। আমি ১২।১৩ বৎসর বয়সে তাঁহাকে খুব বুড়া দেখিয়াছি; বোধ হয় তাঁহার আশী বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি তালপাতার ও নারিকেল পাতার ছাতি ব্যবহার করিতেন। তাঁহার দুই গাছা পৈতা ছিল, একটি মৃগচর্ম্মের, অন্যটি সূতার। সর্ব্বদাই পূজা আহ্নিক লইয়া থাকিতেন। ছেলে শ্রীপ্রসাদকে ডাকিতেন—'রামগঙ্গা'। দুর্গাপূজায়, শ্যামাপূজায় ও সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধে লোকজন খাওয়ান খুব ছিল; মেয়ে জামাই, দৌহিত্র প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার পুত্র কেশব যশোরে অনেক টাকা রোজগার করিয়া বাড়িতে ভাল করিয়া পূজার দালান দিয়াছিলেন।

"তারাকান্ত রায়, উমাকান্ত রায়, শিবাকান্ত রায়, রামকৃষ্ণ লাহিড়ীর শ্যালক ছিলেন; অর্থাৎ তাঁহার স্ত্রী কার্ত্তিক দেওয়ানের পিসী। কার্ত্তিকচন্দ্র খুব ফর্সা ছিলেন; ফার্সী ও ইংরাজি ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল; তিনি গানবাজনায় ওস্তাদ ছিলেন। আমি তাঁহার গান শুনিতে যাইতাম। রাজবাড়ীতে গান বাজনার চর্চ্চা ছিল। বৃদ্ধ দেলওয়ার খাঁ কেবলমাত্র হাতে তালি দিয়া গান গাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেন। খয়েরুদ্দি খুব ভাল সানাই বাজাইত; সেতারেরও ওস্তাদ বলিয়া মহারাজ তাহাকে সুখ্যাতি করিতেন।

"মহারাজ গিরীশচন্দ্র খুব সুপুরুষ ছিলেন। অমন লম্বা মানুষ প্রায় দেখা যায় না। দেহে খুব বল ছিল। দোগেছের তাঁতীরা তাঁহার কাপড় বুনিত—তেরো হাত লম্বা। আমার জ্যাঠামশাই তাঁহার কর্ম্মচারী ছিলেন; মহারাজ একবার সেই কাপড় তাঁহাকে একজোড়া দিয়াছিলেন। মহারাজের আজ্ঞা ছিল যে তাঁহার প্রত্যেক কর্ম্মচারী নিজের নিজের বাড়ীতে দুর্গাপূজা করিবে। একবার তিনি শুনিলেন যে, আমার জ্যাঠামহাশয় কন্যাদায়গ্রস্ত বলিয়া দুর্গোৎসব করিতে পারিবেন না। তিনি বলিলেন, 'কি! আমার কর্ম্মচারী দুর্গোৎসব ক'রবে না! যা' দরকার আমার তোষাখানা থেকে যাবে; পূজার সমস্ত খরচ আমার।' কর্ম্মচারীদের বাড়ীতে পূজা উপলক্ষে বৎসরে একদিন তাঁহার শুভাগমন হইত। আমার মনে আছে, আমাদের বাড়ীতে তিনি আসিয়াছিলেন; আমরা সব ছেলেপুলে গলায় কাপড় দিয়া হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। আনন্দময়ীর পূজা খুব ধুমধামের সহিত হইত। তখনকার দিনে

নিয়ম ছিল, গাভীর বাঁটের প্রথম দুধ, গাছের প্রথম ফল, আনন্দময়ীকে দিয়া আসিতে হইবে। রাজবাড়ীতে বৈকালে ভোগ কি ছিল জান? দোলো গুড়ের পাক। একটা প্রকাণ্ড কটাহ হইতে সমস্তটা একটা বোরার মধ্যে ঢালা হইত; দশ বারোটা বোরা এইরকমে বোঝাই করা হইত। পূজা সাঙ্গ হইলে, সেই ভোগ কুড়ুল দিয়া কাটিয়া কর্ম্মচারীদিগের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। পূজার প্রতিমা গড়িত,—শান্তিপুরের কারিকর। একজন দুর্গা, অসুর ও সিংহ গড়িত; একজন লক্ষ্মী-সরস্বতী; একজন কার্ত্তিক-গণেশ: একজন সাজ লাগাইত; একজন চালচিত্র করিত। প্রতিবারে প্রতিমার নূতন পাট হইত। প্রতিমা গড়া শেষ হইলে মহারাজ করযোড়ে কারিকর-দিগকে বলিতেন—'তোমরা যদি অনুমতি কর, তা'হ'লে আমি মাকে পাটে বসাতে পারি।' তাহারা বলিত—'আপনি বসান।' পূজার সময় একশত ফুট লম্বা ও পঞ্চাশ ফুট চওড়া জায়গা লাল শালু দিয়ে মোড়া ও ঘেরা হইত; পূজার পরদিন আর সে শালু দেখিতে পাওয়া যাইত না। এ জেলার ব্রাহ্মণমাত্রই দেবোত্তর জমি পাইত ও রাজবাড়ীতে খাইতে পাইত।

"মহারাজ গিরীশচন্দ্রের দুই রাণী ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ বড় রাণীর মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছিল। কিন্তু ছোটরাণী খুব বুদ্ধিমতী ও সুন্দরী ছিলেন। স্বয়ং পাক করিয়া মহারাজকে সোণার থালে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইতেন। আহারের পর মহারাজ খড়্‌কে-কাটি লইতেন—ব্রাহ্মণের হাত হইতে; শান্তিপুরের এক ব্রাহ্মণ পরিবার এখনও খড়্‌কী নামে পরিচিত। ছোটরাণী শ্রীশচন্দ্রকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন।

"কুমার শ্রীশচন্দ্র যখন একটু বড় হইলেন, তাঁহার ইচ্ছা হইল যে, তিনি খরচ-পত্রের অকারণ বাহুল্য যাহাতে না হয়, সে বিষয়ে একটু কড়াকড়ি ব্যবস্থা করিবেন। মহারাজ গিরীশচন্দ্রের স্নানের জন্য একসের তেল বরাদ্দ ছিল; শ্রীশচন্দ্র কমাইয়া এক পোয়া করিলেন। যে ব্যক্তি তেল মাখাইত, সে এক পলা তেল লইয়া মহারাজের কাছে গেলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—'একি!' ব্যাপার অবগত হইয়া শ্রীশচন্দ্রকে তিনি বলিলেন—'তুমি বোঝনা; চাকর-বাকরের কিছু পাওয়া চাই, নইলে উহাদের চলবে কেন?'

"ব্রাহ্মণ পরিচারক মহারাজকে খড়্‌কে-কাটি দিত। অগ্রদ্বীপ হইতে যখন দ্বাদশ গোপাল আনা হইত, নৌকা খড়িয়া নদীর ঘাটে পৌছিলে, ব্রাহ্মণ পাল্কী-বেহারা পাল্কী কাঁধে করিয়া রাজবাড়ীতে লইয়া আসিত।

"মহারাজ শ্রীশচন্দ্র ফার্সী ও সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন; তাঁহার স্ত্রী বামাসুন্দরী চমৎকার রাঁধিতে পারিতেন; আমি অনেকবার তাঁহার রান্না খাইয়াছি। মহারাজ সতীশচন্দ্রের স্ত্রী ভুবনেশ্বরীও চমৎকার রাঁধিতে পারিতেন। মহারাজ স্বয়ং আমাকে

নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইতেন। মহারাণী তাঁহাকে বলিতেন,—'তুমি উমেশবাবুকে নিমন্ত্রণ করেছ ; তিনি ত তোমাদের বাহিরের টেবিলের খানা খাবেন না ; আমি তাঁর জন্য রাঁধব।' সে রকম রান্না আমি কোথাও খাই নাই। মহারাজ সতীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর সম্পত্তি Court of Ward-এ গেলে মহারাণীর একশত টাকা মাসিক allowance বরাদ্দ হইল। তাহাতে তাঁর কষ্ট হইল। আমাকে তাঁহার কষ্টের কথা জানাইলেন। আমি ষ্টীভেন্‌স্‌ সাহেবকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করায় মহারাণীর ছয় শত টাকা মাসহারা ধার্য্য করা হইল। আমি শিক্ষাবিভাগের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলে পর মহারাণী আমাকে তাঁহার এষ্টেটের দেওয়ান হইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন ; আমি সম্মত হইলাম না।"

আচার্য্য দত্তমহাশয় একটু চুপ করিলেন। একটু পরে বলিলেন—

"রামতনুবাবুর কথা বলিতে বলিতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি ; কিন্তু কৃষ্ণনগরের ইতিহাসের সহিত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বংশের ইতিহাস কতটা জড়িত হইয়া আছে, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ। ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সময়ে মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের কতটা ঐকান্তিক চেষ্টা ছিল, সে কথা পূর্ব্বেই তোমায় বলিয়াছি ; আবার যখন এখানে ব্রাহ্মমন্দির-নির্ম্মাণ করিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক হাজার টাকা দান করিলেন এবং ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় এখানকার ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তা হইলেন, তখনও তাঁহাদের কার্য্যে মহারাজের sympathy ছিল। কেশবচন্দ্র সেন একটা বিধবাবিবাহ উপলক্ষে যখন এখানে আসিলেন, সমাজে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হইল, তখনও মহারাজের sympathy ভিতরে ভিতরে তাঁহার দিকে ছিল। বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে যে দল দণ্ডায়মান হইয়াছিল, তাহার নেতা হইলেন তারিণী প্রসাদ ঘোষ।"

আজ অপরাহ্নে দীনবন্ধু মিত্রের কথা উত্থাপন করিলাম। আচার্য্য দত্ত মহাশয় বলিলেন,—"দীনবন্ধু খুব আমুদে লোক ছিল ; আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত ; প্রায়ই আমার সহিত দেখা করিতে আসিত ; একবার আমার ব্যায়রামের সময় বঙ্কিম চাটুয্যেকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। রামতনুবাবুর মত দীনবন্ধুরও একটু পানদোষ ছিল ; কিন্তু পাছে আমি টের পাই, এই জন্য সে সদাই সতর্ক থাকিত। সেক্ষপীয়র পড়িতে খুব ভালবাসিত। তাহার যে পাণ্ডিত্য খুব বেশী ছিল তাহা নহে ; তবে সেক্ষপীয়র হইতে মালমস্‌লা আদায় করিয়া নিজের নাটকের পুষ্টিসাধন করিত। দেখনা, Merry Wives of Windsor-এর Falstaff-কে কেমন সে হোঁদলকুৎকুতের পোষাকে খাড়া করাইয়াছে। তাহার 'সধবার একাদশী'[১] যখন প্রকাশিত হয়, তখন আমি ঢাকায়, যখন 'নীলদর্পণ'[২] বাহির হইল, তখন আমি এখানে।

[১] ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে।—সং [২] ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে—ঢাকা হইতে।—সং

"ডাকবিভাগের কর্ম্মচারী হইয়াও দীনবন্ধু এই বইখানা প্রকাশিত করিয়া, যে চরিত্রবলের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা তোমরা আজিকার দিনে বুঝিতে পারিবে না। সৌভাগ্যক্রমে স্যর্ জন্ পীটর্ গ্রাণ্ট্ নীলকরের অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। বড় বড় লোক নীলকরদিগের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ ছিল। লর্ড ম্যাক্নটনের একজন আত্মীয় এখানে জমিদার ছিলেন। হিন্দু প্যাট্রিয়ট্ জিদ্ করিয়া বসিল যে, Indigo Commission বসান হোক্। নীলকরেরা বলিল যে তাহাদের বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা কথা বাজারে প্রচারিত হইয়াছে। 'প্যাট্রিটিয়ট' তাহার উপযুক্ত জবাব দেয়। কমিশন বসিল। সভাপতি হইলেন সেটন্ কার (W. S. Seton Kerr); মিঃ বিচার্ড টেম্পল, চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, রেভারেণ্ড জে সেল্ ও ফার্গুসন্ (W. F. Fergusson) কমিশনেব মেম্বর ছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট হার্শেলের জবানবন্দী আমার বেশ মনে আছে।

'প্রশ্ন।—তুমি এতদিন এখানে আছ, তোমরা মতে ইহার প্রতিবিধানের কোনও উপায় আছে কি?

'উত্তর।—হাঁ খুব সহজ উপায় আছে (A very simple remedy)।

'প্রশ্ন।—কি?

'উত্তর।—উভয় পক্ষেব মধ্যে ন্যাযবিচার (Justice between the parties)।

'প্রশ্ন।—তুমি কি বলিতে চাও যে, এই লোকগুলা বাস্তবিকই অত্যাচার পীড়িত (Do you mean to say these people are really oppressed)?

'উত্তর।—হাঁ, আমি বলিতে চাই (Yes, I do)।'

"যখন পাদ্‌রী ব্লমহার্ড্বে জবানবন্দী লওয়া হয, তিনিও জোর করিয়া বলিলেন যে, ন্যায়-বিচার হয় না।

"১৮৬০ সালে গ্রীষ্মকালে এই কমিশন বসিয়াছিল, পনেব দিন ধরিয়া এখানে জবানবন্দী লওয়া হইয়াছিল।

"যশোহর জেলায় লক্ষ্মীপাশা অঞ্চলে একজন নীলকর ছিল; তাহার নাম ম্যাক্ আর্থার। একদিন সে সেখানকার জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ বেনব্রিজ্ সাহেবকে সকাল বেলায় breakfast-এ নিমন্ত্রণ করিল। বেন্‌ব্রিজ্ আগে হইতেই জানিতেন যে, ম্যাক্ আর্থার অত্যন্ত অত্যাচারী বলিয়া সেখানে একটা অখ্যাতি ছিল। তিনি সেই নীলকরের কুঠির ২।১ মাইল দূরে নিজের তাঁবু ফেলিলেন। অতি প্রত্যুষে ম্যাক্ আর্থাবের বাড়ীর দিকে যাইতে যাইতে শুনিতে পাইলেন যে, কে যেন ক্রন্দনের সুরে ক্ষীণস্বরে বলিতেছে—'দোহাই সাহেব, দোহাই সাহেব।' সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া তিনি বুঝিলেন যে, ম্যাক্ আর্থারের গুদামের ভিতর হইতে এই

কাতর ধ্বনি আসিতেছে। নীলকরকে কিছু না বলিয়া তিনি সর্দ্দার বেয়ারাকে বলিলেন, 'গুদামের চাবি লইয়া আমার সঙ্গে আয়।' চাবি খুলিতেই একটা কঙ্কালসার মানুষ ধস করিয়া তাঁহার পায়ের কাছে পড়িয়া গেল। তৎক্ষণাৎ তাহাকে তুলিয়া লইয়া, তাঁহার নিজের তাঁবুতে ফিরিয়া গেলেন। নিমন্ত্রণ খাইতে গেলেন না। ম্যাক্ আর্থার সমস্ত অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। কি! আমার অজ্ঞাতসারে আমার গুদামের চাবি খুলিয়া লোকটাকে ছিনাইয়া লইয়া গেল! এই অত্যন্ত 'বেআইনি' ব্যাপার লইয়া গভর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন করিতে প্রস্তুত হইল। এদিকে সেই লোকটা একটু প্রকৃতিস্থ হইলে, বেন্‌ব্রিজ্ নিজের তাঁবুতে বসিয়া তাহার জবানবন্দী লইলেন। সে বলিল, 'কুঠির সাহেব আমাকে কিছু খেতে দেয়নি, শুধু ধান খেতে দিয়েছিল।'—তিনি একটা রিপোর্ট লিখিয়া তাহাকে সদরে পাঠাইয়া দিলেন। গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ের রীতিমত তদন্ত করিলেন। তদন্তের ফলে ম্যাক্ আর্থারের অর্থদণ্ড হইল।

"সামান্য ছয় শত কি সাতশত টাকা অর্থদণ্ড হইল বটে; কিন্তু স্যর জন্ পীটর গ্রাণ্ট্ খুব কড়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। আর একটু গোড়ার ইতিহাস না জানিলে সে মন্তব্যটুকু বুঝিতে পারিবে না।

"যখন স্যর ফ্রেড্রিক হ্যালিডে বাঙ্গালার ছোট লাট, তখন যশোহরের মধুমতী চন্দনা-নদীতে ঘন ঘন ডাকাইতি হইত; জেলার পুলিশ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিত না। অনেক বিবেচনা করিয়া, কমিশনর সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে লিখিলেন—'মধুমতী চন্দনার উপরে একটা floating sub-division করিলে হয় না?' এই প্রস্তাব স্থানীয় জনসাধারণের অনুমোদিত হইবে কি না, তাহা জানিবার চেষ্টা করা হইল। বেশী আপত্তি করিল,—নীলকর ম্যাক্ আর্থার! সে বলিল, 'এখানে একটা সবডিভিসন করিলে, মোক্তারের শুভাগমন হইবে; আর এই সকল চাষারা জুয়াচোর ও দুষ্টবুদ্ধি হইয়া নষ্ট হইবে।' তাহার এই আপত্তি শুনিয়া লাট-সাহেব হ্যালিডে বলিলেন—'Floating sub-division-এ কাজ নাই।'

"এই সমস্তই কাগজে কলমে লাট দপ্তরে লিপিবদ্ধ ছিল। স্যর জন্ পীটর গ্রাণ্ট্ এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া ম্যাক্ আর্থার বেনব্রিজ্-ঘটিত ব্যাপারের উপর মন্তব্য প্রকাশ কালে লিখিয়াছিলেন—'These proceedings throw a strong light upon M'c Arthur's disinclination to have a subdivision.'

"স্যার ফ্রেড্রিক হ্যালিডে নীলকরদিগের বন্ধু ছিলেন। স্কন্স্ সাহেবের কথা আমি তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি অত্যন্ত সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যখন এখানে জজ্, তখন লর্ড ডাল্‌হৌসি বাঙ্গালার গভর্ণরের কাজ চালাইতেছিলেন; তাঁহার

সেক্রেটরি ছিলেন স্যর সেসিল বীডন্। স্কন্স্, স্যর সেসিলকে লিখিলেন—'আমি নীলচাষের ব্যাপার বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছি; আমার এই চিঠি ও minute আপনি অনুগ্রহ করিয়া লর্ড ডালহৌসীর হস্তে দিবেন।' তখন লর্ড ডালহৌসি স্যর ফ্রেড্রিক হ্যালিডেকে বাঙ্গালার মস্‌নদে বসাইবার ব্যবস্থা একরকম পাকা করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ১৮৫৪ সালের মার্চ্চ মাসে তিনি লিখিলেন, 'The fittest man in the service of the honorable company to hold this great and most important office is, in my opinion, our colleague the Hon'ble F. J. Halliday.' কাজেই স্কন্সের কাগজপত্র নূতন ছোট লাট হ্যালিডের হাতে পড়িল। তিনি চটিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন—'স্কন্স্ জানে কি?' যশোহর, নবদ্বীপ, রাজসাহীর নীলচাষের উপর কমিশন বসাইলেন। কমিশন স্কন্সের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিল; আরও বলিল,—'নীলকরেরা বনজঙ্গল কাটিয়া দেশের উন্নতি সাধন করিয়াছে।'"

একটু চুপ করিয়া আচার্য্য দত্ত মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"আব্দুল-লতিফের Case-টা জান কি?" আমি উত্তর করিলাম, "না।" তিনি বলিলেন, "গোবরডাঙ্গার নিকটে কোলার‌ওয়া সবডিভিসনে হাবড়ার আব্দুল লতিফ সব্‌ডিভিসনাল অফিসার ছিলেন। তাঁহার নিকটে সেখানকার কুঠির সাহেবের নামে একটা নালিশ হইল। সাহেবের নামে বাঙ্গালা ভাষায় ছাপান নোটিশ জারি হইল। তাহাতে লেখা ছিল—'তুমি আসিবে।' সাহেব চটিয়া গেল; লাট সাহেবকে জানাইল যে, মৌলবী তাহাকে 'তুমি' বলিয়া আহ্বান করায় তাহার মানহানি হইয়াছে। স্যর ফ্রেড্রিক কমিশনার বিডওয়েলকে এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। মৌলবী সোজা জবাব দিলেন—'এই যে ছাপান ফর্ম্,—এ ত আমি আবিষ্কার করি নাই; গভর্ণমেণ্ট করিয়াছেন; আমি শুধু ভরাট করিয়াছি মাত্র।' স্যার ফ্রেড্রিক ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—'মৌলবী ঠিকই করিয়াছে; কিন্তু সে ওখানে অনেক দিন আছে, তাহাকে অন্যত্র বদ্‌লি করিয়া দেওয়া হউক।'

"স্যাব জন্ পীটর গ্রাণ্ট্ বাঙ্গালাব ছোট লাট হইলে পর, সেই সকল কাগজপত্র মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

"লর্ড ডাল্‌হৌসির প্রাইভেট সেক্রেটরি ছিলেন—কোর্টেনে (F. F. Courtenay)। Courtenay-র একজন বিশিষ্ট বন্ধু সণ্ডার্স (Saunders) যশোহরে ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সণ্ডার্স জ্বরে বড় ভুগিতেছিল; বদলি করিবার জন্য Courtenay হ্যালিডেকে অনুরোধ করিলেন। সেই সময়ে কৃষ্ণনগরে একটি পদ খালি হইল, কিন্তু হ্যালিডে সণ্ডার্সকে না আনাইয়া অগষ্টস এলিয়ট্‌কে এখানে আনাইল। সণ্ডার্সের মৃত্যু হইল। Courtenay

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া লর্ড ডাল্‌হৌসিকে সকল কথা বলিয়া দেন; হ্যালিডেকে প্রাইভেট চিঠিও দিলেন। হ্যালিডে injured innocence-এর ভাণ করিলেন। Courtenay লিখিলেন,—'তোমার ethical laxity আছে; তোমার assumed surprise আমি বুঝি; আমি সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিব।' Friend of India ও Englishman পত্রিকায় সমস্ত ব্যাপারটা বাহির হইল। Friend of India-র সম্পাদক সমস্ত চিঠি খানাকে উড়াইয়া দিতে চাহিয়া ছিলেন।

"স্তর পীটর গ্রাণ্ট্ এই ব্যাপারটাও মুদ্রিত করাইয়া বাহিরে প্রকাশ করিয়া দিলেন।

"তিনি আমাদের কলেজ দেখিতে আসিয়াছিলেন; আমার সঙ্গে দেখা করিতেও আসিয়াছিলেন। খুব জোয়ান শরীর ছিল; সারা রাত্রি খাটিতেন—শেষে তিন ঘণ্টা ঘুমাইতেন; সমস্ত চিঠি নিজে লিখিতেন অথবা বলিয়া যাইতেন।

"বাঙ্গালার লেফটেনাণ্ট গভর্ণরের আরম্ভ ও শেষ দেখিলাম। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, স্তর জন্ পীটর গ্রাণ্ট্ দেশের লোকের শ্রদ্ধা যতদূর আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন, তেমন আর কেহ পারেন নাই। নীলকরের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য দেশে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইহা শুধু কথার কথা নহে; প্রকৃতই ঘটিয়াছিল। ১৮৬০ সালে তিনি যে minute লেখেন, তাহার একস্থলে ছিল:—'On my return a few days afterwards, along the same two rivers (the Kumar and Kaliganga), from dawn to dusk as I steamed along these two rivers for some 60 or 70 miles, both banks were literally lined with rows of villagers claiming justice in this matter. Even the women of the villages on the banks were collected in groups by themselves; the males stood between the riverside villages at a great distance on eithe side. I do not know that it ever fell to the lot of any Indian officer to steam for 14 hours through a continued double street of suppliants for justice; all were most respectful and orderly, but also were plainly in earnest.'

"১৮৬২ সালে তিনি পদত্যাগ করিলেন। আমরা তাঁহাকে বিদায়কালে অভিনন্দন করিলাম। যে address দেওয়া হইল তাহা আমারই রচনা; তাহাতে আমার স্বাক্ষর ছিল। তদুত্তরে তিনি আমাকে লিখিলেন—'It is impossible for one, whose humble endeavours in the public service of our

country have been so generously appreciated as mine have been by you, ever to forget you.'

"হ্যালিডে ও গ্রাণ্টের মনোমালিন্যের কথা যে সকল বলিলাম, তাহাতে মনে করিও না যে, স্যার ফ্রেড্রিক হ্যালিডেকে দেশের লোক শ্রদ্ধা করিত না। ছোট লাট হইবার পর তিনি ইংরাজিতে প্রথম অভিনন্দন পান,—কৃষ্ণনগরে—১৮৫৫ সালে; সে address-ও আমি রচনা করিয়াছিলাম। তিনি রচনার ভাষায় মুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'কে লিখিয়াছে?'—আমাকে তাঁহার সম্মুখে লইয়া গেলে পর, তিনি অনেকক্ষণ আমার সহিত আলাপ করিলেন ও আমার উন্নতি কামনা করিলেন।"

পাঁচ

২২এ চৈত্র, ১৩২০

আজ শ্রীযুক্ত ব্রহ্মমোহন মল্লিক মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলাম "—আপনার স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিয়া লইবার ইচ্ছা করিয়াছি; আপনার যদি আপত্তি না থাকে,"—আমাকে বাধা দিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আমার বলিবার এমন কি আছে, যাহা আপনি আগ্রহের সহিত শুনিতে পারেন?" আমি বলিলাম—"আপনি পুরাতন হিন্দুকলেজের ছাত্র; সে সম্বন্ধে অনেক কথা আপনি বলিতে পারেন।" তিনি অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন—"১৮৩২ সালের ৬ই জুন তারিখে আমি জন্মগ্রহণ করি; ১৮৪০ সালে বাঙ্গালা স্কুলে ভর্ত্তি হই।

"আপনি বোধ হয় জানেন না, লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের সময়ে এদেশে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা স্কুল স্থাপিত হয়।[১] এখন যেখানে প্রেসিডেন্সি কলেজ রহিয়াছে, ঐখানে আমাদের বাঙ্গালা স্কুল ছিল। প্রবেশিকা ফী সমেত এক বৎসরে বেতন আগাম দেওয়া হইল—দুই টাকা মাত্র; দ্বিতীয় বৎসরের বেতন চারি টাকা দিতে হইয়াছিল। ইহার পরে যতদিন পর্য্যন্ত স্কুল কলেজে পড়িয়াছিলাম, বেতন হিসাবে আর একটি পয়সাও খরচ করিতে হয় নাই।

"বাঙ্গালা স্কুলে দুই বৎসর লেখা পড়া করিয়াছিলাম। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড মাঝে মাঝে এই বাঙ্গালা স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিতেন। আমার শিক্ষকদিগের মধ্যে পণ্ডিত হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যকে বেশ মনে পড়ে; ব্রাহ্ম সমাজের পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বিদ্যালয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। মাঝে মাঝে বক্তৃতা করিতেন; কিছু কিছু পড়াইতেন। কি পুস্তক পড়া হইত, ঠিক আমার স্মরণ নাই, ভূগোল পড়িতে হইত; রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা ব্যাকরণ পড়িতাম।

"এই বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্য হইতে ছয়জন ছেলেকে বিনা বেতনে হেয়ার স্কুলে পড়াইবার নিয়ম ছিল। আমাদের বৎসরে নির্ব্বাচিত ছাত্রদিগের মধ্যে আমি অন্যতম ছিলাম; বিনা বেতনে হেয়ার স্কুলে প্রবেশ লাভ করিলাম।

[১] "......বাংলা পাঠশালার ভিত্তি প্রস্তর ১৮৩৯ সনের ১৪ জানুয়ারী ডেভিড হেয়ার কর্ত্তৃক প্রোথিত হয়।......১৮ জানুয়ারী ১৮৪০.... বাংলা পাঠশালার পাঠারম্ভ হয়।" ('বাংলার জনশিক্ষা' যোগেশচন্দ্র বাগল)—সং

"২২ নম্বর মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে,—এখন যেখানে মিউনিসিপ্যাল আপিস রহিয়াছে, ঐখানে হেয়ার সাহেবের স্কুল ছিল। হেড মাষ্টার ছিলেন—উমাচরণ মিত্র; তিনি ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন। গণিতের শিক্ষক ছিলেন—রাধামাধব দে। ইতিহাস পড়াইতেন—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। হেয়ার স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে যে সকল পুস্তক অধ্যয়ন করিতাম, তন্মধ্যে মনে পড়ে, Homer's Illiad, Murray's Grammar, Playfair's Geometry, Goldsmith's Rome.

"স্কুলে হেয়ার সাহেব শিক্ষকতার কার্য্য করিতেন না। প্রথমে তিনি ঘড়ি তৈয়ার করার ব্যবসা লইয়া এদেশে আসেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রচারে তাঁহার উৎসাহ দেখিয়া, কোম্পানি বাহাদুর এক সহস্র টাকা বেতনে তাঁহাকে ছোট আদালতের জজ করিয়া দিলেন। সাহেব প্রতি রবিবারে স্কুলে আসিয়া আমাদিগের জামা খুলিয়া সাবান দিয়া গা ধোয়াইয়া দিতেন। যাহাতে ছেলেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, সে বিষয়ে তিনি খুব যত্নবান্ ছিলেন। আমাদের সঙ্গে তিনি প্রায়ই বাঙ্গালায় কথা কহিতেন। তিনি নিজে শিক্ষক নিযুক্ত করিতেন; মাসান্তে শিক্ষকদিগের বেতন দিবার জন্য স্কুলে আসিতেন। যতদূর স্মরণ হয়, বোধ হয় গ্রীষ্মকালে ছুটি ছিল না, পূজার সময় ছুটি হইত, বড দিনের ছুটিও ছিল।

"হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠাতৃদিগের মধ্যে হেয়ার সাহেব অন্যতম ছিলেন। তজ্জন্য কলেজ হইতে তিনি প্রতি মাসে তিনশত টাকা allowance পাইতেন। তিনি সেই টাকা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন—'আমি ও টাকা লইব না। উহার পরিবর্ত্তে আমার স্কুলের ত্রিশটি ছাত্র বিনা বেতনে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন পায়, ইহাই আমার বাসনা।' তদবধি ত্রিশটি করিয়া হেয়ার স্কুলের ছাত্র হিন্দু কলেজে বেতন না দিয়া অধ্যয়ন করিতে পাইত। সেই ত্রিশ জনের মধ্যে আমাদের বৎসরে আমি অন্যতম। এমনি করিয়া হিন্দুকলেজে প্রবেশ লাভ করিলাম। হেয়ার সাহেবের মৃত্যুর দিন আমার খুব মনে পড়ে। সব স্কুল বন্ধ হইল। গোলদীঘিতে গোর দেওয়ার সময় আমরা উপস্থিত ছিলাম। ছাত্রেরা নগ্নপদে গিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরেও ত্রিশজন ছাত্র বরাবর হিন্দু কলেজে পড়িতে পাইত। এই ব্যবস্থা কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল।

"হিন্দুকলেজের স্কুল বিভাগের প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম। আমাদের পাঠ্যপুস্তক ছিল—

Pope's Essay on Criticism.

Cowper's Task (Richardson's Selections).

Drama একখানা, বোধ হয় Otway-Venice Preserved.
Bell's Euclid.
Stewart's Geography.
Goldsmith's Rome.
Keightley's India.
প্রবোধ চন্দ্রোদয়।

"আমাদের হেড মাষ্টার ছিলেন—রিচার্ড জোন্‌স্ (Richard Jones) খুব যোগ্য লোক; অল্প স্বল্প ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন; কিন্তু তিনি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌ও ছিলেন; পরে কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহার নিজের একটা প্রকাণ্ড লাইব্রেরি ছিল; সাট্‌ক্লিফ্ সাহেব বলিতেন—'কলিকাতায় আর কাহারও এত বড় লাইব্রেরি নাই।'

"আমাদের অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন—ভন্ (Vaughan) সাহেব; তাঁহার নিকটে আমরা একটু বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। হেয়ার স্কুলে আমরা Hind's Algebra হইতে অঙ্ক কসিতাম। হিন্দুকলেজে আসিয়া দেখি যে, Wood's Algebra হইতে অঙ্ক কসিবার হুকুম হইয়াছে। তখন সবে মাত্র কলিকাতায় Wood's Algebra আমদানি হইয়াছে; অনেক দাম। হেয়ার স্কুলের ছেলেরা Hind's Algebra হইতে অঙ্ক কসিয়া আনিলে সাহেব বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—'তোমরা এ ক্লাসের উপযুক্ত নও (you are not fit for the class);—অগত্যা কলেজের একটি ছেলের বই দেখিয়া অঙ্ক কসিতে আরম্ভ করিলাম।

"আমাদের ইংরাজি সাহিত্যের শিক্ষক ভাইনিং (Vining) সাহেব খুব ভাল লোক ছিলেন। বাঙ্গালা পড়াইতেন রামচন্দ্র মিত্র। মিত্রজ. মহাশয় আমাদিগকে Geography-ও পড়াইতেন। সাহেবদিগের সহিত সদ্ভাব রাখিবাব জন্য তাঁহার প্রাণপণ প্রয়াস ছিল; পাঁচজনের নিকট হইতে খবরের কাগজ লইয়া আসিয়া সাহেবদিগকে পড়িতে দিতেন।

"স্কুল-বিভাগে এক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া আমি জুনিয়ার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। পাস করিয়া Fourth College Class-এ উন্নীত হইলাম। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে আমাদের পাঠ্যপুস্তক ছিল—

Shakespear's King John.
Vanity of Human Wishes.
Spectator (First Half).
Euclid I—VI and XI.

Plane Trigonometry—Hindman's.
Wood's Algebra (Up to Binomial Theorem and Summation of Series).
Hume's History of England.
Stewart's Mental Philosophy.

"কলেজের প্রিন্সিপ্যাল লজ্ সাহেব (Edmund Lodge) ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন; বিশেষতঃ তিনি সেক্সপীয়র ও জন্‌সন্ পড়াইতে ভালবাসিতেন। তিনি গণিতেও সুপণ্ডিত ছিলেন। চৌরঙ্গীতে তিনি সস্ত্রীক বাস করিতেন। আমি তাঁহার বাড়ীতে যাইতাম; সেখানে আমার সহিত অনেকক্ষণ ইংরাজি কাব্যের আলোচনা করিতেন।

"Spectator পড়াইতেন ফোগো সাহেব (D. Foggo); লোকটি কেম্ব্রিজের বি. এ.; বিবাহ করেন নাই; রুগ্ন ছিলেন। ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন—সট্‌ক্লিফ্ সাহেব (Sutcliffe)। স্কুলের হেডমাষ্টার জোন্‌স্ সাহেব দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন।

"দ্বিতীয় বৎসরে আমরা নূতন পাঠ্যপুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিলাম।

	শিক্ষক
Shakespeare's Hamlet.	লজ্
Bacon's Essays.	ফোগো
Scott's Lay of the Last Minstrel.	লজ্
Potter's Mechanics.	লজ্
Geometrical Conic Sections.	লজ্
Algebra.	লজ্
Guizot's History of the English Revolution.	
Physical Geography	
Stewart's Mental Philosophy.	

"দ্বিতীয় বাৎসরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তৃতীয় বাৎসরিক শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করা গেল।

Shakespeare's Macbeth.
Do. Henry VIII.
Milton's Paradise Lost I-II.
Bacon's Advancement of Learning.
Dugald Stewart's Mental Philosophy.
Analytical Conics.
Differential and Integral Calculus.

Hydrostatics.
Adam Smith's Wealth of Nations.
Smith's Moral Sentiments.
Mill's Logic.
Macaulay's History of England.
Arnold's Lectures on Modern History.
Spherical Trigonometry.
Newton's Principia.

"লজ্‌ সাহেব প্রথমে আমাদিগের গণিতের অধ্যাপক ছিলেন; কিন্তু Council of Education-এর সেক্রেটরি ডাক্তার মৌআটের সহিত তিনি ঝগড়া করিলেন; কিছু দিনের জন্য ছুটি চাহিয়াছিলেন, ছুটি মঞ্জুর হইল না; তিনি পদত্যাগ করিলেন। সটক্লিফ্‌ সাহেব আমাদের গণিতের অধ্যাপক হইলেন। জোন্‌স ও সটক্লিফ্‌ উভয়ে অধ্যক্ষের কাজ (Joint Principals) করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে যখন হিন্দুকলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত হইল, তখন সটক্লিফ্‌ সাহেব প্রিন্সিপ্যাল হইলেন; জোন্‌স্‌ কেবলমাত্র অধ্যাপনা করিতেন।

"গণিতের আর এক জন অধ্যাপক ছিলেন—ভিসেণ্ট্‌ রীস। ইঁহার জন্মস্থান সুইট্‌জার্লাণ্ড্‌। ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া Surveyor General-এর আফিসে Meteorological Reporter হইয়াছিলেন। প্রত্যহ বেলা তিনটা হইতে চারিটা পর্য্যন্ত কলেজে আসিয়া অঙ্ক কসাইতেন; তিনটা ক্লাসের ছাত্র একত্র করিয়া তিনি পড়াইতেন। একখানি বীজগণিত (Lecroix' Algebra) তিনি ফরাসি ভাষা হইতে ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এই নিরীহ অধ্যাপকটি যে নেপোলিয়নের ধ্বজাধারী (standard bearer) ছিলেন, এমন কল্পনা কাহারও মনে সহসা উদিত হইতে পারে না; কিন্তু প্রত্যহ বেলা চারিটার পর তিনি আমাদিগকে তাঁহার জীবনের সেই পুরাতন কাহিনী শুনাইতেন। য়ুরোপের রঙ্গমঞ্চে নেপোলিয়নের সমরাভিনয় যেন আমরা চোখের উপরে দেখিতাম। যেনা (Jena), অষ্টার্লিট্‌জ (Austerlitz), মস্কো (Moscow),—ছবির পর ছবি দেখাইয়া যাইতেন; আর তাঁহার দুই গণ্ড প্লাবিত করিয়া অশ্রু বহিয়া যাইত।

"চতুর্থ বৎসরে আমরা Merchant of Venice, Othello, Tempest, Novum Organum, Dryden's Macflecknoe, Dryden's Absalom and Achitophel, Young's Night Thoughts, Mill's Political Economy, Optics, Astronomy, Calculus পড়িয়াছিলাম। সীনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও আমাদিগকে আরও এক বৎসর অপেক্ষা করিয়া চাকরি পাইবার জন্য একটি পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল।

মহানুভব লর্ড হার্ডিঞ্জের পিতামহের Public Service Resolution অনুসারে এই পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ১৮৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসে আমরা তিন জন এই পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইলাম,—রাধাগোবিন্দ দাস, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ও আমি। ১৮৫৬ সালের জানুয়ারি মাসে আমি ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর হইলাম।

"আমাদের সীনিয়র পরীক্ষায় স্বয়ং লর্ড হার্ডিঞ্জ্ ইংরাজি প্রবন্ধের প্রশ্নপত্র রচনা করেন,—'Write an essay on Poetry'। পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে টাউন্ হলে প্রশ্ন-পত্র বিতরণের সময় সাহেবেরা বলিলেন—'Try to please the Governor'। শিক্ষাসমিতির সভাপতি ক্যামারণ সাহেব ইংরাজি সাহিত্যের প্রশ্ন করিলেন। বিদ্যা-সাগর বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিতে দিলেন।

"স্যর চার্লস্ উডের মন্তব্য[১] কার্য্যে পরিণত হইলে অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। আমি প্রথমেই বাঁকুড়ায় স্কুলের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর হইলাম। গর্ডন ইয়ং তখন শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর। প্রেসিডেন্সি বিভাগে ইন্‌স্পেক্টর হইলেন—উড্রো সাহেব; বর্দ্ধমান ও উড়িষ্যা বিভাগে—হড্‌সন্ প্রাট্; বেহারে—চ্যাপম্যান; আসামে রবিন্সন্। প্র্যাট্ ও চ্যাপ্‌ম্যান সিভিলিয়ান ছিলেন। উড্রো সাহেব প্রথমে লা মার্টিনীয়র কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কার্য্য অনেকদিন করিলেন; পরে মোঁআটের যায়গায় কিছুদিন কাউন্সিল অভ এডুকেশনের সেক্রেটরির কাজ করিলেন। শিক্ষা-বিভাগের পুনর্গঠন হইলে পর তিনি প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুলগুলির ইন্‌স্পেক্টর হইলেন।

"আমি যখন বাঁকুড়ায় যাই, তখন সেখানে কেবলমাত্র একটি জিলা স্কুল ছিল। আমার চৌদ্দ মাস অবস্থানকালে আরও কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তখন রেলগাড়িতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত যাওয়া যাইত; তাহার পরে দামোদর পার হইয়া ঘোড়ার গাড়ী। বাঁকুড়ায় দুধ ও ঘি খুব ভাল পাওয়া যাইত। স্কুল পরিদর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের সময় গ্রামের মধ্যে ঘৃতের গন্ধ পাইয়া পাল্কি থামাইয়া ঘি কিনিতাম,—টাকায় সাত পোয়া। উৎকৃষ্ট চাউলের মন তিন টাকার কম ছিল।

"বাঁকুড়া হইতে বদলি হইয়া হাওড়ায় আসিলাম। কিছুদিন পরে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের সহিত অদল বদল করিয়া লইলাম। সে আসিল হাওড়ায়, আমি গেলাম কলিকাতায়।

"তখন কলিকাতায় 'এডুকেশন গেজেট' ওব্রায়ান্ স্মিথ সাহেবের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইত। কাগজখানি শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। স্মিথ

[১] Wood's Education Despatch of 1854 : ইহাতে সর্বপ্রথম শিক্ষাবিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা ছিল। ইহা ছাড়া ইহাতে ভারতের সর্বত্র বিভিন্ন স্তরের শিক্ষায়তন (network of graded schools) প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা ছিল।—সং

সাহেব বিলাত চলিয়া গেলেন। আমার বন্ধু কানাইলাল পাইনের উপর পত্রিকা-পরিচালনের ভার ন্যস্ত হইল। আমি তাঁহার কাগজে রণজিৎ সিংহের জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে আরম্ভ করিলাম। পরে ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

"১৮৫৮ সালে বন্ধু কানাইলালের সাহচর্য্যে হুঁকাপটিতে আমি একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলাম; তাহার নাম,—Model School। হেডমাষ্টার হইলেন, তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়; বেতন পঞ্চাশ টাকা মাত্র। এই তারাপ্রসন্নবাবু পরে বর্দ্ধমানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকিল হইয়া বহু বৎসর দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

"আমি যখন বাঁকুড়ায়, ভূদেববাবু তখন হাওড়ায় হেড মাষ্টার আমি যখন হাওড়ায় ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর হইলাম, ভূদেববাবু তখন হুগলি নর্ম্যাল্ স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইলেন। ভূদেববাবুর যাযগায় কাউপার সাহেব হাওড়ায় হেডমাষ্টার হইলেন। হুগলিতে অবস্থানকালে ভূদেববাবু কলিকাতায় এডুকেশন গেজেট আপিসে প্রায়ই আসিতেন। পত্রিকাখানি আমার হাত হইতে প্যারিচরণ সরকারের হাতে গেল; তিনি ছাড়িয়া দিলে ভূদেববাবু ইহার সম্পাদক হইলেন। ভূদেববাবুর পিতা * খুব পণ্ডিত ছিলেন; নিজে নিত্য পূজা করিতেন। একদিন তিনি বাহিরে

---

* ২৭এ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১।

আজ সন্ধ্যার পর বীডন উদ্যানে আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত কথোপকথন-প্রসঙ্গে ভূদেববাবুর কথা উঠিল। তিনি বলিলেন—"ভূদেববাবুর পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ আমার পিতার বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রের চর্চ্চা তাঁহার খুব ছিল, কয়েক বৎসর পঞ্জিকা করিয়াছিলেন ভূদেবকে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিবার সময় আমার বাবাকে তিনি বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন, যাহাতে আমার দাদাকেও হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি করিযা দেওয়া হয। বাবা কিন্তু তাঁহার কথায় বিচলিত হন নাই। ছেলেকে সংস্কৃত পড়াইয়া কোনও লাভ নাই, এই রকম ধারণা তর্কভূষণের ছিল। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ভূদেববাবু সকলের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহাব অনেক সদ্গুণ ত ছিলই, তাঁহার মত সুশ্রী পুরুষ সচরাচর নয়নগোচর হয় না। সরল সুদীর্ঘ দেহ, নধর গৌর কান্তি, তাঁহার মত স্বদেশভক্ত বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজে প্রায় দেখা যাইত না। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন আমাকে বলিলেন, ভূদেববাবু Comte-র দর্শনশাস্ত্র পড়িয়া বিস্মিত হইয়া বলিয়াছেন, 'Comte যে রকম সুন্দরভাবে তাহার দার্শনিক মতগুলি বিধি বদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ হয়, সে বোধ হয়, বামুন পণ্ডিতের ধরতাটা কোনও রকমে শিখিয়া লইয়াছে।' কিন্তু Comte যে আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম সাহিত্য সম্বন্ধে বড় একটা বেশী কিছু জানিতেন, এমন ত বোধ হয় না। তাঁহার Positive Polity-র এক জায়গায় তিনি লিখিয়া-ছিলেন—'যখন আমার ধর্ম্ম সর্ব্বত্র গৃহীত হইবে, তখন যাঁহারা প্রচারকের কাজ করিবেন, তাঁহারা ইংরাজকে বলিবেন,—ব্রাহ্মণ চিরদিন স্বাধীনতা ভালবাসে; সে বরাবর স্বাধীনভাবে তাহার সমাজ-তন্ত্র রক্ষা করিয়া আসিতেছে; তাহাকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা দাও; ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণকে ফিরাইয়া দাও।' আর একস্থলেও ইংরাজের সহিত ভারতবাসীর সম্পর্কের অপ্রীতিকর উল্লেখ আছে। সে যাহা হোক, ভূদেববাবুর প্রতি অনেক ইংরাজের অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল। লজ্ সাহেব তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রের ও মনুষ্যত্বের প্রশংসা করিয়া এক উচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রবন্ধ মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

গিয়াছিলেন; ফিরিতে অনেক রাত্রি হইল; আসিয়া শুনিলেন যে, তাঁহার পুত্র ভূদেব আদৌ পূজা করেন নাই। তাঁহার মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল; কারণ পূজা না করাটা যে কত দোষের তাহা তাঁহার ছেলে বুঝিল না। ভূদেববাবু ছেলেবেলায় সংস্কৃত পড়িতেন। একদিন তাঁহার বাপের এক বন্ধু তাঁহাকে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের পরীক্ষা করেন; তিনি সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন নাই; তাঁহার পিতা তাঁহাকে উত্তম মধ্যম প্রহার করেন। ভূদেব গোঁ ধরিয়া বসিলেন—'আমি সংস্কৃত পড়্‌ব না; আপনাদের সংস্কৃত পড়া এমন ধারা যে, না পার্‌লে এত প্রহার! আমি সংস্কৃত পড়্‌ব না।' ভূদেববাবুর ইংরাজি পড়া আরম্ভ হইল। কলিকাতার হিন্দুকলেজে তিনি মাইকেলের সতীর্থ বন্ধু। বহুদিন পরে মাইকেল বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভূদেববাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। ভূদেববাবুর বাড়ীতে মাইকেলের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছিল।

"বঙ্কিমবাবুর সঙ্গেও আমার প্রথম আলাপ হয় ভূদেববাবুর বাড়ীতে। বঙ্কিমবাবু তখন সবে মাত্র লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; মাঝে মাঝে এডুকেশন গেজেটে লিখিতেন। হিন্দুকলেজে পঠদ্দশায় দীনবন্ধু মিত্রের ও মহেন্দ্র সরকারের সহিত আমার খুব জানাশুনা হইয়াছিল; তাঁহারা আমাদের নীচের ক্লাসে পড়িতেন। আমার বিশ্বাস, ১৮৫৪ সালের Education despatch-এর ফলে বাঙ্গালা রচনার দিকে অনেকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। হুগলির হেড পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন স্বনামধন্য হইয়াছেন। পরে তাঁহার জায়গায় আমি কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্নকে আনাইলাম; ইনি কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত-রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর যে 'বাঙ্গালার ইতিহাস' লিখেন, তাহার এক অংশ রামগতি ন্যায়রত্ন কর্তৃক রচিত। মদনমোহন তর্কালঙ্কার 'শিশুশিক্ষা' লিখিলেন। বিদ্যাসাগর এডুকেশন কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট বীটন সাহেবকে ধরিয়া বলিলেন—'ইংরাজি হিন্দু কলেজের ছেলেরা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হয়! আমার কলেজের ছেলেরা কেন হয় না?' সেবার দু জন ডেপুটি হইলেন; মদনমোহন তর্কালঙ্কার তাঁহাদের অন্যতম।

"প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী পাটীগণিত ও বীজগণিত রচনা করিলেন। ১৮৭১ সালে আমি জ্যামিতি লিখি; সমগ্র পুস্তকখানা মুদ্রিত করি ১৮৭২ সালে। আমার পূর্ব্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্লেফেয়ারের জ্যামিতির প্রথমার্দ্ধ বাঙ্গালায় লিখিয়াছিলেন,—বিশেষ ভাল হয় নাই। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের Encyclopedia Bengalensis হইতে একটা অংশ (১৮৪৯) ভূদেব বাবু পুনর্মুদ্রিত করেন; তাহাতে মৌলিকতা কিছু ছিল। জ্যামিতির শেষার্দ্ধ ঢাকার কালীকুমার দাস অনুবাদ করেন। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণপণা দেখাইয়াছিলেন—কৃষ্ণকমলের জ্যেষ্ঠ সহোদর রামকমল ভট্টাচার্য্য; নানাশাস্ত্রে তাঁহার

অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। আমার পুস্তকের জ্যামিতিক পরিভাষা সম্পূর্ণ আমারই। নর্ম্যাল স্কুলে প্রসন্নবাবুর পাটীগণিত ও আমার জ্যামিতি আগাগোড়া পঠিত হইত। উড্রো সাহেবের কথায় আমি বাঙ্গালায় ত্রিকোণমিতি (Trigonometry) রচনা করি। আর একখানি বই লিখিলাম; তাহার নাম দিলাম—'জ্যামিতিক অনুশীলনী' (Geometrical Problems); ভূগোল লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করি নাই।

"শিক্ষাবিভাগে ভূদেববাবুর উন্নতির কথা আলোচনা করিতে গেলে, একটি রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিতে হইবে। আমি ছাড়া আর কেহ সে ব্যাপারটি অবগত আছেন কি না, জানি না। মেড্‌লিকট যখন ইন্‌স্পেক্টর, ভূদেববাবু তখন তাঁহার অ্যাসিষ্টাণ্ট। কয়েকজন সিভিলিয়ন 'Indian Empire' নামে, একখানি কাগজ বাহির করিতেন। সেক্রেটরি অ্যাশলি ইডন্ ও ইন্‌স্পেক্টর মেড্‌লিকট তাহাতে প্রবন্ধ লিখিতেন; ভূদেব বাবুও লিখিতেন। এই সূত্রে ইডনের সঙ্গে তাঁহার পরিচয়ের আরম্ভ। ক্রমশঃ তিনি ইডনের কাছে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন—'এ দেশে সিভিলিয়নের সাহায্য ব্যতীত উন্নতি করা অসম্ভব।' একদিন তিনি ইডন্ সাহেবকে বলিলেন—'মেড্‌লিকট আমার patron ছিলেন; সিভিলিয়নের সাহায্য না পাইলে এ দেশে উন্নতি হয় না; আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ,—আপনাকে আমার patron হইতে হইবে।' অগত্যা সাহেব স্বীকৃত হইলেন। কিছু দিন পরে ইডন্ চিফ কমিশনর হইয়া বর্ম্মায় চলিয়া গেলেন। স্যর জর্জ্জ ক্যাম্পবেল ভূদেববাবুর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া ডাইরেক্টর আট্‌কিসন্‌কে লিখিলেন—'যদি তুমি সতর্ক না হও, তোমার শিক্ষাবিভাগের সর্ব্বনাশ হইবে।' ভূদেববাবু কোনও রকমে ছুটি লইয়া বর্ম্মায় গিয়া ইডনের শরণাপন্ন হইলেন। সাহেব বলিলেন—'এখন ত আমি কিছু করিতে পারি না; কোনও রকম করিয়া দিন কতক কাটাইয়া দাও।' স্যর অ্যাশলি ইডন্ বাঙ্গালার ছোটলাট হইলে শিক্ষা-বিভাগের প্রথম শ্রেণীতে একটা পদ খালি হইল। ডাইরেক্টরের মনোনীত লোক একজন ছিল; কিন্তু ছোটলাট জিজ্ঞাসা করিলেন—'ভূদেব কোথায়?' (Where is that old man, Bhudev?) ভূদেববাবুর দেড় হাজার টাকা বেতন হইল।

ছয়

১৬ই ফাল্গুন, ১৩২২

আজ প্রাতে স্বনামধন্য নটরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাব স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ করিবাব জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলাম। তিনি বলিলেন—"আপনার 'পুরাতন প্রসঙ্গ' পুস্তক প্রকাশিত হইবার পর আমি উহা পাঠ করিয়াছিলাম। ৺মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আপনার নিকটে কলিকাতায় থিয়েটরের বনিয়াদ পত্তনেব যে ইতিহাস দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমার অনেক কথা মনে হইয়াছিল। একটা কথা ধরুন। 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকের রচয়িতা বলিয়া পণ্ডিত রামনারায়ণ জনসাধারণে পরিচিত। আমার কিন্তু ছেলেবেলা থেকে শোনা আছে যে উক্ত নাটকখানি পণ্ডিত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রচনা করিয়া দেন। এ বিষয়ের ভাল করিয়া অনুসন্ধান হওয়া উচিত। বইখানার মধ্যে কয়েকটা লক্ষণ দেখিয়া আমারও সন্দেহ হয় যে বোধ হয় উহা পণ্ডিত মহাশয়ের রচিত নহে। প্রথমতঃ দেখিবেন—বক্তৃতার ভাষাটা গুরুগম্ভীর সংস্কৃত ধাঁজের ভাষা; তাঁহার অন্যান্য নাটকের ভাষা এতটা সংস্কৃত ঘেঁসা নহে। আবার দেখুন, তাঁহার অন্য কোনও নাটকে

ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি
দু চারি আদার কুচি

এই ধরণের কবিতা আর দেখিতে পাওয়া যায় না। যিনি ও রকম কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত, তিনি যে একেবারেই আর ওপথ মাড়ালেন না, এ যেন কেমন কেমন ঠেকে। বিশেষতঃ তখনকার দিনে ও-ধবণের কবিতা অত্যন্ত আদরণীয় ছিল। আমি জানি, ভাল ভাল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বাঙ্গালা ভাষায় ঐ রকম সহজ সরস কবিতা রচনা করিয়া আনন্দবোধ করিতেন, দশের কাছে সমাদরও পাইতেন; বটতলার ছাপাখানায় সেই সকল কবিতাপুস্তক প্রকাশিত হইত। ইদানীং অনেক জায়গায় আমি সেই সকল বইয়ের সন্ধান করিয়াছি, কিন্তু কোথাও আর সেগুলি পাই না। আর একটা কথা,—'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' নাটকে পট-পরিবর্ত্তন নাই; পণ্ডিত মহাশয়ের অন্যান্য নাটকে কিন্তু ইংরাজী নাটকের পদ্ধতি অনুসারে গর্ভাঙ্কাদি বিভাগ আছে। তাই বলিতেছিলাম যে উক্ত নাটকের রচয়িতা বাস্তবিক পণ্ডিত মহাশয় কি না, সে বিষয়ে আপনারা একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ভাল হয়।"

আমি বলিলাম—"মহেন্দ্রবাবু যেখানে শেষ করিয়াছেন; আপনারা সেইখানে আরম্ভ করিয়াছেন; অর্দ্ধেন্দুশেখরের সঙ্গে যাঁহারা পাবলিক থিয়েটর প্রথম দাঁড়

করাইলেন, আপনি তাঁহাদের অন্যতম। আপনি যদি আমাদের বাঙ্গালী ষ্টেজের গত চুয়াল্লিশ বৎসরের ইতিহাস আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করেন, তাহা হইলে বাঙ্গালীর থিয়েটার পর্ব্বের ইতিহাসটা বোধ হয় এক রকম দাঁড় করান যাইতে পারে। আপনার জীবদ্দশায় যদি সেই ইতিহাসের মালমসলা সঞ্চিত না হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালীর একটা মস্ত সাহিত্যিক ক্ষতি হইবে। এতাবৎ যে সকল বিবরণ বাহির হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে অনেক ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। আপনাকে জজের আসন গ্রহণ করিতে বলিতেছি না। আপনি নিজের বক্তব্য বলিয়া যাউন; বাঙ্গালী পাঠকপাঠিকা বিচার করিবেন। আগে আপনি আপনার বাল্য জীবনের কথা কিছু বলুন।"

মুখ হইতে গুড়গুড়ির নলটি নামাইয়া বসু মহাশয় বলিলেন—"বঙ্গাব্দ ১২৬০এর ৬ই বৈশাখ রামনবমীর দিন আমি জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতার নাম কৈলাসচন্দ্র বসু। আমাদের আদি বাসস্থান কলিকাতা নহে; আমরা ধল্‌চিতার বসু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি। আমার প্রপিতামহ ধল্‌চিতা গ্রাম হইতে আসিয়া কলিকাতায় প্রথম পদার্পণ করেন। শোভাবাজারে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাটীর সম্মুখে আমাদের কলিকাতার পুরাতন বাটী ছিল; তখন গ্রে-ষ্ট্রীট রাস্তা ছিল না।

"ওরিয়েণ্টল্ সেমিনরিতে আমার পিতাঠাকুর বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সতীর্থ বন্ধু শম্ভুনাথ পণ্ডিত পরে হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন। মেট্রোপলিটান কলেজ যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অক্ষয় কীর্ত্তি, ওরিয়েণ্টল্ সেমিনরি তেমনি গৌরমোহন আঢ্য মহাশয়ের অক্ষয় কীর্ত্তি। শিক্ষাপ্রচার করিতে গিয়া যদি কোনও বাঙ্গালীর martyrdom হইয়া থাকে, তাহা গৌরমোহন আঢ্যের। নিম্নতম শ্রেণীতে ইংরাজি ভাষা শিখাইবার জন্য তিনি ফিরিঙ্গি শিক্ষক নিযুক্ত করিতেন। আমার মনে আছে একজন শিক্ষকের নাম ছিল স্মিথ, আর একজনের নাম ছিল ব্যালিস্। মাঝের শ্রেণী-গুলিতে ভাল ভাল বাঙ্গালী শিক্ষক নিযুক্ত করা হইত। উপরের দিকে খাঁটি ইংরাজ ও ভাল বাঙ্গালী শিক্ষক রাখা হইত। এক হিসাবে ওরিয়েণ্টল্ সেমিনরি হিন্দু কলেজের বিপরীত দিকে চলিয়াছিল। হিন্দু কলেজ বিলাতী উচ্ছৃঙ্খলতার গৌরব করিত; ওরিয়েণ্টল্ সেমিনরি সামাজিক সংরক্ষণ-নীতির প্রশ্রয় দিয়া প্রাচ্য আদর্শকে তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে না বলিয়া দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া বসিয়াছিল। বাছাই করিয়া ভাল ইংরাজ শিক্ষক নিযুক্ত করিবার জন্য গৌরমোহন শ্রীরামপুরে গিয়াছিলেন; নৌকাযোগে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়ে জলমগ্ন হইয়া তিনি প্রাণত্যাগ করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হইতে কোনও প্রকার অর্থ-সাহায্য না লইয়া যে বাঙ্গালী হিন্দু-সন্তান উচ্ছৃঙ্খলতার দিনে বাঙ্গালীর ছেলেকে সংযত প্রাচ্য আদর্শে দীক্ষিত করিয়া উচ্চ ইংরাজি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ওরিয়েণ্টল্ সেমিনরি

প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার উন্নতির জন্য একান্তভাবে সচেষ্ট ছিলেন, তাঁহার এই শোকাবহ মৃত্যুকে martyrdom বলিব না ত কি বলিব? অথচ এই করুণ ব্যাপারটির বিষয় কয়জন কলিকাতাবাসী বাঙ্গালী অবগত আছেন? ওরিয়েণ্টল্ সেমিনরির সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক কত গভীর তাহা আপনি শুনিলে বিস্মিত হইবেন। আমি ভূমিষ্ঠ হইবার পরে আঁতুড় ঘরে পিতা আমার মুখ দেখিলেন কি দিয়া জানেন? ওরিয়েণ্টল্ সেমিনরিতে পঠদ্দশায় তিনি যে স্বর্ণপদক পুরস্কার পাইয়াছিলেন, সেই সোণার মেডেল্‌টি সেই সদ্যোজাত শিশুটির চোখের সামনে ক্ষণেকের জন্য ধরিয়া তাহার কচি মুঠার ভিতরে অতি ধীরে তাহা রক্ষা করিলেন। মহাশয়, আজ আমার মাথায় একগাছি চুলও কালো নাই; প্রকৃতি দেবীর শুভ্র আশীর্ব্বাদ আমার শিরে অজস্র বর্ষিত হইয়াছে; এ জীবনে অনেক পুরস্কার দুই মুঠা ভরিয়া অর্জ্জন করিয়াছি; কিন্তু এই বিশ্বপ্রকৃতির সহিত সেই প্রথম পরিচয়ের নিশীথে আমার পিতৃদেবের সেই যে আশীর্ব্বাদ হিরণ্যমণ্ডিত হইয়া আমার অঙ্গ চুম্বন করিয়াছিল, তাহার সহিত বাবার ওরিয়েণ্টল্ সেমিনরিতে পঠদ্দশার একটি আনন্দস্মৃতি বিজড়িত হইয়া এই অতিক্ষুদ্র ব্যাপারটিকে আমার নিকটে মহীয়ান করিয়া তুলিয়াছে। সমস্ত দেশের নিকট হইতে অনেক পুরস্কার দুই মুঠা ভরিয়া অর্জ্জন করিয়া আবার অকাতরে বর্জ্জন করিয়াছি; দেশের আশীর্ব্বাদ নতমস্তকে গ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু সেই যৌবন-প্রৌঢ়ত্বের বিজয়োল্লাসের মধ্যে বোধ হয় কি এক অভিশাপ ছিল, একটা অহমিকা ছিল, একটা মত্ততা ছিল, তাই ভোগের দিনে ভাল করিয়া ভোগ করিতে পারি নাই। আজ বার্দ্ধক্যের সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া প্রহর গণিতেছি, আর ভাবিতেছি—ভোগের চেয়ে ত্যাগ বড়, অর্জ্জনের চেয়ে বর্জ্জন পুণ্যতর। অনেক সুখ দুঃখের স্মৃতি লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছি। কিন্তু আমার সমস্ত অর্জ্জিত পুরস্কারকে, অজস্রবর্ষিত আশীর্ব্বাদধারাকে, কর্ম্মীর বিজয়োল্লাসকে ছাপাইয়া সেই সুবর্ণপদক আজ আমার জীবনকে স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।

"আরও শুনিবেন? মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে যে গাভীর দুগ্ধ পান করিতাম, তাহা ওরিয়েণ্টল্ সেমিনরির পয়সা হইতে ক্রয় করা হইত। বাবা ওরিয়েণ্টল্ সেমিনরিতে শিক্ষক ছিলেন। কয়েক বৎসর তিনি হেড্‌মাষ্টার হইয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে কয়েক জনের নাম করিতে পারি,—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnerjee), চন্দ্রনাথ বসু, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, কৃষ্ণদাস পাল। কৃষ্ণদাস পাল যে বাবার ছাত্র ছিলেন, তাহা আমি ঘটনাচক্রে একদিন তাঁহারই মুখে শুনিলাম। তখন মল্‌হার রাও গাইকবাড় ও কর্ণেল ফেয়ার ঘটিত ব্যাপার লইয়া দেশময় জল্পনা কল্পনা হইতেছিল; রেসিডেণ্ট্ সাহেবকে হীরকচূর্ণের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া খাওয়ান হইয়াছিল; এই অপরাধে গাইকবাড় অভিযুক্ত। কৃষ্ণদাস পাল 'হিন্দু

পেট্রিয়ট' পত্রিকায় লিখিলেন—'আমরা একশত পাইকবাড়কে হারাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু একজন নর্থব্রুককে হারাইতে প্রস্তুত নহি।'—আমি এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া 'হীরকচূর্ণ' নামে একখানি নাটক লিখিলাম; দুষ্টুমি করিয়া কিছু হাসি ঠাট্টা করিলাম। নাট্যসাহিত্যে এই নাটকখানি আমার প্রথম রচনা। অক্রূর দত্তের বাড়ীর দেববাবু আমাকে একদিন কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের নিকটে লইয়া যান; তাঁহার সাহায্য আমার তখন অত্যন্ত আবশ্যক। আমার নাম শুনিয়া তাঁহার একটি বন্ধু বলিয়া উঠিলেন—'ওঃ ইনিই আপনাকে থিয়েটরের ষ্টেজে বিদ্রূপ করিয়াছেন।' তাকিয়ায় ঈষৎ হেলান দিয়া কৃষ্ণদাস পাল আমায় বলিলেন—'আপনার নাম অমৃতলাল বোস্? বাড়ী কোথায়?' আমি বিনীত ভাবে উত্তর দিলাম—'কম্বুলিয়াটোলায়' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কম্বুলিয়াটোলার বোস্? কৈলাসচন্দ্র বোস্ আপনার কেউ হতেন?' আমি বলিলাম—'আমি তাঁহারই পুত্র।'...'তুমি তাঁর ছেলে?' এই বলিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন—'তুমি তাঁর ছেলে? আমিও যে তাঁব ছেলের মত, আমি যে তাঁর ছাত্র! তুমি ত আমার গুরু-ভাই হলে!' এই বলিয়া তিনি সস্নেহে আমাকে কাছে বসাইয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; যে কাজের জন্য আমি তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলাম, তাহা এমনভাবে সুসম্পন্ন করাইয়া দিলেন যে, তেমন কিছুতেই আশা করিতে পারি নাই।

"খুব ছেলেবেলায় মনে পড়ে, বাবা সেক্ষপীয়র আবৃত্তি করিতেন; আমি একবর্ণও বুঝিতাম না, কিন্তু মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সেই আবৃত্তি শুনিতাম। অনেকে তাঁহার আবৃত্তি শুনিতে আসিতেন; ভবানীচরণ দত্ত রোজ আসিতেন। কবিতা আবৃত্তির দিকে এখনও আমার একটা প্রবল ঝোঁক আছে। অল্পবয়সে অনুকূল অবস্থার মধ্যে পতিত হওয়ার দরুণ এই প্রবৃত্তি আমার মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল কি না, কে জানে? ইংরাজি বা বাঙ্গালা ভাষায় প্রবন্ধাদি লিখিবার অভ্যাস বাবার ছিল কি না আমি ঠিক বলিতে পারি না, তবে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যকে অনেক সময়ে তিনি অর্থসাহায্য করিতেন; 'ভাস্কর' ও 'রসরাজ' অনেকদিন পর্য্যন্ত আমাদের বাড়ীতে আসিত। মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বে বাবা ওরিয়েন্টল্ সেমিনরির শিক্ষকের পদত্যাগ করিয়া ম্যাকেঞ্জি লায়াল্ কোম্পানীর এজেন্সি করিয়া কিছু বেশী পয়সা রোজগার করিয়াছিলেন। তখনও তাঁহার পড়াশুনার অভ্যাস খুব ছিল। দ্বিপ্রহরে আপিসের কাজ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি প্রত্যহ মেট্‌কাফ্ হলে গিয়া পড়িতে বসিতেন। আমাদের পাড়ার ছোট ছোট ছেলেদের লেখাপড়ার সুবিধার জন্য তিনি পূর্ব্বেই একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। এই স্কুল হইতে ছেলেরা প্রথম এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেয় ১৮৬৪ সালে। এখানে যেমন সংস্কৃত পড়াইবার ব্যবস্থা ছিল, সংস্কৃত কলেজ ব্যতীত অন্য কোথাও আর সে রকম ছিল না। প্রথম

শ্রেণীতে রঘুবংশ কুমারসম্ভব পড়া শেষ হইয়া যাইত। ইদানীং সর্ব্বজনবিদিত অজিত ন্যায়রত্ন মহাশয় তখন এই বিদ্যালয়ের উপরের ক্লাসে পড়াইতেন। আপনাদের রিপন কলেজের ভূতপূর্ব্ব পণ্ডিত রামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পিতা রামগোপাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছে এখানে আমি সাহিত্য ও ব্যাকরণ পড়িয়াছি। শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের পিতা এখানে অনেকদিন অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়ে আমাদের পাড়ার বিশ্বম্ভর মৈত্র মহাশয় যথেষ্ট অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। ওরিয়েণ্টল্ সেমিনরির কয়েক জন ভাল ভাল শিক্ষককে সপ্তাহে দু' এক ঘণ্টা করিয়া এখানে আনাইয়া এখানকার ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল; আমার মনে আছে সেমিনরির শিক্ষক থার্লো সাহেব আমাদিগকে মাঝে মাঝে অঙ্ক কসাইতেন। ইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন—হেন্‌রি হাইড্। তিনি প্রত্যহ দমদমা হইতে জুড়িগাড়ি হাঁকাইয়া ইস্কুলে আসিতেন। তাঁহার মাসিক বেতন ছিল চল্লিশ টাকা মাত্র!

"ওরিয়েণ্টল্ সেমিনরি হইতে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। আমার পরীক্ষা দিবার কথা ১৮৬৬ সালে, কিন্তু তখন আমার বয়স ১৩ বৎসর মাত্র; সুতরাং দুই বৎসর অপেক্ষা করিয়া তবে আমি পরীক্ষা দিতে পাইলাম। আমাদের হেড্‌মাষ্টার ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী; ইতিহাস পড়াইতেন চন্দ্রনাথ বসু; অঙ্ক কসাইতেন বেণীমাধব দে; ইংরাজি সাহিত্য পড়াইতেন ফ্রেড্রিক্ পেনি। দুইটি পণ্ডিত ছিলেন খাঁটি সেকেলে টুলো পণ্ডিত,—একজনের নাম গণেশ, অপরটির নাম সরস্বতী। সরস্বতী পণ্ডিত মহাশয় আমাদের বাড়ীতে বসিয়া এক খোরা ফলারের সঙ্গে একশত আম অবলীলাক্রমে খাইয়া ফেলিতেন। কিন্তু ছেলেরা তাঁহাদের নামে তখন ছড়া তৈয়ার করে নাই। কিছু পূর্ব্বে হিন্দুস্কুলের ছেলেরা তাহাদের শিক্ষকদের নামে যে ছড়া করিয়াছিল তাহা আমাদের মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল—

"গুড্ সাহেবের লম্বা ঠ্যাং,
তার নীচে ঈশ্বর ব্যাং;
ঈশ্বর ব্যাং বড় দানা,
তার নীচে গুপে কানা।—" ইত্যাদি।

"এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। তখন যত বাঙ্গালা বই প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার অধিকাংশই আমি পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। মদনমোহন, তারাশঙ্কর, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, মাইকেল সব ছেলেই পড়িত। বটতলার বিখ্যাত পুস্তকবিক্রেতা বেণীমাধব দের পুত্র লালবিহারী আমার সহপাঠী ছিল। তাহাদের দোকানে যত উপন্যাস নাটক ছিল, এক এক খানি করিয়া বোধ হয় সবগুলিই পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। নাটকের প্রতি আমার বিশেষ টান ছিল। লাল

বিহারী একদিন দোকান হইতে আমাকে একখানি নাটক পাঠাইয়া দিল,—তাহার নাম 'আইন সংযুক্ত কাদম্বিনী নাটক'। ভাবিলাম না জানি কি রহস্যই ইহার মধ্যে আছে। Preparatory class-এর মার্শমান পাঠ করিয়া কখন যে ওখানা পড়িতে পাইব, তাহার জন্য অস্থির হইয়া রহিলাম। পড়িয়া দেখিলাম,—কথোপকথনচ্ছলে সমস্ত পিনাল্ কোড খানা নাটকে পরিণত করিবার চেষ্টা! বুঝিতে পারিলাম ডাক্তার যদুগোপালের 'ধাত্রীশিক্ষা'র ধরণটুকু অনুকরণের ব্যর্থ প্রয়াসের ফলে লেখকের এই বিষম বিড়ম্বনা। Dialogue-এ কিছু লেখা হইলেই তাহা নাটক হইল, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া উকিল গ্রন্থকার এই নাটক লিখিয়া ফেলিয়াছেন। এক এক খানি নাটক খুব উৎরাইয়া যাইত। 'ফল্গারে নাটক' নামক একখানি প্রহসন পাইয়াছিলাম; রচনাটি অতি সুন্দর। আর কিন্তু কোথাও সে বই দেখিতে পাই না। বিবাহের দিন উপবাস করিয়া থাকিতে হয়; লালবিহারীর দোকান হইতে নাটক চাহিয়া পাঠাইলাম। দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী' সেই প্রথম আমার হাতে পড়িল। তখনকার দিনে দীনবন্ধুর নাটকের জন্য আমরা সকলে উদগ্রীব হইয়া থাকিতাম; বঙ্কিমের পুস্তকেব জন্য তখনও জন-সাধারণের সে রকম উৎকণ্ঠা হইত না। যখন বঙ্গদর্শনে 'বিষবৃক্ষ' ধারাবাহিক প্রকাশিত হইতে লাগিল তখন হইতে বঙ্কিম সকলের হৃদয় জুড়িয়া বসিলেন; তাহার পূর্ব্বে সকলে খোঁজ করিত,—দীনবন্ধুর কোনও নূতন নাটক বাহির হইল কি না। বিবাহের দিন 'লীলাবতী' আগাগোড়া পাঠ করিয়া ভাবিলাম,—'তাই ত, পত্নীটি আমার কি রকম হবেন! সারদাসুন্দরীর মত হলেই ভাল হয়; আমার ত ঝোঁক লীলাবতীর চেয়ে সারদাসুন্দরীর দিকে। নিশ্চয়ই সারদাসুন্দরীর মত হবে। যদি না হয়! লীলাবতীও মন্দ নয়, কিন্তু……।' বিবাহ হইয়া গেল। দেখিলাম আমার পত্নীটি সারদাসুন্দরীও নন্, লীলাবতীও নন,…একটি চেলির পুঁটুলি! (Chronicler মহাশয় এইখানে একটু সাবধান না হইলে আমার বিপদের সম্ভাবনা! আমি একথাগুলি কিছু ভয়ে ভয়ে বলি!)

"পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তারি পড়িবার জন্য মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করিলাম। ছেলেবেলা থেকেই আমি ডাক্তারির ভাণ করিয়া খেলা করিতাম; কলাগাছ কাটিয়া amputation-এর সখ মিটাইতাম; বেলের আটা পচিয়া পোকা হইলে জোঁক বসান'র অভিনয় করিতাম; বেলের আটা সেবন করাইয়া বাস্তবিকই কোনও কোনও রোগীকে আরাম করিতাম! আবার ম্যুনিসিপ্যালিটির রাস্তার পরিদর্শক সাহেব সাজিয়া হ্যাট পরিতাম। ওরিয়েণ্টল্ সেমিনরিতে পড়িবার সময়েই ব্ল্যাণ্ড্‌ফোর্ড সাহেবের রসায়ন সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিতে যাইতাম। মেডিক্যাল কলেজে আমার সহাধ্যায়িগণের মধ্যে ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর, তারিণী চরণ বসু, ৺মহেন্দ্রনাথ

ঘোষ ও শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র দে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। ম্যাক্‌নামারা সাহেব যখন রসায়ন পড়াইতেন, স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর এইচ. উড্রো মধ্যে মধ্যে সেই বক্তৃতা শুনিতে আসিতেন; ঘটনাচক্রে প্রায়ই তিনি আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিতেন। তাঁহাকে দেখিয়াই আমার মনে পড়িত আমাদের শ্যামবাজারের ইস্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়া তিনি যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—'ছেটা মৌমাছি কেটা পা (ছটা মৌমাছির কটা পা)?' তাঁহার নাম H. Woodrow ছিল; ছেলেরা বলিত—হুড্রো। তিনি লম্বা স্বর করিয়া বলিতেন,—'আমি হুড্রো নই, এইচ. উড্রো';—শেষ ওকারের স্বরটা অনেকদূর-টানিয়া লইতেন।

"মোটের উপর দুই বৎসর কলেজে অধ্যয়ন করিলাম। মধ্যে মধ্যে কাশীতে ডাক্তার লোকনাথ মৈত্র মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া থাকিতাম; তিনি আমাকে তাঁহার নিজের ছেলের মত স্নেহ করিতেন। তখন তাঁহার নিজের সন্তান হয় নাই। শেষে একেবারে অ্যালোপ্যাথির পন্থা পরিত্যাগ করিয়া হোমিওপ্যাথি চর্চ্চা করিবার জন্য কাশীতে লোকনাথ বাবুর বাটীতে রহিলাম। হোমিওপ্যাথির সঙ্গে আমার সম্পর্ক বাল্যকাল হইতেই দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। এগার বৎসর বয়সের সময় আমাদের বাটীর সন্নিকটস্থ একটি বৃক্ষ হইতে পড়িয়া যাওয়ায় আমার একটি হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। লোকনাথবাবু আমাদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়া দেখিলেন যে হাড় fracture হইয়া গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ আমার বাবার অনুমতি লইয়া তিনি প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বেরিণিকে লইয়া আসেন। আমার ভাঙ্গা হাত লইয়া বোধ হয় কলিকাতায় হোমিওপ্যাথির প্রথম Surgical case হয়। যেদিন প্রথম বন্ধন মোচন করিয়া একটা পাৎলা bandage বাঁধিয়া দেওয়া হইল, সেদিন সেই ব্যাণ্ডেজ খোলা দেখিবার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় ও ডাক্তার রাজেন দত্ত আসিয়াছিলেন। একটা হাসির কথা আমার মনে আছে। খোঁজ হইতেছিল, পাৎলা paste board কোথায় পাওয়া যায়! একজন বলিলেন, 'সেক্ষপীয়রের মলাট ছিঁড়িয়া লইলে হয় না?' ডাক্তার সাহেব হাসিয়া বলিলেন—'Or the cover of the Bible may do!' খৃষ্টীয় ধর্ম্মে বেরিণি সাহেবের শ্রদ্ধা ছিল না। তখন জানিতাম না যে, যে ভাঙ্গা হাত হোমিওপ্যাথিক Surgery-তে জোড়া লাগিল, সেই হাত ভবিষ্যতে হোমিওপ্যাথির সেবায় নিযুক্ত হইবে। লোকনাথবাবু জজ ব্যাঙ্ক্‌ আয়রণসাইডের স্ত্রীকে বিষম আমাশয় রোগ হইতে মুক্ত করিয়া কাশীতে হোমিওপ্যাথিকে সুপ্রতিষ্ঠ করিতে পারিয়াছিলেন। জজ সাহেব নিজে হোমিওপ্যাথ্‌ হইলেন। লোকনাথবাবু তৃতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারী হইলেন। তাঁহার একটি ছেলে সুরেন্দ্র সম্প্রতি বিলাত হইতে ডিগ্রী লইয়া আসিয়াছে; আর একটি ছেলে দ্বিজেন্দ্র মেও হাঁসপাতালের Resident

Surgeon। ডাক্তার লোকনাথবাবুর সাধ্বী স্ত্রী কচি ছেলেগুলিকে লইয়া বিধবা হইলেন; কত কষ্টে যে তাহাদিগকে মানুষ করিলেন, তাহা ভগবান্ জানেন। আমার জীবনপ্রবাহ বক্রগতিতে এতাবৎ চলিয়া আসিয়াছে; যে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ ধারাটি বারাণসী তীর্থে লোকনাথ মৈত্র মহাশয়ের চরণতল ধৌত করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহার সার্থকতায় আমার জীবন ধন্য হইয়া গিয়াছে। অনেক দিন পরে তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া আমি লিখিয়াছিলাম—

'কোথা তাত লোকনাথ, দেবপদে প্রণিপাত,
কত কথা ওঠে মনে তোমার স্মরণে।
কত স্নেহ ভালবাসা, কত সুখ কত আশা
পেয়েছি পায়ের পাশে কিশোর জীবনে॥

*

এমনি নিদাঘ নিশি, ছাদেতে সকলে মিশি
পাশাপাশি পালঙ্কেতে করি জাগরণ।
কত গল্প বহুতর, মিথ্যা দ্বন্দ্ব মনোহর,
গ্রহগতি হেরি, করি তারকাগণন॥
তোমার ইঙ্গিতে রাতে, সেই পাচিকার সাথে,
রন্ধন বলিয়া মন্দ কলহরোপণ।
পিসীমারে মনসাধে, কৃপণতা অপবাদে
কাঁদায়ে, সেধেছি পরে ধরিয়ে চরণ॥

* * *

ইংরাজ জজের জায়া, ছাড়িতে ছাড়িতে কায়া,
তব চিকিৎসায় পায় প্রাণ পুনরায়।
পুরস্কার দিতে এর, আয়রণ-সাইডের,
কোমল কৃতজ্ঞ মন পুলকেতে চায়॥
মহাপ্রাণ লোকনাথ, নিজে না পাতিয়া হাত
দীন দুঃখী তরে চায় চিকিৎসা-আলয়।
হানিমান্ জয় জয়, ভারতে কাশীতে হয়,
হোমোপ্যাথি হস্পিটাল্ প্রথমে উদয়॥'

"কাশীতে অবস্থানকালে ডিউক্ অভ্ এডিনবরার দর্শনলাভ আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। তখনও আমি কলিকাতা মেডিক্যাল্ কলেজের সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন

করি নাই। একটি বিশালকায় হস্তীপৃষ্ঠে লর্ড মেয়ো ও ডিউক্ অভ্ এডিনবরা পাশাপাশি বসিয়াছিলেন। সেই শালপ্রাংশু মহাভুজ লর্ড মেয়োর করুণ পরিণাম স্মরণ করিলে এখনও মনে বেদনা বোধ করি।

"বিদ্যাসাগর তাঁহার পিতৃদেবকে কাশীতে রাখিতে গিয়াছিলেন। লোকনাথ-বাবুর বাসাতেই তিনি উঠিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই লোকনাথবাবুকে হোমিও-প্যাথি শিখিতে বলেন। লোকনাথবাবু যথাসাধ্য তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তখন গঙ্গার উপরে সেতু নির্ম্মিত হয় নাই। ভোর রাত্রে নৌকাযোগে নদী পার করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে রাজঘাট ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিতে হইবে। সে কার্য্যের ভার আমারই উপর পড়িল। ঘুমাইয়া পড়িলে চলিবে না; যদি ভোর রাত্রে জাগিতে না পারি? স্থির করিলাম,—ঘুমাইব না; সতীর্থ বন্ধু মধুসূদন লাহিড়ীর ইঙ্গিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ধরিয়া বলিলাম—'গল্প বলিতে হইবে।' তিনি বলিলেন,—'গল্প শুন্‌বি? কি রকম গল্প বল্‌ব,—দু মিনিটের মত, না আধ ঘণ্টার মত?' ছোট বড় বিচিত্র রূপকথায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত নিশাযাপন করিলাম। গভীর নিশীথে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—'ওরে চুড়ী কিন্‌তে হবে।' এত রাত্রে দোকানদারকে পাওয়া যাবে কেমন করিয়া? তিনি বলিলেন—'পেতেই হবে; কাশীতে এসে চুড়ী না নিয়ে ফিরে যাব কি করে?' সেই রাত্রিতে চুড়ী কিনিয়া আনা হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় আবার গল্প বলিতে লাগিলেন। শেষ রাত্রে তাঁহাকে রেল ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিলাম। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সে রাত্রি ভুলিব না।

"কবি নবীনচন্দ্র সেনের সহিত এই সময়ে কাশীতে আমার প্রথম আলাপ হয়। নবীন তখনও কোনও বই লিখিয়া মুদ্রিত করিয়া, প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। ছোট ছোট কবিতা লিখিয়া বন্ধুবান্ধবকে শুনাইত। লোকনাথবাবু জানিতেন,—নবীন একজন ভাল কবি। তখন কাশীতে 'বুড়ুয়ামঙ্গল'-এর খুব ধুম; হোলির পরে মঙ্গলবারে হইত। নদীর উপরে নাচ, গান, যাত্রা; কাশী-নরেশের সহিত বিজিয়ানা-গ্রামের রাজার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইত। লোকনাথবাবু বলিলেন,—'নবীন বুড়ুয়ামঙ্গল দেখ্‌তে যাচ্ছ, পদ্যে বর্ণনা কর্‌তে হবে।' কালী, কলম, কাগজ, ও একটি বোতল মদ লইয়া নবীন ও আমি নৌকায় উঠিলাম। বিশ্বনাথের চরণতলে আমি মদ খাইতে শিখিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পরে নবীনকে বলিলাম,—'লিখ্‌বে ত লেখ, নইলে মদ দোব না।' নবীন এক নিঃশ্বাসে বুড়ুয়ামঙ্গল লিখিয়া ফেলিল।...অনেক দিন পরে নবীন যখন Personal Assistant to the Commissioner of Chittagong (কমিশনার ছিলেন ক্রীন সাহেব) আমি তাহার একটি পত্রের উত্তরে কাশীর কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলাম—

'কতদিন সেই দিন হয় কি স্মরণ।
কাশীতে নিশিতে গঙ্গাবক্ষে বিচরণ॥
বুড়ুয়ামঙ্গল মেলা মহা ধুমধাম!
বসন্ত-বাহারে সাজে বারাণসী ধাম॥
জলেতে দোকানপাট জলেতে বাগান।
ঢুলে ঢুলে চলে জলে শত জলযান॥
তীরে দীপ, নীরে দীপ, দীপ তরী 'পরে।
লক্ষ দীপ দেখে চক্ষু সলিল ভিতরে॥
তরণী তরুণী রূপে উজল বিমল।
যামিনী কামিনী দীপে আমোদে বিহ্বল॥
নাচে রম্ভা মেনকার অনুজা সকল।
তরঙ্গে উছলে জলে লাবণ্য তরল॥
কি স্বর-লহর তোলে ভাসায়ে গগন।
অঙ্গ টলে তরী টলে সঙ্গে টলে মন॥
আমি ধরে' বসিলাম তোমারে নৌকায়।
হইবে বর্ণিতে মেলা কম কবিতায়॥
নন্দনে রচিলে বসি মকরকেতন।
হ'ত কি না হ'ত গীত তোমার মতন॥'

"নবীনচন্দ্র বেশী দিন কাশীতে থাকিতে পারিলেন না, কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া গেলেন। বাগ্‌বাজারের অভয়চন্দ্র মল্লিক কাশীতে আমাদের বাড়ীতে উঠিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানির কর্ড লাইন তখন খোলা হইয়াছে; তিনি সেই রেলের জন্য জমি আগাগোড়া ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন,—তিনি Land Acquisition Deputy Collector ছিলেন। লোকনাথবাবুর সঙ্গে তাঁহার শ্বশুর-জামাই সম্পর্ক পাতান ছিল। লোকনাথবাবুকে বরাবর জামাই ষষ্ঠীর তত্ত্ব করিতেন। কাশীতে আমার প্রতি তিনি যথেষ্ট স্নেহ প্রকাশ করিলেন। কিছুকাল পরে কলিকাতায় তিনি আমার সন্ধান পাইয়া আমাকে তাঁহার বাড়ীতে ডাকাইয়া লইয়া আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে ডেপুটি করিয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অদৃষ্টে হাকিম না থাকিলে মল্লিক মহাশয় কি করিতে পারেন? গভর্মেণ্টের কাছে তাঁহার প্রতিপত্তি খুব বেশী; তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানির বড় সাহেবেরা জমি সংক্রান্ত গোলমাল উঠিলেই তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার সহিত পরামর্শ করিত। আমি কিন্তু তখন ভুবন নিয়োগীর বাড়ীতে নূতন থিয়েটারে আখড়াই দিতে যাইতাম। ভুবন নিয়োগীর

বাড়ী যাইতে হইলে অভয়বাবুর বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা দিয়া গেলেই শীঘ্রই যাওয়া যায়; কিন্তু পাছে তিনি আমাকে ধরিয়া ডেপুটি করিয়া দেন, এই ভয়ে একটা পাশের সরু গলি দিয়া লুকাইয়া থিয়েটার করিতে যাইতাম।...অভয়বাবুর পৌত্র ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক এখন লোকসমাজে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

"এই সময়ে সর্ব্বত্রই ডেঙ্গুজ্বরের আবির্ভাব হইল। কাশীতে আমাদের বাসায় চাকর বামুন সকলেই জ্বরে পড়িল। কোনও রকম করিয়া একটু জলসাবু তৈয়ার করিয়া রোগীদের পথ্য ও আমার নিজের আহার সারিয়া লইতে হইত। ১৮৭২ সালের গোড়ায় লোকনাথবাবুর চিঠি লইয়া কাশী পরিত্যাগ করিয়া বাঁকিপুরে ডাক্তারি করিতে গেলাম। বলদেব পালিত মহাশয়ের বাসায় উঠিলাম। বাঁকিপুরেও তখন অনেকে ডেঙ্গুজ্বরে পীড়িত; উকিল গুরুপ্রসাদ সেনকে আমি চিকিৎসা করিয়াছিলাম। দুইদিনে আমার চারটি টাকা রোজগার হইল। ডাক্তার বসন্ত দত্ত আমার মুরুব্বি হইলেন। বলদেববাবুর বাসায় কিছুদিন অবস্থানের পর একটা স্বতন্ত্র বাড়ীতে বসন্তবাবুর সঙ্গে আমি থাকিবার ব্যবস্থা করিলাম। তিনি আমাকে হাতে ধরিয়া কার্য্যে ব্রতী করিয়া দিলেন; যাহাতে আমার উন্নতি হয় কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কেশবচন্দ্র সেন বিলাত হইতে আসিয়া বাঁকিপুরে ছয় সাত দিন আমাদের বাসায় ছিলেন। সহর খুব সরগরম হইয়া উঠিল। একটা প্রকাণ্ড সভায় কেশববাবু। বক্তৃতা করিলেন। আমি বক্তার কাছে বসিয়া সমস্তটা লিখিয়া লইবার চেষ্টা করিলাম। কলেজের একজন ইংরাজ অধ্যাপক সভাপতি হইয়াছিলেন। অনেক বাগ্মীর বক্তৃতায় এ জীবনে মুগ্ধ হইয়াছি; কেশববাবুর বক্তৃতা grand, divine, inspired!—আর কাহারও সম্বন্ধে আমি এমন কথা বলিতে প্রস্তুত নই। পহেলা জানুয়ারিতে তিনি যখন কলিকাতা টাউন হলে প্রতি বৎসর বক্তৃতা করিতে দাঁড়াইতেন, দেশী বিদেশী সকল শ্রোতাই বিস্ময়ে ও পুলকে অভিভূত হইত; বক্তৃতার মধ্যে তিনি যখন দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী হেলাইয়া There, my God বলিয়া উঠিলেন, তখন সেই তর্জ্জনী সঙ্কেতাভিমুখে আমাদের মুখ ফিরাইতে হইত; সহসা মনে হইত যেন ঐখানে তাকালেই ঈশ্বরকে আমরাও দেখিতে পাইব। দেখুন, পরমহংস ঠাকুর একদিন একজন প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বক্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আচ্ছা তুমি যে হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াও, তোমার চাপ্‌রাস্ আছে?' ব্রাহ্মণ বলিলেন—'ঠাকুর, চাপ্‌রাস্ বুঝ্‌তে পারলুম না; চাপ্‌রাস্ কি? আমার চাপ্‌রাস্ নেই?' 'তা' হ'লে তোমার কথা মান্‌বে কেন? দেখ, একটা গাঁয়ে একটা পুকুর ছিল; গাঁয়ের সকলেই সেই পুকুরের জল খেতো; কিন্তু সেই পুকুরের পাড়টা দুষ্টু লোকেরা ময়লা করত, কারও বারণ শুনত না। একদিন গাঁয়ের সকলে মিলে হাকিমের কাছে দরখাস্ত করলে। কিছুদিন পরে একটা চাপ্‌রাশ-পরা লোক

এসে পুকুরের পাড়ের ওপর একটা গাছে হাকিমের আদেশ লটকে দিয়ে গেল। তার পরে আর কেউ পুকুরের পাড় ময়লা করে নি। তার চাপ্‌রাস ছিল, তাই তা'র কথা মানলে। তোমার চাপ্‌রাস না থাক্‌লে তোমার কথা লোকে মান্‌বে কেন?' আমার মনে হয় কেশব সেনের চাপ্‌রাস্ ছিল।

"কেশববাবু তখনকার যুবকদিগের আদর্শ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার দেখা দেখি অনেক ছোক্‌রা চস্‌মা পরিতে আরম্ভ করিল। কেশববাবু চস্‌মা নাকে দিয়া ঘুমাইতেন। একদিন আমি তাঁকে বলিলাম—'চস্‌মা চোখে না থাক্‌লে স্বপ্নও দেখ্‌তে পান না?' তিনি হাসিয়া উঠিলেন। একদিন বসন্তবাবু ও কেশববাবু বাসা হইতে বাহির হইয়া যাইবার কিছু পরে আমি বলদেববাবুর বাড়ীতে চলিয়া গেলাম। যাইবার সময় চাকরকে বলিয়া গেলাম আজ আর বাসায় ফিরিব না। সন্ধ্যার পর তাঁরা দুজনে আসিয়া আমাকে ধরিয়া লইয়া গেলেন। কেশববাবু বলিলেন, 'আজ ফুর্ত্তি করে এত খাবার কিনে এনে চাকরের কাছে শুনি যে তুমি আজ আর বাসায় ফিরবে না। আমরা ভাব্‌লুম তাও কি হয়? এ খাবার খাবে কে?'—এখন ত যখনই আমার মনে হয় যে আমাকে ছাড়া কেশববাবুর জীবনের একটি দিনের আনন্দ অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হইয়াছিল, তখনই আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।

"বলদেববাবু সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত ছিলেন। সংস্কৃত ছন্দে তিনি সুন্দর শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন একটি শ্লোক আমার মনে পড়িতেছে,—

'সমাচ্ছন্নাকাশে জীমূতজালে।
জ্বলে স্বর্ণলেখা তড়িন্মাল্যভালে॥
হৃদে তেমতি শ্রীমতী রাধিকার
প্রিয়প্রাপনাশা হবে অন্ধকার।'

"এই ছন্দে তিনি ভর্ত্তৃহরি রচনা করিয়া ফেলিলেন। তিনি সাহিত্যরসিক ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সঙ্গলাভ আমার বেশী দিন ঘটিল না।

"১৮৭২ সালের শেষাশেষি বাঁকিপুর পরিত্যাগ করিলাম।

"এইবার আমার থিয়েটর জীবনের কথা আসিয়া পড়িবে। কাশীতে অবস্থানকালে দুইটি ভদ্রলোকের সংশ্রবে আসিয়াছিলাম, উপেন্দ্রনাথ দাস তাঁহাদের অন্যতম। নানা কারণে তিনি তখন তাঁহার পিতা শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের কোপ দৃষ্টিতে নিপতিত হইয়া লোকনাথবাবুর বাসায় আসিলেন। আজ তাঁহার নামটুকু উল্লেখ করিলাম মাত্র। আমার রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে আবার আপনি তাঁহার দেখা পাইবেন। আর একজনের নাম আমি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে স্মরণ করিতেছি,—রাজচন্দ্র সান্ন্যাল। তিনি তখন

কুইন্‌স্ কলেজের লাইব্রেরিয়ান্। প্রিন্সিপ্যাল গ্রিফিংস্ সাহেবের স্বরচিত বেণুবনের কুঞ্জবীথিকায় সন্ধ্যায় একাকী তাঁহার পাদচারণা আমার মানসপটে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। প্রত্যহ সেই বেণুকুঞ্জের মধ্যে উপবেশন করিয়া গ্রিফিংস সাহেব রামায়ণ ইংরাজি পদ্যে অনুবাদ করিতেন। রাজচন্দ্রবাবু লাইব্রেরি হইতে ইংলণ্ডের ও ফ্রান্সের ইতিহাস, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি অনেক বিষয় পড়িবার সুযোগ করিয়া আমাকে দিয়াছিলেন। ইংরাজি পড়ার নেশা আমার খুব জমিয়া উঠিল। আজ শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে সান্যাল মহাশয়ের কথা স্মরণ করিতেছি। জীবনে যদি আমি কিছুমাত্র কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া থাকি, তজ্জন্য সান্যাল মহাশয়ের নিকটে আমি অনেক অংশে ঋণী। আজ তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া আমি বিদায় লইলাম।”

সাত

২২শে ফাল্গুন, ১৩২২

আজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় বলিলেন,—"গোড়াতেই আপনাকে আমার ছেলেবেলাকার আরও দু'একটা কথা বলিয়া লই। এখন পর্য্যন্ত আমি এমন কিছু বলি নাই যাহাতে আপনি আমার বাঙ্গালা রচনার—বিশেষতঃ Parody রচনার—গোড়ার সূত্র ধরিতে পারেন। আজ প্রথমেই সেই কথা আপনাকে বলিব।

"আমার একজন খুব দূর সম্পর্কীয় কাকা ছিলেন; তাঁহার নাম প্যারিমোহন বসু। তাঁহার দুই খুড়া খৃষ্টান হইয়া যান;—একজনের কন্যাদ্বয় বিধুমুখী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু, যশ অর্জ্জন করিয়াছেন; তাঁহার বংশের আর একজন কেশববাবুর সমাজের ব্রাহ্ম হইলেন। প্যারীকাকার সতীর্থ সুহৃদ ছিলেন নবকৃষ্ণ ঘোষ; নবকৃষ্ণবাবু জ্যোতিষশাস্ত্র বেশ আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি 'রামশর্ম্মা' নামে সাময়িক সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। তখনকার খৃষ্টান পাদরীর স্কুলে বিদ্যালাভ করিয়া তাঁহারা পঠদ্দশায় বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা করিবার বড় একটা অবসর পান নাই, কিন্তু ল্যাটিন গ্রীক পড়িয়াছিলেন। একটু বেশী বয়সে প্যারীকাকা বেঙ্গল থিয়েটরের তখনকার নামজাদা নট 'গ্যাদাড়ু' গিরীশ ঘোষের ভগ্নীকে বিবাহ করেন। আমার পিতার মৃত্যুর অল্পকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

"তিনি আমাকে একটু একটু ল্যাটিন গ্রীক পড়াইতেন, আমি তাঁহাকে বাঙ্গালা বই পড়িয়া শুনাইতাম; 'ভাস্কর' কাগজখানা প্রায়ই তাঁহাকে শুনাইতে হইত। ক্রমশঃ তাঁহার বাঙ্গালা রচনার দিকে একটা প্রবল ঝোঁক হইল। তিনি শ্লেষ-রচনায় সিদ্ধহস্ত হইলেন; 'ভাস্করে' তাঁহার সেই সকল parody প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল। মাইকেলকে লইয়া তিনি parody করিতেন। মাইকেল লিখিয়াছেন—

আহা,
শৈবালের দলে শোভে যেই রত্নরাজি,

প্যারীকাকা লিখিলেন,—

আহা,
বৃষভের ল্যাজে শোভে যেই পুচ্ছরাজি,...

পুনশ্চ, মাইকেলকে অনুকরণ করিয়া তিনি লিখিলেন—

আমি হনু, এ বিপুল বিশ্বে কে না ডরে
দেখি মোর লাফ!

"তাঁহার এই সকল শ্লেষ-রচনায় ক্রমে আমি তাঁহার সাক্‌রেদ্ হইয়া উঠিলাম; অনেক সময়ে তিনি আমাকে পাদপূরণের জন্য আহ্বান করিতেন। আমার রচনায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিলে আমি কৃতার্থ হইতাম। ইহার পূর্ব্বে কবিতা রচনায় আমার হাতে খড়ি দিয়াছিলেন আমাদের এই শ্যামবাজার স্কুলের পণ্ডিত ব্রহ্মানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। তখনকার দিনে অক্ষক্রীড়ার ওস্তাদ তাঁহার মত আর কোনও বাঙ্গালী ছিলেন কি না সন্দেহ। তিনি একখানা বই লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন—'অক্ষবল চরিত'। পণ্ডিত মহাশয় 'ছন্দপ্রকাশ', 'ছন্দবোধ' প্রভৃতি কয়খানি অতি সুন্দর পুস্তকও বচনা করিয়াছিলেন। বাবা তখন স্কুলের সেক্রেটারি। বাবার অনুমতি লইয়া ঐ পুস্তকগুলি স্কুল-পাঠ্যরূপে ব্যবহৃত হইল। আমরা বিদ্যালয়ে নানা ছন্দে কবিতা রচনা করিতে অভ্যাস কবিলাম। পরে প্যাবীকাকার নিকটে অভয় পাইয়া ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে আমার প্রথম চিত্রকাব্য বচিত হয়। আমার সেই প্রথম বচনাটী মোটেই রসাত্মক নহে কয়েকটী ছন্দোবদ্ধ শব্দ মাত্র। আদ্যক্ষরগুলি একত্র জুড়িলে আমার নামটী বানান কবা হয়। এখনও আমার সেটী মুখস্থ আছে—

শ্রীশ্রীহবিপদে যে বা করয়ে স্মরণ
অবনী ভিতরে সেই আদরের ধন॥
মৃত্যুভয় নাহি থাকে সদা আনন্দিত।
তপ জপ করে সদা মনের সহিত॥
লালসা নাহিক ধনে মোক্ষ প্রয়োজন।
লভিতে লালসা মাত্র ঈশ্বর চরণ॥
বন্দি ঈশ্বর চরণ খোঁজে মোক্ষপথ।
সুজন স্বজন তাঁর শত্রু হয় হত।

"এ কবিতাটী লিখিয়া আমাব মোটেই আনন্দ হয় নাই। কোনও রকম করিয়া মিল চাই; এ ত হইল শব্দের গোঁজামিল মাত্র। প্যারীকাকা বলিলেন—'একটা ভাল করে পদ্য লেখ না।' তখন সবেমাত্র স্তর রাধাকান্ত দেবের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি বলিলেন,—'স্তর রাধাকান্ত দেবের উদ্দেশে একটা কবিতা লেখ না।' আমি তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া মাইকেলের 'রেখো মা দাসেরে মনে' কবিতাটার ছন্দে একটা পদ্য রচনা করিলাম। প্যারীকাকার তাহা এত ভাল লাগিল যে তিনি তাহা 'ভাস্করে' প্রকাশিত করিয়া দিলেন। এই আমি প্রথম আমার লেখা ছাপায় অক্ষরে দেখি। কবিতাটী আমার নিজেরও বেশ পছন্দসই হইয়াছিল। কিন্তু শ্লেষ-রচনার দিকেই আমার প্রবণতা বেশী রহিয়া গেল। আমার মধ্যে কিছু সরসতা, native wit, ছিল; তিনি তাহা ফুটাইয়া তুলিলেন।

"আমার যে একটু native wit ছিল, অল্পবয়সেই তাহার কিছু কিছু পরিচয় দিয়াছিলাম। আমাদের ছেলেবেলায় কলিকাতার নাট্য সমাজে কালিদাস সান্ন্যাল খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি একাধারে গাইয়ে বাজিয়ে নাচিয়ে এবং Organiser। বর্দ্ধমান রাজবাটীতে তাঁহার খুব আদর প্রতিপত্তি ছিল। তিনি ইচ্ছা করিলে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিতেন; কিন্তু সেদিকে আদৌ তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। তাঁহার রচিত 'নলদময়ন্তী' নাটক কয়েকবার অভিনীত হইয়াছিল। তিনি ফটোগ্রাফি বড় ভালবাসিতেন। তখনকার দিনে বিলাত হইতে রীতিমত তৈয়ারী প্লেট আমদানী হইত না; কলোডিয়মের সাহায্যে আলোক চিত্র তুলিতে হইত। সময়ে সময়ে তাঁহার খুব ভাল সোরা আবশুক হইত। আমাদের সোরার কল ছিল। একদিন তিনি আমাকে বলিলেন—'ওহে খুব ভাল সোরা কিছু আমাকে দিতে পার?' আমি বলিলাম, 'তা কেন পারব না?' কিছু পরে আন্দাজ তিন সের সোরা কালীদাদাকে দিলাম। তিনি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 'খুব ভাল ত? নুন নেই ত?' আমি দু একবার 'না, না' বলিয়া শেষটা বলিলাম—'আজ্ঞে, একটু আছে বৈ কি, তা নইলে যে শুধু পীটর্ হোতো!' তিনি বলিলেন—'অ্যাঁ কি হোতো?' আমি উত্তর দিলাম,—'শুধু পীটর হোতো। নুন না থাকলে কি সল্ট্-পীটর্ হয়?' কালীদাদা হাসিয়া উঠিলেন। আমাদের উৎকৃষ্ট সোরা ইংরাজ রাসায়নিক কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়া বাজারে বিক্রয় হইত।

"প্যারীকাকার মৃত্যুর পরে আমার বাঙ্গালা রচনা দিন কতক বন্ধ ছিল। ঘটনাচক্রে আমি একখানা প্রহসন নাটক লিখিয়া ফেলিলাম। আমাদের পাড়ায় একটা সখের যাত্রার দল ছিল। একদিন তাহারা আমাকে ধরিয়া বসিল—'আপনি একটা আমাদের পালা লিখে দিন।' আমি বলিলাম, আমি কি লিখে দোব?' তাহারা পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল; একখণ্ড দাশুরায়ের পাঁচালী আমার কাছে রাখিয়া গেল। আমি তখন সবেমাত্র পড়িয়াছি 'একেই কি বলে সভ্যতা?' তাহারই অনুকরণে আমি একখানা Farce রচনা করিলাম; নামটা বড় ছোট খাট হইল না—'একেই কি বলে তোদের বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি করা?' এই রচনাটি এখন একেবারে লুপ্ত। রচনায় যে বিশেষ কিছু কৃতিত্ব ছিল তাহা নহে; তবে এইটুকু বলিতে পারি—আমি অনুকরণ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু চুরি করি নাই। কথাটা বিশেষ করিয়া বলিতেছি, কারণ ইদানীং বাঙ্গালা সাহিত্যে চোরাই মাল সর্ব্বত্রই নজরে পড়িতেছে।

"রস-সাহিত্য-রচনার জন্য আমি আর একজনের নিকট অত্যন্ত ঋণী। তিনি 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শিশির ঘোষ। কাশীতে যখন লোকনাথবাবুর বাসায় ছিলাম, 'অমৃতবাজার পত্রিকা' পাঠ করিতাম। তখন কাগজখানি বাঙ্গালা ভাষায়

পরিচালিত হইত ; যশোর হইতে নিয়মিত ভাবে কাগজ বাহির হইত ; কলিকাতা সহরে তখনও বড় একটা জাহির হয় নাই। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় হাস্যোদ্দীপক প্রসঙ্গ 'বিবিধ' নামে প্রায়ই প্রকাশিত হইত। তেমন সরস Comic titbits আমাদের সাহিত্যে অত্যন্ত দুর্লভ। পঞ্চানন্দের প্রথম আমলে অনেকটা ইন্দ্রনাথে সেই খাঁটি রস উপভোগ করা যাইত। আমি পত্রিকার সেই অংশটার রসপ্রাচুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া যাইতাম। শিশির বাবুর প্রতিভা যে কতদিকে বিকশিত হইয়াছিল, তাহা আর আপনাকে বলিয়া শেষ করিতে পারিব না। তিনি গান বাজনার বিচক্ষণ সমজদার ছিলেন, কুস্তি করিতে জানিতেন ; কবি ছিলেন, সুরসিক ছিলেন। প্রবল ঝটিকায় অনেকগুলা গ্রাম উৎসন্ন হইয়া গেল ; তিনি সেই সমস্ত গ্রাম পর্য্যটন করিয়া সেই সাইক্লোনের গতি নিরূপণ করিলেন। তাঁহার স্বদেশপ্রীতি academic ধরণের পোষাকী ব্যাপার ছিল না। নীলকরে প্রপীড়িত প্রজাদিগের দুর্গতি তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন ; দেশবাসীর বেদনায় তাঁহার হৃৎপিণ্ড চঞ্চল হইয়া উঠিত।

"দেখুন আপনাকে এই সকল স্মৃতিকথা বলিতে বসিয়া ভাবিতেছি যে, মানুষ যখন বিচিত্র কর্ম্মপ্রবাহের উপর দিয়া ভাসিতে ভাসিতে একটা কোথাও গিয়া ঠেকে, তখন কিসে কি হইল, তাহার হিসাব নিকাশ করা তাহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন উঠিয়া উঠে। বহির্জগতের এবং অন্তর্জগতের ঘাতপ্রতিঘাতে যে মানুষটী গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার পক্ষে তৌলদণ্ড লইয়া সেই বিচিত্র শক্তি-তরঙ্গের voltage ওজন করিতে বসা বাতুলতা মাত্র। কেহ আমাকে প্রশ্ন না করিলে আমার বাল্যজীবনের এতগুলা কথা একত্র সাজাইয়া বলিতে পারিতাম না ; তবুও অনেকটা বোধ হয় এলোমেলো হইয়া যাইতেছে। যে কথাটা আগে বলা উচিত ছিল, যে ব্যক্তির নাম আগে করিলে ইতিহাস হিসাবে নিখুঁত হইত, সে কথাটী অথবা সে নামটী পরে মনে পড়িতেছে। কি করিব ; যখন যেমন মনে পড়িতেছে, আমার স্মৃতিকথা সেই রকম লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

"ছেলেবেলায় আমাদের জিম্ন্যাষ্টিকের খুব ধুমধাম ছিল। শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে একজন ফিরিঙ্গি (তাহার নাম ছিল পীটর) জিমন্যাষ্টিক খেলা দেখাইয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিল। বাঙ্গালীদের মধ্যে ঝোঁক হইল, ঐ রকম খেলোয়াড় হইতে হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উদ্যোগী হইলেন দুর্গাদাস কর, নবগোপাল মিত্র ও শ্যামাচরণ ঘোষ। অল্পদিনের মধ্যেই ভাল জিম্ন্যাষ্টিক্ আখড়া স্থাপিত হইল। আমাদের ওস্তাদ হইলেন পীটর। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী শিখিল অখিলচন্দ্র চন্দ্র। পরে তিনি Ward's Institution-এ (রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রতিষ্ঠিত) শিক্ষক হইলেন। শ্যাম ঘোষ ব্যায়াম শিক্ষা সম্বন্ধে অনেকগুলি বই রচনা করিয়া গিয়াছেন। স্বনামধন্য দুর্গাদাস কর শ্যাম ঘোষাক উৎসাহ দিতেন। আর নবগোপাল মিত্র ? আজ আমরা পত্রিকার

গুণে কিম্বা বক্তৃতার আসরে তাঁহার নাম ভুলেও মুখে আনি না; কিন্তু একদিন তিনি কলিকাতার বাঙ্গালী যুবকদিগের নেতৃস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার 'ন্যাশনাল পেপার' সর্ব্বত্র আদরণীয় ছিল। এই 'ন্যাশনাল' শব্দটা বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই প্রথম ভাল করিয়া জনসমাজে চালাইয়া যান। শঙ্কর ঘোষের লেনে তাহার বাড়ী ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের সমাজে 'ন্যাশনাল' শব্দটা বড় unlucky; কোনও 'ন্যাশনাল' অনুষ্ঠান আজ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া দাঁড়াইল না। নবগোপালবাবুর উদ্যোগে চৈত্র মাসে একটা মেলা বসিত। এই আমাদের প্রথম 'ন্যাশনাল' মেলা। যোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ী হইতে তিনি যথেষ্ট সাহায্য ও উৎসাহ পাইয়াছিলেন। আমার মনে আছে, এই মেলায় মহেন্দ্র ভট্টাচার্য্য একটা রাসায়নিক বিভাগ খুলিয়াছিলেন। আমরা নবগোপালবাবুর চেলা হইলাম।

"আমাদের দেখাদেখি চারিদিকে জিম্‌ন্যাষ্টিক্ আখড়া স্থাপিত হইল। স্যর জর্জ ক্যাম্পবেল্ দুইবার আমাদের আখড়ায় আসিয়া মেডাল দিলেন। বিদ্যালয়গুলাতে ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইল। শ্যাম ঘোষ হুগলি কলেজে ব্যায়াম শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। আমাদের পাড়ায় নটবর চৌধুরীর বাড়ীতে আমরা একটা আখড়া করিলাম।

"ছেলেবেলায় আমাদের এই কম্বুলিয়াটোলার স্কুলে যখন অধ্যয়ন করিতাম, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি আমার সতীর্থ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার নাম ছাড়া আর যে কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল মনে পড়ে না। বরং বোধ হইত তাঁহার মধ্যে রসকস কিছুই ছিল না। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বাড়ীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল; আমরা শুনিলাম যে তিনি ও বাবু (পরে মহারাজ স্যর) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মামাত 'পিসতুত' ভাই ছিলেন। অর্দ্ধেন্দুশেখরের চাল চলনও যেন আভিজাত্যসূচক বলিয়া বোধ হইত। স্কুলের শিক্ষক হাইড্ সাহেব ছেলেদের নামের শেষ অংশটা ডাকিতেন; যথা,—অমৃতলাল বসু না ডাকিয়া ডাকিতেন—লাল বসু; অর্দ্ধেন্দুর নাম তিনি কখনও ঠিক করিয়া বলিতে পারেন নাই; মুস্তফি না বলিয়া সাহেব বলিতেন,—ম্যাষ্টিফ্। অর্দ্ধেন্দুকে ছেলেরা বড় জ্বালাতন করিত; আমিও অনেক সময়ে তাহাদের সহিত যোগ দিতাম; কিন্তু যখন তাহারা একটু বাড়াবাড়ি করিত, আমি তাঁহার পক্ষ লইতাম। আমাদের সহিত দুই বৎসর কম্বুলিয়াটোলার স্কুলে লেখাপড়া করিয়া অর্দ্ধেন্দু পাইকপাড়ার স্কুলে চলিয়া গেলেন।

"ইহার পরে প্রায় চার বৎসর কাটিয়া গেল। অর্দ্ধেন্দুর সহিত আমার দেখাশুনা হয় নাই; তাঁহার নাম পর্য্যন্ত আমি বিস্মৃত হইয়া গেলাম। আমি ওরিয়েন্ট্যাল সেমিনরিতে তখন অধ্যয়ন করি। আমি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই প্রাইভেট্ থিয়েটর সম্বন্ধে আলোচনা ছেলেমহলে খুব হইত। কোথায় কোন নাটক অভিনীত হইল, কে কি ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন, নাটকে কলিকাতা সমাজের কোন

ব্যক্তির উপর কটাক্ষ করা হইয়াছে, এই সমস্ত বিষয় লইয়া ছেলেরা জল্পনা কল্পনা করিত। এইখানে আপনাকে বলিয়া রাখি যে 'হুতোম প্যাচার নক্সা' রচনার পর হইতে নাটক বা উপন্যাস সাহিত্যে কে কার জবাব দিল ইহাই সকলে জানিতে চেষ্টা করিত। আমি অনেক নাটক পড়িয়াছিলাম, কিন্তু কখনও থিয়েটর দেখিতে যাই নাই; সন্ধ্যার পরে বাড়ীর বাহিরে বেশীক্ষণ থাকা আমাদের নিষেধ ছিল। শুনিলাম যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'বুঝলে কি না'র জবাব ভুলু মুখুয্যে (আহিরীটোলার ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়) খুব দিয়াছে; তাহার জবাবের নাম, 'কিছু কিছু বুঝি'। ছেলেমহলে খুব হৈচৈ পড়িয়া গেল। আমরা শুনিলাম জোড়াসাঁকোর কয়লা ঘাটায় উহা অভিনীত হইবে। বন্ধুরা আসিয়া আমাকে ধরিয়া বসিলেন—'চল, থিয়েটার দেখতে হবে।' আমি বলিলাম, 'আমার যাওয়া হবে না; সন্ধ্যার পরে কখনও বাড়ীর বাহিরে থাকি নাই।' তাঁহারা বলিলেন,—'তবে না হয় দিনের বেলায় চল, ষ্টেজ দেখে আসবে।' আমি সম্মত হইলাম। সেখানে আমার প্রথম থিয়েটরের ষ্টেজ দর্শন হইল। সীন্ বড় বেশী ছিল না; দেয়ালের গায়ে একখানা 'সীন্' অঙ্কিত দেখিলাম। কৌতূহলবশবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কে কে অভিনয় করিবে? শুনিলাম,—ধর্ম্মদাস আছেন, আর আছেন—অর্দ্ধেন্দু! নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। 'অর্দ্ধেন্দু! কোন্ অর্দ্ধেন্দু?' কে একজন বলিল—'অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি। চমৎকার প্লে করে।' এ নাম ত আর কাহারও হইতে পারে না; ইনি নিশ্চয়ই আমার সেই কম্বুলিয়াটোলা স্কুলের সহপাঠী! কিন্তু তখন ত সে অত্যন্ত অরসিক ছিল; এখন চমৎকার অ্যাক্ট্ করে! জিজ্ঞাসা করিলাম—'একবার তাঁর সঙ্গে দেখার সুবিধা হয় না। সে কোথায়?' দেখা হইল না; ফিরিয়া আসিলাম।

"কিছু দিন পরে হঠাৎ একদিন অর্দ্ধেন্দুর দেখা পাইলাম। আমাদের বাড়ীর দরজায় বসিয়া আছি (বাড়ীর সম্মুখে খোলা ড্রেণ ছিল; সেই ড্রেণের উপর সাঁকো ছিল; দরজার সামনে বাঁধান সাঁকোর উপরে বসাটাই দরজায় বসা বলা হইত) এমন সময়ে অর্দ্ধেন্দু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাকে দেখিয়া তাহার ভারি আনন্দ হইল; আমি কি করিতেছি, থিয়েটার দেখিতে ভালবাসি কি না, ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া সে বলিল—'তুমি একদিন আমাদের থিয়েটর দেখ্তে যাবে? টিকিট এনে দোব।' আপনারা এখন বুঝিতে পারিবেন না, কিন্তু তখন থিয়েটরের টিকিট পাওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার ছিল; অনেক খোসামোদ করিয়া তবে টিকিট যোগাড় করা হইত। আমি বলিলাম—'না ভাই, আমার যাওয়া হবে না, রাত্তিরে বাইরে থাকা আমার নিষেধ, আর এ বছরে আমি এণ্ট্রান্স এক্জামিন দোব।' আমার যাওয়া হইল না। দেখুন, নিজে থিয়েটর করিবার আগে আমি ঝামাপুকুরে দুই বার মাত্র শকুন্তলার অভিনয় দেখিয়া-

ছিলাম; অভিনয় আমার পিসীমার বাড়ীতে হইয়াছিল বলিয়া আমার দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল।

"১৮৬৯ সালে 'সধবার একাদশী' অভিনীত হইল। তৎপূর্ব্বে আমি ঐ নাটকখানি পাঠ করিয়াছিলাম। কেবলই মনে হইত, আমি ছাড়া জগতে এমন মানুষ নাই যে নিমে দত্তের ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। রামচন্দ্র মিত্রের বাড়ীতে অভিনয় হইল; চারিদিকে খুব সুখ্যাতি শোনা গেল। আপনাকে এইখানে আমি একটি কথা বলিতে পারি—That play was the unconscious germ of the public stage.

"আমি তখন মেডিক্যাল কলেজে আনাগোনা করি। একদিন অর্দ্ধেন্দুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল; সে বলিল—'সধবার একাদশী' দেখ্‌তে গেলে না? আমি বলিলাম,—'কি করে যাই?' পরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করিলাম—'আচ্ছা, তোমাদের নিমে দত্ত কে সাজে?' অর্দ্ধেন্দুর মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে বলিল—'গিরীশ ঘোষ।' আমি ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলাম—'গিরীশ ঘোষ? কোন্ গিরীশ ঘোষ?' সে বলিল 'বোস পাড়ার নীলকমল ঘোষের ছেলে; চমৎকার অ্যাক্টর্।' আমি বলিলাম—'ওঃ, নবীন সরকার মহাশয়ের জামাই? সে ত কেরাণিগিরি করে! সেক্ষপীয়র আওড়াবে কি করে? কলাপাতার প্রকাণ্ড ঠোঙ্গায় মুড়ে সাজা পান নিয়ে তা'কে রোজ আপিস যেতে দেখি। দিগম্বর দে'র কাছে Book-keeping শিখে, সে অপিসে খুব ভাল Book-keeper হয়েছে জানি; কিন্তু সেক্ষপীয়রের সে কি বোঝে? ব্রজ (গিরিশ বাবুর বড় সম্বন্ধী, চুণীলালের পিতা) কিছু বোঝে; সে বরং চেষ্টা করলে পারতে পারে; কিন্তু……গিরীশ ঘোষ!' হায় রে মূঢ় আত্মাভিমান! ঘরে বসিয়া 'সধবার একদশী' পড়িয়া যে স্বপ্নের জাল চারিদিকে বুনিয়াছিলাম, আজ কোথা হইতে অর্দ্ধেন্দুশেখর একটা দম্‌কা ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিয়া আমার সেই স্বপ্নজাল ছিন্ন করিয়া দিল? আমি ছাড়া জগতে অন্ততঃ আরও একজন মানুষকে পাওয়া গিয়াছে, যে নিমে দত্তের ভুমিকায় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া দশজনের নিকট হইতে বাহবা লইয়াছে! অর্দ্ধেন্দুশেখর হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—'তা নয় হে, তা নয়। নিমের পার্ট সে বেশ প্লে করে; তুমি একদিন চল না, দেখ্‌বে। আমি আস্তে আস্তে বলিলাম—'তা হ'তে পারে।' অভিনয় দেখিতে গেলাম না।

"দেখুন, সোজা কথায় আপনার নিকটে আমার এই পুরাতন কাহিনী বিবৃত করিতেছি; psychological analysis করিতে বসি নাই। দুই দণ্ড স্থির হইয়া বসিয়া আত্ম-বিশ্লেষণ করিব, এমন সময় বা সামর্থ্য আমার নাই। বলিতে পারেন, যে তরুণ যুবক কখনও রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া কোনও নাটক পূর্ব্বে অভিনয় করে নাই, তাহার এমন চিত্তবিকার হয় কেন? এ ঈর্ষ্যার কারণ কি? অল্প দিন পরে যাঁহার

নিকটে আমাকে নত মস্তকে শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে দীক্ষাগ্রহণ করিতে হইবে, যাঁহার প্রথম মধুর সম্ভাষণে আমাকে মুগ্ধ ও অভিভূত হইতে হইবে. তাঁহার প্রথম সুখ্যাতি পরের মুখে শ্রবণ করিয়া আমার মেজাজ খারাপ হইয়া গেল কেন?

"কিন্তু সে সকল কথা পরে বলিতেছি। নটবর চৌধুরীর বাড়ীতে আমাদের সেই জিম্‌ন্যাষ্টিক্ দল খেলাধূলা করিত। সেই সময়ে একটি লোক সেখানে আনাগোনা করিতে লাগিল; তাহার নাম গিরীশচন্দ্র মিত্র। লোকটি বাস্তবিকই একটা genius। দুর্ভাগ্য ক্রমে তিনি এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভদ্রলোকের ছেলের মত ভাল করিয়া তিনি লেখাপড়া শিখিতে পারেন নাই। কিন্তু মহেন্দ্র চাটুয্যের বহু পূর্ব্বে তিনি ক্লারিয়নেট বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে শিখিয়াছিলেন; একটা সুন্দর মডেল এঞ্জিন তৈয়ার করিয়া ফেলিলেন; ঢাকার শুক্‌লালের প্রসিদ্ধ সেতারের অনুকরণে একটা সেতার আগাগোড়া নিজের হাতে গড়িয়া তুলিলেন। তাঁহার কাছে বসিয়া তাঁহার কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইতাম। তিনি কাহারও সাহায্য লইতেন না; কাঠ চেরা হইতে আরম্ভ করিয়া হস্তিদন্তের বিচিত্র কারুকার্য্য পর্য্যন্ত বাদ্যযন্ত্রের আগাগোড়া তিনি নিজে করিতেন। খুব ভাল ছাঁটকাট সেলাইয়ের কাজ উত্তম দর্জ্জীকে হার মানাইয়া দিতেন। তিনি বলিলেন,—লোহার ডাণ্ডার উপর খেলা করার দরকার নাই, মাটিতে নানা প্রকার ব্যায়াম করা যাউক। নূতন ধরণে ব্যায়াম শিক্ষা চলিতে লাগিল।—মাঝে অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করিয়া ব্যায়াম-নৈপুণ্য দেখাইতাম। সেই দিন আমাদের উৎসব। প্রহসনের ব্যবস্থাও করা হইত। উহা আমাদের উৎসবের অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। সেই সূত্রে গিরীশচন্দ্র ঘোষের সহিত আমার প্রথম আলাপ পরিচয় হয়।

"নটবরের—(আমরা তাঁহাকে চিরকাল নাটুদাদা বলিয়া ডাকিতেছি, নটবর বলিতে যেন কেমন বাধ বাধ ঠেকে)—নটবরের বাড়ীতে অর্দ্ধেন্দু শেখর ঘন ঘন আসিতে লাগিলেন; হাস্য পরিহাসের তুফান উঠিত। অর্দ্ধেন্দু ছিলেন আমাদের সভার মধ্যমণি; বিদ্রূপাত্মক কথাবার্ত্তার ও অঙ্গভঙ্গির বৈচিত্র্যে তিনি আমাদের ওস্তাদ হইয়া দাঁড়াইলেন। একদিন তিনি সাজিলেন কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন; আমরা সব রোগী সাজিলাম—ফিরিঙ্গি, উড়ে, হিন্দুস্থানী ইত্যাদি; Caricature-এর চূড়ান্ত করা হইত। ক্রমশঃ এই রকমেই যেন অভ্যাস দাঁড়াইয়া গেল। আমাদের মনে একটা অভিমান ছিল, যা-তা সাজ্‌তে আমরা রাজি হইতাম না; অর্দ্ধেন্দুশেখরের সে রকম কোনও অভিমান ছিল না। এমনি করিয়া Caricature করিতে শিখিলাম; কিন্তু farce রচনা করিয়া নিমন্ত্রিত ভদ্রমণ্ডলীর সম্মুখে অভিনয় করা কিছু শক্ত ব্যাপার। রচনা করিতাম বটে; কিন্তু এখন ইচ্ছা হইল, একজন পাকা ওস্তাদের কাছ থেকে একটা ফার্স লিখিয়া লইতে হইবে।

সখের যাত্রার দলের জন্ত গিরীশ ঘোষ পালা রচনা করিয়া দিতেন, গান বাঁধিয়া দিতেন; একবার তাঁহাকে ধরিলে হয় না? এক রবিবারে আমি একাকী গিরীশবাবুর বাড়ী গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। গিরীশবাবু বলিলেন—'তুমি কে গা! তোমার নাম কি?' উত্তর হইল—'আজ্ঞে, আমার নাম অমৃতলাল বসু; আমি কৈলাশচন্দ্র বসুর ছেলে।' 'ওঃ, বুঝেছি, বোসো; তুমি কি কর্‌ছ?' 'সম্প্রতি আমি এন্ট্রান্স দিয়েছি; আপনার কাছে এসেছি একটু কাজে; আমরা acrobatic performance করচি; একটি farce যদি আপনি লিখে দেন তা' হ'লে বড়ই ভাল হয়।' 'তোমাদের কি রকম ফার্স দরকার তা' ত আমি জানি না। ফার্স তোমরা যদি করে থাক, আর একদিন সেই খানা নিয়ে আমার কাছে এস।'......কিছুদিন পরে একখানা বই লইয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনি বইখানা ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন—'এখানা কে করেছে?' আমি বলিলাম, 'আজ্ঞে, আমি।' 'তুমি ত মন্দ করনি; তুমিই লেখ না,—আমি দেখে দোব।' সেই দিন থেকে তাঁহার বাড়ীতে আমার যাওয়া আসা আরম্ভ হইল। তাঁহার মুখে সেক্সপীয়র-আবৃত্তি শুনিতাম;—তাঁহার সে Grand voice আপনারা শুনিতে পান নাই, 'সধবার একাদশী'ও তিনি আবৃত্তি করিতেন।

"তাহার পরে আমি কাশী চলিয়া গেলাম। কাশীর কথা পূর্ব্বে আপনাকে বলিয়াছি। কাশী হইতে মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতাম। এখানে অবস্থান কালে আমাদের এই কম্বুলিয়াটোলার স্কুলে শিক্ষকতা করিতাম, বেতন লইতাম না। ভূপেন্দ্রনাথ বসু, চুণীলাল বসু, প্রিয়নাথ সেন আমার ছাত্র। অর্দ্ধেন্দুশেখর ও ধর্ম্মদাস সুর তখন এই স্কুলে মাষ্টারি করিত। আমার বাবা, কাকা, মামা, সকলেই ইস্কুল মাষ্টারি করিয়াছিলেন; আমিও মাষ্টারি করিতাম। অর্দ্ধেন্দু বলিলেন—'তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে; 'লীলাবতী'র অভিনয় করতে হবে।' নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত ব্যবস্থা করিবার ভার লইলেন। এই নগেন্দ্রনাথই অর্দ্ধেন্দুশেখর ও গিরীশচন্দ্রের মিলন সংঘটিত করিয়াছিলেন। কথা হইল, এবার আমরা টিকিট বিক্রয় করিব; বিক্রয়লব্ধ পয়সায় আমরা নিজেদের ষ্টেজ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে পারিব। তখন গড়ের মাঠে লিউইস্ থিয়েটারের বাড়ী ছিল; কাণে মাকড়ী-পরা সুলতানা-নামধারী একটা লোক ঐ কাঠের বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিল। ভবিষ্যতে ঠিক সেই বাড়ীর প্ল্যানে ভুবন নিয়োগীর থিয়েটার-বাড়ী তৈয়ার করিয়াছিলাম, কেবল দৈর্ঘ্যে দশ ফুটের তফাৎ হইয়াছিল মাত্র। সে কথা পরে বলিব।

"লীলাবতীর রিহার্সাল চলিতে লাগিল। অর্দ্ধেন্দু আমায় বলিল—'দেখ, সব পাওয়া গেছে, উড়েটা পাচ্চি না, কি করা যায়?' আমি বলিলাম—'তোমাদের আমি একটা ভাল উড়ে দিতে পারি।' এই বলিয়া শশীকে লইয়া গেলাম। তা'র পরে

অনেক দিন শশীর নাম 'বিসাড়ি' হইয়া গিয়াছিল। অর্দ্ধেন্দু আমাকে জোর করিয়া যোগজীবনের ভূমিকা লওয়াইলেন। তালিম দেওয়া যখন শেষ হইয়া আসিল, কাশী হইতে লোকনাথবাবু কলিকাতায় আসিয়া আমাকে কাশীতে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। বন্ধুরা কত কাকুতি মিনতি করিলেন; তিনি কাহারও কথায় বিচলিত হইলেন না। আমার আর ষ্টেজে দাঁড়ান হইল না।

"আমাদের রিহার্সাল হইত গোবিন্দ গাঙ্গুলীর বাড়ীতে; গাঙ্গুলী হাইকোর্টের কর্ম্মচারী ছিলেন। বেশ সৎ লোক; কিন্তু তাঁহাকে লইয়া আমরা কিছু কিছু হাসিঠাট্টা করতাম। একদিন আমাদের পূরা মজ্‌লিস বসিয়াছে, গোবিন্দ হাইকোর্ট হইতে প্রত্যাগমন করিয়া অত্যন্ত গম্ভীরস্বরে আমাদিগকে বলিলেন,—'দেখ, হাইকোর্টে শুনে এলাম, সত্য মিথ্যা বল্‌তে পারি না, লর্ড মেয়োকে নাকি আন্দামান দ্বীপে খুন করেছে।' সে দিন মজ্‌লিস বন্ধ হইয়া গেল। অনতিবিলম্বেই সহরময় কথাটা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সরস্বতী পূজার ধুমধামের আয়োজন সর্ব্বত্রই আপনা আপনি বন্ধ হইয়া গেল। দেশময় বিষাদের কালিমা লক্ষিত হইল।

"লোকনাথবাবুর সঙ্গে কাশী চলিয়া গেলাম। ১৮৭২ সালের গোড়ায় কাশী পরিত্যাগ করিয়া বাঁকিপুরে আসিলাম। ঐ বৎসরের নবেম্বর মাসে বাঁকিপুর হইতে কলিকাতায় আসিলাম। বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজার উপলক্ষে এই যে বাঁকিপুর ছাড়িলাম আর সেখানে ডাক্তারি করিবার জন্য ফিরিয়া যাইতে হইল না।

"কলিকাতায় আসিয়া যে দিন প্রথম আমি আমাদের স্কুল দর্শন করিতে যাই, অর্দ্ধেন্দু আমাকে দেখিয়া ক্লাশ হইতে বাহির হইয়া আসিল। তখনই হেড্ মাষ্টারের নিকট হইতে ছুটি লইয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া ভুবন নিয়োগীর বাগ্‌বাজারের গঙ্গাতীরস্থ বৈঠকখানায় গেল। গঙ্গাতীরে সেই সুন্দর অট্টালিকার কোনও চিহ্ন এখন নাই; পোর্ট ট্রষ্টের কল্যাণে সেটী লুপ্ত হইয়াছে। পথে যাইতে যাইতে অর্দ্ধেন্দু আমাকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। গিরীশবাবুর সঙ্গে মনোমালিন্য হইয়াছে। অনেকের একটা ভুল ধারণা আছে যে টিকিট বিক্রয় করিবার কথা শুনিয়া তিনি আপত্তি করিয়াছিলেন; তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না যে টিকিট বিক্রয় করিয়া পয়সা লওয়া হয়; কিন্তু যখন তিনি বুঝিলেন টিকিট বেচা সকলের ইচ্ছা, তিনি থিয়েটরের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। গিরীশবাবু বলিয়াছিলেন, 'থিয়েটরের জন্য এক-খানা ভাল বাড়ী না করিয়া টিকিট বেচিবার ব্যবস্থা করিলে কিছুই হইবে না; আগে ভাল ষ্টেজ কর, তারপরে টিকিট বিক্রয় কর; নইলে লোকে টিকিট কিনিবে কেন?' অর্দ্ধেন্দু ও নগেন্দ্র বন্দ্যো বলিলেন—'আমরা ছোট বাড়ীতেই আরম্ভ করি, ছোট খাটো ষ্টেজ্ করি; একেবারে বড় বাড়ি বড় ষ্টেজ কোথায় পাওয়া যাবে?' এই কথা লইয়া

দলাদলির সূত্রপাত হইয়াছিল। এ সকল বিষয় আমি কিছুই জানিতাম না; আমি তখন কলিকাতায় ছিলাম না। যখন গঙ্গার তীরে ভুবন নিয়োগীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম, তখন বুঝিলাম গিরীশবাবুকে বাদ দিয়াই থিয়েটর করিতে হইবে। বাড়ীর দোতালায় আমাদের রিহার্সালের বন্দোবস্ত। ভুবন আলোর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে, একটি হার্মোনিয়মও কিনিয়া দিয়াছে। তাহার চাকর হুঁকো টিকে তামাক রাখিয়া যাইত, আমরা নিজে নিজে তামাক সাজিতাম।

"রসিক নিয়োগীর ঘাটের উপরে ভুবন নিয়োগীর সেই বাড়ীটি এখন আর নাই; তাহার সোপানাবলী কলবাহিনী ভাগীরথীর জলে ধৌত হইয়া যাইত। দ্বিতলের প্রকাণ্ড হলে আমরা নীলদর্পণের রিহার্সাল চালাইতাম। আমার কোনও পার্ট লইবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু সকলে মিলিয়া চাপাচাপি করিয়া ধরিল; বলিল—'তুমি সৈরিন্ধ্রীর পার্টটা নাও; বেশী নয়, দু এক রাত্রি তুমি প্লে কর, তা'র পর না হয় আমরা অন্য ব্যবস্থা করে নেবো।' সেই দু এক রাত্রি করিতে করিতে আজ চুয়াল্লিশ বছর কাটিয়া গেল।"

আট

২৬এ ফাল্গুন, ১৩২২

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনারা ১৮৭২ সালের নবেম্বর মাসে নীলদর্পণের রিহার্সাল করিতে লাগিলেন ; আপনি সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকা লইলেন ; আর কে কি ভূমিকা লইলেন ; নীলদর্পণের প্রথম অভিনেতৃদলের নাম কলিকাতার-ষ্টেজের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকা উচিত।" অমৃতবাবু বলিলেন,—

"অর্দ্ধেন্দু	উড্ সাহেব, সাবিত্রী, গোলোক বসু, একজন চাষা রায়ৎ।
নগেন্দ্র	নবীনমাধব।
কিরণ (নগেন্দ্রের ভাই)	বিন্দুমাধব (নবীনমাধবের ভাই)।
শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	গোপীনাথ দাওয়ান।
মতিলাল সুর	রাইচরণ ও তোরাপ। (মতিলালের মত তোরাপ আর কেহ কখনও সাজিতে পারিল না।)
মহেন্দ্রলাল বসু	পদী ময়রাণী।
শশিভূষণ দাস (বিসাড়ী)	আমিন, পণ্ডিতমশাই, কবিরাজ।
পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	লাঠিয়াল। (ইনি বেশী দিন অভিনয় করেন নাই।)
গোপালচন্দ্র দাস	আদুরী, একজন রায়ৎ।
যদুনাথ ভট্টাচার্য্য	একজন রায়ৎ।
অবিনাশচন্দ্র কর	রোগ্ সাহেব। (এই একটী পার্ট্ সে প্লে করিল ; তেমনটি আর কেহ পারিল না। আমিও রোগ সাহেবের পার্ট্ প্লে করিয়াছি, কিন্তু অবিনাশের মত হয় নাই।)
গোলোক চট্টোপাধ্যায় ...	খালাসী।
ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী ...	সরলা। (চমৎকার প্লে করিতেন।)
অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (ওরফে বেলবাবু বা কাপ্তেন বেল) ...	ক্ষেত্রমণি।

তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়	রেবতী। (এমন চমৎকার রেবতী আর কেহ কখনও হইতে পারিল না। বেচারা শেষটা পাগল হইয়া মারা গেল।)
আমি	সৈরিন্ধ্রী।
ধর্ম্মদাস সুর ও যোগেন্দ্রনাথ মিত্র (এঞ্জিনীয়ার)	ষ্টেজের অধ্যক্ষ। (ইহারাই পরে ষ্টার থিয়েটারের বাড়ী তৈয়ারি করিয়া দেন।)
কার্ত্তিকচন্দ্র পাল	Dresser।
নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	কমিটির সেক্রেটারী।
বেণীমাধব মিত্র	কমিটির প্রেসিডেণ্ট। (ইনি থিয়েটরের বেশী কিছু বুঝিতেন, তাহা নহে। আপিসে চাকরি করিতেন, বয়সে বড়, মুরুব্বি হইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলেন। তাঁহাকে থিয়েটরে সাজিবার জন্য কখনও অনুরোধ করা হয় নাই।)

"খুব উৎসাহের সহিত আমাদের রিহার্সাল চলিতে লাগিল। আমি তখন থিয়েটরে গা ঢালিয়া দিয়াছি। একদিন রসিক নিয়োগীর ঘাটের বৈঠকখানায় আমি একাকী বসিয়া আছি এমন সময়ে তিনটী ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেদিন আমাদের দলের আর সকলে সেখানে উপস্থিত ছিল না, কেন এখন আমার ঠিক মনে নাই। বোধ হয় সেদিন তাঁহারা মেটেবুরুজের নবাবের পশুশালা দেখিতে গিয়াছিলেন; আমি একাকী তামাকু সেবন করিতেছিলাম। আগন্তুকদিগকে দেখিয়া আমি সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিলাম। একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'ভুবন নিয়োগীর এই বাড়ীতে থিয়েটরের রিহার্সাল হয়?'

'আজ্ঞে হাঁ।'

'তুমি কি সেই দলের একজন প্লেয়ার?'

আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়িলাম।

'আজ তোমরা এখনও রিহার্সাল আরম্ভ কর নাই কেন?'

'আজ আমাদের রিহার্সাল বন্ধ; আজ আমি ছাড়া আর কেউ এখানে উপস্থিত নাই।'

'তাই ত; আমরা এলুম তোমাদের রিহার্সাল দেখতে—'

'আসুন, ভেতরে বসুন, তামাক খান।'

'থাক্, আর তামাক খাব না। আমাদের তুমি চিনতে পারচ না। আমার নাম শিশিরকুমার ঘোষ, ইনি অক্ষয়চন্দ্র সরকার, আর ইনি প্যারিমোহন রায়।'

আমি তৎক্ষণাৎ শিশিরবাবুর পদধূলি লইলাম, অক্ষয়বাবুকে ও প্যারিমোহনবাবুকে নমস্কার করিলাম।

শিশিরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—'তোমার নাম কি?'

'অমৃতলাল বসু।'

'তুমি কি সাজবে?'

'সৈরিন্ধ্রী।'

'আচ্ছা সমস্ত পালাটা না হয় আজ নাই হল, তুমি সৈরিন্ধ্রীর পার্টটা একটু আমাদের শোনাবে?'

"আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া সম্মত হইলাম। আমি জানিতাম চুঁচুড়ায় অক্ষয় সরকারের দল 'লীলাবতী'র রিহার্সাল দিয়াছিলেন; তখন আমাদের সখের দলে 'লীলাবতী' হইয়াছিল। অক্ষয়বাবুর নাম শুনিয়াই আমার মনে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল; এ সময়ে আমাদের হাতের তাস কি দেখান উচিত? যাহা হউক, আমি শিশিরবাবুকে বলিলাম—'আমি আপনার লেখা পড়েছি, আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি খুব বেশী, আপনি যখন বল্‌চেন তখন আমি আমার পার্ট একটু আপনাকে শোনাতে পারি।'

"আমি নবীনমাধবের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে সৈরিন্ধ্রীর অভিনয় করিয়া দেখাইলাম। তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেলেন।

"সেদিন ফিরিয়া যাইবার সময় শিশিরবাবু আমাকে বলিলেন,—'এখন আমি বৌবাজারে হিদারাম ব্যানার্জির গলিতে থাকি; তুমি আমার বাসায় আমার সঙ্গে দেখা কোরো।' তখন হইতেই তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গেল। আমি তাঁহার বাড়ীতে যাতায়াত করিতে লাগিলাম। দেখুন সেদিন য়ুনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্ হলে আমি শিশিরবাবুর সম্বন্ধে বলিয়াছিলাম—'তিনি একজন আস্ত বাঙ্গালী।' এ কথাটা যে কত সত্য তা' আপনারা বোধ হয় আজ কাল উপলব্ধি করিতে পারিবেন না; তিনি দেশের সমস্ত অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া স্বদেশবাসীকে প্রবুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই যে নূতন থিয়েটার খোলা হইল[১], যখন তিনি শুনিলেন ইহার নাম ন্যাশনাল * থিয়েটার

[১] ডিসেম্বর, ১৮৭২। (দ্রঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস')—সং

* কেহ কেহ ইহার নাম Calcutta National করিবার কথা তুলিয়াছেন। অমৃতবাবু আপত্তি করিয়া বলিলেন—Calcutta এবং National এ দুটো শব্দের সামঞ্জস্য হয় না; Calcutta শব্দটা বাদ দেওয়া হইল।—লেখক।

দেওয়া হইয়াছে, তখনই তিনি ভাবিলেন,—ইহার ভিতর দিয়া কি বাঙ্গালীজাতির বিশিষ্ট ভাবগুলিকে ফুটাইয়া তোলা যাইবে না? এই যে democratic ষ্টেজ, ইহা ত আর ধনী গৃহস্থের খেয়ালের উপর নির্ভর করিবে না; বাঙ্গালীর সর্ব্বাঙ্গীন ভাবপুষ্টির সাহায্য করিবে না কেন? ইহারা ত সাহস করিয়া 'নীলদর্পণ' লইয়া আরম্ভ করিয়াছে। দেশের মর্ম্মস্থান হইতে যে বেদনা গুমরিয়া গুমরিয়া এতদিনে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, যাহার সহিত সমবেদনার জন্য লং সাহেবের কারাবাস হইল,[১] সেই বেদনা ত এই ছোকরাদের বুকে বাজিয়াছে। ইহারা যদি সদ্বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে ইহাদের নিকট হইতে ভবিষ্যতে বঙ্গদেশ অনেক আশা করিতে পারে শিশিরবাবু আমাদের থিয়েটরের একজন ডাইরেক্টর হইলেন।

"এখন যে বাড়ীতে শিশিরবাবুর ছেলেরা বাস করিতেছেন, ঐ বাড়ী আমরা শিশিরবাবুর জন্য ভাড়া করিয়া দিই। তিনি আমাদের পল্লিতে বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কারণ আমাদের নিকটে থাকিতে পারিলে তাঁহার আহ্লাদের পরিসীমা থাকিত না। অমৃতবাজার পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা যাহাতে বর্দ্ধিত হয় তজ্জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কাগজ অল্পদিনের মধ্যেই নিজগুণে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া দাঁড়াইল। পত্রিকার কাজে আমি যে কিয়ৎ পরিমাণেও নিজেকে নিয়োজিত করিতে পারিয়াছিলাম তাহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়া গেলাম। আমার চিত্তবৃত্তি উদ্বোধনের জন্য 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র নিকটে আমি কত ঋণী তাহা কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারি নাই। কোনও প্রকারে যে সে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভবপর তাহা তখন মনেই হইত না। বরং শিশিরবাবুর সংস্রবে থাকিয়া একটা মানুষ হইয়া উঠিতে পারিব এই আশা করিতে লাগিলাম।

"শিশিরবাবু আমাদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন; মনোমোহন বসু ও নবগোপাল মিত্র প্রথম হইতেই আমাদের সঙ্গে কাজ করিতে আনন্দবোধ করিতেন। নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় ভাই দেবেন্দ্রনাথ আমাদের থিয়েটরের অন্যতম ডাইরেক্টর ছিলেনে। গিরীশবাবুও ডাইরেক্টর পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু গিরীশবাবুর অভিমান তিরোহিত হইবার পূর্ব্বেই আমরা পবলিক থিয়েটর খুলিয়া অভিনয় আরম্ভ করিয়াছিলাম।

"নবেম্বর মাসে আমাদের রিহার্সাল চলিতে লাগিল। অর্দ্ধেন্দু ছিলেন আমাদের General master, কিন্তু সব বিষয়েই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন নগেন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার মত organiser বাঙ্গালীর মধ্যে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। নিমাইচরণ সান্ন্যালদের প্রকাণ্ড অট্টালিকার * বহির্ব্বাটীর নীচেটা ভাড়া করা হইল; চল্লিশ টাকা

---

১ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ।—সং

* জোড়াসাঁকো ঘড়ি-ওয়ালার বাড়ীটা।

মাসিক ভাড়া স্থির হইল। মহাশয়, তখন আমরা চল্লিশ টাকা ভাড়া দিয়া যে অংশটুকু পাইয়াছিলাম, এখন তাহার চল্লিশ টাকা ম্যুনিসিপ্যাল টেক্স দিতে হয়। সে বাড়ীতে আমাদেব ষ্টেজ হইবে। আব্দুল মিস্ত্রীকে লইয়া ষ্টেজ তৈয়ার করিতে বসিয়া গেলাম, কাজ বড় ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। ধর্ম্মদাস না থাকিলে সুব্যবস্থা হইবে না; কিন্তু সে ত সমস্ত দিন আমাদের কম্বুলিয়াটোলার স্কুলে মাষ্টারি করিয়া বেলা চারিটার সময় অব্যাহতি পাইত; তাহারই কথা অনুযায়ী ষ্টেজ গঠিত হইতেছিল। গতিক দেখিয়া আমি তাহাকে বলিলাম,—দেখ, এক কাজ করা যাক্; তোমার বদলে আমি স্কুলে পড়াব; মাসকাবারে তোমার পুরো মাইনে তোমার হাতে দোব; তুমি সমস্ত দিন ষ্টেজ নির্ম্মাণে আব্দুলকে খাটাও।' হেড্‌মাষ্টার আমাকে পাইয়া আনন্দিত হইলেন। আমি ঐ বিদ্যালয়েই তাঁহার ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ছিলাম। স্কুলের ছুটি হইলে পর আমি ধর্ম্মদাসের সঙ্গে যোগ দিয়া রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত কাজ করিতে লাগিলাম। কাজ যখন অনেকটা অগ্রসর হইল, আমরা স্থির করিলাম যে ৭ই ডিসেম্বর রাত্রিতে আমাদের প্রথম অভিনয় এই ষ্টেজে করিতে হইবে। ধর্ম্মদাস ষ্টেজ করিয়া দিলেন; নোটিস ও টিকিট ছাপান এবং গ্যাস-ব্যবস্থাব ভার নগেন্দ্রের উপর ন্যস্ত হইল।

"সহরের গণ্যমান্য ভদ্রলোকেরা, আমাদের কার্য্য কতদূর অগ্রসর হইল মাঝে মাঝে দেখিতে আসিতেন; প্রায়ই কাহারও মুখ হইতে আশ্বাস-বাণী শুনিতে পাওয়া যাইত না; বরঞ্চ অনেক বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইয়াছিল। পয়সা কড়ি নাই, মুরুব্বি নাই, অথচ এতবড় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা গিয়াছে, যেমন করিয়াই হউক ইহা সুসম্পন্ন করিতে হইবে। নগেন্দ্র ষ্ট্যান্‌হোপ প্রেস হইতে থিয়েটরের নোটিস মুদ্রিত করিয়া আনিল। তিন শ্রেণীর ব্যবস্থা করা হইল,—দুই টাকার, এক টাকার ও আট আনার। প্রথম শ্রেণীর জন্য জানবাজার হইতে চেয়ার ভাড়া করিয়া আনা হইল; দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য বাঁশেব খুঁটির উপর তক্তা দিয়া এক রকম বেঞ্চি করা হইল; তৃতীয় শ্রেণীর জন্য দালানের সিঁড়ির উপর ও রকে বসিবার আসন করিয়া দেওয়া হইল।

"৭ই ডিসেম্বর, শনিবার ১৮৭২ খৃঃ অব্দ বাঙ্গালার পাব্‌লিক্ ষ্টেজের একটা স্মরণীয় দিন। অপরাহ্নকালেও আমাদের আয়োজন করা অনেক বাকী ছিল। অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া গ্যাস লাগাইয়া দিবার জন্য গৌরমোহন ধরকে রাজী করান হইল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে গ্যাস বসান হইল; সন্ধ্যার পর খবর আসিল যে অবিনাশ কর জ্বরে পড়িয়াছে, রোগ সাহেব সাজিবে কে? তাহার কছে তৎক্ষণাৎ লোক পাঠান হইল; সে বলিল—'যে রকম করিয়াই হউক আমি প্লে করিব।' পাল্কী চড়িয়া সে আসিল।

"একটা জানালায় টিকিট বিক্রয় করা হইয়াছিল। দলে দলে দর্শক আসিতে

লাগিল। এত ভিড় হইবে আমরা কখনও কল্পনা করিতে পারি নাই। সকলে টিকিট পাইল না। জাব্বা-জোব্বা-পরা ভদ্রলোকরা চেয়ারগুলি দখল করিয়া বসিলেন। অভিনয় আরম্ভ হইল। গোলোক বোস ও উড্ সাহেব রূপে প্রথম দুই দৃশ্যে অর্দ্ধেন্দু দর্শকমণ্ডলীর মন অধিকার করিয়া বসিলেন।

"করতালি-ধ্বনিতে বৃহৎ অট্টালিকা কম্পিত হইতে লাগিল। যথাসময়ে তৃতীয় দৃশ্যে সীন উঠিল; আমি সৈরিন্ধ্রী বেশে ষ্টেজের উপরে উপবিষ্ট। চাহিয়া দেখি, আমার গুরুস্থানীয় কয়েকজন ভদ্রলোক সম্মুখে বসিয়া আছেন। মুহূর্ত্তের জন্য আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল; আমি যেন তখন সমাজচ্যুত, জাতিচ্যুত হইয়া আমার ব্যর্থ জীবনের সমস্ত লজ্জার ভার শিরে বহন করিয়া আমার গুরুজনদিগের সম্মুখে নারীবেশে উপবিষ্ট হইয়াছি; যেন মনে হইল, টিকিট বেচিয়া পাব্লিক্ ষ্টেজে অভিনয় করিয়া আমি আমার সমাজকে, স্বদেশকে, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে আজ যে লজ্জা দিতেছি তাহার একমাত্র শাস্তি—বহিস্করণ। আমার তখনকার মনের ভাব আজ আপনারা বুঝিতে পারিবেন না। তখন সমাজ ছিল, সমাজ বন্ধন ছিল, সমাজদ্রোহিতার শাস্তি ছিল। মুহূর্ত্তের জন্য আমার মাথা ঘুরিয়া গেল; পরক্ষণেই ভাবিলাম এ যা' হ'বার তা'ত হ'ল; এখন যদি ভাল করিয়া প্লে করিতে না পারি, তাহা হইলে গঞ্জনা লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না। কায়মনোবাক্যে নীলদর্পণের সৈরিন্ধ্রী হইলাম। বাহবা ধ্বনির তালে তালে 'সীন' পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

"আজ আমি একটুও অতিরঞ্জিত করিয়া আপনাকে বলিতেছি না। প্রত্যেক অ্যাক্টর যেন নিপুণ শিল্পীর মত দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ'কে নিজের মনের মতন করিয়া ষ্টেজের উপর গড়িয়া তুলিল। কোন্ অভিনেতাকে বিশেষ ভাবে সুখ্যাতি করিব জানি না। বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় সুপুরুষ নগেন্দ্রনাথকে নবীনমাধবের ভূমিকায় যেমন মানাইয়াছিল, তেমন নবীনমাধব আর জীবনে দেখি নাই। অনন্যসাধারণ রূপগুণসম্পন্ন মহেন্দ্র বসু পদীময়রাণীর ভূমিকায় অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। ক্ষেত্র গাঙ্গুলীর মত সরলা কোনও স্ত্রীলোক কখনও সাজিতে পারে নাই। ক্ষেত্রমণির, রেবতীর, সরলার, সাবিত্রীর ও সৈরিন্ধ্রীর বিচিত্র রোদনধ্বনি বাঙ্গালীর বিভিন্ন সমাজস্তরের বিভিন্ন বয়সের রমণী-কণ্ঠের আর্ত্তনাদ সুস্পষ্টভাবে ফুটাইয়া তুলিল। পর সপ্তাহে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' সৈরিন্ধ্রীর সমালোচনা করিয়া লিখিলেন—'তাহার রোদনস্বর অপূর্ব্ব বলিতে হইবে।'

"রাত্রি বারটার সময় থিয়েটর ভাঙ্গিয়া গেল। লোকের মুখে সুখ্যাতি আর ধরে না। আবার শনিবারে 'নীলদর্পণ' অভিনয় করা হইল। একদিন একটী ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন—'ওহে, গিরীশ ঘোষ তোমাদের নামে একটা গান বেঁধেছে, তোমাদের খুব ঠাট্টা করেছে।' আমরা বলিলাম, 'বটে, কই সে গান, দেখি।' আমাদের

গালাগালির গানটী পড়িয়া আমাদের এত ভাল লাগিল যে আমি বলিলাম,—'ওহে, চমৎকার গান! এস গাওয়া যাক্।' আমরা সকলে গান ধরিলাম,—

লুপ্তবেণী বইছে তেরোধার।
তাতে পূর্ণ অর্দ্ধ ইন্দু কিরণ সিঁদুর মাখা
মতির হার॥
নগ হ'তে ধারা ধায়,
সরস্বতী ক্ষীণকায়,
বিবিধ বিগ্রহ ঘাটের উপর শোভা পায়;—
শিব শম্ভুস্মত মহেন্দ্রাদি যদুপতি অবতার॥
কিবা ধর্ম্মক্ষেত্র স্থান,
অলক্ষেতে বিষ্ণু করে গান,
অবিনাশী মুনি ঋষি কর্‌ছে বসে ধ্যান;—
সবাই মিলে ডেকে বলে 'দীনবন্ধু' কর পার॥
কিবা বালুময় বেলা,
পালে পালে রেতের বেলা,
ভুবনমোহন চরে করে গোপালে খেলা,—
মিলে যত চাষা, কোরে আশা, নীলের
গোড়ায় দিচ্চে সার॥
কলঙ্কিত শশী হরষে, অমৃত বরষে,
বুঝি বা দিনের গৌরব যায় খসে,
স্থানমাহাত্ম্যে হাড়ি শুঁড়ি পয়সা দে
দেখে বাহার॥

গানটির ব্যাখ্যা এই—

লুপ্তবেণী—বেণী মিত্র; অভিনয় করিতেন না, অথচ কমিটির মাথার উপরে প্রতিষ্ঠিত। গঙ্গা যমুনা সরস্বতী-সঙ্গম।

তেরোধার—ত্রিধারা।

পূর্ণ—পূর্ণচন্দ্র ঘোষ।

অর্দ্ধ ইন্দু—অর্দ্ধেন্দু।

কিরণ—কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মতি—মতিলাল সুর।

নগ হতে ধারা ধায়—বাস্তবিক নগেন্দ্রই organiser ছিল।

সরস্বতী ক্ষীণকায়—মূর্খ।

বিগ্রহ—একটা মন্দ গালাগাল। আবার অন্যপক্ষে ত্রিধারা-সঙ্গমে দেবমূর্ত্তি।

ধর্ম্মক্ষেত্র স্থান—ধর্ম্মদাস ও ক্ষেত্রমোহন ষ্টেজ তৈয়ার করিয়াছিল।

বিষ্ণু—ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক; নেপথ্যে গান করিতেন।

অবিনাশী—অবিনাশচন্দ্র কর।

ভুবনমোহন চরে—গঙ্গাতীরে ভুবনমোহন নিয়োগীর বৈঠকখানা বাটীতে।

চাষা—অভিনেতৃদলের মধ্যে অনেকগুলি সদ্‌গোপ ছিলেন।

দীনবন্ধু—নীলদর্পণ রচয়িতা।

পালে পালে—পালপদবীধারিগণ।

শশী—শশিভূষণ দাস।

অমৃত—অমৃতলাল বসু।

"গিরীশবাবুর এই গানটী আমরা সকলে মিলিয়া মহানন্দে গাইলাম। তাহার ফলে তাঁহার মনে ভাবান্তর হইল; তিনি বোধ হয় আমাদের উপর কতকটা প্রসন্ন হইলেন। কিন্তু সেই সময়ে 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় আমাদের অভিনয়ের একটা বিদ্রূপ-পূর্ণ সমালোচনা বাহির হইল।[১] লোকে বলিল, নিশ্চয়ই ঐ চিঠিখানা গিরীশবাবু লিখিয়াছেন। দু' এক ছত্র আমার মনে আছে,—Up goes the red rag; and appears in view rickety stage with its repulsive hangings ইত্যাদি! সৈরিন্ধ্রীর বিশ্রী ওষ্ঠবিকৃতির (Sairindhri with her upper lips curved) উল্লেখ উক্ত পত্রে ছিল। কিন্তু গিরীশবাবুর অভিমান বেশী দিন টিকিল না। ১৮৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে তিনি আমাদের সঙ্গে মিলিত হইলেন। ইতিমধ্যে আমরা 'জামাই বারিক'[২] 'নবীন তপস্বিনী'[৩] প্রভৃতি অভিনয় করিয়া ফেলিয়াছিলাম। 'নবীন তপস্বিনী'র জলধর-ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দু শত্রু-মিত্রের হৃদয় জয় করিয়াছিল।

"কেবলমাত্র 'নীলদর্পণ' নাটকখানি লইয়া আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। শুধু একখানা নাটক কতদিন লোকের ভাল লাগিতে পারে? নীলদর্পণ দুই রাত্রি অভিনীত হইবার পরই[৪] আমরা 'জামাই বারিকে'র রিহার্সাল আরম্ভ

[১] 'A spectator' স্বাক্ষরযুক্ত একটি পত্র ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর 'ইণ্ডিয়ান মিরার' ('ইংলিশম্যান' নহে)-এ প্রকাশিত হয়। (দ্রঃ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস)—সং

[২] ১৪ ডিসেম্বর ১৮৭২;—সং [৩] ৪ জানুয়ারী ১৮৭৩।—সং

[৪] 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রথম ও দ্বিতীয় অভিনয়ের মধ্যে ন্যাশনাল কর্ত্তৃক 'জামাই বারিক' অভিনীত হয়। পরবর্তী কালে স্মৃতিকথা বিবৃত করিতে গিয়া অমৃতলাল বসু এ-বিষয়ে ভুল করিয়া গিয়াছেন।" (দ্রঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)—সং

করিয়া দিলাম। থিয়েটরের প্ল্যাকার্ড আমরা এবার 'ইংলিশম্যান পত্রিকা'র প্রেস হইতে মুদ্রিত করিয়া লইলাম।

"ক্রমে ক্রমে আমাদের সাহস ও উৎসাহ বাড়িয়া গেল। একে একে দীনবন্ধু মিত্রের সমস্ত নাটক অভিনয় করিলাম। এক এক সপ্তাহে এক এক নূতন বই প্লে করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। একখানি মাত্র বই লইয়া আমরা থিয়েটর আরম্ভ করিয়াছিলাম। মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী'[১] ও 'বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ'[২] এবং 'একেই কি বলে সভ্যতা', শিশিরবাবুর 'নয়শোরুপেয়া'[৩] ও পণ্ডিত রামনারায়ণের 'নবনাটক'[৪] ও মনোমোহন বসুর 'প্রণয়পরীক্ষা'ও ঐ বাড়ীর ষ্টেজে দেখান গেল। 'কৃষ্ণকুমারী'তে গিরীশবাবু নামিলেন। ১৮৭৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'কৃষ্ণকুমারী' অভিনীত হইল। *

ভীম সিংহ	গিরীশচন্দ্র ঘোষ।
বলেন্দ্র সিং	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
ধনদাস	অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি।
জগৎ সিং	কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
মন্ত্রী	গোপালচন্দ্র দাস।
কৃষ্ণকুমারী	ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলী।
রাণী	মহেন্দ্রলাল বসু।
বিলাসবতী	বেলবাবু
মদনিকা	আমি।

"একটী গান গাহিবার জন্য নট আবশ্যক ছিল। আমরা মাসিক বেতন চল্লিশ টাকা ধার্য্য করিয়া হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করিলাম। বঙ্গের সাধারণ নাট্যশালায় ইনিই প্রথম ও একমাত্র বেতনভোগী। তিনি পাথুরিয়া ঘাটার ঠাকুর বাড়ীতে পূর্ব্বে অভিনয় করিতেন। তিনি কেবল ফুটলাইটের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া গোড়াতেই একটি গান গাহিয়া যাইবেন। গানের অংশ খর্ব্ব করিয়া অ্যাক্‌টিংকে বড় করিয়া তুলিব ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের দেশী যাত্রায় গানই প্রধান, এই জন্য যাত্রা 'শুনিতে' হয়; থিয়েটরে অঙ্গভঙ্গী অর্থাৎ 'অ্যাক্‌টিং' প্রধান, এই জন্য

[১] ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩; [২] ৮ মার্চ ১৮৭৩।—সং

[৩] ৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩, [৪] ২৫ জানুয়ারি ১৮৭৩।—সং

* গিরীশবাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনীতে দেখিতে পাই—'গিরীশবাবু আপনার নাম প্রকাশে অসম্মত হওয়ায় কৃষ্ণকুমারী নাটকের হ্যাণ্ডবিলে এইরূপ লিখিত হইল—'A distinguished amateur'.

থিয়েটার 'দেখিতে হয়। নট ও অ্যাক্টর মূলতঃ একই অর্থবোধক। নট নৃত্য করিবেন; এই যে নৃত্য করা, ইহার অর্থ কেবল মাত্র dancing নহে; তিনি বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীদ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করিবেন; এই জন্য ইংরাজিতে dancing-কে poetry of motion বলে। তাঁহার মুখে যদি কথা বসাইয়া দেওয়া যায়, সেই কথা তাঁহার ভাব-ব্যঞ্জনার সহায়তা করিবে মাত্র। অ্যাক্টরও প্রধানতঃ অঙ্গভঙ্গী দ্বারা ক্রমে আত্মপ্রকাশ করিবেন। দেখুন, সঙ্গীতের সুরই প্রধান; শব্দগুলি মনের ভাব দশজনকে বুঝাইবার জন্য সহায়ক মাত্র। যাত্রার অনেক উৎকর্ষ আমাদের দেশে হইয়াছিল, কিন্তু এমন দাঁড়াইয়া গেল, যে বক্তৃতার মধ্যে যেই শুনা যাইত 'আহা সখি, সে কেমন? প্রকাশ করিয়া বল'— অমনি ছেলের পল্টন গান ধরিয়া দিত! ঐ 'প্রকাশ করিয়া বল' শুনিলেই সকলে অস্থির হইয়া উঠিত। কিন্তু সমজদার শ্রোতা অস্থির হইতেন না। কারণ গানের ভিতর দিয়াই ত যাত্রা 'প্রকাশ করিয়া' বলিবে; গান বন্ধ করিয়া দিলে তাহার সমস্তই অব্যক্ত রহিয়া গেল। থিয়েটর কিন্তু গানকে ছোট করিয়া দিল; অ্যাক্টিংই ড্রামার স্বধর্ম্ম। তাই আমরা কেবল মাত্র একটি গানের ব্যবস্থা করিলাম।

"অনেক বাঙ্গালী ও ইংরাজ ভদ্রলোক আমাদিগকে উৎসাহ দিতে আরম্ভ করিলেন। ৺উপেন্দ্রমোহন ঠাকুরের কথায় আমরা চার টাকায় একটি নূতন শ্রেণী খুলিলাম। বলাইচাঁদ মল্লিক আসিতেন। ডাক্তার হণ্টার (পরে স্যর উইলিয়ম হণ্টার) ও মেজর বেয়ারিং (এখন লর্ড ক্রোমার) আসিতেন ত বটেই; অনেক সময়ে আমাদিগকে সুপরামর্শও দিতেন। শিশিরবাবুর 'নয়শো রুপেয়া' অভিনয় করিতে গিয়া আমরা কিছু বিপন্ন হইয়া পড়িলাম। তখন আমরা স্বাধীনভাবে কোন অংশ পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন করিতাম না; গ্রন্থরচয়িতার সঙ্কেতানুযায়ী কাজ করিতাম। একস্থানে ছিল 'চুম্বন'। আমার মনে একটু খট্‌কা লাগিল। ডাক্তার হণ্টারকে ভিতরে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এটা পাব্‌লিক ষ্টেজে দেখান উচিত কি না? তিনি বলিলেন—'তোমাদের সমাজে উচিত কি না বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদের ষ্টেজে স্ত্রী পুরুষে অভিনয় করে, সেখানে ওটা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না। পুরুষ এখানে নারী সাজিয়াছে; বোধ হয় এস্থলে উহা ভাল হইবে না। তোমরা বাদ দিয়া যাও।' ডাক্তার হণ্টার তাঁহার আসনে গিয়া বসিলেন। আমরাও তাঁহার পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিলাম।

"নীলদর্পণ অভিনীত হইবার সময় একরাত্রিতে[১] পুলিসের ডেপুটি কমিশনার ল্যাইল্‌স্‌ সাহেব আসিয়াছেন শুনিয়া অনেকে মনে করিল যে তিনি দু' চার জনকে ধরিয়া

---

[১] 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের দ্বিতীয় রজনী (২১ ডিসেম্বর, ১৮৭২)-তে। (দ্রঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস)—সং

লইয়া যাইবেন। তাহাতে কেহই দমিয়া গেল না; বরং সকলেরই ফুর্ত্তি বাড়িয়া গেল; তোরাপ বেশে মতিলাল আস্ফালন করিয়া বলিল—'ধরে নিয়ে যায় যাবে, আমি এই লুঙ্গি পরেই যাব।' পুলিস সাহেব যখন শুনিলেন যে এই রকম্ ধারণা দাঁড়াইয়াছে, তিনি হাসিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, 'দীনবন্ধুবাবুর সঙ্গে আমাব বিশেষ পরিচয় ছিল; তাই আমি তাঁহার এই উৎকৃষ্ট নাটকেব অভিনয় দেখিতে আসিয়াছি। আপনারা আর কিছু মনে করিতেছেন কেন?'

"এতদিন পরে নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ সম্পাদিত মাসিক পত্রিকায় আমার স্মৃতিকথা লিপিবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইতেছে; ইহাতে আমি যথেষ্ট গৌরব ও আনন্দ বোধ করিতেছি। নাটোরেব রাজবংশের সহিত এই 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের সময়ে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। রাজা চন্দ্রনাথের মত সহৃদয় বন্ধু আমাদের আর কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ। ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের বাঙ্গালী Attaché বোধ হয় তাঁহার পূর্ব্বে এবং পরে আব কেহ হয়েন নাই। বড লাট নর্থব্রুক বাহাদুর বারাকপুরে যাইবার সময়ে মাঝে মাঝে তাঁহাকে নিজের গাড়ীতে লইয়া যাইতেন। কিন্তু তিনি অম্লানবদনে আমাদের থিয়েটরের গ্রীণরুমে প্রবেশ করিয়া আমাদিগকে পোষাক পরাইয়া দিতেন। হয় ত তাড়াতাড়ি নারীবেশ পরিত্যাগ করিয়া পুরুষবেশে রঙ্গমঞ্চে দেখা দিতে হইবে; রাজা চন্দ্রনাথ অসঙ্কোচে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া অভিনেতার পায়ের মোজা খুলিয়া দিতেন। আজ ভক্তিপূর্ণ প্রাণে তাঁহাব কথা স্মরণ করিতেছি।"

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩

অমৃতবাবু বলিলেন—"বিশ্বকোষ অভিধানে 'রঙ্গালয়' শীর্ষক প্রবন্ধে একটু আধটু ভুল রহিয়া গিয়াছে। প্রথম দেখুন—বেবতীর ভূমিকা লইয়াছিলেন তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, তিনকড়ি মান্না নহে। তিনকড়ি মুখুয্যেকে আমরা 'ঠাকুর্দ্দা' বলিয়া ডাকিতাম, যদিও তাঁহার বয়স বেশী ছিল না। আবার, দেখুন, গিরীশবাবুর গানে আছে—'কলঙ্কিত শশী হরষে, অমৃত বরষে'; এস্থলে বিশ্বকোষের লেখক টীকা করিয়াছেন—'অমৃত বরষে—অমৃতলাল পাল, একজন অভিভাবক।' অথচ সকলেই জানিতেন যে ঐ 'অমৃত' সৈরিন্ধ্রীবেশী অমৃতলাল বসু। সৈরিন্ধ্রীর অশ্রুবর্ষণের উল্লেখ করিয়া 'অমৃত বরষে' লেখা হইয়াছে। আব অমৃতলাল পাল কোনও কালে 'অভিভাবক' অথবা থিয়েটরের ভাবুকও ছিলেন না। এই রকম ছোটখাট অনেক ভুল উক্ত প্রবন্ধে আছে। পুনশ্চ দেখুন, লেখক একস্থলে বলিতেছেন,—নবীনমাধবের মৃত্যুশয্যার দৃশ্যে সৈরিন্ধ্রীকে যে 'মড়াকান্না' কাঁদিতে হইত, অমৃতবাবু সহজে তাহা আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। শেষে অমৃতবাবু নিজ বাড়ীর পার্শ্বস্থ একটা খালি ভাঙ্গাবাড়ীতে প্রত্যহ দুপ্রহর বেলায় গিয়া এই ক্রন্দন শিখিবাব জন্য সাধনা করিতেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু সেখানে গিয়া কাঁদিতে শিখাইতেন, উভয়ে গলা মিলাইয়া কান্না অভ্যাস করিতেন। আট দশ দিন এইরূপ কঠোর সাধনায় অমৃতবাবু মড়াকান্না আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যহ এই সাধনার বিষয় পল্লীস্থ স্ত্রীলোকেরা জানিত না, কাজেই রটিয়া গেল যে ভাঙ্গা বাড়ীতে ভূতে রোজ কাঁদে।—এই বর্ণনার কিছু গলদ্ আছে। ব্যাপারটা এই :—আমি ত সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকা গ্রহণ করিলাম। প্রথমে নিজে নিজেই আমার পার্টটা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে ত্রুটি করি নাই। এক দিন অর্দ্ধেন্দুবাবু বলিলেন, 'তোমার পার্টটা কেমন হ'ল দেখি?' তিনি আমার পরীক্ষা লইয়া বলিলেন—'না, হয় নি।' এই বলিয়া সৈরিন্ধ্রীর প্রথম দৃশ্যে চুলের দড়ি বিনানর সময় কথার ভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত, তাহা তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। আমার মেয়েলিপনা ঠিক হইল না। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমি ভাবিলাম, বক্তৃতার ধরণটা ঠিক করিয়া লইতে বেশী দেরি হইবে না; আসল ব্যাপারটা হইতেছে ঐ কান্না। ঐটাকে আয়ত্ত করিতে হইবে। এই মনে করিয়া আমি আমাদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী কালিদাস সান্ন্যাল মহাশয়ের নিকটে কান্না শিখিতে গেলাম। তাঁর সেকেলে ধরণের কান্না; সুরটাই মেয়েলি, কিন্তু আমার মনে হইল যেন emotion-এর অভাব। আমার ঠিক উহা ভাল

লাগিল না। আমি একাই চেষ্টা করিয়া দেখিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রত্যহ ঐ পোড়া বাড়ীতে দ্বিপ্রহরে আমি মড়াকান্না অভ্যাস করিতাম। একাকী করিতাম; অর্দ্ধেন্দু বা অন্য কেহ আমার দোসর ছিলেন না। কয়েক দিন পরে আমি অর্দ্ধেন্দুকে বলিলাম, 'একবার আমার কান্নার জায়গাটা শোনো দেখি।' মড়াকান্নার অভিনয় দেখিয়া তিনি সানন্দে আমার হাত ধরিয়া বলিলেন—'বহুৎ আচ্ছা! বেশ হয়েছে।' আমার নাট্যজীবনে অর্দ্ধেন্দু আমার প্রথম গুরু বটে; কিন্তু এই কান্না সাধনায় আমি গুরুকে লুকাইয়া স্বয়ং সিদ্ধিলাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমার নাট্যগুরু অর্দ্ধেন্দু-শেখরের আশীর্ব্বাদে সফলপ্রযত্ন হইলাম। তাঁহার নিকটে আমি যে কত ঋণী তাহা স্বীকার করিতে আমি কখনও সঙ্কোচ বোধ করি নাই। সঙ্কোচ বোধ করাটাই অত্যন্ত লজ্জাকর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে ভুল ধারণা দাঁড়াইয়া যাইবে ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। তিনি বাস্তবিক যাহা করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি থাকিয়া যাইবে। আমার সঙ্গে সেই পোড়ো বাড়ীতে গলা সাধেন নাই বলিয়া তাঁহার কৃতিত্বের কিছুমাত্র খর্ব্বতা হইবে না।

"নাটোরের রাজা চন্দ্রনাথের কথা বলিতেছিলাম। কাশীতে অবস্থানকালে আমি তাঁহার মহত্ত্ব ও সৌজন্যের পরিচয় পাইয়াছিলাম। সমস্ত প্রবাসী বাঙ্গালীর মন তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে রাজা চন্দ্রনাথ attaché পদে প্রতিষ্ঠিত হন। আমি তখন কাশীতে ছিলাম। লোকনাথবাবু বলিলেন, রাজাকে অভিনন্দন দিতে হইবে। তাঁহার কথায় প্রবাসী বাঙ্গালীরা আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। বঙ্গীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের উজ্জ্বল রত্ন, রাণী ভবানীর কুলতিলক প্রথম বাঙ্গালী attaché-কে কাশীধামে পাইয়া প্রবাসী বাঙ্গালীরা যদি উপযুক্তরূপে তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিতে না পারে তাহা হইলে অত্যন্ত লজ্জার কথা। লোকনাথ মৈত্র মহাশয়ের উদ্যোগে উদারপ্রকৃতি বিজিয়ানাগ্রামের মহারাজ ও কাশী-নরেশ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; ডাক্তার ল্যাজারস্ তাঁহার সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। প্রকাণ্ড সভামণ্ডপ নির্ম্মিত হইল। তত্রত্য কলেজের আইনের অধ্যাপক গিরীন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় কর্ত্তৃক ইংরাজি ভাষায় অভিনন্দনপত্র রচিত হইল; গিরীন্দ্রবাবু তখন লোকনাথবাবুর বাসায় অবস্থান করিতেছিলেন। আমরা কয়জনে মিলিয়া একটি বাঙ্গালা রচনা খাড়া করিলাম। আয়োজনের ত্রুটি হইল না। আমার কিন্তু মনটা বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। রাজা চন্দ্রনাথকে আমি তখনও চোখে দেখি নাই। কেবলই মনে হইতে লাগিল যে এই প্রকাণ্ড সভামণ্ডপে নানা দেশ বিদেশের রাজা মহারাজা সমবেত হইবেন, আমাদের এই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ রাজা তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃতিদত্ত রাজটীকা লইয়া দাঁড়াইতে পারিবেন ত? মনে হইল যেন তাঁহার চেহারার উপর সমস্ত বাঙ্গালী জাতির

মান ইজ্জৎ নির্ভর করিতেছে। আমার যেন ছট্‌ফটানি ধরিল। সন্ধ্যা হইল। দেব-মন্দিরে সন্ধ্যারতি আরম্ভ হইল। অসংখ্য দীপালোকে সভাস্থল ঝল্‌মল্ করিতে লাগিল। রাজা চন্দ্রনাথ তাঞ্জাম হইতে অবতরণ করিলেন। আমি বিস্ফারিত নেত্রে দেখিলাম—হাঁ, রাজা বটে! কাশীপ্রবাসী বাঙ্গালীর গৌরবমুকুট বটে। রাণী ভবানীর বংশের উজ্জ্বল প্রদীপ আজ বিশ্বনাথের চরণতলে দীপ্ত হইয়া জ্বলিতেছে। বেশের অদ্ভুত পরিপাট্য ছিল, কিন্তু ঐশ্বর্য্যের বাহুল্য ছিল না। আনন্দে আমার চোখে জল আসিল। অভিনন্দন পত্র পঠিত হইল। তিনি বিনীতভাবে তৎপ্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলিলেন। সভাভঙ্গ হইল।

"কলিকাতায় পাবলিক ষ্টেজের প্রথম অবস্থায় তাঁহার আনুকূল্যে ও সৌজন্যে আমরা কৃতার্থ হইয়া গেলাম। তিনি যে কখনও আমাদিগকে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন এমন কথা আমি বলিতেছি না। বাস্তবিকই আমরা ধনী ও অভিজাত সমাজের নিকটে অর্থ ভিক্ষা করি নাই। তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আসিবেন; যদি ভাল লাগে, দুটি ভাল কথা বলিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন; যেখানে ভাল লাগিল না, সেখানে আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিবেন;—ইহার অধিক আমরা কিছু আশা করিতাম না। এইখানে আপনাকে একটু সতর্ক হইতে হইবে; যেন পাঠক পাঠিকাব ভুল ধারণা না হয় যে আমরা অভিজাতবর্গের অন্ততঃ moral patronage-এর ভিখারী ছিলাম। ন্যাশনাল থিয়েটরের ষ্টেজ বাস্তবিকই democratic ছিল; দেশের আপামর সাধাবণের আনন্দের সামগ্রী হইবে, ইহাই তাহার একান্ত আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টার বিষয় ছিল। আমাদের আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া পুণ্যশ্লোক শিশিরবাবুর মত বোধ হয় মহাত্মা উপেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গুণগ্রাহী রাজা চন্দ্রনাথ আমাদের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ভীমসিংহের ভূমিকায় গিরীশবাবুর রিহার্স্যাল দেখিয়া রাজা চন্দ্রনাথ স্বহস্তে গিরীশবাবুকে নিজের রাজবেশ পরাইয়া দিয়া তাঁহার কটিদেশে নিজের তরবারি ঝুলাইয়া দিলেন। 'আমি যখন মদনিকার ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলাম, তিনি গ্রীণরুমে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন; আমি প্রত্যাবৃত্ত হইলেই তিনি অবলীলাক্রমে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আমাব পায়ের মোজা খুলিয়া দিলেন; আমার সলজ্জ প্রতিবাদ তিনি গ্রাহ্য করিলেন না। রাজা চন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল যে তিনি 'শর্ম্মিষ্ঠা'য় যযাতি সাজিবেন; কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিল না।

"মাইকেলের 'শর্ম্মিষ্ঠা'র উল্লেখ করিতে গিয়া তাঁহার 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের কথা মনে পড়িল। সে সম্বন্ধে আমার দু একটি কথা বলিবার আছে। দেখুন, 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করিল। য়ুরোপীয় ধরণে উৎকৃষ্ট ট্র্যাজেডি যে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইতে পারে, তাহা মাইকেল বাঙ্গালীকে দেখাইয়া দিলেন। তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পরবর্ত্তী বাঙ্গালী নাটককারগণ যশস্বী হইয়া

গিয়াছেন। মাইকেল ও দীনবন্ধুর নিকটে আমাদের নাট্যসাহিত্য যে প্রভূত পরিমাণে ঋণী ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। 'নীলদর্পণ' বাঙ্গালী সমাজের সমসাময়িক চিত্র লইয়া বাঙ্গালীকে করুণরসাত্মক নাটকের আদর্শ দেখাইয়া দিল ; মাইকেল বিলাতী classic ধরণের ট্র্যাজেডির আদর্শ 'কৃষ্ণকুমারী'তে দেখাইলেন। প্রহসন রচনার পন্থাও মাইকেল দেখাইয়া দেন। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়িয়া গেল। বাঙ্গালী সাহিত্য-সেবিগণ বোধ হয় অনেকে তাহা জানেন না। গিরীশবাবুর পদ্যের ছন্দ গিরীশবাবুর নিজের আবিষ্কৃত নহে। ঐ ছন্দের আবিষ্কর্ত্তা আর কেহ নহেন—স্বয়ং কালীপ্রসন্ন সিংহ।[১] সত্যপ্রিয় কৃতজ্ঞ গিরীশবাবু তাঁহার প্রথম নাটক 'রাবণবধ'-এর title page-এ হুতোম প্যাঁচায় ঐ ছন্দে রচিত লাইন কয়টি তুলিয়া দিয়াছিলেন ; ছন্দ হিসাবে তাঁহারই প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন। এ সকল কথা পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা করিতেছি।

"কিন্তু মজা এই যে, গতিক দেখিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়,—'কৃষ্ণকুমারী' নাটকখানি রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের পক্ষে বড়ই unlucky ; কেহ বোধ হয় উহা লইয়া সামলাইতে পারে নাই। দেখুন, পাইকপাড়ায় উহা অভিনীত হয় নাই। হইবার উদ্যোগ করিতেই রঙ্গমঞ্চের মজ্‌লিসি দল ভাঙ্গিয়া যায়।[২] শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে ভাঙ্গা দল লইয়া অভিনয় হইয়াছিল।[৩] অভিনয় হইবার পূর্ব্বেই কিন্তু শোভাবাজার প্রাইভেট্ থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি ভাঙ্গিয়া গেল। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, কি কারণে জানি না, উক্ত নাট্য-সভার সহিত নিজের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলেন। আরও অনেকে চলিয়া গেলেন। এক রকম করিয়া অভিনয় করা হইল বটে, কিন্তু পূর্ব্বের দল ভাঙ্গিয়া গেল। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক অভিনয় করিবার কিছু দিন পরেই আমাদের ন্যাশনাল থিয়েটরের অভিনয় বন্ধ করিতে হইল।[৪] 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের উপরে নারদের একটু অনুকম্পা আছে। কিসে গোলমাল বাধিল ঠিক এখন বলিতে পারিব না ; টাকা কড়ির খরচ পত্র লইয়া মনো-

[১] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাচার নক্সা' (১৮৬১-২) প্রকাশের পূর্বে মধুসূদন দত্ত তাঁর 'পদ্মাবতী' (১৮৬০) নাটকে কিছু কিছু অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। তবে, তিনি 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) নাটকের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন, 'অমিত্রাক্ষর পদ্যই নাটকের উপযুক্ত পদ্য ; কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য এখনও এদেশে এতদূর পর্যন্ত প্রচলিত হয় নাই যে, তাহা সাহসপূর্বক নাটকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন করিতে পারি।' (দ্রঃ 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' ২য়—ডঃ সুকুমার সেন)।—সং

[২] "'শর্মিষ্ঠা'র অভিনয়ের (১৮৫৯) পর (পাইকপাড়ার রাজাদের) বেলগাছিয়া নাট্যশালায় আর কোন অভিনয় হয় নাই।" (বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস)—সং

[৩] ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৭।—সং

[৪] প্রথম অভিনয়: ২২এ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩ ; "৮ই মার্চ ১৮৭৩ সালে ('কৃষ্ণকুমারী'র) যে অভিনয় হয়, উহাই সে বারের মত ন্যাশনাল থিয়েটারের শেষ অভিনয়।" (বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস)—সং

মালিন্য দাঁড়াইয়া গেল। ভীমসিংহের ভূমিকায় গিরীশবাবু নিজেকে a distinguished amateur বলিয়া বিজ্ঞাপিত করাইয়াছিলেন; কিন্তু তখন আমরা সকলেই amateur, তবে গিরিশবাবু অবশ্যই "distinguished' ছিলেন। কেহই মাহিনা লইতেন না। আমরা পেশাদার-ই ছিলাম না। ভাল থিয়েটর নির্ম্মাণ করিতে হইবে। তজ্জন্য টাকা আবশ্যক, আমাদের সকলেরই ঝোঁক ছিল যে ষ্টেজের উন্নতি করিবার জন্য যথেষ্ট অর্থসঞ্চয় করিতে হইবে। এই কারণে থিয়েটারের জন্য যখন আমরা প্ল্যাকার্ড্ ছাপাইতাম, প্রতি রাত্রির প্ল্যাকার্ডের শিরোদেশে লেখা থাকিত—'For the benefit of the stage' (ষ্টেজের উন্নতির জন্য)। এই কয়টি কথা আমিই বলবৎ করিয়া প্রথম প্ল্যাকার্ডের উপর বসাইয়া দিয়াছিলাম। গিরীশবাবুর কাছে একজন ন্যাশনাল থিয়েটরকে পেশাদারী থিয়েটার বলায় তিনি বলিয়াছিলেন,—'ভুনেটা * বাঁচিয়ে দিয়েছে রে,—পেশাদারী নয়!' দেখুন, গিরীশবাবুর সঙ্গে আমাদের একটা তখনকার মনোমালিন্যের কথায় **পরমহংসদেবের** কথা মনে পড়িয়া গেল! একদিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে কেশববাবু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সামাজিক নানা প্রশ্ন লইয়া তখন সভা সমিতিতেও পত্রিকার স্তম্ভে উভয়ের মধ্যে বাদানুবাদ চলিতেছিল। ঠাকুর জানিতেন উভয়ের মধ্যে প্রীতিবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'দেখ, তোমাদের দুজনকার ঝগড়া যেন রাম-শিবের লড়াই। রাম শিবের গায়ে বাণ মারছেন, শিবও রামের গায়ে বাণ মারছেন, আবার তখনই রাম শিবকে স্তব করছেন, আর শিব রামকে স্তব করছেন, কেন না রামের গুরু শিব, আর শিবের গুরু রাম। দুজনের মধ্যে মিটমাট হয়ে যাবার বাধা কিছু নাই, কিন্তু যত গোল বাধিয়ে দেয় রামের বাঁদরগুলো আর শিবের ভূতপ্রেতগুলো। তোমাদেরও ঝগড়া সহজেই মিটমাট হয়ে যায়, কিন্তু যত গোল করতে ঐ বাঁদর আর ভূতপ্রেত-গুলো।'...গিরীশবাবুর সঙ্গে ন্যাশনাল থিয়েটরের প্রণয়ভঙ্গের জন্য ভূতপ্রেত বানর যে কতকটা দায়ী ছিল না এমন কথা বলা যায় না। সে যাহা হউক, টাকার কথা বলিতেছিলাম। আমরা কেহই বেতনভোগী ছিলাম না। অর্দ্ধেন্দুর কিছু টানাটানি ছিল; তাঁহাকে প্রায়ই টাকা দিতে হইত। নীলদর্পণের তৃতীয় অভিনয় রজনীতে অর্দ্ধেন্দুর অদর্শনে আমরা অস্থির হইয়া পড়িলাম; কোনও রকম করিয়া যোগেন্দ্রনাথ মিত্রকে দিয়া তাঁহার কাজ চালাইয়া লইলাম। পরদিন প্রাতে অর্দ্ধেন্দুর বাড়ীতে গিয়া তাঁহার পিতা ৺শ্যামাচরণ মুস্তফী মহাশয়ের হস্তে নগেন বন্দ্যো চল্লিশটি টাকা দিয়া আসিলেন। তখনকার মত গোল মিটিয়া

---

* আত্মীয় স্বজনের মধ্যে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু ভুনি বোস বলিয়া পরিচিত।—লেখক।

গেল। ইহার জন্য অর্দ্ধেন্দুকে দোষ দিতে পারি না। থিয়েটরের সর্বাঙ্গীন উন্নতি করিতে গিয়া তিনি নিজের সংসারের দিকে দৃক্‌পাত করিবার অবসর পান নাই। তাঁহারা পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়ী হইতে বরাবর মাসে মাসে যে বৃত্তি পাইয়া আসিতেছিলেন, 'কিছু কিছু বুঝি' প্রহসনের অভিনয়ের পর হইতেই তাহা বন্ধ হইয়া যায়।[১] সুতরাং থিয়েটরের জন্য তাঁহাদিগকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল। যদি আমরা তাঁহার অর্থাভাব মোচনের চেষ্টা না করিতাম তাহা হইলে আমাদের আচরণ অত্যন্ত গর্হিত হইত। সে যাহা হউক, টিকিটলব্ধ অর্থে আমাদের খরচ চলিয়া গেলেই হইল; সে টাকা যে আবার বাড়ীতে লইয়া যাইতে হইবে এমন কল্পনা আমাদের কাহারও ছিল না। তাই বলিতেছিলাম, কেন যে আমাদের মধ্যে গোলযোগ বাধিয়া থিয়েটর বন্ধ হইয়া গেল, তাহা ঠিক আপনাকে বলিতে পারিব না; কেন না, যখন টাকা-হিসাবে আমাদেব দলের মধ্যে কেহই স্বার্থপর ছিলেন না, তখন টাকা লইয়া গোলযোগ হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহাই হইল। থিয়েটরে আমাদের অভিভাবক স্থানীয়গণ সকলকে সন্তোষজনকরূপে টাকার হিসাব বুঝাইযা দিতে পারিলেন না। থিয়েটরের শেষ অভিনয়রজনীতে যবনিকা পতনের পূর্বে "জ্যাঠা" বেহারী (বিহারীলাল বসু) নারীবেশে ফুট্‌লাইটের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া গিরীশবাবুর রচিত একটি গান গাহিয়া দর্শকবৃন্দের নিকট হইতে বিদায় লইলেন:

'কাতর অন্তরে আমি চাহি বিদায়।
সাধি ওহে সুধিব্রজ ভুলোনা আমায়॥
এ সভা রসিকমিলিত,
হেরিয়ে অধিনী চিত
আধ পুলকিত
আধ হুতাসে শুকায়॥

[১] "১৮৬৭ সনের ২রা নবেম্বর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জোড়াসাঁকো, কয়লাহাটার বাড়ীতে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'কিছু কিছু বুঝি'...প্রহসনের অভিনয় হয়। ....প্রহসন খানির সর্বত্র পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়ীর প্রতি প্রচ্ছন্ন কটাক্ষ ও আক্রমণ ছিল।' ......অর্দ্ধেন্দুশেখর সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'নটচূড়ামণি অর্দ্ধেন্দু শেখর' পুস্তিকায় বলিয়াছেন, 'কিছু কিছু' বুঝিতে অর্দ্ধেন্দু অভিনয় করেন, সেই তাঁহার প্রথম রঙ্গমঞ্চে পদার্পণ। উক্ত শ্লেষ প্রহসনে তাঁহার তিনটি অংশ ছিল। তাহার একটি অংশ রাজবাটির কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বিদ্রূপ। ইহাতে তিনি তাহার পিতৃষসা-গৃহে বিরক্তিভাজন হন; তাঁহার পিতা তাঁহাকে অভিনয় করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু নাট্যামোদী অর্দ্ধেন্দু ক্ষান্ত হইলেন না, তাহাতে তাঁহাকে পিতৃষসার (মহারাজ যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের জননীর) গৃহ পরিত্যাগ করিতে হয়।'" (বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস)—সং

অস্তগামী দিনমণি
যেমতি হেরি নলিনী
আধ ধনি বিমলিনী,
আধ হাসি চায় ॥
মম প্রতি ঋতুপতি
হয়েছে নিদয় অতি ;
হাসাইছে বসুমতী,
আমারে কাঁদায় ॥
নির্মাইয়ে নাট্যালয়
আরম্ভিব অভিনয়,
পুনঃ যেন দেখা হয়
এ মিনতি পায় ॥'

"গান শেষ হইল। দর্শকবৃন্দ চঞ্চল হইয়া আক্ষেপোক্তি করিতে লাগিলেন। মধুচক্রে লোষ্ট্রক্ষেপ করিলে মক্ষিকার দল যেমন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া গুণ গুণ করিতে থাকে, তদ্রূপ সেই দর্শকমণ্ডলী অস্ফুট কলরব করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। সকলেই বলিলেন—'কেন তোমরা বন্ধ কর্‌বে? কেন তোমরা বিদায় চাও? তোমাদের ভুলব কেন? যেখানে অভিনয় কর্‌বে আমরা আস্‌ব বৈকি!' বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা চাঁদার খাতা খুলিয়া তাঁহাদের সম্মুখে ধরিতাম, তাহা হইলে একটা নাট্যালয় নির্মাণের খরচ তখনই সহি করাইয়া লইতে পারিতাম।

"১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের মধুযামিনীর সেই করুণ বিদায়গীতি আজিও থাকিয়া থাকিয়া আমার হৃদয়-নিকুঞ্জে গুঞ্জরিত হইয়া উঠে। আমার সেই উদ্দাম যৌবনের বসন্তোৎসবে সেই 'আধ-পুলকিত আধ-হুতাশে-শুকায়' হৃদয় আজ আপনাকে কেমন করিয়া বুঝাইব? তা'র পরে কত বসন্ত আসিল ও গেল; কত হাসি কান্নার ভিতর দিয়া আমার জীবন-নাট্য লীলায়িত হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু সেই রাত্রির সেই বেদনা আজিও বিস্মৃত হই নাই। তখন যৌবন ছিল, মনে সাহস ছিল, 'পুনঃ যেন দেখা হয়' বলিয়া মিনতি করিতে পারিয়াছিলাম; কায়মনোবাক্যে সাধনা করিয়াছিলাম; সিদ্ধিলাভও হইয়াছিল। সেই সাধনা ও সিদ্ধির কথা পরে বলিতেছি।"

দশ

২১এ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩

অমৃতবাবু বলিলেন, "ন্যাশনাল থিয়েটার ভাঙ্গিয়া গেল। দলাদলির সূত্রপাত পূর্ব্বেই হইয়াছিল; এবার পাকাপাকি দুইটা দল দাঁড়াইয়া গেল। ষ্টেজের মালপত্তর আমরা কিছুই পাইলাম না। বোধ হয় পাইলাম না বলিলে ঠিক বলা হয় না; আমরা সকলে উপস্থিত থাকিয়া এইরূপ ব্যবস্থা করিলাম যে, ন্যাশনাল থিয়েটারের ষ্টেজ গিরীশবাবুর বাড়ীতে রাখা হইবে।

"অল্প দিনের মধ্যেই সেই ষ্টেজ টাউন হলে বাঁধা হইল। আমাদের সহিত এই নূতন থিয়েটরের কোনও সম্পর্ক রহিল না। তাঁহারা 'নীলদর্পণ' অভিনয় করিলেন।[১] দেশী হাসপাতালের সাহায্যার্থ এই অভিনয় হইবে। এইরূপ বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছিল।

"এই কথাটা একটু ভাল করিয়া বলা আবশ্যক। আমি আমার স্মৃতিকথা বলিয়া যাইতেছি; ঠিক যে থিয়েটারের ইতিহাস দিতে বসিয়াছি, তাহা নহে। তবে আমার স্মৃতিকথার অনেকটাই আমার নাট্য-জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাই নাট্য-সাহিত্যের ও রঙ্গমঞ্চের বিবরণ হয় ত কিছু বেশী হইয়া পড়িতেছে। আবার নিজের স্মৃতিকথা বলিতে হয়ত First Person Singular-এর উপর কিছু বেশী জোর পড়িয়া যায়; সেই যে ছেলেবেলায় I by itself I কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম, আজও তাহার হাত এড়াইতে পারি নাই। তাই মাঝে মাঝে বোধ হয় একটু চেষ্টা করিয়া সেই কেন্দ্রস্থ 'I'-এর অন্য বিষয় দেখিবার অবসর করিয়া লইতে হয়।

"এই যে টাউন্ হলের থিয়েটারের দল, ইহারা আমাদের সেই ন্যাশনাল থিয়েটারের ভাঙ্গা দল; আমাদের সহিত বিচ্ছিন্ন হইবার পরই গিরীশবাবু এই ভগ্নাংশ-টিকে ন্যাশনাল থিয়েটর নামে রেজিষ্টরি করিয়া লইলেন।

"এই সঙ্গে আমাদের আর একটি দেশীয় অনুষ্ঠানের ইতিহাস জড়িত হইয়া আছে। ডাক্তার ম্যাক্‌নামারা নামে তখন কলিকাতায় চক্ষুরোগের একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ছিলেন। তিনি গিরীশচন্দ্র দাস ও অন্যান্য কয়েকটী বাঙ্গালী ভদ্রলোককে ধরিয়া বলিলেন,—যেমন করিয়া হউক একটা দেশীয় হাসপাতালের জন্য কিছু টাকা তুলিয়া দেওয়া চাই। বৃন্দাবন পালের পুত্র রাজেন্দ্র পাল সে সময়ে সখের থিয়েটরের একজন চাঁই

[১] ২৯ শে মার্চ, ১৮৭৩।—সং

ছিলেন। তাঁহারই বাড়ীতে পূর্ব্বে 'লীলাবতী' অভিনীত হইয়াছিল।[১] ডাক্তার সাহেবের অনুরোধে গিরীশ দাস, রাজেন্দ্র পাল ও অন্যান্য কয়েক জন ভদ্রলোক টাউন্ হলে এই থিয়েটরের ব্যবস্থা করিলেন।

"'নীলদর্পণ' অভিনীত হইল। আমি দুই টাকা দর্শনী দিয়া অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। যতদূর স্মরণ হয়, গিরীশবাবু নবীনমাধব সাজিয়া ছিলেন, মতিবাবু তোরাপ, গোবি (ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর) সৈরিন্ধ্রী—মাধু (শ্রীযুক্ত রাধামাধব কর) সাজিয়াছিলেন কিনা, তাহা আমার এখন মনে পড়িতেছে না।

"এইখানে মাধুর কথা কিছু বলিয়া রাখি। আমরা যখন সান্যালদের বাড়ীতে অভিনয় করি[২], তখন মাধু আমাদের দলে ছিলেন না, বিদেশে পোষ্টমাষ্টারি করিতেন। পোষ্টআফিসে চাকরি লইবার পূর্ব্বে সখেরদলের অভিনেতৃগণের মধ্যে মাধু প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন। আমার যখন নাট্য জীবনের আরম্ভ হয় নাই, তখন 'সধবার একাদশী'র রামমাণিক্য ভূমিকায় মাধুর খ্যাতি আমাকে উতলা করিয়া তুলিল। তাঁহার অভিনয় দেখিবার বাসনা আমার মনে অত্যন্ত প্রবল হইল। কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা ফলবতী হইল না। 'লীলাবতী'তে তিনি ক্ষীরোদবাসিনীর ভূমিকায় সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন। সুদূর কাশীতে বসিয়া আমি তাঁহার কৃতিত্বের কথা শুনিলাম; তাঁহার অভিনয় দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না! সান্যালদের বাড়ীতে আমি যখন সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকায় তালিম দিতাম, তখন অর্দ্ধেন্দুশেখর মাঝে মাঝে দুঃখ করিয়া বলিতেন—'আহা, যদি মাধু এখানে থাকত, কি চমৎকার সৈরিন্ধ্রী হ'ত!' গিরীশবাবু আমাকে একদিন বলিলেন,—'বাস্তবিক যে নিজে কাঁদতে জানে না, সে পরকে কাঁদাতে জানে না; মাধুর কান্না অন্তরের ভেতর থেকে ফেটে বেরোয; মাধু কাঁদতে জানে।'

"সে যাহা হউক, সে রাত্রির টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থ ডাক্তার ম্যাকনামারার হস্তে অর্পিত হইল। এমনি করিয়া মেয়ো হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপনে বাঙ্গালীর থিয়েটর অর্থ সাহায্য করিতে সমর্থ হইল।

"আর একটি কথা আপনি নোট করিয়া লইতে পারেন। যে গোবি একদিন মেয়ো হাসপালের উদ্দেশে টাকা তুলিবার জন্য সৈরিন্ধ্রী বেশে টাউন্হলে অভিনয় করিয়াছিল, সে এখন এলবার্ট ভিক্টর হাসপাতাল ও কলিকাতার উত্তরাংশে আর একটি মেডিক্যাল কলেজ[৩] স্থাপনে সফলপ্রযত্ন হইয়াছে। সৈরীন্ধ্রী বেশে গোবিকে আমি

[১] ১৮৭২ সনের ১১ ই মে রাজেন্দ্রনাথ পালের শ্যামবাজারের বহির্বাটির প্রাঙ্গণে 'লীলাবতী'র প্রথম অভিনয় হয়।—সং

[২] ১৮৭২-৭৪।—সং

[৩] বর্ত্তমান R. G. Kar Medical College & Hospital।—সং

ঈর্ষাকষায়িত লোচনে দেখিয়াছিলাম; কিন্তু তাহার সুন্দর অভিনয় দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইলাম। আজ আমার আনন্দের সীমা নাই।

"আমাদের ষ্টেজ ও সীন্ ছিল না। ভাঙ্গাদল যখন টাউন্ হলে গেলেন, আমরা পরামর্শ করিলাম 'অপেরা হাউস' ভাড়া লইয়া প্লে করিতে হইবে। টাউন্ হলে 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের কিছু পরেই আমরা লিণ্ডসে ষ্ট্রীটে মাইকেলের 'শর্ম্মিষ্ঠা'র অভিনয় করিলাম।[১] দুইরাত্রি অভিনয় হইল। অনেকগুলি প্রহসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

"এই প্রহসন-সাহিত্য সম্বন্ধে আমার অনেক কথা বলিবার আছে। আজ শুধু দুটি একটি কথা আপনাকে বলিতে পারি। ক্যাম্বেল সাহেবের আমলে সব্-ডেপুটী তৈয়ার করিবার জন্য স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। Botany, Chemistry, আইন, জরীপকরা, সন্তরণ, জিম্‌ন্যাষ্টিক্ প্রভৃতি নানা বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারিলে তবে সব্-ডেপুটী হইবার সম্ভাবনা হইত। গভর্মেণ্টের সর্কুলার প্রচারিত হইবার অব্যবহিত পরেই অমৃতবাজার পত্রিকায় একটি চমৎকার Cartoon বাহির হইল; কয়েকজন জিম্‌ন্যাষ্টিকের পোষাকপরা বাঙ্গালী যুবক সার গাঁথিয়া দণ্ডায়মান,—তাহাদের কাণে চিম্‌টে, কোমরে শিকল। সব্-ডেপুটী হইবার সমস্ত সরঞ্জাম বর্ত্তমান। আমাদের থিয়েটবের জন্য প্রহসনের সুন্দর মাল মস্‌লা পাওয়া গেল। বেশ মজাদার ফার্স রচিত হইয়া গেল। ছেলেবেলা হইতেই নেলার সাহেবের ডাক্তারখানা লইয়া আমরা কত হাসি ঠাট্টাই যে করিতাম তাহা বলা যায় না; সাহেবের গলার স্বর, কথা কহিবার ভঙ্গি আমরা সুন্দররূপে অনুকরণ করিয়াছিলাম। তখন অনেক ডিস্পেন্সরিতে মদ্য বিক্রয় হইত; সমস্তই আমাদের প্রহসন সাহিত্যের অঙ্গীভূত হইয়া গেল।

"এই প্রহসন সাহিত্য অনেকটা আমাদের মুখে মুখে রচিত হইয়াছিল। অর্দ্ধেন্দু, গোবি, গোপাল দাস, মতি, নগেন বেলবাবু ও আমি, সকলে মিলিয়া মুখে মুখে একখানা impromptu farce শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে রচনা করিয়া ফেলিতাম।

"আমাদের সেই যৌবনের প্রহসন—সাহিত্যের কথা আলোচনা করিতে বসিয়া আজ অর্দ্ধেন্দুর কথা বড় বেশী মনে পড়িতেছে। 'নবনাটকে' অর্দ্ধেন্দুর কর্ত্তা ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া মনে পড়ে; বহুরূপী অর্দ্ধেন্দু শেখর এই কর্ত্তা সাজিয়া যে অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে এখনও আমার হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে; আমার দৃঢ় ধারণা, এইটিই অর্দ্ধেন্দুর masterpiece। পূর্ব্বে[২] অক্ষয় মজুমদার এই ভূমিকায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে যথেষ্ট বাহাদুরি দেখাইয়াছিলেন

[১] ৫ই এপ্রিল, ১৮৭৩।—সং

[২] ১৮৬৭ সনের ৫ই জানুয়ারী জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে 'নব নাটক'-এর প্রথম অভিনয় হয়। (বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস)—সং

বটে; কিন্তু অর্দ্ধেন্দু যেন 'কর্ত্তা'কে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিলেন। অর্দ্ধেন্দুর মুখে শুনিয়াছি যে অক্ষয়বাবুর অভিনয় দেখিয়া তাঁহার ঐ ভূমিকায় অভিনয় করিবার সাধ হয়। অক্ষয় মজুমদার তাঁহার আদর্শ ছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহার আদর্শকে ছাড়াইয়া চলিয়া গেলেন। মনোমোহন বসুর 'প্রণয় পরীক্ষা' নাটকে গুলিখোর জামাই নটবরের ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুকে মনে পড়ে। শিশিরবাবুর 'নয়শো রূপেয়া'য় ছাতুলাল বেশে অর্দ্ধেন্দুর নিলাম-ডাকা মনে পড়ে। অনেক কথা মনে পড়ে; একদিন ভাল করিয়া অর্দ্ধেন্দুর acting সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বলিব; আজ নয়। আজ শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, লিণ্ডসে ষ্ট্রীটে আমরা 'বিলাতী বাবু', 'মডেল স্কুল', 'উপাধি বিতরণ' প্লে করিয়াছিলাম; অখিলবাবুর ব্যায়াম-ক্রীড়াও সে রঙ্গমঞ্চে দেখান হইয়াছিল।

"সেখানকার নাট্যলীলা আমাদের অল্প দিনের মধ্যেই সাঙ্গ হইয়া গেল; আমরা কালী সিংহের একটা হল্ ভাড়া লইয়া ষ্টেজের প্লাটফরম বাঁধিতে লাগিলাম।

"এমন সময়ে কলিকাতা হইতে ঢাকা যাইবার প্রস্তাব হইল। আমাদের সকলেরই খুব উৎসাহ। অর্দ্ধেন্দু, আমি, নগেন, কিরণ, ক্ষেত্র গাঙ্গুলী, বেলবাবু, বিহারী বসু প্রভৃতি সকলেই বিদেশে যাইতে প্রস্তুত। মেয়ে সাজিবার জন্য মহেন্দ্র সিংহ নামে একটি সুন্দর ছেলে পাওয়া গেল। ঢাকার মোহিনীমোহন দাসের নামে একখানি পত্র বলাই সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে লইয়া ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসের গোড়ায় কলিকাতা পরিত্যাগ করিলাম।

"তখন সপ্তাহে একদিন মাত্র ষ্টীমার গোয়ালন্দ হইতে ছাড়িত; যেখানে সন্ধ্যা হইত, সেইখানেই জাহাজ নোঙ্গর করা হইত। জাহাজে আহারাদির অসুবিধা হইয়াছিল বটে; কিন্তু ঢাকায় যে রাঁধুনি বামুন পাওয়া যাইবে না তাহা আমরা পূর্বে কল্পনাও করি নাই। শেষে দলের মধ্যে যাঁহারা বেচারা ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদের উপর রন্ধনশালার ভার অর্পিত হইল। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক কালিবাবু আমাদের সঙ্গে ছিলেন; ইনি পরে ইডন হিন্দু হোষ্টেলের সহকারী সুপারিণ্টেও হইয়াছিলেন।

"ঢাকার আতিথ্য-সংকার আমি কখনও বিস্মৃত হইব না। মোহিনীবাবুর হাতে চিঠি দেওয়া হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি একটি প্রকাণ্ড বাগান বাড়ী আমাদের জন্য ছাড়িয়া দিলেন; সেই বাগানবাড়ীটি ঠিক বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত। বুড়ীগঙ্গা তখন কূলে কূলে প্রবাহিত। বড় বড় ষ্টীমার ঢাকা সহরের কিনারায় গিয়া লাগিত। রবিবার দিনে প্রাতে কলিকাতা হইতে ষ্টীমার ছাড়িলে পরদিন বৈকালে উহা ঢাকায় গিয়া পৌছিত।

"ঢাকা সহরে একটি বাঁধা ষ্টেজ ছিল। বেশী কাল-বিলম্ব না করিয়া আমারা

সেই ষ্টেজে 'নীলদর্পণ' লইয়া অবতীর্ণ হইলাম; নবাববাড়ীর ব্যাণ্ড ও মোহিনী বাবুর কন্সার্ট আমাদিগকে সাহায্য করিল; সহরের ছোটবড় সকলেই আমাদের অভিনয় দেখিতে আসিলেন—কালীপ্রসন্ন ঘোষ, অভয় দাস, ডাক্তার কেদারনাথ ঘোষ, জয়েন্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ রাম্পীনি, পুলিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ওয়েদারল্ ও অন্যান্য অনেকে আসিলেন। একরাত্রেই আমরা কিস্তিমাৎ করিয়া দিলাম।

"ঢাকায় অবস্থান-কালে সেখানকার বড় বড় ইংরাজ রাজকর্মচারীদিগের সহিত তত্রত্য স্কুল-কলেজের ছাত্রদিগের যে প্রীতির সম্পর্ক দেখিয়াছিলাম তাহা শুনিলে আপনি অবাক হইয়া যাইবেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ও কমিশনার সাহেবকে বাঙ্গালী ছেলেদের সহিত রাস্তায় দাঁড়াইয়া গল্প করিতে দেখিয়াছি।

"প্রায় একমাস আমরা ঢাকায় রহিলাম। অনেকগুলি নাটকের অভিনয় করিলাম। অর্দ্ধেন্দুকে লইয়া সমস্ত সহর উন্মত্ত হইয়া উঠিল। আমাদের দেশের থিয়েটারের জন্য কোন অভিনেতাকে অমন করিয়া আর কেহ lionise করিয়াছে কিনা জানি না।

"বেঙ্গল টাইম্স্ পত্রিকায় আমাদের 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের বিদ্রূপাত্মক সমালোচনা বাহির হইল। আমি একটি ছোট-খাটো ফার্স রচনা করিয়া পরদিন সন্ধ্যার পর মুদ্রিত বেঙ্গল টাইম্স্ কাগজে পেণ্টুলান, কোট, টাই প্রভৃতি রচনা করিয়া তদ্দ্বারা আপাদমস্তক আবৃত করিয়া ষ্টেজের উপর দাঁড়াইয়া প্রাণ খুলিয়া কেম্প সাহেবকে বিদ্রূপ করিলাম। মজা এই যে, ম্যাজিষ্ট্রেট রাম্পীনি ও পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ওয়েদারল্ বাঙ্গালী দর্শকবৃন্দের হাস্যতরঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন।

"আমরা 'হিন্দু ন্যাশনাল্ থিয়েটর' নাম লইয়া ঢাকায় আসিয়াছিলাম।[১] ভাগ্যলক্ষী আমাদের প্রতি সুপ্রসন্না হইলেন। আমাদের দলের খ্যাতির কথা শুনিয়া অপর দলের আমাদের পুরাতন বন্ধুরা ঢাকায় গেলেন। তাঁহারা মোহিনীবাবুর মেজো ভাইয়ের (রাধিকাবাবুর) আশ্রয় লইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আগে আমরা আসর লইয়াছিলাম বলিয়া ঢাকায় তাঁহারা আসর জমাইতে পারিলেন না। আমাদেরই বাগানবাড়ীর সন্নিকটে লক্ষ্মী বাড়ীতে তাঁহাদের আড্ডা হইল। তাঁহারা জীবনবাবুর বাড়ীতে থিয়েটর করিলেন।

"এইখানে আপনাকে একটা বিষয়ে একটু সতর্ক করিয়া দিতে হইবে। আপনার মুখে শুনিতেছিলাম যে এই দলটিকে 'বিশ্বকোষে'র লেখক 'ধর্ম্মদাস বাবুর দল' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ন্যাশনাল থিয়েটরের কোনও ব্যক্তি যে

---

[১] মে, ১৮৭৩।—সং

যাত্রার দলের অধিকারীর মত একটা স্বতন্ত্র দল গড়িয়াছিলেন, তাহা নহে। যে দলে মহেন্দ্র বসু, গোপাল দাস, মতিলাল সুর, শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তিনকড়ি বাবু ও ধর্ম্মদাসবাবু ছিলেন সে দলকে ধর্ম্মদাসবাবুর দল বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে কেন? বরঞ্চ তাহাকে রাজেন্দ্র পালের দল বলিলে সুশোভন হইত।

"প্রতিদ্বন্দ্বী দলের অনেকেই এক একজন করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। কেহ কেহ পীড়িত হইয়া পড়িলেন; তাঁহাদিগকে লইয়া আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। উভয় দলের যে ঠিক মিলন হইল, এমন কথা বলা যায় না। কিছুদিন পরে দিঘাপতিয়ার রাজকুমারের (এখন রাজা প্রমদানাথ রায়) অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ন্যাশনাল থিয়েটরের নিমন্ত্রণ হয়। তখন দুই দলের অধিকাংশ লোকই একত্র হইয়া চলিয়া গেলেন। আমি গেলাম না। নগেন, কিরণ ও আরও কয়েকজন গেলেন না।

"এদিকে ছাতুবাবুর (৺আশুতোষ দেব) দৌহিত্র শরৎবাবু (৺শরৎচন্দ্র ঘোষ) ছাতুবাবুর বাড়ীর সম্মুখের মাঠে[১] একটি নূতন খোলার ঘরে বেঙ্গল থিয়েটর নাম দিয়া একটি নূতন নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত করেন। মাইকেল মধুসূদনের পরামর্শে থিয়েটরে অভিনেত্রী লওয়া স্থির হইল। তিনি বলিলেন, 'তোমরা স্ত্রীলোক লইয়া থিয়েটর খোল; আমি তোমাদের জন্য নাটক রচনা করিয়া দিব; স্ত্রীলোক না লইলে কিছুতেই ভাল হইবে না। মাইকেল ও শরৎবাবুর ভগ্নীপতি Mr O. C. Dutt (৺উমেশচন্দ্র দত্ত) অগ্রণী হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, হরিদাস দাস ('হরি বৈষ্ণব' নামে ইনি পরিচিত), গিরীশচন্দ্র ঘোষ (ন্যাদাড়ু গিরীশ), দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, বটু বাবু (ইনি প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ৺উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুড়া), প্রিয়নাথ বসু (ছাতুবাবুর ভাগিনেয়), অক্ষয়কুমার মজুমদার প্রভৃতি যোগ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। যে চারি জন স্ত্রীলোককে বাছাই করিয়া লওয়া হইল, তাহাদের নাম জগত্তারিণী, গোলাপ (পরে সুকুমারী দত্ত), এলোকেশী ও শ্যামা।

"১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মাইকেলের 'শর্ম্মিষ্ঠা' লইয়া বেঙ্গল থিয়েটর অভিনয় আরম্ভ করে। এবারে এ ষ্টেজেও মাইকেলের নাটক জমিল না। তাঁহার রচিত 'মায়াকানন' লইয়া যে তাঁহারা অধিকতর সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, এমন কথা বলা যায় না।

"এমন সময় মোহান্ত এলোকেশীর ব্যাপার লইয়া দেশময় তুমুল আন্দোলন

[১] বর্ত্তমানে এই স্থানে 'বিডন স্ট্রীট ডাকঘর' অবস্থিত।—সং

হইল ; পথে ঘাটে সর্ব্বত্রই লোকের মুখে ঐ বিষয়ের আলোচনা চলিতে লাগিল। বেঙ্গল থিয়েটর সময় বুঝিয়া 'উঃ মোহান্তের এই কি কাজ!' নামে একখানা নাটক ষ্টেজে খাড়া করিলেন।[১] সমস্ত দেশের লোক যেন সেদিন বেঙ্গল থিয়েটরে ভাঙ্গিয়া পড়িল। থিয়েটরের কপাল ফিরিয়া গেল।

"তাহার পর প্রতি শনিবার রাত্রে 'মোহান্তের এই কি কাজ' অভিনীত হইতে লাগিল। ধর্ম্মদাসবাবু, নগেনবাবু, ভুবন নিয়োগী ও আমি একদিন বেঙ্গল থিয়েটরে অভিনয় দেখিবার জন্য থিয়েটরের দ্বারদেশে গিয়া লোকের ভিড় ঠেলিয়া টিকিট কিনিতে পারিলাম না।

"অর্দ্ধেন্দু তখন কলিকাতায় ছিলেন না, নানা দেশবিদেশে মিশনরির মত ঘুরিতেছিলেন। একথা আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে চাই যে, থিয়েটরের যদি কেহ কখনও মিশনরি হইয়া থাকেন তাহা হইলে একমাত্র অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি ভিন্ন আর কাহারও নাম করা যায় না। কলিকাতায় বসিয়া আমরা যখন নূতন ষ্টেজ করিবার কল্পনা করিতেছিলান, অর্দ্ধেন্দু তখন বঙ্গের বাহিরে অভিনয়-কলাকে জনসাধারণের আদরের সামগ্রী করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

"ইতিমধ্যে আমরা একবার চুঁচুড়ায় গিয়া 'মোহান্তের এই কি কাজ' অভিনয় করিয়া আসিলাম।[২] এলোকেশী সাজিলেন ক্ষেত্র গাঙ্গুলী ; নগেন, নবীন সাজিলেন ; আমি হইলাম এলোকেশীর বাবা।

"এদিকে মহেন্দ্রনাথ দাসের নিকট হইতে জমি ভাড়া লইয়া আমরা গ্রেট্ ন্যাশন্যাল্ থিয়েটর নাম দিয়া লিউইস্ থিয়েটরের অনুকরণে একখানি কাঠের বাড়ী তৈরী করিলাম। দেখুন, আমরা তখন ছন্নছাড়া হইয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছি। লিউইস্ থিয়েটরের কর্ত্তৃপক্ষেরা পুরাতন সুলতানার বাড়ীটি ভাঙ্গিয়া অন্যত্র নূতন থিয়েটর স্থাপিত করিলেন। ধর্ম্মদাস, নগেন ও আমি সুলতানার বাড়ীর মডেল দেখিয়া আসিলাম। ধর্ম্মদাস ঐ মডেলের অনুকরণে নূতন থিয়েটরের বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে কখনও কোথাও engineering শেখে নাই। আমি দিবারাত তাহার সঙ্গে থাকিতাম। আমরা 'পিট'-এর টিকিট কিনিয়া লিউইস থিয়েটরের অভিনয় দেখিতে গেলাম। অতদূরে বসিয়াও ধর্ম্মদাস curtain-এ কয়-পর্দ্দা কাপড় লাগে তাহা ঠিক করিয়া লইল। কিছুক্ষণ পরে বাজারে কাপড়ের দোকানে গিয়া কাপড়ের বহর দেখিয়া সমস্ত নিজে জোগাড় করিয়া লইল। এইজন্যই আমি বলি যে, ধর্ম্মদাস বাঙ্গালীকে ষ্টেজ নির্ম্মাণ

[১] ৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩।—সং [২] ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩।—সং

করিতে শিখাইয়াছেন, অর্দ্ধেন্দু ও গিরীশবাবু বাঙ্গালীকে অভিনয় করিতে শিখাইয়াছেন। এই ষ্টেজ নির্ম্মাণ করাইতে ভুবন নিয়োগীর ত্রয়োদশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল।

"সে যাহা হউক, এখন যেখানে মিনার্ভা থিয়েটর রহিয়াছে, ঐখানে আমাদের নূতন থিয়েটরের ষ্টেজ নির্ম্মিত হইল; কিন্তু কি নাটক অভিনীত হইবে তাহা স্থির হইল না। বেঙ্গলে তখন 'মায়াকানন' লইয়া নাড়াচাড়া করা হইতেছে; জমাট বাঁধিতেছে না। বাজারে এমন নূতন কোনও বই নাই যাহা ষ্টেজের উপর চালনসই হইতে পারে। মহা বিভ্রাটে পড়া গেল। নগেন আমাকে বলিলেন—'তুমি না হয় একটা লিখে ফেল; ঐ 'মায়াকানন' ভেঙ্গে-টেঙ্গে একটা যা হয় কিছু তৈয়ার করে দাও।' আমি ও দেবেন্দ্র নামক মেডিক্যাল কলেজের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, দেবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—আমরা কয়জন মিলিয়া 'কাম্যকানন' নামে একটা নাটকই বলুন আর Fairy Tale-ই বলুন রচনা করিয়া ফেলিলাম। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ৩১এ ডিসেম্বর আমাদের গ্রেট্ ন্যাশনাল্ থিয়েটর খোলা হইল। মিঃ উমেশচন্দ্র দত্ত (Mr. O. C. Dutt) আমাদিগকে বলিলেন,—'তোমাদের এই নূতন থিয়েটরের দেয়ালের গায়ে লিখে দিচ্চি যে স্ত্রীলোক অভিনেত্রী বাদ দিয়ে তোমাদের এ থিয়েটর ১৭।১৮ দিনের বেশী চল্‌বে না।' তিনি যাহা বলিয়াছিলেন বাস্তবিক তাহাই ঘটিয়াছিল। কিন্তু এই নূতন ষ্টেজে আমরা নিছক পুরুষ মানুষ লইয়া পূর্ব্বের মত অবতীর্ণ হইলাম।

"সে রাত্রে আমাদের থিয়েটর-ভবন দর্শকবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। আমি সেদিন 'কাম্যকাননের' নায়করূপে অবতরণ করিয়াছি। ষ্টেজের উপরে ভীমা কালী-মূর্ত্তি! নৃমুণ্ডমালিনীর সর্ব্বাঙ্গে লাল আলোক-রশ্মি ঈষৎ কাঁপিতেছিল। সম্মুখে চিনির নৈবেদ্য জ্বলিয়া উঠিল। আমি জানু পাতিয়া করযোড়ে বলিতেছিলাম—'মা কি অগ্নিমূর্ত্তিতে আমার পূজা গ্রহণ করিলেন?'...অমনি চারিদিক হইতে আগুন! আগুন! ধ্বনি উত্থিত হইল; দুপ্ দাপ্ করিয়া দর্শকগণ লাফাইয়া পড়িতে লাগিলেন। Auditorium-এর দিকে চাহিয়া দেখি আমাদের কাঠের বাড়ীর সম্মুখের দেয়াল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। সেই লেলিহান অগ্নিশিখার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ষ্টেজের উপরে আমি চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলাম। মাথা ঘুরিয়া গেল। সহসা দেখিলাম—দুইহাতে সেই চঞ্চল লোকের ভিড় ঠেলিয়া ব্যায়ামবীর অখিল সেই অনলশিখার সম্মুখীন হইয়া ঘুসি ও লাথি মারিয়া মড়্ মড়্ করিয়া তক্তা ভাঙ্গিতেছে। আমার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। যে য়ুরোপিয় কন্‌ষ্টেবল্ দর্শকবৃন্দের রক্ষার জন্য সে রাত্রিতে তথায় উপস্থিত ছিল, অন্বেষণ করিয়া তাহার কোনও

সন্ধান পাওয়া গেল না। জনকতক বাঙ্গালী যুবক অখিলকে সাহায্য করিল। কাঠের বাড়ীর এক অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করা হইল।

"বাহিরে দর্শকবৃন্দ একত্র হইয়া মহা কোলাহল করিতে লাগিল। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিলেন, আমাদের শত্রুরা এই কাজ করিয়াছে। বাহিরের লোকেরা 'টিকিটের পয়সা ফিরিয়ে দাও' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। মনোমোহন বসু মহাশয় তাহাদিগকে ভাল কথায় বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন; তাঁহার কথা তাহারা উড়াইয়া দিল। অর্দ্ধেন্দু তাহাদিগকে একটা বক্তৃতা দিতে চেষ্টা করিয়া বিফলকাম হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তখন মিঃ উমেশচন্দ্র দত্ত ও ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে বলিলেন—'তুমি যা হয় একটা কিছু বল; ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা কর।' আমার তখন সেই hero-র বেশ পরা ছিল। ভদ্রলোকদিগের সম্মুখে জোড় হস্তে দাঁড়াইলাম। তাঁহারা চুপ করিলেন। আমি বলিলাম,—'আমার একটি নিবেদন আছে; অনুগ্রহ করিয়া শুনিবেন কি?' তাঁহারা বলিলেন,—'শুনিব।' আমি ষ্টেজের উপরে হাঁটু গাড়িয়া বসিলাম। বিনীতভাবে বলিলাম—'আপনারা আমাকে দুটা কথা বলিবার অনুমতি দিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন; তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতেছি। আজ আমাদের বড় সাধে আগুন লাগিয়াছে; আমাদের দুঃখের গভীরতা আপনারা হৃদয়ঙ্গম করিতে একটু চেষ্টা করিবেন কি? কত খরচপত্র সাধ্য-সাধনা করিয়া আমরা এই ষ্টেজ গড়িয়া-তুলিয়াছিলাম, কত উৎসাহে এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম, আপনাদিগকে তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব? আমাদের প্রতি শত্রুতাচরণ করিয়া কেহ এ কাণ্ড ঘটায় নাই। বেশ দেখা যাইতেছে যে দেয়ালের গায়ে গ্যাস-বাক্সে চিম্‌নি বসান হয় নাই; তাই উত্তাপের আধিক্য বশতঃ এই অগ্নিকাণ্ড হইয়া আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। আপনারা জানিবেন এমন শত্রুতা মানুষে করিতে পারে না। (চারিদিক হইতে 'না, না,' শব্দ ধ্বনিত হইল)। এখন টিকিট বিক্রয়লব্ধ পয়সা কেমন করিয়া ফিরাইয়া দেওয়া যায়? আপনারা সকলেই নিজ নিজ আসন পরিত্যাগ করিয়াছেন, অতএব আপনাদের নিকটে আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে একদিন আপনারা বিনা পয়সায় আমাদের অভিনয় দেখিতে পাইবেন।'......তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন। এখানে বলিয়া রাখা ভাল,—'কাম্যকানন' আর কখনও অভিনয় করিবার চেষ্টা করা হয় নাই। সে কাজ ভালই হইয়াছে।

"পরদিন,—১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারিতে—বেলভেডিয়ারে Fancy fair উপলক্ষে আমরা অভিনয় করিলাম[১]।"

[১] বেলভেডিয়ারে সখের বাজারে 'নীলদর্পণ' অভিনয় হয়।—সং

২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩

প্রবীণ নাট্যাচার্য্য * শ্রীযুক্ত রাধামাধব কর মহাশয়-বলিলেন—"আপনার 'পুরাতন প্রসঙ্গ' পাঠ করিয়া যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিতেছি। ১৮৭২ সালের শেষাশেষি কলিকাতায় পাব্লিক ষ্টেজের বনিয়াদ পত্তনের সঙ্গে ভুনি বোসের (শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর) স্মৃতি জড়িত হইয়া আছে, ইহা আমি বিশেষভাবে অবগত আছি। বাস্তবিকই তৎপূর্ব্বে ভুনিবাবু কোনও থিয়েটার দেখিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না। কিন্তু আমি ১৮৭২ সালের কিছু পূর্ব্বের কথা আপনাকে বলিতে পারি। আপনি ষ্টেজের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইতেছেন; বোধ হয় আমি আপনাকে দু' একটি নূতন কথা শুনাইতে পারি। রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের মালমসলা গত বিশ পঁচিশ বৎসরের মধ্যে দুই তিনটি ভদ্রলোক আমার নিকট হইতে লইয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; 'বিশ্বকোষ' অভিধানের লেখক তন্মধ্যে অন্যতম।"

'বিশ্বকোষে' রঙ্গালয়ের ইতিহাসের একটি বিশেষ ত্রুটির উল্লেখ করিয়া আমি বলিলাম, "আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আমি আপনার নিকট হইতে নূতন করিয়া সেই সকল মালমসলা সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করি। আপনার শৈশবের স্মৃতিকথা আরম্ভ করুন।"

তিনি বলিলেন—"১৮৫৩ সালের পৌষ মাসে সাঁতরাগাছিতে আমি জন্মগ্রহণ করি। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কর আমার চেয়ে এক বছর পাঁচ মাসের বড়। আমার বয়স যখন পাঁচ বৎসর তখন আমার পিতৃদেব (স্বর্গীয় ডাক্তার দুর্গাদাস কর) বরিশাল হইতে ঢাকায় বদলি হইয়া গেলেন।

"শৈশব হইতেই সঙ্গীতের দিকে আমার কেমন একটা সহজ প্রবণতা ছিল। আমার পিতৃবন্ধুগণের মধ্যে যদি কেহ আমাদের বৈঠকখানায় বসিয়া গান গাহিতেন, দুই তিনবার শুনিলেই আমি তাহার স্বর তান লয় আয়ত্ত করিয়া লইতাম। জীবনে আমি প্রথম গান শিখি এই ঢাকা সহরে। সেটি আমার এখনও বেশ মনে আছে:—

(স্বর—শঙ্কর আড়খেমটা)

নবীন নাগর রসের সাগর
ভুল্‌বে কেন আমায় দেখে।
তোমার মত নবীন নারী
হ'তেম যদি লো সুন্দরী,
নাগরের মন করে চুরি
কাল কাটাতাম মনের সুখে॥

* ভারত সঙ্গীতসমাজ হইতে একমাত্র শ্রীযুক্ত কর মহাশয়ই নাট্যাচার্য্য উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

"ঢাকায় আমাদের একটি মুসলমান পরিচারিকা ছিল, বাড়ীর ছোট ছেলে মেয়েদের লইয়া সে বাহিরে বেড়াইত। আমার বেশ মনে পড়ে আমাদের সেই মুসলমান দাই আমাকে একটু ছাড়িয়া দিয়া আপন মনে গান গাহিত—

শাহজাদে আলম তেরে লিয়ে
জঙ্গল সহর বিয়া বান ফিরে,
উত্তর দক্ষিণ পূরব পশ্চিম
দিল্লী সহর মুল্‌তান ফিরে।

"তাহার মুখে এই গানটি শুনিতে আমার বড় ভাল লাগিত; অতি অল্প আয়াসেই আমি উহা আয়ত্ত করিয়া লইলাম। তাহার সেই করুণ-কোমল কণ্ঠস্বর আজও যেন আমার কর্ণে বাজিতেছে।

"এই সময়ে ঢাকার সখের যাত্রার খুব ধুম। অধিকাংশ পালা কৃষ্ণ বিষয়ক। আমাদের বাড়ীতে একবার একদল সখের যাত্রাগান করে; আজও তাহার একটী গান আমার কিছু কিছু মনে আছে—

কাল নিদ্রা কেন অঙ্গে এলি।
তোর কি এত ধার, ছিল রে রাধার,
রাধার মূলাধার কোথায় লুকালি।

"দীনবন্ধু মিত্র তখন ঢাকায় ডাকঘরের ইন্‌স্পেক্টর, আমার পিতাঠাকুর ছিলেন সরকারী ডাক্তার; এ. সিম্পসন্ ছিলেন সিবিল সার্জ্জন; তারকনাথ ঘোষ ছিলেন সদরালা; ভোলানাথ পাল, ঢাকা কলেজের অন্যতম শিক্ষক। দীনবন্ধুবাবুর সঙ্গে বাবাব খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। ঢাকার একটি ছাপাখানায় 'নীলদর্পণ' মুদ্রিত হইতেছিল। প্রত্যহ রাত্রি ৯।১০ টার সময় দীনবন্ধুবাবু আমাদের বাসায় আসিতেন; বাবা তাঁহাকে লইয়া তাঁহার নিজের শয়ন ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া দুজনে নীলদর্পণের প্রুফ সংশোধন করিতেন। 'ভৈষজ্যরত্নাবলী' গ্রন্থ রচনা করিয়া বাবা বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন সত্য; কিন্তু আপনারা বোধ হয় জানেন না যে ১২৭০ বঙ্গাব্দে তাঁহার এক-খানি নাটক ঢাকায় মুদ্রিত হয়, উহার নাম 'স্বর্ণশৃঙ্খল নাটক'। প্রকাশকের বিজ্ঞাপনে জানা যায় যে উক্ত নাটকখানি ১২৬২ বঙ্গাব্দে বরিশালে রচিত ও অভিনীত হয়।

"শৈশবকালেই আমার লাফালাফি ঘোড়ায় চড়া বন্দুক ছোঁড়া ইত্যাদি দেখিয়া গুরুজন যে উদ্বিগ্ন হয়েন নাই এমন কথা বলিতে পারি না। লেখাপড়া আমার আদৌ ভাল লাগিত না। তাই গোড়াতেই আপনাকে বলিয়াছিলাম যে আমার মত অপণ্ডিত লোকের জীবন-কাহিনী শ্রবণ করিতে আপনার কৌতূহল কেন হইল বুঝিতে পারি না।

তবে আমার মনে হয় যে সেকালের সমাজের যে অংশে একটু আলোকরশ্মি ফেলিতে পারিব, বোধ হয় কোনও সুপণ্ডিত বিজ্ঞ বক্তা ঠিক তাহা করিতে পারিবেন না। যাহা হউক, আপনি যখন আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, আমি অকুণ্ঠিতভাবে বলিয়া যাইতেছি।

"১৮৬২ সালে বাবা, মেটিরিয়া মেডিকার অধ্যাপক রূপে ঢাকা হইতে কলিকাতায় বদলি হইয়া আসিলেন। আমি ট্রেণিং স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। বোধ হয় সে সময়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি ও যোগেন্দ্রনাথ মিত্র ঐ স্কুলে আমাদের চেয়ে এক ক্লাস উপরে পড়িতেন। স্কুলে পড়াশুনা যত হউক আর না হউক, বিদ্যালয়ের বাহিরে সঙ্গীতচর্চ্চা, বিশেষতঃ বাঁশী বাজান, খুব চলিতে লাগিল। বোধ হয় ১৮৬৫ সালে আমার প্রথম সখ চাপিল—ফ্লুট বাঁশী বাজাইতে হইবে। আমার পিতৃবন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র মহাশয় ফ্লুট বাজাইতেন; তাঁহার বাঁশী আমাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। আমার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া মিত্র মহাশয় আমাকে একটি বাঁশী দেন, এবং নিজে শিখাইয়া দেন কেমন করিয়া সা, রি, গা, ম, প, ধ, নি ফুঁ দিতে হয়। স্কুলে পকেটে করিয়া বাঁশী লইয়া যাইতাম। কয়েক বৎসর পরে আমি হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হই। পাথুরিয়াঘাটার বড় রাজার জামাই পুণ্ডরীকাক্ষ আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন; তাঁহার আর এক জামাই, চারু, উপরের ক্লাসে পড়িতেন। টিফিনের সময় পুণ্ডরীকাক্ষ, মহেন্দ্র গুপ্ত, এন্. সরকার প্রভৃতি আমার সতীর্থ বন্ধুগণ ও চারু মুখুয্যে আমাকে বাঁশী বাজাইতে বলিত। চারু আমাকে সঙ্গে করিয়া পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর-বাড়ীতে লইয়া গিয়া নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিলেন—'এই ছেলেটি আমাদের স্কুলে পড়ে; কেমন গাইতে বাজাতে পারে দেখবেন?' তিনি বলিলেন—'বটে? আচ্ছা একটি গান গাও ত?' আমি কোনও সঙ্কোচ না করিয়া গাহিলাম—

(সুর—কাফি যৎ)

চঞ্চল নয়ন তোর ওলো বেনে বৌ।
জলে যাবার বেলা,
পথে কিসের খেলা,
মা'কে বোলে দেব তোর।
আমার সঙ্গে যাবি,
যোড়া টাকা পাবি,
গয়না গাঁথায়ে দেব তোর॥

"নবীনবাবু আমার গান শুনিয়া প্রীত হইলেন। ঠাকুরবাড়ীতে তখন বাঁধা ষ্টেজ ছিল; থিয়েটর হইত। সেই দিন হইতে তাঁহাদের বাড়ীতে অভিনয় দর্শন করিবার জন্য কার্ড পাইতাম।

"কলিকাতায় আসিয়া আমার সমবয়স্ক বন্ধুগণের সহিত একত্র বসিয়া আমি কবিতা আবৃত্তি করিতে ভাল বাসিতাম। মেঘনাদ বধ, নীলদর্পণ, শর্ম্মিষ্ঠা নাটক, বুধেলা কাব্য, ভুবনমোহন চতুর্ধুরীণ্‌ রচিত 'ছন্দকুসুম' প্রভৃতি পাঠ করিয়া তাহাদের অধিকাংশ আমাদের মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কবিতা আমার বড় ভাল লাগিত। ১২৭১ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসের দেবীপক্ষে পঞ্চমীর দিন বেলা দশটা হইতে অপরাহ্ণ তিনটা পর্য্যন্ত যে ভীষণ ঝড় হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে সে সময়ে ছোট বড় অনেক কবিতা রচিত হইয়াছিল। ঈশান বাবুও লিখিলেন—

কি ঝাড়ন ঝেড়েছ বাবা একাত্তরের ঝড়ে,
চাল চুলো সব গেল উড়ে।
বাবা, ঝড়ের কি গুঁতো,
উড়ে গেল মুতো,
গরুগুলো হয়ে গেল বেঁড়ে॥

"ঝড়ের চোটে মুথা ঘাস, গরুর ল্যাজ খসিয়া যাওয়ার উল্লেখের পর আর কোনও কবি বাড়াবাড়ি করিয়া একাত্তরের ঝড় লইয়া উচ্ছ্বাসময়ী কবিতা রচনা করিতে সাহস করেন নাই।

"যখন শোভাবাজারের কুমার দেবীকৃষ্ণ বাহাদুরের বাড়ীতে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক অভিনীত হইতেছিল, আমরা স্যর রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রদৌহিত্র রাখালচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে শ্যামলাল মিত্র মহাশয়ের বৈঠকখানায় ইংরাজি নাটক Beauty and the Beast অভিনয় করিলাম। সীন্ নাই, পর্দ্দা টাঙ্গান হইল; তাহার উপরে উদ্যান, রাজবাটী ইত্যাদি শব্দ লিখিয়া Garden ও Palace বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। অনেক ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এই ইংরাজি অভিনয়ে যোগদান করিয়াছিলেন।

"এই সময়ে দাদা মহাশয়ের মুখে হিন্দী গান 'গোরি বদনপর'...ইত্যাদি শুনিয়া আমি সেই গানটি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিলাম—

গলায় পলার মালা
সোনা-মুখেতে তোর উল্কি।
দেখাইয়ে রূপের রাশি,
গলায় দিলি প্রেমের ফাঁসি,
বাজিকরের বাজির মত
লাগিয়ে দিয়ে ভেল্কি।

"তখন কলিকাতায় যাত্রাগানের খুব ধুম। সর্ব্বত্রই যাত্রার আদর ছিল। গোবিন্দ অধিকারীর দল, রাধাকৃষ্ণ বৈরাগীর দল, বদন অধিকারীর দল, মহেশ চক্রবর্ত্তীর দল, বৌ মাষ্টারের দল, ঝোড়োর দল, ব্রজ অধিকারীর দল, উমেশ মিত্রের দল (গোপাল উড়ের দল নামে প্রসিদ্ধ), মদন মাষ্টারের দল, লোকা ধোপার দল প্রভৃতি যাত্রার দল তখনকার বাঙ্গালী সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। গোবিন্দ অধিকারী রাত্রিশেষে আসরে নামিতেন ; তখন যাত্রা শুনিবার জন্য কর্ত্তারা আসিয়া বসিতেন। তৎপূর্ব্বে রাত্রি নয়টা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত ছেলে ভুলাইবার জন্য অনেক রকম সঙের ব্যবস্থা ছিল। গোবিন্দ অধিকারীর পোষাক জরি-বসান শালুর কাপড়ে প্রস্তুত ছিল। যাহারা স্ত্রীলোকের ভূমিকা লইত, তাহারা কলাপাতার গহনা পরিত। অধিকাংশ গানের পালা কৃষ্ণবিষয়ক। প্রধান বাদ্যযন্ত্র ছিল তানপুরা, খোল ও করতাল। যাত্রার 'কোরসের' ব্যাপারটায় খুব গোল হইত। কিন্তু প্রত্যেক দলই নাচ গানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। গোবিন্দ অধিকারী বৃদ্ধ বয়সেও স্ত্রীলোকের পোষাক পরিয়া বিন্দে দূতী সাজিয়া আসরে নামিতেন, অথচ কিছুমাত্র বেমানান বলিয়া মনে হইত না। অতি মধুর কীর্ত্তনাঙ্গে তিনি সকলকে মোহিত করিয়া দিতেন। মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে আসিয়া বিন্দে দূতী গান ধরিল—

শ্যামশুক নামে প্রিয় পাখী
এদেশে এসেছে উড়ে,
সাধের গোকুল আঁধার করে
রাধারে দিয়েছে ফাঁকি।
দেখেছ কেউ দেখার দেখা ?
পাখীর মাথায় পাখীর পাখা,
তা'তে রাধার নামটি লেখা,
বাঁকা ঠাম বাঁকা আঁখি।
বিধি যদি পাখা দিত,
পাখী হয়ে উড়ে যেতাম ;
যে বনে সে পাখী আছে
সেই বনে খুঁজিয়া নিতাম ;
পাখীর বরণ চিকণ কাল,
হেরব না আর কত কাল,
বৃন্দাবনে পাখী ছিল,
না হেরে তায় ঝুরে আঁখি।

এলাম পাখীর অন্বেষণে,
দেখা হলে বাঁচি প্রাণে,
জানে না সে রাই নাম বিনে,
রাই নামেতে সদা সুখী ॥*

"এই সঙ্গীতের তালে তালে এক পা, দুই পা, তিন পা অগ্রসর হইয়া, আবার এক পা, দুই পা পশ্চাতে হটিয়া বিন্দে দূতীর নৃত্য তাহার গানকে অধিকতর মধুর করিয়া দিত।

"বদন অধিকারী যখন গান ধরিত—

"রাই, মিছে গাঁথ মিনি সুতোর হার।
যার জন্যে গাঁথ হার,
সে করেছে পরিহার,
আর ত ব্রজে আসিবে না সে ব্রজবিহার—

"তখন দর্শক মণ্ডলী চঞ্চল হইয়া আহা, আহা, করিয়া রাইয়ের দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিত। নাচ গানের উপর যাত্রার দল খুব ঝোঁক দিত। ঝোড়োর দল 'কমলে কামিনী' পালার জন্য সর্ব্বত্রই বাহবা পাইত। ঝোড়ো নিজে চমৎকার নাচিতে ও গাইতে পারিত। বৌ মাষ্টারের দল 'ধ্রুবচরিত্র' পালা গাইয়া আপামর সাধারণের মনোরঞ্জন করিত। আমার মনে পড়ে দুই রাণীর নাচ;—তাহাদের অপরূপ নৃত্যভঙ্গী তখনকার কলাকুশলীর বিস্ময়োৎপাদন করিত। রাণী গান ধরিলেন,

রাজ-সিংহাসনে বসিতে বাসনা কোরো না।
জন্ম জন্মান্তরে পুণ্যপুঞ্জ কোরে,
জন্মাইতে পারো যদি মম উদরে,
তবু হয় কি না হয়,—
আমার উত্তম কুমার আছে জান না।

"আমি এত নিবিষ্ট চিত্তে সেই গান শুনিলাম যে তৎক্ষণাৎ সুর তান লয়-সুদ্ধ সেই গান আমার কণ্ঠস্থ হইয়া গেল।

"ঝোড়োর 'কমলে কামিনী'র গানগুলিও খুব মিষ্ট ছিল। ককুভ রাগিণীতে সে গাহিত—

* এই গানটির কয়েক চরণ রাধামাধববাবুর মুখস্থ ছিল। সম্পূর্ণ গানটি ৺মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রাজবাড়ীর ভূতপূর্ব্ব চিকিৎসক শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের নিকটে পাইয়াছি। আরও একটি সম্পূর্ণ গান তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি।—লেখক।

শুন নৃপমণি
না দেখি, না শুনি,
এমন কখনও রূপসী রমণী।
কালীদহ মাঝে,
সরোজে বিরাজে,
উগারিছে গজে গ্রাসিয়ে অমনি।

আবার ললিত রাগিণীতে সকলকে চঞ্চল করিয়া সে গান ধরিত—

এই যে ছিল কোথা গেল কমলদলবাসিনী।
লোক লাজ ভয়ে বুঝি লুকাল শশিবদনী।
কোথা গেল সেই করী,
কোথা গেল সে সুন্দরী,
এ মায়া বুঝিতে নারি,
হবে এ কা'র রমণী॥

"মহাশয়, যাত্রাগানের সে দিন এখন আর নাই। গানের সুরের সঙ্গে সঙ্গে পর্দ্দায় পর্দ্দায় যেন আমাদের মনশ্চক্ষুর সমক্ষে নব নব সৌন্দর্য্যের উন্মেষ হইত; আসরের প্রত্যেক ঝাড় লণ্ঠন যেন সেই শব্দের তরঙ্গে রণ্‌রণ্‌ করিয়া বাজিয়া উঠিত; নর্ত্তকের প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী যেন সেই ধ্বনিতরঙ্গে লীলায়িত হইয়া যাইত। সে বিচিত্র নৃত্যকলার অন্তেষ্টিক্রিয়া বোধ হয় আমাদের দেশে হইয়া গিয়াছে। প্রজ্বলিতদীপশীর্ষ পিত্তলের পিল্‌সুজ মাথায় লইয়া প্রকাণ্ড আসরের মাঝখানে নটবরের বিস্ময়কর নৃত্যলীলা আজকালকার বঙ্গ সমাজে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ফুলের ডালি হাতে লইয়া বিদ্যাসুন্দরের মালিনীর চৌতালে নাচ আবালবৃদ্ধবনিতার চমক লাগাইয়া দিত। আবার মহেশ চক্রবর্ত্তীর দলের 'দক্ষযজ্ঞ' অভিনয়ে যজ্ঞস্থলে সতীকে না দেখিতে পাইয়া ভৃগুমনির স্ত্রী গান গাহিল—

কই গো প্রসূতি, তোমার সতী ভবনে।
এ যজ্ঞ হবে না পূর্ণ সে কন্যা বিনে।
জাননা তনয়া গুণ, আমি জানি বিশেষ গুণ,
ত্রিগুণে ত্রিতাপহরা তাপিত জনে॥

"তাঁহার গানের রেশ পর্য্যন্ত যখন মিলইয়া গেল, সহসা নৃত্যকুশলা নাপ্‌তিনী আসরে অবতীর্ণ হইয়া পুঁটুলিটি হাতে লইয়া তাহার বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীর লীলাতরঙ্গে দর্শকমণ্ডলীকে মোহিত করিয়া গান ধরিত—'আল্‌তা পরাব মার রাঙ্গা চরণে।'

পুরবাসিনীর ভূমিকায় বেশবিন্যাস করিয়া সুসজ্জিত নট তাহার ঘনবিন্যস্ত কেশের উপরে স্থাপিত তিনটী কলস লইয়া যে অদ্ভুত poetry of motion-এর সৃষ্টি করিত, তাহা আপনারা কল্পনা করিতেও পারিবেন না। নাচ গানের সে দিন এখন আর নাই। এখন আপনারা কথায় কথায় আর্ট লইয়া আলোচনা করেন, কিন্তু আজকাল দেখিতেছি, আপনারা—কায়মনোবাক্যে কিনা বলিতে পারি না—অন্ততঃ বাক্যে, অত্যন্ত puritan ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন ;—কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ সরমে সঙ্কোচে আপনাদের নাসিকা কুঞ্চিত হইয়া উঠে। যে সঙ্গীতের আসরে ভদ্রসমাজে পিতা-পুত্র একত্র বসিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিত না; পর্দ্দার আড়ালে মাতা স্ত্রী কন্যার অধিষ্ঠান কাহারও কিছুমাত্র উদ্বেগের কারণ হইত না; সে সঙ্গীত আপনারা বোধ হয় আজকাল আপনাদের মোটা purist মাপকাটীতে পরিমাপ করিয়া প্যুরিটান দরজির দোকান হইতে কাটিয়া ছাঁটিয়া ভদ্রসমাজের উপযোগী করিয়া বাহির না করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন না। আপনারা বোধ হয় ভুলিয়া যান্ যে, তখনও আমাদের সমাজে পূতচরিত্র পুণ্যশ্লোক নরনারীর অভাব ছিল না; কিন্তু তখনকার সেই সঙ্গীত-কলার আদর করিলে কোনও নরনারীর মনে কোনও প্রকার মলিনতা যে আসিতে পারে, ইহা তাঁহারা কল্পনাই করিতে পারিতেন না। পৌরাণিক ঘটনাবিশেষ তখনকার দিনে যাত্রাগানের বিষয়ীভূত হইত। যাত্রার আসরে অথবা কবির লড়াইয়ে সেই ঘটনাটিকে ফুটাইয়া তোলা হইত মাত্র। এখন এমনটি দাঁড়াইয়াছে যে, অসঙ্কোচে কবির লড়াই লইয়া আলোচনা করা শক্ত। কিন্তু তখন ভদ্রসমাজে কাহারও মনে কোনও খটকা লাগিত না। সত্যবতী অম্বালিকাকে যখন বংশরক্ষার জন্য ব্যাসদেবের নিকট যাইতে পীড়াপীড়ি করিতেন, তখন কোনও ভদ্রসন্তানই সভা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন না; বরং সকলেই অম্বালিকার উত্তর শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিতেন। সত্যবতীর কথার পর ঢুলী উঠিয়া ঢোল বাজাইতে আরম্ভ করিল; সেই অবসরে অম্বালিকা তাহার উত্তর রচনা করিয়া লইল। কিছুক্ষণ পরে ঢুলী থামিলে অম্বালিকা দাঁড়াইয়া গান ধরিল—

আমার ঘট্‌ল আজ এ কি জ্বালা,
ঠাকরুণ গো,
ভেবে মরি করব কি উপায়।
ছিল ঠেক্‌রো সিংহি ধীবর রাজা,
জানি তা'র ফরাসডাঙ্গায় ধাম,
তা'র জ্যেষ্ঠা কন্যা মান্যা তুমি
সত্যবতী মৎস্যগন্ধা-নাম।

কাশীরাজার কন্যা মোরা সামান্যা কেউ নই,
তোমার পুত্রবধূ হই।
চিত্রসেন পতি ছিল,
সে আমারে ছেড়ে গেল গো,
সেই পতির শোকে মনোদুঃখে
মর্ম্মে মরে রই।
ক'রে ধর্ম্মে ধর্ম্মে ধর্ম্মরক্ষা
প্রাণ রেখে সেই পতির পায়॥
তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র যিনি,
ঐ ছ্যাখ ব্যাসমুনি বড ঠাকুর যিনি,
দেখে তায় মরি লাজেতে,
তিনি কোন সাহসে ঢুকলেন এসে আমাব ঘবেতে।
সে যে মস্ত দেড়ে, দাড়ী নেড়ে, অন্দবে ঢুকে,
গিয়ে বস্‌ল তাল ঠুকে।
আমি তা' দেখতে পেয়ে,
চলে যাই ঘোমটা দিয়ে গো,
সে যে পথ আগুলে
দাঁড়ায় সম্মুখে;
করে আঁচল ধরে টানাটানি আঁচল ছাড়ে না।
তোমার কথার ভাবে বোঝা গেছে,
এ ঘটন তুমি ঘটিয়েছ,
এমন রাজ্যরক্ষের বংশরক্ষের দায়,
বল কি ফল হবে তায়,
ছি ছি লজ্জায় মরে যাই,
আমরা সতীর মেয়ে সাধ্যা সতী পতিব্রতা হই,
বরং আত্মঘাতী হ'তে পারি এমন কর্ম্মে দিই না সায়॥

"সত্যবতী অনেক নজির দেখাইলেন। অম্বালিকা সোজা উত্তর দিলেন—
যদি করতে হয় ত আপনি কর, ঠাকৃরুণ,
ও কথা আমায় ব'ল না।
অমন সন্ত ছেলে বিইয়ে দিতে
অন্য কেউ ত পারবে না।

বাল্যকালে নদীর তীরে বাইতিস তরণী,
কথা লোকমুখে শুনি,—
দেখে তোর রূপের ডালি, অস্ফুট' কমল কলি'
তা'তে হুল বসায়ে স্থূল বাঁধালেন পরাশর মুনি।
তুমি একবার ক'রে পার পেয়েছ নাইক কিছু ভয়,
এখন যত ইচ্ছে তত কর কেউ ত কিছু বল্‌বে না।
যদি কর্‌তে হয় ত আপনি কর, ঠাক্‌রুণ,
ও কথা আমায় ব'ল না॥

"তখনকার ভদ্র সমাজের আসরে পুরাণের এই শাশুড়ী-বধূর কথাকাটাকাটি, আজকাল একেবারেই অচল হইয়া পড়িয়াছে। কবির লড়াইয়ের একটি খাঁটি নমুনা পর্য্যন্তও আজকাল আপনাদের বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডার হইতে অন্বেষণ করিয়া বাহির করিতে পারিবেন কি না, সন্দেহ। তাই আজ তখনকার কবির লড়াইয়ের নিদর্শণ স্বরূপ এই পৌরাণিক শ্বশ্রূ-বধূর কথাকাটাকাটি আপনাকে লিপিবদ্ধ করিতে বলিতেছি।

"কবি আবার অনেক সময়ে ধনী গৃহস্থকে মুখের উপরে কড়া কথা শুনাইয়া দিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেন না। গৃহস্থও নিজের ত্রুটি স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কলিকাতায় একটি বড়লোকের বাড়ীতে ঈশ্বর গুপ্ত একবার আহূত হইয়াছিলেন। তাহাকে একটি খেলো হুঁকায় তামাক দেওয়া হইয়াছিল; সে হুঁকা আবার সছিদ্র। কবির দল গুপ্ত মহাশয়কে বলিল—'এইবার আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে আমরা গান আরম্ভ করি।' কবি বলিলেন—দাঁড়াও; এই গানটা আগে গাও ত,—

নাইক আর তেলের কেঁড়ে,
এখন বেড়ে তেতালা।
পেয়ে রাম গোপালের গোপালগাদন
বেড়েছে খুব বোলবোলা॥
এরা ছিল নড়ী, বেচ্‌ত চুড়ী,
হিঁদুর বাড়ী যেত না।
এখন বাড়্‌ছে rank পাচ্চে thank,
ট্যাঁকে ব্যাঙ্ক-নোট ধরে না।
কবির হাতে খেলো হুঁকো,
বাবুর সাম্‌নে আল্‌বোলা॥

"গান শুনিয়া বাবু নিজে উঠিয়া আসিয়া গুপ্ত কবিকে তামাকের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাঁহাকে নিজের পাশে বসাইলেন।

"আর একজন ধনীকে লক্ষ্য করিয়া যাদব কবি সভার মাঝে গান ধরিলেন,—

গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল
এয়ি গাড়ুর গুম।
ছি, ছি, লজ্জাসরম নাইক সেটার
আস্ত হুথুম থুম্।
কিবা রংটি চমৎকার,
হুঁকোর নল্‌চে বা কোন ছার,
আবলুশ আল্‌কাৎরা হেথা কল্‌কে পাওয়া ভার।
দেখে কোলের ছেলে আঁৎকে ওঠে
ছট্‌কে ছুটে পালায় ঘুম।

"বাঙ্গালী কবির এই তীব্র সমালোচনার কাছে অসংযত হিন্দুগৃহস্থকে নতমস্তক হইতে হইত।

"কবির লড়াইয়ের কথা বলিতে বসিয়া তর্‌জায় প্রশ্নোত্তর মনে পড়িতেছে। প্রশ্ন হইল,—শ্রীকৃষ্ণর বুকেতে ভৃগুপদচিহ্ন আছে, শ্রীরাধার বুকেতে কি আছে?—তৎক্ষণাৎ অপর দল হইতে উত্তর হইল,—নবনারীকুঞ্জর যখন হয়, শ্রীরাধা সেই নবনারীকুঞ্জরের মেরুদণ্ডরূপে বিলম্বিতা হইয়াছিলেন; সেই কুঞ্জরপৃষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ আরোহন করিলে, তাঁহারই পদচিহ্ন শ্রীরাধার বক্ষে অঙ্কিত হইয়া যায়। তাই, শ্রীকৃষ্ণ যেমন ভৃগুপদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিতেছেন, শ্রীরাধাও তেম্নি শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্ন নিজ বক্ষে ধারণ করিতেছেন।

"এমনই করিয়া পৌরাণিক প্রসঙ্গ লইয়া তখন বাঙ্গালী ভদ্রসমাজ যাত্রাগানের, কবির লড়াইয়ের, তরজায় প্রশ্নোত্তরের ভিতর দিয়া প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিত।

"শুধু যে বিশিষ্ট ভদ্রলোকরাই এ আনন্দ উপভোগ করিতেন, তাহা নহে। যে গৃহস্থের প্রাঙ্গণে যাত্রাগান, কবির লড়াই প্রভৃতি হইত, তাহার গৃহে সেদিন সকলের অবারিতদ্বার; দ্বারে টিকিট দেখাইতে না পারিলে এই সামাজিক আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে, এমন কল্পনা তখন কাহারও মনে উদিত হয় নাই। এখন আমাদের কি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে দেখুন। আপনি নিমন্ত্রণ পাইলেন, তথাপি আপনার আমন্ত্রণকারীর গৃহে যথাসময়ে প্রবেশলাভ করা দুর্ঘট; সেখানে গিয়া এক-খানি টিকিট দেখাইতে হইবে! তখন হিন্দু গৃহস্থের ক্রিয়াকর্ম্মে আপামর সাধারণ সকলেই নির্ব্বিচারে আনন্দে যোগদান করিতে পারিত।

"তবে, আনন্দ সব সময়ে অনাবিল ছিল না। শতাধিক ইয়ার-পরিবেষ্টিত হইয়া বাগ্‌বাজারের শিবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রূপচাঁদ পক্ষীর দলের নেতৃত্ব করিয়া

তাহাদের সমস্ত সংসারিক ব্যয়ভার নিজের স্কন্ধে লইয়া তাহাদিগকে বিচিত্র পক্ষিকা-আর্টিষ্টে পরিণত করিয়াছিলেন। সেই নীরব পক্ষিকাসেবকদিগের আসরে একদিন এক ভিখারিণী আসিয়া কিঞ্চিৎ ভিক্ষা চাহিলে পক্ষিরাজের চমক ভাঙ্গিল। তিনি অমনি গান ধরিলেন—

"উঃ, মাগীর ঠ্যাং দুটো কিবা লম্বা রে,
ঠোঁট দুটো পাকা রম্ভা ;—
পেচক জিনিয়া সুমধুর ধ্বনি,
কোকিল পোড়ায়ে খেয়েছ লো ধনি,
পেটেতে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী
করিতেছে হাম্বা হাম্বা রে।
পক্ষরাজ বলে, আর ভাবিলে হবে কি,
মানব আকৃতি এক বয়ার পেয়েছি,
এরে নাও মা জগদম্বা ॥

"বোধ হয় আপনি ভুলিয়া যান নাই যে, যে সময়ের কথা আমি বলিতেছি, তখন আমি বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। আমার মত সুশীল বালককে ছাত্ররূপে পাইবার ভাগ্য বোধ হয় আপনার কখনও হয় নাই। হেয়ার স্কুলে পড়িবার সময় ইস্কুলে ইস্কুলে দাঙ্গা হইত। সে রকম মারামারি প্রায় প্রতি শনিবারে ও বড় বড় ছুটির পূর্ব্বে হইত। জেনারল্ আসেম্ব্লির ছেলেদের সঙ্গে হেয়ার, হিন্দুর ছেলেদের দাঙ্গাটাই বেশী হইত। আমি একটি দলপতি ছিলাম ; খবর পাইলেই আমার কুস্তিগির পালোয়ান বন্ধুগণ আসিয়া পড়িত ;—অখিলচন্দ্র, বসন্ত বর্ম্মণ, প্রসন্ন গাঙ্গুলী, ভুবন ছুতোর, কড়ি ভট্টাচার্য্য, উমেশ দে, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যো, ভুবন মিত্র, বিনোদ হাল্দার ;—ইহাদিগকে re-inforce করিবার জন্য জাহাজ হইতে গোরা খালাসী ভাড়া করিয়া আনা হইত। তাহারা Fighting Charlies নামে পরিচিত ছিল ; কোমরে দড়ি বাঁধা, হাতে boomerang-এর মত অস্ত্র। হেয়ার স্কুলের সম্মুখের নর্দ্দামার কাছে বেলা সাড়ে দশটার সময় দুইজন ইংরাজ প্রহৃত হইয়া চলিয়া গেল। বেলা এগারটার সময় ইন্‌স্পেক্টর কেঙ্ক সাহেব তিন চারি শত কন্‌ষ্টেবল্ লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। এবার ছেলেদের সঙ্গে পুলিসের ভীষণ মারামারি হইল। কতক্ষণ লড়াই হইল বলিতে পারি না ; অবশেষে ছেলেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। আমি শ্যাম বিশ্বাসের বাড়ীতে পলাইয়া গেলাম। ইন্‌স্পেক্টর সাহেব জোর করিয়া স্কুলের দরজা খুলিয়া ফেলিলেন। হেডমাষ্টার গিরীশচন্দ্র দে ও দ্বিতীয় শিক্ষক নীলমণি চক্রবর্ত্তী তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। কোনও বাধা না মানিয়া পুলিশ ত্রিশ-চল্লিশ জন বালককে ধরিয়া

লইয়া গেল। হেড মাষ্টার মহাশয় ছেলেদের জন্য জামিন হইতে গিয়া কলুটোলার থানায় আসামী বলিয়া গ্রেপ্তার হইলেন। শ্যাম বিশ্বাসের বাড়ীতে একটা প্রকাণ্ড সভা হইল; বিদ্যাসাগর মহাশয় ও পাথুরিয়াঘাটার বড় রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সে সভার কিংকর্তব্য স্থির করিলেন। তাঁহারা জামিন হইয়া ছেলেদের মুক্তি দেওয়াইলেন। হেড মাষ্টার মহাশয়ও খালাস পাইলেন। পরিণামে পুলিসেরই অপযশ হইল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মাবকাশের পূর্ব্বে এই ঘটনা হইয়াছিল।

"হেয়ার স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়াই আমি হিন্দু স্কুলে চলিয়া গেলাম। তখন ভোলানাথবাবু স্কুলের হেড মাষ্টার। আমার মত কয়েকটি ছাত্রের সৌজন্যাতিশয্যে ব্যথিত হইয়া তিনি আমার বাবাকে বলিলেন—'আপনার ছেলেটিকে আমার ইস্কুল থেকে সরিয়ে নিন, নইলে আমার ইস্কুল যায়।'

"হিন্দু স্কুল হইতে ভফ সাহেবের স্কুলে চলিয়া গেলাম। যথাসময়ে এণ্ট্রান্সের ফী জমা দিবার জন্য টাকা লইয়া, ভাল দেখিয়া একটি বাঁশী কিনিয়া ফেলিলাম। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের পালা শেষ হইল।

"এমনই করিয়া বাবাকে ফাঁকি দিয়া চলিতে চলিতে, একদিন পিতৃহস্তে বিষম লাঞ্ছিত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়া একেবারে বিলাত পলাইবার ব্যবস্থা করিলাম। বন্ধুগণের ও দাদার সহিত গোপনে পরামর্শ করিলাম। মাতাঠাকুরাণীর চোখে ধূলা দিয়া, বাবার লোহার সিন্ধুক হইতে পাঁচ হাজার টাকার নোটের তাড়া বাহির করিয়া লইয়া হাওড়ায় ট্রেণে উঠিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিলে গান ধরিলাম—

সে কি আমার অযতনের ধন।
মনপ্রাণ সুশীতল করে যেই জন॥
তবে যে অপ্রিয় বলি,
নিতান্ত জ্বালাতে জ্বলি,
নতুবা তার ও সকলি প্রেমেরই কারণ॥

"আহার নিদ্রা ভুলিয়া সমস্ত রাত্রি গান করিলাম। জামালপুর ষ্টেশনে গাড়ি থামিলে, ষ্টেশন-মাষ্টার, গার্ড ও পাহারাওয়ালা প্রত্যেক কামরা অন্বেষণ করিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিলেন। আমার আর বিলাত যাওয়া হইল না।"

বার

৩রা মাঘ, ১৩২৩

শ্রীযুক্ত রাধামাধব কর মহাশয় বলিলেন—"আমার পড়াশুনা শেষ হইয়া গেল; আমিও বাঁচিলাম; বই ফেলিয়া বাঁশী ধরিলাম। বাল্যকাল হইতে আমাদের দেশীয় সঙ্গীতের আবহাওয়ায় আমার গুরুজনদিগের চক্ষুর অন্তরালে আমি ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিলাম; সরস্বতীর কমলবনে আমার সতীর্থ-বন্ধুগণের কলকোলাহলে আমার কণ্ঠ মিলাইতে না পারিয়া দেবী বীণাপাণির বীণাটির উপর মুগ্ধনেত্রে নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়াছিলাম। যখন আমার বুলি ফুটিল, সঙ্গীতের আনন্দে মাতিয়া উঠিলাম; আমি বুঝিতে পারিলাম যে সে আনন্দ কেবলমাত্র আমারই হৃদয়ের আনন্দ; আমার সতীর্থ-বন্ধুগণের মধ্যে তখন এমন কাহাকেও পাইলাম না যিনি আমার বুলি শুনিতে চাহেন; মধ্যে অনেকেই সরস্বতীর বরপুত্র হইয়া আমার নিকট হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছিলেন। আমার নূতন সঙ্গী, নূতন শ্রোতৃমণ্ডলী লাভ হইল। বাঁশী আমার প্রেয়সী হইল। আমাব যত কিছু মান অভিমান সেই বাঁশীটিকে লইয়া। মহাশয়, বাল্যকালে আমি একখানি বই পড়িয়াছিলাম, তাহার নাম—'বনিতা মরণ, খেদেব কারণ'। সেই কবিতা পুস্তকের কয়েক চরণ মনে মনে আবৃত্তি করিয়া আমার এই মান-অভিমানের পালার সহিত মিলাইয়া লইতাম;—

আর এক দিন ছলে বলিলাম তারে।
প্রেয়সি, তুমি ত ভালবাস না আমারে॥
উত্তর করিল ধনি মৃদু মৃদু হাসি।
তুমি মনে জান ভালবাসি কি না বাসি॥
ভালবাসি মুখে মাত্র বলিলে কি হবে।
ভালবাসি কি না বাসি কাযে বুঝে লবে॥

—আমার বাঁশী আমাকে কাযে বুঝাইয়া দিত সে আমাকে কত ভালবাসে।

"সে কথা যাক্। আমাদের দেশীয় সঙ্গীতের আবহাওযার কথা বলিতেছিলাম। বিদেশী সঙ্গীত যে কি রকম তাহা কি তখন জানিতাম? শ্যামপুকুরে, সিম্‌লায়, যোড়াসাঁকোয়, কালীঘাটে, বেনেটোলায় যে ভিন্ন ভিন্ন পাঁচালীর দল গান করিত, সঙ্গীতরসজ্ঞ এমন কোনও ব্যক্তি তখন ছিলেন না, যিনি তাহাতে প্রচুর আনন্দ না পাইতেন। শুধু দাশুরায়ের পাঁচালীর কথা বলিতেছি না; তাঁহার কবিত্ব ও ভাব-সম্পদ বঙ্গসাহিত্যে অতুল। স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র ঘোষ বলিতেন—যদি কবি হইতে

চাও, তবে বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চারিজন কবির লেখা ভাল করিয়া পড়,—কাশীদাস, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র ও দাশুরায়।' আমাদের বাল্যকালে কলিকাতার পাড়ায় পাড়ায় অনেক ছোট বড় পাঁচালীর কবি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ; শ্যামপুকুরের কেদারনাথ বসু তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার একটি গান আমার বেশ মনে পড়ে,—

কা'র ওপরে খেদ কর লো
ওলো বিনোদিনী,
মিছে ভাবনা ভেব না ভেব না,
এ জ্বালা রবে না
দিবা রজনী।
প্রেমভঙ্গ হয়েছে,
গিয়েছে,
সে আশার বাসা ভেঙ্গেছে,
সে গতশোচনা ধনি,
কেন কর লো মিছে।
থাক' স'য়ে সই,
রসময়ী
তোমায় কই
এতে অশান্ত হ'য়ো না লো ধনি।

বিনোদিনী গাহিলেন—

চতুরঙ্গে দুখে জ্বলে জীবন।
কখন হবে সখি, তা'র সঙ্গে
সুখ সাধ মিলন।
প্রাণ গেল, নাহি হ'ল আলাপন,
এ কি জ্বালাতন,
আর সহিব বল কত,
নাহিক বুঝি মরণ।

"বাগ্‌বাজারের মোহনচাঁদ বসুর রচিত পাঁচালির বিনোদিনী ললিত বিভাস রাগিনীতে গান ধরিত—

বল, কোন্ কামিনীর সহবাসে যামিনী পোহালে।
সারা নিশি সুখে ত ছিলে ?

অরুণ নয়ন, অর্দ্ধনিমীলন,
পীযূষপানেতে যেন
পরিতেছ ঢলে ঢলে টলে।
না জানি কেমন মেয়ে,
তা'র কেমন পাষাণ হিয়ে,
পরেরই পরাণ পেয়ে
নিশি জাগালে।
নব অনুরাগে
সারা নিশি জেগে,
অলস অবশ অঙ্গ
পড়িতেছে ঢলে ঢলে টলে॥

"এই রাধাকৃষ্ণলীলায় আমাদের দেশীয় সঙ্গীত ওতপ্রোত হইয়াছিল। ছাতুবাবুর (৺আশুতোষ দেব) বাড়ীতে পাথুরিয়াঘাটার বড় রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই গানটি শুনিয়া আসিলেন—

কি কর কি কর, শ্যাম নটবর, যাই সর নিজ কাজে।
অবলার প্রতি, এ কেমন রীতি, পাইয়ে পথেরই মাঝে।
আমরা ব্রজের গোপ ললনা,
তুমি তা'কি শ্যাম জেনেও জাননা,
সর না, সর না, ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা,
মরি হরি মোরা লাজে।
ওহে কালা চতুর ত্রিভঙ্গ,
কখনও করনি রমণীসঙ্গ,
সর না, সর না, লাগে অঙ্গে অঙ্গ,
হেন কি তোমারে সাজে।

"রাজবাটীতে ফিরিয়া আসিয়া বড় রাজা ইহার পাল্টা জবাব রচনা করিলেন,—

কেমনে বা সরি, বল না কিশোরী,
পড়েছি রূপেরই ফাঁদে,
এ পথে আসিয়ে, তোমারে হেরিয়ে,
পড়েছি লো পরমাদে।
কি করি এখন করিতে গমন, চরণে চরণ বাধে॥

অতি খরতর নয়নেরি শর,
তাহে শরীর করে জরজর,
এবে যে বলিছ—সর সর সর,
কি জানি কি অপরাধে।
করি নে বটে রমণী সঙ্গ, তুমি সে স্বভাব করিলে ভঙ্গ,
এবে মানা কর ছুঁইতে অঙ্গ, এ রীতি কি রীতি রাধে ?

"এখন বোধ হয় আপনি বুঝিতে পারিতেছেন, এই খাটি বাঙ্গালা সঙ্গীতের আব্‌হাওয়া কোন্ দিক হইতে বহিতেছিল। শুধু বসন্তের অথবা বর্ষার সঙ্গীত নহে, শুধু প্রভাত-সঙ্গীত অথবা সন্ধ্যা-সঙ্গীত নহে, শুধু কৈশোর-সঙ্গীত অথবা যৌবন-সঙ্গীত নহে ;—অনাদিকাল হইতে এই করুণ অথচ মধুর ধ্বনিতরঙ্গ বিশ্ব-সঙ্গীতের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের চারিদিকের আকাশ ও বাতাসের মধ্য দিয়া আমাদের সর্ব্বাঙ্গের স্নায়ুতরঙ্গে হিল্লোলিত হইয়া বাঙ্গালী-জীবনের সমস্ত অপূর্ণতাকে কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। বৈষ্ণব-শক্তি সৌর-গাণপত্য নির্ব্বিশেষে বাঙ্গালী বালক বালিকা, নবীনা প্রৌঢ়া, স্থবির যুবক, অধিকারী অনধিকারী নির্ব্বিশেষে সকলেই এই শান্ত-দাস্য-সখ্য-মধুর-রসামৃত আকণ্ঠ পান করিত। রুচিবিকারের অবসর ছিল না। এই সমস্ত সাধারণ বাঙ্গালী গৃহস্থ নরনারী যে নির্ব্বিকার ছিল, এমন কথা আমি বলিতেছি না ; কিন্তু তাহাদের আর যাহাই থাকুক, রুচিবিকার ছিল না ; রাধাকৃষ্ণ লীলামৃত পানে তাহাদের কখনও অরুচিও হইত না।

"যাক্, ও সকল বিষয় আপনারা অবসর মত আলোচনা করিয়া দেখিবেন। আপনাকে পাইয়া আমি আজ এত কথা বলিতেছি, তাহার কারণ আমার যাহা কিছু বলিবার আছে, তাহা নিঃশেষ করিয়া শীঘ্রই কলিকাতা পরিত্যাগ করিবার বাসনা করিয়াছি। কাশীবাস করিব স্থির করিয়াছি। আমার অতীত-স্মৃতির ভস্মস্তূপ হইতে সরিয়া যাইবার পূর্ব্বে আপনি আপনার কলমের খোঁচা দিয়া কেন সেই ছাই উড়াইতে চেষ্টা করিলেন ? অমৃতবাবুর প্রসঙ্গে আমার কথা কেন পাড়িয়াছিলেন ? কথায় আছে বটে

যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়ে দেখ তাই,
পেলেও পেতেও পার লুকান রতন,—

কিন্তু যদি রতন না মেলে ?

"১৮৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় সখের থিয়েটারের খুব ধুম পড়িয়া গেল। শিবপুরে বাঁধা ষ্টেজে 'রামাভিষেক' নাটক অভিনীত হইল। বাগ্‌বাজারে

'নলদময়ন্তী'[১] ; বউবাজারে 'সাবিত্রী সত্যবান'[২] নাটক লইয়া আরম্ভ করিয়া মনোমোহনবাবুর 'হরিশ্চন্দ্র'[৩] ও 'প্রণয় পরীক্ষা' নাটকের অভিনয় করা হইয়াছিল। আরপুলি লেনে যাত্রা ও থিয়েটর মিশ্রিত করিয়া এক রকম দাঁড় করান হইল। ঝামাপুকুরের দল 'প্রণয়-পরীক্ষা' নাটকের অভিনয়ে সুখ্যাতি লাভ করিল। কাঁসারিপাড়ায় বাঁধা ষ্টেজ ছিল ; সে দল 'শকুন্তলা'[৪] ও 'বুড়া শালিকের ঘাড়ে রোঁ' লইয়া দর্শকের মনোরঞ্জন করিল। কিন্তু যিনি 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র কর্ত্তা সাজিলেন তিনি এমন একটি কেলেঙ্কারি করিয়া বসিলেন যে, ভবিষ্যতে আর কোনও ষ্টেজে তিনি পদার্পণ করিতে সাহস করেন নাই। মদের ঝোঁকে তিনি নিজের বক্তব্য ভুলিয়া গিয়া ঈষৎ বিকৃতস্বরে ডাকিলেন—'গদা !' টডের রাজস্থানের সম্পাদক ও অমৃতবাজার পত্রিকার সহকারী সম্পাদক গোপাল মজুমদার গদা সাজিয়াছিলেন। কর্ত্তা ডাকিলেন—'গদা !' উত্তর হইল—'আজ্ঞে।' 'একটা খড়কে নিয়ে আয় !' ইহার জন্য গদা একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু কি করিবে ; তৎক্ষণাৎ দর্শ্মার বেড়া হইতে একটা কাঠি ভাঙ্গিয়া কর্ত্তার হাতে দিয়া বলিলেন—'আজ্ঞে, এই নিন।' কর্ত্তা টলিতে টলিতে আলোর কাছে আসিয়া কাটিটা নাড়িয়া চাড়িয়া বলিলেন —'অ্যাঁ, এই তোর খড়কে কাটি !'—এই বলিয়া পুরাকালে ভূতপ্রেতগণ যে শারীরিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করিয়াছিল, কর্ত্তা আজ তাহার পুনরাভিনয় করিয়া বুড়ো শালিকের দফা রফা করিলেন। দর্শকগণ মার মার করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল ; কর্ত্তা খড়ম ফেলিয়া ষ্টেজের তলায় লুকাইলেন। গোপাল মজুমদার ওরফে গদা-গোপাল ভবিষ্যতে অভিনয়-কার্য্যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কাঁসারিপাড়ার দল এ ধাক্কা সামলাইতে বিশেষ বেগ পাইয়াছিল। ভবানীপুরের দল বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস'[৫] নাটকাকারে পরিণত করিয়া বিদ্যাসাগরের ভাষা যথাসম্ভব রক্ষা করিয়া আসর জমাইতে চেষ্টা করিল। আহিরীটোলায় জনায়ের পূর্ণ মুখুয্যের বাড়ীর বাঁধা ষ্টেজে 'নবীন তপস্বিনী'র অভিনয় হইল। শুঁড়ী পাড়ায় জনার্দ্দন সা'র বাড়ীর বাঁধা ষ্টেজে 'পদ্মাবতী' নাটক বেশ উৎরাইয়া গেল। যে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভবিষ্যতে ন্যাশনাল থিয়েটর প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন, তিনি এই নাটকে অভিনেতৃরূপে প্রথম আসরে নামিলেন। যোড়াসাঁকোর শ্যাম মল্লিকের বাড়ীতে নীচের হলে বাঁধা ষ্টেজ ছিল ; সেখানে হরিমোহন কর্ম্মকার বিরচিত প্রথম বাঙ্গালা অপেরা অভিনীত হয়। এইখানে বলিয়া রাখি যে, ন্যাশনাল থিয়েটরের পূর্ব্বে আর কোনও বাঁধা ষ্টেজে অপেরা হয় নাই। কোন্নগরে 'নবীন

[১] ১৮৬৪ ; [২] ১৬ই নভেম্বর, ১৮৬৫ ; [৩] জানুয়ারি, ১৮৭৫ ; [৪] জুলাই, ১৮৬৭।—সং

[৫] ১৮৬৬ সনের জুন মাসে ভবানীপুরে নীলমণি মিত্রের বাড়ীতে উমেশচন্দ্র মিত্র প্রণীত 'সীতার বনবাস' নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। (বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস)—সং

তপস্বিনী' প্লে করা হইল। আগড়পাড়ায় 'কাদম্বরী' অভিনীত হইল। এইখানে এই সমস্ত থিয়েটরের গান রচনা সম্বন্ধে আপনাকে একটা কথা বলিয়া রাখি। খাঁটি দেশী ওস্তাদের হিন্দুস্থানী গানের সুরের অনুকরণে বাঙ্গালা থিয়েটরের গান রচিত হইত। 'মৈথিলীমিলন' যাত্রার একটা গান লইয়া আপনাকে বুঝাইয়া দিতেছি,—

কি কব চারুবদনে,
কি কষ্ট তব বিহনে,
বনে,
আজও জাগিছে মম মনে।
তুমি ত হে ধনি, সদা সুখ মনে,
থাকি হরষে অশোকবনে,
ভ্রমে ভুলে চন্দ্রাননে
ভাব নি এ প্রিয়জনে॥

যে হিন্দী গানের সুর লইয়া এই গানটি রচিত হইয়াছিল, তাহার কয়েক চরণ শুনিবেন কি?

দোলায়ে লাল রঙ্গে সো।
দোলায়ে লাল নওলো সারি, ব্রজদুলালী,
ঝুলে শ্যামসঙ্গে।
সরল ডাঁটি জড়িত খাম্বা,
মারোয়া বারোঁয়া অতি সুরঙ্গা,
চওকি লাগিল জগমগতে
সরল তনয়া কুল।

"চারিদিকে সখের থিয়েটর হতে লাগিল। আমি তখন স্কুলের ছাত্র বটে; কিন্তু এই সমস্ত থিয়েটর দেখিয়া বেড়াইতাম। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের দুর্গাপূজা উপলক্ষে শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে পীটর সাহেবের জিম্‌নাষ্টিক দেখিয়া আমাদের কয়েকজনের মনে হইল,—ঐ রকম একটা কিছু আমরা করিতে পারি না কি? যোগেন্দ্রনাথ মিত্র,* শ্যামাচরণ ঘোষ ও আমি,—আমরা তিন জনে আমাদের এই শ্যামবাজারের ১০৭ নম্বর বাড়ীর একটা ঘরের কড়িকাঠে দড়ি টাঙ্গাইয়া জিম্‌নাষ্টিক আরম্ভ করি। যোগেন্দ্র হেয়ার স্কুলে তখন এণ্ট্রান্স্ ক্লাসে পড়েন; শ্যামাচরণ কোন্ ক্লাসে পড়িতেন এখন আমার

* স্মৃতি কথার এই অংশ বিবৃতিকালে যোগেন্দ্রবাবু রাধামাধববাবুকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে থিয়েটরের ইতিহাস ইঁহারা দুজনে মিলিয়া আমাকে বলিয়া গিয়াছেন।—লেখক

ঠিক স্মরণ নাই। রুট্‌লেজ-এর Manual Exercises নামক পুস্তক ক্রয় করা হইল। শ্যামবাজার ষ্ট্রীটের ৫০ নম্বর বাড়ীর উঠানে ভাল করিয়া ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা গেল। ওস্তাদ্‌ শিক্ষক কেহই আমাদের ছিলেন না; তবে মধ্যে মধ্যে কলিকাতা ম্যুনিসিপালিটির Overseer ভিসেণ্ট্‌ সাহেব আমাদিগকে ব্যায়ামক্রীড়া দেখাইয়া দিতেন। পাড়ার অনেক ছেলে আমাদের সঙ্গে যুটিয়া গেল। জলপূর্ণ বড় ঘড়ায় দড়ি বাঁধিয়া আমি দাঁতে করিয়া সেই ঘড়া ভূমি হইতে তুলিতে পারিতাম; একটা জলপূর্ণ গেলাস আমার কপালের উপর স্থাপিত করিয়া তিনটে লোহার চাকা দুই হাতে লইয়া প্রত্যেক চাকার ভিতর দিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ গলাইয়া দিতে পারিতাম; Horizontal Bar-এ পা লাগাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে হাত পা ছাড়িয়া দশ হাত দূরে ভূমিতে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতাম। মহাশয়, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমি যে একজন বলিষ্ঠ যুবক ছিলাম, ব্যায়াম-শিক্ষার ওস্তাদ্‌ হইতে পারিয়াছিলাম, আজিকার আমার এই চেহারা দেখিয়া আপনি তাহা অনুমান করিতে পারেন কি? উইল্‌সন্‌-এর সার্কাস দেখিয়া আমি অনেকগুলি ক্রীড়া আয়ত্ত করিয়া লইলাম। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আমাদের প্রথম Public performance হইল; বাজনার আয়োজন করা হইল; এই সূত্রে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে আসিয়া মিশিলেন; ক্রীড়ার অবসরে নগেন্দ্র, যোগেন্দ্র ও আমি একটা কন্সার্ট খাড়া করিলাম;—নগেন্দ্রের ঢোলক, যোগেন্দ্রের বেহালা, আমার বাঁশী। ব্যায়ামক্রীড়া দেখান শেষ হইল। আমরা ভাবিলাম, একটা কন্সার্ট করিলে হয় না? ৫৭ নম্বর রামকান্ত বোসের ষ্ট্রীটে Bagbazar Amateur Concert নামে একটি দল গঠিত হইল। কম্বুলিয়া টোলার গিরীশ মিত্র আমাদের কন্সার্টের মাষ্টার ছিলেন। তাঁহার মত অদ্ভুত কারিকর প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। তিনি গৎ তৈয়ার করিয়া দিতেন। এখনও তাঁহার রচিত গৎ অনেক জায়গায় শুনিতে পাই। স্কুলের ছুটির পর আমরা নিজেদের পোষাক তৈয়ারি করিতাম; জল খাবারের পয়সা বাঁচাইয়া আমরা এই কার্য্যটি সম্পন্ন করিয়াছিলাম। আমাদের কন্সার্টের প্রথম public performance হইল জজ্‌ অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পাথুরিয়াঘাটার বাড়ীতে; তাহার পরে জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ও হেমচন্দ্র করের বাড়ীতে আমরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। প্রিয়মাধব ঘোষের বাড়ীতে 'রত্নাবলী' নাটক অভিনীত হইবার সময় আমরা বাজাইয়া ছিলাম। 'রত্নাবলীর' পরেই একটা প্রহসন দেখান হইল; প্রিয়নাথ বসু মল্লিক সেই প্রহসনের গান বাঁধিয়া দিয়াছেন; ভুলো মুখুয্যেকে গালি দেওয়া সেই প্রহসনের উদ্দেশ্য। পাথুরিয়া-ঘাটার ছোট রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আপনি জানেন বোধ হয়, বড় রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'বুঝলে কি না'র উত্তরে ভুলো মুখুয্যে 'কিছু কিছু বুঝি' রচনা করিয়া বড় রাজাকে বিদ্রূপ করিয়াছিল। এবার ভুলো

মুখুয্যেকে গালি দেওয়া হইল। সেই রাত্রে ধর্ম্মদাস সুর ও অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি আমাদের সঙ্গে মিশিলেন। পাছে রাত্রিতে কন্সার্টের দলে গিয়া মিশি, এই জন্য বাবা কড়া পাহারার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমি আমাদের গৃহের বহিঃপ্রাচীর-সংলগ্ন একটা বক গাছের উপরে উঠিয়া একটা উচু ডাল হইতে লাফাইয়া পড়িতাম। নীচে দাঁড়াইয়া নগেন্দ্র আমাকে ধরিয়া ফেলিত ; শেষরাত্রে প্রাচীরের বহির্দ্দেশ হইতে দ্বিতলের কার্নিশে উঠিয়া নিঃশব্দে ঠাকুরমার ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার শয্যায় শয়ন করিতাম।

"আমরা যখন জিম্‌নাষ্টিক করি, তখন আমাদের ভলণ্টীয়র হইবার খুব সখ্ হইয়াছিল। ইয়ুরেশিয়ানরা তখন সবেমাত্র সখের সেনা হইবার অধিকার লাভ করিয়াছে দেখিয়া আমাদের ঝোঁক হইল। আমরা পঞ্চাশ ষাট জন বাঙ্গালী যুবক সেনাপতিকে আবেদন করিতে অগ্রসর হইলাম। উপেন্দ্রনাথ দাস, শ্যাম সিং, রাধা-গোবিন্দ কর, যোগেন্দ্রনাথ মিত্র, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, শ্যামাচরণ ঘোষ ও আমি সেই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলাম। আর কাহারও নাম আমার এখন মনে পড়িতেছে না। তখন ব্রাহ্ম-বিবাহ বিল সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য কেশবচন্দ্র সেন ও নব-গোপাল মিত্র সিমলা পাহাড়ে যাইবেন স্থির হইয়াছিল। ইঁহাদের হস্তে আমাদের আবেদনপত্র দেওয়া হইল। ইঁহারা সেনাপতির নিকটে পত্রখানি পেশ করিবার ভার লইলেন। রাজেন্দ্রলাল মল্লিক, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের মুরুব্বি হইলেন। অনেক দিন পরে গভর্মেণ্ট হইতে উত্তর আসিল—'আবশ্যক হইলে তোমাদিগকে আহ্বান করা যাইবে ; এখন দরকার নাই।' প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এতদিন পরে ইংরাজ গভর্মেণ্ট আমাদিগকে দেশীয় সেনা গঠন করিতে আহ্বান করিয়াছেন।

"তখন বোসপাড়ায় একটা সখের যাত্রার দল ছিল ; 'শর্ম্মিষ্ঠা' অভিনয় করিয়া তাহারা বেশ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিল। গিরীশবাবু তাহার গোটা কতক গান বাঁধিয়া দেন। একটি গান আমার কিছু কিছু মনে আছে ;—

আহা মরি মরি !
অনুপমা ছবি, দেবী কি মানবী,
ছলনা বুঝি করে বনদেবী।
রঞ্জিত রোদনে বদন অমল, নয়ন কমলে নীর ঢল ঢল,
নিতম্ব চুম্বিত বেণী আলোড়িত,
বিমোহিত চিত হেরি মাধুরী !

"উমেশচন্দ্র চৌধুরীও 'শর্ম্মিষ্ঠা'র গোটা কতক গান বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। একটি ছোট গান আমার মনে পড়িয়া গেল ;—

কি করি, সখি,
ভুলিয়া রহিল আঁখি,
ও রূপ হেরি চলিতে না পারি।
জলধরে হেরিয়ে যেমন চাতকিনী
তেমতি মানস আমারি॥

"নগেন বলিলেন—'ওরা যাত্রা করেছে, এস আমরা থিয়েটর করি। তাহার কথায় আমরা সকলেই নাচিয়া উঠিলাম। নগেন থিয়েটরের সবই জানে, কারণ সে যে 'পদ্মাবতী' নাটকে নিজে অভিনয় করিয়াছে। গিরীশবাবুর পরামর্শে 'সধবার একাদশী' অভিনয় করিবার ব্যবস্থা করা হইল। শনি রবিবারে তালিম দেওয়া আরম্ভ হইল। বাগবাজারে দুর্গাচরণ মুখুয্যের পাড়ায় প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়ীতে ষ্টেজ বাঁধিয়া সপ্তমী পূজার দিন 'সধবার একাদশী' অভিনীত হইল।[১] অভিনয় ভাল হইল না। তবু আমাদের এই প্রথম অভিনয়ে কে কি সাজিয়াছিল শুনিবেন?

নিমচাঁদ		গিরীশচন্দ্র ঘোষ
ঘটিরাম		অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী
নকুড়		মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
জীবন		ঈশানচন্দ্র নিয়োগী
কাঞ্চন		রাধামাধব কর
কেনারাম		অরুণচন্দ্র হালদার
রামমাণিক্য		নীলকণ্ঠ গাঙ্গুলী
কুমুদিনী		আপালচন্দ্র বিশ্বাস
সৌদামিনী		মহেন্দ্রনাথ দাস
নটী	...	নগেন্দ্রনাথ পাল

"কোজাগর পূর্ণিমার নিশীথে শ্যামপুকুরে নবীনচন্দ্র সরকার মহাশয়ের বাড়ীতে পুনরায় অভিনয় করা হইল। এবার আমাদের অভিনয় দেখিয়া সকলে খুসী হইলেন। অল্পদিনের মধ্যেই ষ্টেজ ও সিন্ তৈয়ার করা হইল। এটর্ণি দীননাথ বসুর বাড়ীতে আমাদের তৃতীয় অভিনয় হইল। সে রাত্রিতে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ আমাদের অভিনয় দেখিয়া বলিলেন—'তোমরা বেশ প্লে করেছ, কিন্তু তোমাদের ষ্টেজ ভাল নয়।' কিছুদিন পরে গিরীশবাবু আমাদের থিয়েটরের ষ্টেজ তাঁহার শ্বশুর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া আমাদের দল হইতে সরিয়া গেলেন। আমরা তখন গদা-গোপালকে ধরিয়া তাঁহার স্থানে বসাইয়া rehearsal দিতে লাগিলাম।

---

[১] ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে।—সং

"১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের শ্রীপঞ্চমীর দিনে রায় রমাপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের ভবনে আমাদের অভিনয় হইবে, স্থির হইল। ষ্টেজ পাওয়া যায় কোথায়? শিবপুরের সখের দলের ষ্টেজ শোভাবাজারের রাজ বাটীতে 'বেণী সংহার' নাটক অভিনয় করিবার জন্ত শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় আনাইয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র স্তায়রত্ন মহাশয়ের উদ্যোগে সমস্ত টোল হইতে ছেলে বাছিয়া লইয়া এই সংস্কৃত নাটকের অভিনয় করান হইয়াছিল। সেই ষ্টেজ আনাইয়া আমরা মিত্র মহাশয়ের দালানে খাটাইলাম। তখন আমার বাবা সেখানে দর্শকরূপে গিয়াছিলেন; দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ও বন্ধুপরিবৃত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। গিরীশবাবু নট-নটীর একটি prologue রচনা করেন; কয়েকটি নূতন গানও সন্নিবেশিত করিয়া দেন। এবার—

নিমচাঁদ	...	গিরীশবাবু
অটল	...	নগেন বন্দ্যো
কর্ত্তা	...	অর্দ্ধেন্দু
নকুল, নট	...	মহেন্দ্র বন্দ্যো
ঘটিরাম	...	অবিনাশ মুখোপাধ্যায়
ইন্‌স্পেক্টর	...	ফেলু বোস
দামা	...	যোগেন্দ্র ভটাচার্য্য
রামমাণিক্য	...	রাধামাধব কর
গোকুল	...	শিবচন্দ্র
কাঞ্চন	...	নন্দ ঘোষ
সৌদামিনী	...	সারদা দাস
কুমুদিনী	...	বিনোদ দাস
নর্ত্তকীদ্বয়	...	শীতল দাস, নিমাই বন্দ্যো

"কর্ত্তা ভূমিকায় অর্দ্ধেন্দুশেখর ক্রোধবশে অটলকে যখন পদাঘাত করেন, দীনবন্ধু বাবু সহসা দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—'There you have improved upon the author!'

"আমাদের গানে সুর দিতেন একটি মুসলমান ওস্তাদ; তাঁহার নাম হিঙ্গুল খাঁ। তাঁহার সুর অনুসারে গিরীশবাবু গান বাঁধিতেন। আমাদের সুখ্যাতি শুনিয়া 'পর্দ্দিঠা'-ওয়ালারা বিদ্রূপ করিয়া বলিল—'ওঃ, ভারি ত বাহাদুরি করেছ! ছবি এঁকে, পর্দ্দার আড়ালে ওরকম নাচ গান ত সকলেই করতে পারে। আমাদের মত খোলা আসরে যাত্রা

করতে পার ত বুঝি।' আমদপুর হইতে যাত্রার সাট মিলাইয়া পনের দিনের মধ্যে আমরা যাত্রাগানের আসরে নামিলাম। 'উষা-অনিরুদ্ধ' পালায় আমি উষা সাজিলাম; হিঙ্গুল খাঁর সুরে গিরীশবাবু গান বাঁধিয়া দিলেন। মহেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনিরুদ্ধ সাজিলেন। মতিলাল সুর হইলেন বাণরাজা। আমার একটি গানের দুই ছত্র মনে পড়িতেছে,—

যামিনীতে একাকিনী ঘুমঘোরে অচেতন,
হেরিনু স্বপনে সখি পুরুষ রতন।

"কলিকাতার একটি গলির ভিতরে একই দিনে দুই পৃথক আসরে 'শর্ম্মিষ্ঠা' ও 'উষা-অনিরুদ্ধ' যাত্রা গাওয়া হইল। উভয়ের মধ্যে ৩।৪ খানি বাড়ীর ব্যবধান ছিল মাত্র। আমাদের পালা খুব জাকিয়া উঠিল। আমরা দুষ্টামী করিয়া কয়েক টুকরা কাগজে দুই ছত্রে একটি কবিতা লিখিয়া 'শর্ম্মিষ্ঠা'-ওয়ালাদের আসরে ফেলিয়া দিয়া আসিলাম,—

সাগর পার বোলে তার বড় ছিল আঁটুনি,
সে বোল ফুরাল, এখন কি বলে তা শুনি।

"তাঁহারা হিঙ্গুল খাঁর সম্পর্ক লইয়া একটা বিদ্রূপাত্মক গান রচনা করিল। গানটি আমার মনে নাই; তার ভাবার্থ এই যে আমরা অত্যন্ত অপদার্থ, যেহেতু আমরা মুসলমানের হস্তে উষাকে সমর্পণ করিলাম। গিরীশবাবু তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন—

ভেলা রে ধনটা আমার জাহির করলি কারদানি।
নিই নি উষার বিয়ের ভার, করেছি হরণ,
হরণ করলে পাওনা ঠাওর, ধন্য তোরে বাখানি॥

"ইহার উত্তরে 'শর্ম্মিষ্ঠা'-ওয়ালারা গিরীশবাবুর উদ্দেশে 'ঘরে তোর ন্যাংটা দিগম্বর' বলিয়া যে তীব্র শ্লেষপূর্ণ গান রচনা করিল, তাহাতেই আমরা হটিয়া গেলাম।"

ষ্টেজ

২৯শে মাঘ, ১৩২৩

শ্রীযুক্ত রাধামাধব কর মহাশয় বলিলেন,—"যখন আমরা 'ঊষা-অনিরুদ্ধ' যাত্রা করিলাম তখনও আমাদের 'সধবার একাদশী' চলিতেছিল। এমন সময় দীনবন্ধুবাবুর 'লীলাবতী' প্রকাশিত হইল। লীলাবতী লইয়া আমাদের আখ্‌ড়া বসিল,—গোবিন্দ গাঙ্গুলীর শ্বশুরবাড়ীতে। কিছু দিনের মধ্যে কিন্তু গৃহস্বামীর সহিত মনান্তর হইল। আমরা 'ঊষা-অনিরুদ্ধ' যাত্রার বাড়ীতে rehearse করিতে আরম্ভ করিলাম। সেখান হইতে আমরা রাজেন্দ্র পালের বাড়ীতে চলিয়া গেলাম। 'লীলাবতী'র অভিনয় হইবে। এইখানে আমরা কেমন করিয়া ষ্টেজ তৈয়ার করিলাম, তাহা আপনি এই যোগেন্দ্রবাবুর মুখে আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করুন।"

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় বলিলেন,—"পালেদের বাড়ীতে 'লীলাবতী' অভিনীত হইবার পূর্ব্বে স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে ষ্টেজ ও সীন সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথাবার্ত্তা হয়। তিনি বলিলেন, 'তোমাদের এই গুটান সীন্‌এ সব ঘটনা ভাল করিয়া দেখান হয় না; সবান' সীন্ আবশ্যক। যদি ভাল করিয়া ষ্টেজ করিতে চাও, ময়দানে গিয়া অলিম্পিক থিয়েটার দেখিয়া আইস।' আমি তখন এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সার্ভে ক্লাসে পড়িতাম। ময়দানে সার্ভে করিবার জন্য আমাদের তাঁবু পড়িল। অষ্ট্রেলিয়ার কয়েকজন অভিনেতা ময়দানে ঐ থিয়েটর প্রতিবৎসরে শীতকালে চালাইত। তাহাদের দলের একজন মার্কিন অভিনেতা ম্যাক্‌বেথ্ সাজিত। যথারীতি টিকিট কিনিয়া ময়দানের থিয়েটরে আমরা ম্যাক্‌বেথের অভিনয় দেখিয়া আসিলাম। সেই মার্কিন যুবক অল্পদিনের মধ্যেই কলিকাতা হইতে চলিয়া গেল। আমার ঝোঁক হইল উহাদের ষ্টেজের অনুকরণে আমি সীন্ করিতে শিখিব। আমাদের সাবেক ধরণের গুটান সীন্‌-এ দরজা খোলা দেওয়া ইত্যাদি দেখান সম্ভবপর ছিল না। আমি ময়দানে আমাদের তাঁবু হইতে অলিম্পিক থিয়েটর-ওয়ালাদিগকে পত্র লিখিলাম, তাঁহাদের ষ্টেজের ভিতরে আমাকে অনুগ্রহ করিয়া যদি প্রবেশ করিতে দেন, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হই। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। অল্প-দিনের মধ্যেই আমি সমস্ত শিখিয়া লইলাম। কেমন করিয়া নৌকা ভাসান দেখাইতে হয়, আকাশপথে মানুষ অন্তর্হিত হইতে পারে, বিদ্যুৎ, বজ্রনির্ঘোষ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি সমস্তই আয়ত্ত করিলাম। রাজেন্দ্র পালের বাড়ীতে ষ্টেজ রচিত হইতে বিলম্ব হইল না।"

রাধামাধব বাবু বলিলেন—"ষ্টেজ নির্ম্মিত হইল। প্রসিদ্ধ গীতগোবিন্দ গায়ক

মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলেন, 'এইবার আমাদের টিকিট বিক্রয় করা উচিত।' পরামর্শটা মন্দ বলিয়া মনে হইল না। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে জনসাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইল। স্যর রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র রূপলাল মিত্র মহাশয় ইংরাজি ভাষায় একটি আবেদন পত্র লিখিয়াছেন। যোড়াসাঁকোর যোগেন্দ্রনাথ বসুর একটি ছাপাখানা ছিল; সেইখানে আমাদের prospectus মুদ্রিত হইল; উক্তপত্রে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্ম্মদাস সুর ও যোগেন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয়ের স্বাক্ষর ছিল। পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে আমরা যাতায়াত করিলাম; বিদ্রূপ ও টিটকারী ভিন্ন আমাদের বেশী কিছু লাভ হইল না। অনন্যোপায় হইয়া চাঁদার খাতায় তখন প্রত্যেকে ২০৲।২৫৲ টাকা সই করিলাম। এখনও বোধ হয় সেই prospectus ও সেই চাঁদার খাতা শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বসুর নিকট আছে।"

যোগেন্দ্র বাবু বলিলেন,—"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুলে ভোলানাথ আমার সতীর্থ বন্ধু ছিলেন। যখন আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতাম, বিদ্যাসাগর মহাশয় সহসা একদিন আমাদের ক্লাসে প্রবেশ করিয়া ভোলানাথকে বলিলেন,—'তোমার মত ছাত্রকে আমার স্কুলে রাখতে পারব না; তুমি চলে যাও।' শিক্ষকদিগকে তিনি একটু অন্তরালে গিয়া বলিলেন, 'ভোলা ঠাকুরবাড়ীতে বিদ্যাসুন্দর থিয়েটরে 'বিদ্যা' সেজেছিল, 'রত্নাবলী' যাত্রাতেও ও 'সখী' সাজে। কথাগুলি স্পষ্ট আমাদের কানে গেল। ভোলানাথ চলিয়া গেল। আজকাল আপনাদের সকল কলেজের ছেলেরা কলেজেই থিয়েটর করিয়া কলেজের কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট হইতে বাহবা লইতেছে। বিদ্যাসাগর জীবিত থাকিলে আজ আপনারা এতদূর বাড়াবাড়ি করিতে পারিতেন কি ?"

রাধামাধববাবু বলিলেন—"ব্রজবাবুর বাড়ীতে ষ্টেজের প্ল্যাটফরম ও অন্যান্য মালপত্র কিছু ছিল। তিনি তখন অত্যন্ত পীড়িত। আমরা তাঁহার বাড়ী হইতে ষ্টেজ সরাইয়া লইয়া যাইতে অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি সম্মত হইলেন। আমরা সেই রাত্রিতে সমস্ত মালপত্র ঘাড়ে করিয়া লইয়া স্থানান্তরিত করিলাম। বিশ্বকোষের লেখক বলিয়াছেন যে আমরা অর্থাভাবে নিজেরা ঘাড়ে করিয়া জিনিষগুলি লইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমরা গোলযোগ না করিয়া চুপি চুপি কাজ সারিব মনে করিয়া ঐরূপ করিয়াছিলাম। বিশ্বকোষের 'রঙ্গালয়' প্রবন্ধের এই অংশে কত ভুল আছে দেখিবেন? এই ভলুমের ১৯০, ১৯১, ১৯২ পৃষ্ঠায় আপনাকে দেখাইয়া দিতেছি।

(১) গোবর্দ্ধন রাজপথ সীন-এ আঁকিয়াছিল, এইরূপ লেখা আছে। 'লীলাবতী'তে রাজপথের সীনই ছিল না।

(২) ধর্ম্মদাস তুলি ধরিলেন। ঠিক কথা; কিন্তু একা নয়; ক্ষেত্র ও আর্ট-স্কুলের অন্যান্য ছাত্রেরা সীন আঁকিয়া দিয়াছিল।

(৩) মতিবাবু, মহেন্দ্রবাবু, নগেন্দ্রবাবু অর্দ্ধেন্দুবাবু কেহই টাকা দিয়া দল বজায় রাখেন নাই।

(৪) অর্দ্ধেন্দুবাবু এ সময় টিকিট বেচিবার প্রস্তাব করেন নাই; মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা এ প্রস্তাব পূর্ব্বেই উপস্থাপিত হইয়াছিল।

(৫) শুধু অর্দ্ধেন্দুবাবু নয়, দলের অন্যান্য সকলেই ষ্টেজ ব্রজবাবুর নিকট হইতে প্রার্থনা করেন।

(৬) অর্থ-কষ্টের জন্য আমরা জিনিষগুলা নিজেরা ঘাড়ে করিয়া আনিয়াছিলাম, ইহা মিথ্যা কথা। ধর্ম্মদাস সুরের বাড়ীর সম্মুখে একটা ছোট মাঠ ছিল, সেইখানে ঐ কাঠগুলা আমরা রাখিলাম। সেই প্ল্যাটফরমের উপরে আমাদের ষ্টেজ খাড়া হইল।

(৭) ধর্ম্মদাস ও রাজেন্দ্র ম্যাক্‌লিন্‌কে রাখে নাই; রাজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে তখনও আমাদের দলের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই।

(৮) বৃন্দাবন পালের বাড়ীতে ষ্টেজের জিনিষগুলা লইয়া যাইবার সময় অর্দ্ধেন্দু বাবু কোনও কথাই বলেন নাই; এসকল ব্যাপারে তিনি মোটে কথাই কহিতেন না।

(৯) রাজেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া আমাদের টিকিট বেচিবার আশা ত্যাগ করিতে হয় নাই।

(১০) ইহার বহুপূর্ব্বে নবগোপাল মিত্র আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন।

(১১) Calcutta National Theater নামকরণের প্রস্তাব আদৌ উল্লিখিত হয় নাই; নবগোপালের মুখ হইতে এরূপ অসঙ্গত নাম কখনই প্রস্তাবিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

(১২) হিঙ্গুল খাঁর দ্বারা উড়িয়ার ভূমিকা সুবিধাজনক হইল না এমন কথা লেখকের কলম হইতে বাহির হইল কেমন করিয়া? উড়িয়ার ভূমিকায় হিঙ্গুল খাঁ অদ্বিতীয় ছিল।

(১৩) শশী বিশাড়ীকে অর্দ্ধেন্দু এখন কোথা হইতে পাইবেন? কয় বৎসর পরে সে ন্যাশনাল থিয়েটরে আসিয়া যুটিল, লেখকের তাহা নিশ্চই অজ্ঞাত।

(১৪) শশীকে অর্দ্ধেন্দু উড়িয়া ভাষা শিখাইবেন কি, শশী এমনি ওস্তাদ ছিল যে সে অর্দ্ধেন্দুকে শিখাইতে পারিত।

(১৫) ষ্টেজও পচে নাই, দলও ভাঙ্গে নাই। রাজেন্দ্র পালের দালানে ওরকম চারটে ষ্টেজের সরঞ্জাম রাখিবার জায়গা ছিল।

(১৬) অর্দ্ধেন্দুবাবু দল গড়িবেন কি? নগেনবাবুই দল গড়িলেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু দলের শিক্ষকতা করিতেন; ওসব ভাঙ্গাগড়ার দিকেই যাইতেন না।

(১৭) এই সময়ে গিরীশবাবু কোনও সখের যাত্রার দল বসান নাই; কোনও সঙ্‌এর পালা বাঁধেন নাই। উনি আপিসে বসিয়া 'লুপ্ত-বেণী' গানটি রচনা করিয়া আমাদের এই বাড়ীতে আসিয়া গানটি আমাদিগকে গাইতে বলেন; এই বাড়ীতে বসিয়া ঐ গানের সুর ধরা হয়।

(১৮) আমি গিরীশবাবুর দলে যোগ দিব কি, তাঁহার দল কোথায় ছিল? 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' যাত্রায় দুইটা সং দেওয়া হইয়াছিল,—সাপুড়ে ও বাউল। নটবর, ওরফে নাটুদাদা, সাপুড়ে সাজিয়াছিল; আর আমি বাউল। বাউল সাজিয়া আমি ঐ গানটি গাহিয়াছিলাম।

(১৯) 'অমৃত বরষে'—অমৃত পাল নয়, ভুনি বোস।

"যাক্, আর ছোট বড় কত ভুল আপনাকে দেখাইব? পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি যে বিশ্বকোষের লেখক ঐ 'রঙ্গালয়' প্রবন্ধের জন্য মালমসলা আমার নিকট হইতে কিছু সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু যে কারণেই হউক, বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে অর্দ্ধেন্দুশেখরের আবির্ভাবের পরবর্ত্তী অংশটা লেখকের হস্তে বিকৃত হইয়া গেল।

"লীলাবতী ও ললিতের কথা অমিত্রাক্ষর ছন্দে থাকার দরুণ অনেকেই পশ্চাৎপদ হইলেন। শেষে গিরীশবাবু আসিয়া যখন ললিতের ভূমিকা গ্রহণ করিলেন, তখন আর কোনও বাধা রহিল না। পাত্রপাত্রী নির্ব্বাচন স্থির হইয়া গেল।

লীলাবতী	...	...	সুরেশচন্দ্র মিত্র
ললিত	...	...	গিরীশচন্দ্র ঘোষ
হেমচাঁদ	...	...	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
নদেরচাঁদ	...	...	যোগেন্দ্রনাথ মিত্র
যজ্ঞেশ্বর	...	...	গোপালচন্দ্র দাস
রঘুউড়ে	...	...	হিঙ্গুল খাঁ
ক্ষীরোদবাসিনী	...	...	রাধামাধব কর
সারদা সুন্দরী	...	...	বেলবাবু
ঝি	...	...	অর্দ্ধেন্দুশেখর

"ঝির মুখে খাঁটি মেদিনীপুরের ভাষা শুনিয়া সকলে চমৎকৃত হইয়াছিল। দীনবন্ধু মিত্র, মহেন্দ্রলাল সরকার, কানাইলাল দে, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার রাজকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সেদিন দর্শকরূপে তথায় উপস্থিত ছিলেন।

"১৮৭২ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে রাজেন্দ্র পালের বাড়ীতে 'লীলাবতী' অভিনীত হইল। মুক্ত আকাশতলে উঠানের উপর দর্শকবৃন্দের বসিবার আসন করা হইয়াছিল। সন্ধ্যার সময় কালবৈশাখীর ঝড় বৃষ্টিতে সমস্ত ভিজিয়া গেল। সেই ভিজে চেয়ারের উপর বসিয়া ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখ ভদ্রলোকগণ অভিনয় দর্শন করিলেন।

"এইখানে আপনাকে বলিয়া রাখি, 'ঊষা-অনিরুদ্ধ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'লীলাবতী' পর্য্যন্ত যতগুলি নাটক আমরা অভিনয় করিয়াছিলাম, সমস্তগুলির স্ত্রীলোকেব ভূমিকার শিক্ষকতা আমাকেই করিতে হইত। আমি কলিকাতা হইতে চলিয়া যাওয়ার পর লীলাবতী অভিনয় বন্ধ হইয়া গেল। স্বর্গীয় গিরীশচন্দ্র ঘোষ আমাব নামের উল্লেখ কবিয়া একস্থানে লিখিয়াছেন—'শ্রীযুক্ত রাধামাধব কর থিয়েটরের শিক্ষকতার দাবী রাখেন।'

"দীনবন্ধুবাবু তখন পোষ্ট আফিসেব বড কর্ম্মচারী,—Personal Assistant to the Postmaster General of Bengal. তিনি তখন সবেমাত্র পীরপৈন্তি-দার্জ্জিলিং ও দার্জ্জিলিং-আসাম ডাক পথেব ব্যবস্থা করিয়া আমাকে পীরপৈন্তিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেখানে ছুটি করাইয়া 'লীলাবতী' অভিনয়ের জন্য আমাকে কলিকাতায় আনিলেন। ভদ্রলোক হইতে হইলে মদ্যপান কবা উচিত, এই ধাবণা তখন আমাদেব মজ্জাগত হইযাছিল। কিন্তু ষ্টেজের উপবে মদের বোতলে লাল জল পুরিয়া মদ্য পানের অভিনয় কবা হইত। 'সধবাব একাদশী'তে নিমচাঁদের ভূমিকা লইয়া গিরীশবাবু বলিলেন,—'রাত্তিবে বোতল বোতল ঠাণ্ডা জল খেয়ে গলায় সর্দ্দি বসে যাবে, আসল মদ নইলে চলবে কেন?' অতঃপব আমাদেব নিমচাঁদকে আব মদ্য পানের ভান করিতে হইত না। অনেক দিন পবে স্বনামধন্য ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী একজন অভিনেতাকে চিকিৎসা করিতে আসিয়া বলিয়াছিলেন,—'আমি কখনও থিয়েটর দেখি না। তোমাদের পাবলিক্ থিয়েটর কিন্তু সমাজের একটা উপকার কবেছে। আমাদের পাড়ায় রাস্তায় মাতালদের বেলেল্লাগিরি একেবাবে কমে গেছে।'

"১৮৭২ খৃষ্টাব্দের পূজার সময় লক্ষ্মীনাবায়ণ দত্তের চোরবাগানের বাড়ীতে 'সধবার একাদশী' ও 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' অভিনীত হইল। গিরীশবাবু একটা নটনটীর Prologue রচনা করিয়া দেন। এই অভিনয়ের জন্য আমাকে মালদহ হইতে আসিতে হইয়াছিল। এসম্বন্ধে বিশ্বকোষের chronology আগাগোড়া ভুল। ইহার অব্যবহিত পরের ইতিহাস আমি দিতে পারিব না, কারণ আমি কলিকাতায় ছিলাম না। বন্ধু যোগেন্দ্রনাথ এখন আপনাকে বলুন।"

যোগেন্দ্রবাবু বলিলেন—"অধিক কিছু বলিবার নাই। আমরা কয়েক জনে ন্যাশনাল থিয়েটর হইতে সরিয়া দাঁড়াইলাম। গিরীশবাবুর ইচ্ছা যে ভাল সাজ সরঞ্জাম ষ্টেজ প্রভৃতি না হইলে পাবলিক থিয়েটর খোলা চলিবে না। নগেন্দ্রবাবু প্রমুখ অনেকেই কিন্তু পাব্‌লিক্ থিয়েটরের পক্ষপাতী। রসিক নিয়োগীর ঘাটের উপর প্রকাণ্ড হলে তাঁহাদের rehearsal হইত। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের জগদ্ধাত্রী পূজার সময় নগেনবাবুর বাড়ীতে তাঁহাদের dress rehearsal হয়। এই সময়ে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বোস আসিয়া এই দলে যোগদান করেন।"

চৌদ্দ

দোল পূর্ণিমা, ১৩২৭

আজ সন্ধ্যার প্রাক্কালে আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মুখ হইতে পুরাতন কাহিনী শুনিবার জন্ম তাঁহার পদপ্রান্তে উপবেশন করিয়া কুশল-প্রশ্ন করিলাম। তিনি বলিলেন, "এখন আর আমি সকালে-সন্ধ্যায় বেড়াইতে পারি না ; শরীর বড় দুর্ব্বল। তুমি আমার কাছে আমাদের দেশের পুরাতন কথা শুনিবার ইচ্ছা কর ; কিন্তু আমি কখনও বাহিরে কাহারও সঙ্গে মিশি নাই ; বিশেষ কিছু বলিতে পারিব বলিয়া মনে হয় না ; তবে বাঙ্গালী হিন্দুসমাজে যে খুব বেশী পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে পারি।

"তখন একান্নবর্ত্তী পরিবার খুব দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত ছিল। ভাই-ভাই যে শুধু একত্র থাকিত, তাহা নহে ; বেশ সদ্ভাবে থাকিত। প্রীতির বন্ধন বাস্তবিক খুব শক্ত ছিল। পরস্পর কলহ করিয়া আদালতের আশ্রয় লওয়া কাহারও কল্পনায় স্থান পাইত না। বিষয়-সম্পত্তি লইয়া যে দিন প্রথম আদালতে মোকদ্দমার কথা শুনিলাম, সে দিন আমার প্রাণে যে কি আঘাত লাগিল, তাহা তুমি কল্পনা করিতে পারিবে না। আমারই আত্মীয়দিগের মধ্যে এইরূপ বিচ্ছেদ প্রথম দেখিলাম।"

আচার্য্য মহাশয় একটু চুপ করিলেন। আস্তে-আস্তে ইংরাজি-ভাষায় তিনি এই পুরাতন সমাজের অবস্থার বিবৃতি করিতে লাগিলেন ; কারণ, আমাদের কথোপকথনের প্রারম্ভেই মিঃ এণ্ড্রুজ আসিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। মিঃ এণ্ড্রুজও নিবিষ্ট-চিত্তে শ্রবণ করিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার পিতামহকে মনে পড়ে কি ?"

আচার্য্য মহাশয় বলিলেন,—"মনে পড়ে বৈ কি ! আমি তখন ছয়-সাত বছরের ছেলে ছিলাম। সে বয়সে তাঁহার সম্বন্ধে আমার কোনও নিজের অর্জ্জিত জ্ঞান নাই ; তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত যাহা কিছু জানি, তাহার অধিকাংশ পরের নিকট হইতে শোনা। তিনি ইয়োরোপে গিয়া ফরাসী অভিজাতবর্গের মধ্যে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন।

"বিলাসিতা আমাদের দেশের অভিজাত-শ্রেণীর মধ্যে খুব বেশী ছিল। বড়-লোকদের যেন একটা ধারণা ছিল যে, ভাল-মন্দ বিচার না করিয়া খুব খরচ করিতে পারিলেই সমাজের মধ্যে প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইবে। কে কত বেশী খরচ করিতে পারে, এই লইয়া যেন পরস্পরের একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। তখনকার সমাজ-চিত্রের এই

অংশটাই মন্দ ছিল। এখন সে রকম বিলাসিতা নাই বটে, কিন্তু এমন অনেক নূতন দোষ সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, যাহা তখন ছিল না। পূজার সময় আমাদের বাড়ীতে যে উৎসব দেখিয়াছি, সে রকম উৎসব পরে আর কখনও দেখি নাই। বোধ হয় আমাদের প্রতিমা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে সুন্দর হইত। পূজার অনেক আগে হইতেই আমাদের বাড়ীতে দর্জী বসিয়া যাইত; জহুরীর আগমন হইত। দর্জী ও জহুরী মিলিয়া বাড়ীর সকলের পোষাক পরিচ্ছদ অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিত। গৃহ-প্রাঙ্গণে যে যাত্রা প্রভৃতির আয়োজন হইত, তাহাতে যোগদান করিবার অধিকার আপামর সাধারণ সকলের ছিল। দরজা বন্ধ করিয়া কড়া পাহারা রাখিয়া, কাহাকেও প্রবেশ করিতে না দেওয়া অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইত। ধনী গৃহস্থের বাড়ীর পূজার আয়োজন কেবল মাত্র সেই পরিবারের ও নিমন্ত্রিত নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের জন্য করা হইত না। প্রত্যেক গৃহস্থের পূজার উৎসব একটা বৃহৎ সামাজিক উৎসব ছিল; সমাজের ছোট-বড় সকলেই অবাধে সে উৎসবে মাতিয়া উঠিত। আমার পিতৃদেব ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগ বশতঃ পূজার সময় বাড়ী থাকিতেন না। তিনি কিছু আগে হইতেই বিদেশ পর্য্যটনে বাহির হইতেন।" আচার্য্য মহাশয় একটু চুপ করিলেন। মিঃ এণ্ড্রুজ ও শ্রীমান্ সন্তোষকুমার তাঁহার পদধূলি লইয়া বিদায় হইলেন। অতঃপর তিনি বাঙ্গালায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। অনেকক্ষণ ইংরাজীতে কথা কহিয়া বোধ হয় তিনি কিছু ক্লান্তি অনুভব করিতেছিলেন। আমি একটু অপেক্ষা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার কথার সূত্র ধরাইয়া দিলাম;—"আপনার পিতৃদেব সে সময়ে বিদেশ-ভ্রমণে বাহির হইতেন?"

"হাঁ। তিনি অনেক যায়গায় বেড়াইতেন। কিন্তু তাই বলিয়া বাড়ীর পূজার উৎসবের কোনও ত্রুটি, কোনও ব্যতিক্রম হইত না। ভিড়ের মধ্যে কোনও কারণে কখনও পুলিসকে কিছুতে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া হইত না। একবার আমাদের বাড়ীতে আমাদের এক বন্ধুর গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী শীলমোহরাঙ্কিত ছিল দেখিয়া এক জন পুলিস-প্রহরী গাড়ীখানা আটক করিবার চেষ্টা করিল। আমাদের বাড়ীতে তখন অনেকগুলি ভদ্র-সন্তান আমাদের পরিবারমধ্যে অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের মত বাস করিতেন; তন্মধ্যে গাঙ্গুলী মহাশয় বোধ করি সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই কনেষ্টবলকে প্রহার করিয়া হাঁকাইয়া দিলেন। কলিকাতা সহরে পুলিস পাহারাওয়ালাকে বড় একটা কেহ ভয় করিত না। এবং এই পুলিসের প্রতি বল-প্রয়োগের জন্য ভবিষ্যতে আমাদের কোনও বেগ পাইতে হয় নাই।

"আমাদের দেশে এই পূজা ও এই উৎসব একেবারে ফাঁপা ও অন্তঃসারশূন্য ছিল না। বিদেশীরা না জানিয়া শুনিয়া যাহাকে idolatry বলিয়া অবজ্ঞা করিত, তাহা বাস্তবিক

idolatry নহে। ব্রাহ্মণাদি ভদ্র-সন্তানের কথা আমি বিশেষ করিয়া বলিতেছি। কোথাও কোথাও যে bigotry ছিল না, তাহা নহে; বাস্তবিক ভক্ত উপাসক সমাজের মধ্যে ছিল, সংখ্যায় অবশ্যই অল্প। সেই সকল খাঁটি ভক্তদের কথা ছাড়িয়া দিলেও এ কথা খুব ঠিক যে, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর সকল শ্রেণীর মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান কিছু না কিছু নিহিত ছিল। ছিল বলিয়াই তখনকার প্রতিমা-পূজাকে কিছুতেই আমি superstition বা idolatry বলিতে প্রস্তুত নহি। সমাজের এই ভাবটাকে যদি ধর্ম্মভাব বলা যায়, তাহা হইলে আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারি যে, আমাদের দেশের সমাজের সকল স্তরেই এই ধর্ম্মভাব কিছু না কিছু ছিল, এবং এখনও আছে। এ হিসাবে আমাদের দেশের নিম্ন-শ্রেণীর লোক ও ইয়োরোপের নিম্ন-শ্রেণীর লোকের মধ্যে ব্যবধান খুব বেশী। এই ধর্ম্মভাব আছে বলিয়া মহাত্মা গান্ধী এত সহজে জন-সাধারণকে ধর্ম্মে মতি রাখিয়া প্রবুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

"আমাদের বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজে যে এই ধর্ম্মভাব, এই সহজ ব্রহ্মজ্ঞান ছিল এবং আছে, এ ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল। দূর পল্লীগ্রাম হইতে অনেক লোক মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আমার বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। তাঁহারা আমাদের বাড়ীর তেতালার উপরে থাকিতেন। সেই সমস্ত খাঁটি পল্লীবাসীদিগের কথা-বার্ত্তায়, আচরণে, ব্যবহারে তাঁহারা কেমন ধর্ম্ম-ভাবাপন্ন, কেমন cultured, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইত। তোমাদের ইস্কুল-কলেজের শিক্ষা-প্রণালীর ও হষ্টেল-বাসের ফলে সেই খাঁটি ধর্ম্মভাব, সেই আমাদের স্বদেশী culture, ও সঙ্গে সঙ্গে একান্নবর্ত্তী পরিবারের দৃঢ় বন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছে। ইস্কুল-কলেজগুলা উঠিয়া গেলে যে বাস্তবিক আমাদের সমাজের লোক-শিক্ষার কোনও ক্ষতি হইবে, এমন ত মনে হয় না। বরং সমাজের কল্যাণকর সুশিক্ষার প্রবর্ত্তনে সুফল ফলিতে পারে। নহিলে আমরা যতই কেন 'স্বদেশী' 'স্বদেশী' বলিয়া চীৎকার করি, আমরা কিছুতেই স্বদেশী হইতে পারিব না। এ কথাটা বোধ হয় তোমাদের ভাল করিয়া বুঝাইতে পারা শক্ত। তোমাদের মনের গতিক এত বদলাইয়া গিয়াছে যে, তোমরা সহজে ধারণা করিতে পারিবে না, কেন আমি এ কথা বলিতেছি। বিদেশী শিক্ষায় বাল্যকাল হইতে পরিপুষ্ট হইয়া এখনকার বাঙ্গালী সন্তান যে ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে তাহারা কেমন করিয়া স্বদেশী হইবে? তাই ওটা কেবল শব্দমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। আমার পিতামহের সঙ্গে আমার ছোটকাকা[১] বিলাত গিয়াছিলেন। ইয়োরোপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি বিলাতী বেশ-ভূষা চাল-চলন সমস্ত ছাড়িয়া দিলেন; তাঁহার বিলাত-প্রবাসের কোনও চিহ্ন লেশমাত্র পরিলক্ষিত হইল না। ইউরোপের সভ্যতা তখন এতই বিজাতীয় বলিয়া গণ্য হইত,

১ নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮২৯-১৮৫৮)।—সং

যে, তখন উহা কিছুতেই আমাদের হিন্দু-সমাজের অঙ্গীভূত হইতে পারে, এ কথা কাহারও মনে হইত না। তবে ডি রোজিও যে সকল বাঙ্গালী যুবকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন, যাহাদিগকে তখন 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে অভিহিত করা হইত, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র।" আচার্য্য মহাশয় একটু চুপ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের যে দল ছিল, তাহার বাহিরে হিন্দু-সমাজের যুবকগণের মধ্যে মদ্যপান কি সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত?" তিনি বলিলেন, "না; উহা সমাজে দূষণীয় বলিয়া গণ্য হইত। মদ্যপানাসক্তি চিরকাল নিন্দনীয় ছিল। ঐ যে রাজনারায়ণ বসুর কথা বলিতেছ, তিনি ঐ ইয়ংবেঙ্গল দলভুক্ত ছিলেন। সেই দল ছাড়িয়া তিনি আমার বাবার কাছে আসিলেন। আজ তিনি জীবিত থাকিলে তোমাকে অনেক কথা বলিতে পারিতেন।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "রাজনারায়ণ-বাবু যখন আপনার পিতৃদেবের কাছে আসিলেন, তখন কি তিনি ইস্কুল-মাষ্টার?" উত্তর হইল,—"না; যতদূর স্মরণ হয়, তখনও তিনি কলেজের ছাত্র। তাঁহার পিতার[১] সহিত রামমোহন রায়ের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল; সেই সূত্রে তিনি আমাদের বাড়ীর সহিত পরিচিত হইলেন। কিছুকাল পরে রাজনারায়ণবাবু ও আমি, আমরা পরস্পর উভয়ের প্রতি খুব আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। তিনি সদানন্দ পুরুষ ছিলেন। আজ আমার সমবয়স্কদিগের মধ্যে কেহই জীবিত নাই। বয়ঃকনিষ্ঠদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই গিয়াছেন; একা কৃষ্ণকমল এখনও আছেন। তাঁর কাছ থেকে ত অনেক কথা তুমি শুনিয়া লইয়াছ। তাঁর মত সুপণ্ডিত প্রায় দেখা যায় না। তাঁকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি ও ভালবাসি। রাজনারায়ণবাবু আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিলেন। কৃষ্ণ-কমলকে আমরা সকলেই শ্রদ্ধা করিতাম। একবার বোধ করি বীটন সোসাইটির এক অধিবেশনে আমি একটা প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। কৃষ্ণকমল সভাপতি ছিলেন। প্রবন্ধের বিষয় ছিল—'আমাদের বিদ্যা ফলবতী হয় না কেন?' আমি বলিয়াছিলাম যে বিদেশীয় ও বিজাতীয় ভাব পরিবর্জ্জন না করিলে আমাদের বিদ্যা কিছুতেই ফলবতী হইবে না।' কৃষ্ণকমল বলিলেন—'বক্তা আমাদিগকে বিদেশীয় ভাব পরিবর্জ্জন করিতে বলিলেন। ভাল কথা। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে কিছু স্বদেশী রীতির পরিহরণ আবশ্যক। শুধু আলো চাল আর কাঁচা কলায় চলিবে না।' পরিহরণ শব্দটা এই আমি প্রথম শুনিলাম। সভাপতি মহাশয়ের সঙ্গে তর্ক করা ত চলে না; ইচ্ছা হইয়াছিল বাহিরে আসিয়া বলি যে, ইয়ং বেঙ্গলের বীফ্ ব্র্যাণ্ডির চেয়ে আলো চাল আর কাঁচকলা ঢের ভাল। কিন্তু সমালোচক যে স্বয়ং কৃষ্ণকমল! আমার আর কিছুই বলা হইল না।

[১] নন্দকিশোর বসু, ইনি রামমোহন রায়ের সেক্রেটারি ছিলেন।—সং

"একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে যে প্রীতি ও সদ্ভাব ছিল, এখন আর তাহা দেখা যায় না। আমার খুল্লতাতগণ সংসারে ও বিষয়-কর্ম্মে বিশেষ মনোযোগ দিতেন না; আমার পিতৃদেব সমস্ত দেখাশুনা করিতেন; কোনও প্রকার গোলযোগ ছিল না। আমরা সব খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো ভাই ঠিক সহোদর ভাইয়ের মত পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত ছিলাম। সামাজিক রীতি-নীতি মানিয়া চলিলে এই প্রকার পারিবারিক ব্যবস্থা খুব হিতকর, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম, রীতি, নীতি সম্বন্ধে সকলে একমত হইয়া চলিলে কোথাও কিছু বাধে না। কিন্তু যদি কেহ ধর্ম্ম-সম্বন্ধে নূতন মত অবলম্বন করিবার প্রয়াসী হন, তাহা হইলে এই একান্নবর্ত্তী পরিবার বাধা দেয়। সে কিছুতেই ব্যক্তিবিশেষের মত মানিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে চায় না; অথবা তাহার মত মানিয়া না লইয়াও, তাহাকে বৃহৎ পরিবারের মধ্যে থাকিতে দিয়া, স্বাধীন ভাবে তাহাকে তাহার নিজের স্বতন্ত্র জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে দেয় না। এইখানে এই joint family system-এর সঙ্কীর্ণতা। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার পর হইতে যে একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল, নানা কারণে সে ভাঙ্গা আর জোড়া দেওয়া গেল না। যে individualism ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রকট হইয়া উঠিল, তাহা সমাজের মধ্যে একান্নবর্ত্তী-পরিবারকে কিছুতেই টিকিতে দিতে চাহিল না। আজ সর্ব্বত্রই সেই disintegration-এর লক্ষণ দেখিতেছি। আমি যে সময়ের ও যে সমাজের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহাব কোনও চিহ্ন এখন আর বর্ত্তমান নাই; তাহা এত পুবাতন যে, রবি তাহা দেখে নাই।

"ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে পরস্পরের খুব প্রীতি ছিল। একের বেদনায় অন্যে কষ্ট বোধ করিতেন। Orthodox সমাজ হইতে তাঁহারা একটু দূরে সরিয়া গেলেন বটে, কিন্তু বিদেশীর আক্রমণ হইতে স্বদেশের মানরক্ষা করিবার সময় সকলে একত্র হইয়া কাজ করিতেন। যখন 'কালা-আইন', black-act-এ[১] দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় চঞ্চল হইয়া উঠিল, স্যর রাধাকান্ত দেব ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার জন্য এক বৃহৎ সভা আহ্বান করিলেন। আমার বাবা যখন সেই সভায় উপস্থিত হইলেন, স্যর রাধাকান্ত তাহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন,—'আপনি না এলে শিবহীন যজ্ঞের মত এ সভা পণ্ড হোতো।'

"একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে ব্যক্তি-বিশেষের স্বাধীন চিন্তা সম্পূর্ণরূপে বাধা পাইত, এ কথা আমি বলিতেছি না। সে সম্বন্ধে সমাজের এক প্রকার toleration বরাবর ছিল। শুধু ধর্ম্ম-সম্বন্ধে স্বাধীন চিন্তা অপ্রতিহত ভাবে চলিতে পারিত; কিন্তু সামাজিক রীতি-নীতি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চলিতে চেষ্টা করিলে সমাজ তাহা সহ্য করিত না। কলিকাতায় তখন সমাজ-বন্ধন অনেকটা দৃঢ় ছিল। সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে

[১] ১৭৮ পৃষ্ঠার ২নং পাদটীকা এবং ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোঃ-র "রাধাকান্ত দেব" পৃঃ ৪৪ দ্রষ্টব্য।—সং

সমাজ বিভক্ত ছিল,—ধনী অভিজাত বংশ ও মধ্যবিত্ত সাধারণ নিম্ন-শ্রেণী গৃহস্থ। আমার পিতামহকে কলিকাতার সকল গৃহস্থই মানিয়া চলিত। সকল পক্ষের দোষ-গুণ বিচার করিয়া তিনি সমাজ-শাসন করিতেন। এ যে ঠিক মধ্যযুগের ইয়োরোপীয় ফিউড্যাল্ ব্যবস্থার মত ছিল, তাহা নহে। সকল গৃহস্থই সমাজের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন ছিলেন; কেহ কাহারও বশতাপন্ন vassal ছিলেন না। অথচ কেহ সমাজের মধ্যে অত্যাচার বা অন্যায় আচরণ করিলে তাহার প্রতীকার সমাজের নিজের হাতেই ছিল। এখন এই উৎকট individualism ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দিনে তোমরা পুলিস ও ইংরাজের আদালতের আশ্রয় লইয়া তোমাদের নিজের সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা কর। এখন সমাজের নিজের কোথাও এমন শক্তি নাই যে, সে নিজের ভিতরকার দোষ সারিয়া লইতে পারে। তখন সমাজের মধ্যে সে শক্তি ছিল, এবং অনেক সময়ে সাধারণ কল্যাণের উদ্দেশ্যে তাহা নিয়োজিত হইত। আমার পিতামহের কথা বলিয়াছি; তাঁহাকে সকলেই মানিত। তাঁহার মৃত্যুর পরে কলিকাতায় একাধিক সমাজশাসক দলপতি দেখিতে পাওয়া গেল। সকলেই অভিজাত শ্রেণীর বড়লোক। তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রভাব কলিকাতার সমাজের এক-এক অংশের উপর বিস্তৃত ছিল। স্যর রাধাকান্ত দেব, ছাতুবাবু (আশুতোষ দেব) প্রত্যেকেই এক-এক দলপতি ছিলেন। আমাদের যে স্বদেশী সভ্যতা culture পুরুষ-পরম্পরাগত চলিয়া আসিতেছিল, ইঁহারা তাহার পোষকস্বরূপ ছিলেন। ইঁহারা প্রত্যহ রীতিমত সভা করিয়া বসিতেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী সেই সভা অলঙ্কৃত করিতেন। কত সুমিষ্ট শ্লোকের আবৃত্তি হইত, রস সাহিত্যের কত ঢেউ খেলিয়া যাইত, তাহা তোমায় আর কি বলিব। ভাল-ভাল গায়ক ও বাদ্যকর সভায় যে গান-বাজনা শুনাইতেন, তাহা সভাস্থ সকলেই উপভোগ করিতে পারিতেন। কারণ, এই সকল সংস্কৃত রস-সাহিত্যের আখ্যান-বস্তু, এই সমস্ত গান-বাজনা, আমাদের স্বদেশী সভ্যতার মর্ম্মস্থান হইতে উৎসারিত হইয়াছে; আর স্মরণ রাখিও যে, সেই স্বদেশী culture সমাজের সকল স্তরেই ছিল। ছিল বলিয়াই সকলের স্বভাব-চরিত্রে, আচার ব্যবহারে তাহার প্রভাব প্রকাশ পাইত। ছিল বলিয়াই এই সমস্ত গান-বাজনা ও রসসাহিত্যের সকলেই সমজদার ছিল। অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে যে বিনয়, নম্রতা ও অন্যান্য সদ্‌গুণ ছিল, তাহাতেই বুঝা যাইত যে, সেই স্বদেশী সভ্যতার প্রভাব কত বেশী ছিল। আসল কথা এই যে, সর্ব্বত্রই authority মানিয়া চলার অভ্যাস এমন দাঁড়াইয়া গিয়াছিল যে, দলপতির সমাজ-শাসন-কার্য্য খুব সহজেই নিষ্পন্ন হইত। তবে দলপতিদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল; কখন-কখনও দলাদলির ও বিরোধের লক্ষণ দেখা যাইত। ছাতুবাবুর দলের সঙ্গে আমাদের দলের বিরোধ মাঝে-মাঝে প্রকাশ পাইত; কিন্তু দু' এক জন্

ভদ্রলোক দুই সভাতেই যাতায়াত করিত ; ক্রমশঃ হয় ত তাহারা এক দল ছাড়িয়া অন্য দলভুক্ত হইয়া পড়িত। এই অভিজাত-শ্রেণীর বড়লোকদের চরিত্রে যে কোনও দোষ ছিল না, তাহা নহে। একটা মহৎ দোষ ছিল ; অনেকেরই উপপত্নী ছিল। কিন্তু তখনকার সমাজ তাহা নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচনা করিত না ; এবং তজ্জন্য তাঁহাদের authority-র কিছুমাত্র লাঘব হইত না ; সমাজের উপর তাঁহাদের প্রভাব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইত না। তাঁহাদের চরিত্রে অন্য অনেক ভাল গুণ ছিল ; সুতরাং কেহ তাঁহাদের শাসন মানিয়া চলিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিত না।

"আজকালকার ডিমোক্রেসির দিনে কেহ কাহারও authority মানিতে প্রস্তুত নহেন। সকলেই স্ব-স্ব-প্রধান। সকলেই চরিত্রে যেন একটা ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায় : সেইটাকে তাঁহারা স্বাধীনতা বলিয়া মনে করেন ; এবং সেই কল্পিত independence-এর গর্ব্ব করেন। এই স্বাধীনতা তাঁহারা দেখান,– কোথায় ? গৃহের মধ্যে। জ্যেষ্ঠের authority মানিয়া চলিলে এই স্বাধীনতা বজায় রাখা চলে না—অতএব যত কিছু স্বাধীনতা প্রকাশ কর ঘরের মধ্যে, বয়োজ্যেষ্ঠের বিরুদ্ধে। ঘরের বাহিরে অকারণে অথবা সামান্য কারণে বিদেশীর পদানত হইতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ কর না ; সেখানে তোমার কিছুমাত্র স্বাধীনতা দেখাইবার চেষ্টা নাই ; যত তোমার independence of spirit ঘরের মধ্যে ! তুমি স্বদেশী হইবার স্পর্দ্ধা কর কিসে ? তোমার স্বদেশ বলিয়া কোনও কিছু জ্ঞান থাকিলে তবে ত তুমি স্বদেশী বলিয়া পরিচয় দিতে পারিতে। তুমি patriotism-এর আস্ফালন কর ! তোমরা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব-প্রধান ; স্বদেশের সঙ্গে কোথায় তোমাদের সংযোগ আছে ? দেশের সমাজের কোনও স্তরের কাহারও বেদনায় কখনও ব্যথা বোধ করিয়াছ কি ? স্বদেশী সভ্যতাকে শ্রদ্ধার:চক্ষে দেখিয়াছ কি ? তোমাদের এই ডিমোক্রেসির যুগের পূর্ব্বে যাঁহারা স্বদেশী culture-এর মধ্যে গড়িয়া উঠিতেন, যাঁহারা সমাজের ভিতর authority মানিয়া চলিতেন, আভিজাত্যের সংস্পর্শেও তাঁহাদের প্রকৃত স্বাধীনতা খর্ব্ব হয় নাই ; তাঁহারা খাঁটি স্বদেশী ছিলেন ; patriotism তাঁহাদের শুধু কথার কথা ছিল না। তোমরা এখন স্বদেশী ফলাও, patriotism ফলাও ! কোনও কিছু বিশেষ পড়াশুনা না করিয়াও বিদ্যা ফলাও ! এই ফলানো তোমাদের একটা রোগে দাঁড়াইয়াছে। আর মজা এই যে, তোমরা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছ যে, তোমরা খুব স্বদেশী, খুব patriot, খুব পণ্ডিত ! কেন তোমরা এমন করিয়া আত্মবঞ্চনা কর, এইটাই আশ্চর্য্য ! সমাজের disintegration-এর দরুণ তোমরা দায়ী না হইতে পারে ; কিন্তু প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রকাশ করিবার জায়গা কি ঘরের মধ্যে ? যেটা উচ্ছৃঙ্খলতা, সেটাকে স্বাধীনতা, independence of spirit বলিয়া জাহির করিতে লজ্জাবোধ কর না কেন ? দেশের হাওয়া যে কত

বদলাইয়া গিয়াছে, লোকের মতিগতি কতদূর বিকৃত হইয়াছে, তাহা আমি বুঝিতে পারি ; এবং বুঝিতে পারি বলিয়াই বেদনাবোধ করি। তোমরা সহজে বুঝিতে পার না যে, তোমাদের পক্ষে স্বদেশী হওয়া, patriot হওয়া কত শক্ত। ইহার জন্য তোমাদের ইস্কুল-কলেজের শিক্ষাব্যবস্থা কতটা দায়ী, তাহাও তোমাদের বুঝিবার সামর্থ্য নাই।

"ইস্কুল-কলেজের সঙ্গে আমার পরিচয় খুব অল্প। লেখাপড়া বাড়ীতেই করিতাম। কিছুদিন বাঙ্গালা পড়িয়া একেবারে সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আরম্ভ করিয়া দিলাম। তখন ছোট-ছোট ছেলেদের পড়িবার উপযোগী বাঙ্গলা বই বড় বেশী ছিল ছিল না। একখানা বইয়ের নাম আমার মনে আছে,'নীতিকথা'[১]। বাড়ীতে পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে পড়িতাম। ক্রমশঃ মুগ্ধবোধ পার হইয়া রঘুবংশ, কুমারসম্ভব শেষ করিলাম। আর বাড়ীতে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া গেল না। স্কলার্শিপ পরীক্ষা দিবার জন্য লেখা-পড়া করা, ইহা আমার কখনও ভাল লাগিত না। দুই বছর সেণ্ট্ পল্স্ ইস্কুলে পড়া হইল। স্কলার্শিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে প্রবেশ করিলাম। প্রেসিডেন্সি কলেজের তখন কি নাম ছিল মনে নাই ;[২] যাহা হৌক সেই কলেজে পড়াশুনা আরম্ভ হইল। পাস করিবার জন্য পড়িতে হইবে, এ আমি কিছুতেই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলাম না। ইতিহাসের পুস্তকখানা এত নীরস ছিল, সে বইখানার একটি পাতাও উল্টাইয়া দেখিলাম না। অঙ্ক আমার ভাল লাগিত ; কিন্তু ক্লাসের বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে অঙ্ক কসা ও গণিত শাস্ত্র অধ্যয়ন করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার ভাল লাগিত Trigonometry ও Mensuration ; বাড়ীতে ইচ্ছামত আমি তাহাই আলোচনা করিতাম। মেটকাফ্ হল্ হইতে যত ইচ্ছা বই লইতে পারিতাম ; কারণ ঐ লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার সময় আমাদের বাড়ী হইতে অনেক টাকা দেওয়া হইয়াছিল। এখন আর সে রকম বই আনা বোধ করি চলে না ; লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষীয়েরা সম্ভবতঃ গোড়ার কথা সব ভুলিয়া গিয়াছেন। আমার যাহা ভাল লাগিত, আমি তাহা বাড়ীতে বসিয়া পড়িতাম ; হয় ত কোন-কোনও দিন স্কুল কামাই করিতাম। ইংরাজ যখন আমাদের বলে, 'তোমাদের home বলিয়া কোনও জিনিষ নাই ; আমাদের home sweet home, আমাদের fireside-এর সমান তোমাদের কিছু নাই,'—তখন আমার মনে হয় যে, এরা বলে কি! আমাদের home নাই, ত কার

---

[১] 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি'র অনুরোধে তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেন ইংরেজী ও আরবী হইতে একত্রিশটি কাহিনী বাংলায় অনুবাদ করিয়া ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রকাশ করেন। (দ্রঃ ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত')—সং

[২] হিন্দু কলেজ ; হিন্দু কলেজ ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন হইতে প্রেসিডেন্সি কলেজ ও হিন্দু স্কুলের রূপ নেয়।—সং

কাছে? অন্ততঃ আমার কাছে আমার বাড়ী যে কি আনন্দের জিনিষ ছিল, সে আর তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব? আমার বাড়ী আমার কাছে স্বর্গ ছিল। কিন্তু কলেজের পড়া একেবারে না করিয়া পরীক্ষা দিয়া উপরের ক্লাসে উঠা দুষ্কর; বাঙ্গালার অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র আমাকে বাঙ্গালায় বেশী নম্বর দিয়া সে যাত্রা উদ্ধার করিলেন। এই রামচন্দ্র মিত্র একটি character! সে যে কি রকম character তা' আমি তোমাকে বুঝাইতে পারিব না; ভাঁড় বলিলেও ঠিক হয় না; অথচ সে এক কিম্ভূত-কিমাকার ব্যাপার! তিনি মাঝে-মাঝে আমাদের বাড়ীতে কর্ত্তাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন। ভাগ্যে কোন রকম করিয়া প্রোমোশন পাইলাম; নইলে বাড়ীতে কৈফিয়ৎ দেওয়া শক্ত হইত। কিন্তু পুনরায় বাৎসরিক পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে কলেজ পরিত্যাগ করিলাম। উত্তরপাড়ার প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় কলেজে আমার সতীর্থ ছিলেন। আর একজন আমার সহপাঠি ছিলেন,—রমেশচন্দ্র মিত্র। সিপাহী বিদ্রোহের বছর দুই পূর্ব্বে আমি কলেজ ত্যাগ করিলাম।

"সিপাহী বিদ্রোহের কিছু পরে আমার 'মেঘদূত' প্রকাশিত হইল।[১] আগে বরাবর আমি বাঙ্গালা কবিতা লিখিতাম। কবিতা রচনার দিকে আমার খুব ঝোঁক ছিল; তা'র মধ্যে হয় ত হাল্‌কা রকমের রঙ্গরসের কবিতাও ছিল। বাল্যকাল হইতে ছবি আঁকার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম; আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল আমি painter চিত্রকর হইব; কিন্তু ভাল করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করার অভাবে আমাব সাধ পূর্ণ হইল না। মেঘদূতে আমার নাম ছিল না। অনেকেই নিজেব নিজের কবিতাপুস্তকে একটু-আধটু করিয়া লইয়া বেমালুম চালাইয়া দিতে লাগিলেন; এমন ভাবে চালাইলেন যেন উহা তাঁহাদের স্বরচিত জিনিষ। কেহ একটু চেষ্টা করিলেই যে আমার নাম জানিতে পারিতেন না এমন নহে। বিদ্যাসাগর কেমন করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং শুনিয়াছি প্রশংসাও করিয়াছিলেন।

"এই যে পরের জিনিষ বেমালুম নিজের বলিয়া চালাইয়া দেওয়া, এ দোষ আমাদের দেশে আছে। অর্দ্ধশতাব্দী অধিক হইয়া গেল, আমার 'তত্ত্ববিদ্যা' বাহির হইয়াছিল।[২] আমাদের দেশে আমি যে ভাবে বাঙ্গালায় দার্শনিক আলোচনা করিয়াছিলাম, সে রকম আমার পূর্ব্বে আর কেহ করেন নাই। 'তত্ত্ববিদ্যা' প্রকাশিত হইবার অনেক পরে কালীবর বেদান্ত-বাগীশের লেখার সমালোচনা করিয়া, 'তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক?' নাম দিয়া একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। কিন্তু আমার 'তত্ত্ববিদ্যা' সকলের পূর্ব্বে রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত

---

[১] ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে।—সং

[২] ১ম খণ্ড: ১৮৬৬, ২য় খণ্ড: ১৮৬৭; ৩য় খণ্ড: ১৮৬৮, ৪র্থ খণ্ড: ১৮৬৯।—সং

হইলে পর নবগঠিত সমাজের জন্য একটা philosophy আবশ্যক বলিয়া বোধ হইল। কি করিয়া সেই philosophy দাঁড় করান যায়, তাহা লইয়া অনেকেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আমাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের। তিনি তাঁহাদিগকে 'তত্ত্ববিদ্যা' পড়িতে বলেন। 'সাধারণে'র দল যাহা খুঁজিতেছিলেন পাইলেন; তাঁহাদের নূতন philosophy প্রকাশিত হইল। বেশ; তাহা লইয়া কোনও বাদবিসম্বাদের কথা হইত না, যদি সব দিক বজায় রাখিয়া কাজ করা হইত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের ইতিহাস-পুস্তকে কোথাও ঋণ স্বীকার করেন নাই! অথচ এত বেশী মিল আছে,—শুধু যে ভাষায় তাহা নহে, আগাগোড়া তর্কের ধারায়—যে তুমি দেখিলে বিস্মিত হইয়া যাইবে। আমার খুব ইচ্ছা হইয়াছিল যে, আগাগোড়া সমস্তটা আমি ধরাইয়া দি। তবে ও-সব কাজ আমার কখনই ভাল লাগে না, তাই কিছু করি নাই। আমি আপন আনন্দে লিখিয়া যাই; কে কোন্ জিনিষটা না বলিয়া গ্রহণ করিল, সে সব খোঁজ রাখা কি আমার কাজ! তবে কথাগুলো ক্রমশঃ আমার কাণে আসিলে আমি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখি যে ঠিক বটেই ত! কিন্তু সে কথা লইয়া আর গোলমাল করিতে ভাল লাগে না।

"তবে ঋণ স্বীকার না করিয়াও এমন ভাবে একটা idea নিজের রচনার মধ্যে চালাইয়া দেওয়া যায় যে, তাহাতে বিস্ময় হইতে পারে কিন্তু রাগ হয় না। আমি যখন প্রথম 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' রচনা করিতে আরম্ভ করি, তাহার কোনও কোনও অংশ বঙ্কিমবাবুকে পাঠাইয়াছিলাম, তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশ করিবার জন্য। তখনকার 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' আর এখনকার 'স্বপ্ন-প্রয়াণে' অনেক তফাৎ। আমার পুস্তকে কতকগুলো কাল্পনিক ছবির সমাবেশ ছিল। বঙ্কিমবাবু বোধ হয় সেগুলো ছাপান নাই, এক-আধটা ছাপাইয়াছিলেন কি না আমার স্মরণ নাই।[১] কিন্তু তাঁহার 'বিষবৃক্ষের' মধ্যে ঠিক সেই রকম ছবির অবতারণা করিয়া বসিলেন। তফাতের মধ্যে দাঁড়াইল এই যে, যাহা স্বপ্নে অশোভন হয় না, তাহা বাস্তব জগতে, গৃহস্থ-চিত্রে, বিশেষতঃ হিন্দু গৃহস্থচিত্রে অত্যন্ত অশোভন হইয়া দাঁড়াইল। নগেন্দ্রনাথের ঘরের মধ্যে সেই রকম ছবি থাকিতে পারে; কিন্তু বাড়ীর মধ্যে গৃহস্থ-বধু গাড়ী হাঁকাইলেন, এ চিত্র একেবারেই সুশোভন হইল না। কিন্তু এই রকম চিত্র-সমাবেশের idea-টা যে তিনি আমার রচনা হইতে পাইতেছিলেন, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু অন্যত্র গুরুশিষ্য খাড়া করিয়া যে ভাবে দার্শনিক আলোচনা করিতে

---

[১] ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহা পুস্তকাকারে বাহির হয়; ইহার প্রথম সর্গটি ১২৮০ সালের (১৮৭৩ খ্রীঃ) শ্রাবণ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত হয়। (দ্রঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর')—সং

বসিলেন, তাহার বহু পূর্ব্বে ঠিক ঐভাবে ঐরকম আলোচনা আমিও করিয়াছিলাম।[১] বঙ্কিমবাবু ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন যখন তাঁহার 'কৃষ্ণচরিত্রে'র সমালোচনা আমি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় করিলাম। তিনি তখন 'প্রচারে'র সম্পাদক, আমি 'পত্রিকা'র সম্পাদক। পত্রিকায় সমালোচনা বাহির হইবার পর তিনি প্রচারে এমনভাবে লিখিলেন যেন সমালোচনা আমার লেখা নহে—কর্ত্তা স্বয়ং লিখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু বাবা তখন অত্যন্ত পীড়িত। তাঁহার সঙ্গে তখন আমি চুঁচুড়ায় ছিলাম বটে; কিন্তু তিনি দোতালার শয্যাগত ছিলেন। তিনি আমাকে এইটুকু মাত্র বলিয়াছিলেন—'দেখ, বঙ্কিম যে রকম করে কৃষ্ণচরিত্রের আলোচনা করচে, তা'র একটা প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক।' তাই আমি প্রতিবাদ করিয়া পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম। সে সমালোচনায় কর্ত্তার কোনও হাত ছিল না; আগাগোড়া আমাব নিজের।

"কেন বঙ্কিম দুটো কৃষ্ণের অবতারণা করিলেন, এবং এক কৃষ্ণকে আদর্শ পুরুষ বলিয়া দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিলেন? বঙ্কিমচন্দ্র শেষাশেষি যতই গীতাভক্ত হউন না কেন, তিনি অনেক দিন ধরিয়া পাকা positivist ছিলেন। Positive Philosophy যাহাই হোক না কেন, শুধু মানুষকে লইয়া একটা Positive religion দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিলে চলিবে কেন? Religion কি অমনি গড়িয়া তুলিলেই হয়? Positivist চাহিল একজন grand man মহাপুরুষ। বঙ্কিমবাবু ভাবিলেন, এই ত আমার হাতের কাছে একজন grand man রহিয়াছেন; যেমন বিষয়বুদ্ধি, তেমনি পরমার্থজ্ঞান, এই রকম চৌকোস মানুষ দরকার। অতএব আমাদের দেশে Positivist religion দাঁড় করাইতে হইলে শ্রীকৃষ্ণকে grand man করিলেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইবে। তবে বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণকে আর মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে এক করিলে চলিবে না। ফলে দাঁড়াইল বঙ্কিমের কৃষ্ণচরিত্র।

"আর্য্য সভ্যতার অতি প্রাচীন তথ্যগুলি সম্বন্ধে ভাল করিয়া আলোচনা হওয়া আবশ্যক। নানাদিক হইতে বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচিত হইলে একদিন আসল সত্য বাহির হইয়া পড়িবে। এই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বও সেই রকম আলোচনার জিনিষ।"

আচার্য্য মহাশয় একটু চুপ করিলেন। বারাণ্ডার বাহিরে কানন প্রান্তর জ্যোৎস্নাপ্লাবিত। আমি বলিলাম, "ছান্দোগ্য উপনিষদে দেবকীনন্দন বাসুদেবের উল্লেখ দেখিতে পাই; ঘোর আঙ্গিরস ঋষি দেবকীনন্দন বাসুদেবকে অমৃতের আস্বাদ দিয়াছিলেন।"

[১] "অধ্যাত্ম বিদ্যার প্রথম প্রস্তাব" ('ভারতী', আশ্বিন ১২৮৭) এবং "দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ" ('ভারতী ও বালক', ভাদ্র ১২৯৩)। (দ্রঃ 'দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর'—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)—সং

তিনি বলিলেন, "দেবকীনন্দন বাসুদেব আছে? তা' হবে; আমার ঠিক স্মরণ নাই। অনেক পরে শ্রীকৃষ্ণের যে tradition গড়িয়া উঠিল, তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই এই দেবকীনন্দন বাসুদেব ঢুকিয়া গেল। অতি প্রাচীন tradition এই রকমেই গড়িয়া উঠে। যাহা হোক, কেন যে দুইটি শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে হইবে তা' ত আমি বুঝিতে পারি না। বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণকে মিলাইয়া লওয়া যায় না কি? আমার মনে ত কোনও জায়গায় বাধা লাগে না। এ সম্বন্ধে আমার একটা থিওরি আছে। আমার মনে হয়, কোন এক অতি প্রাচীন যুগে ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণ অত্যাচারী ক্ষত্রিয় রাজাদের হাত হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য আভীর গোপ প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকের সঙ্গে খুব মিশিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই মিশিয়াছিলেন। রাজার অনুচর তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল। তিনি পুতনা রাক্ষসী, কালীয় নাগকে নষ্ট করিলেন। গোড়া হইতেই তাঁর একটি বড় গোছের দল ছিল। তাই তিনি উৎপীড়িত প্রজাবর্গের পক্ষ অবলম্বন করিয়া দুষ্টের দমন করিয়া জনসাধারণের অত্যন্ত প্রিয় হইলেন। তিনি নিশ্চয়ই আভীর গোপ-পল্লীমধ্যে সকলের সঙ্গে খুব মিশিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ ও ব্রাহ্মণগণ বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নামে নানা অপবাদ রটাইতে আরম্ভ করিলেন; তাঁহার চরিত্রে নানাপ্রকার কলঙ্ক দিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। ব্রাহ্মণ ভৃগু তাঁহার বক্ষে পদাঘাত করিলেন। তিনি তাহাতেও বিচলিত হইলেন না। রামচন্দ্র যেমন ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিতেন; যাহাতে ব্রাহ্মণের যজ্ঞ নষ্ট না হয় সে বিষয়ে যত্ন করিতেন; দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ ত সে রকম কিছুই করিলেন না; তিনি বরং দুষ্ট ক্ষত্রিয় রাজগণকে দমন করিতে লাগিলেন; ব্রাহ্মণের আদেশমত চলা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না; নিম্নশ্রেণীর আভীর গোপ প্রভৃতির সঙ্গে মিশিয়া গেলেন। ক্ষত্রিয়ের ছেলে হইয়া নিম্নশ্রেণীর লোকেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। ফরাসি বিপ্লবের প্রারম্ভে ডিউক অভ অর্লিন্‌স্ যদি জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে না মিশিতেন, তাহা হইলে ফরাসী বিপ্লব অত জোরের সহিত হইত কি না সন্দেহ। আর শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র যদি খারাপ হইবে, তাহা হইলে সহসা অত সহজে একেবারে বৃন্দাবন ত্যাগ করা যাইত কি? মথুরা হইতে দূত আসিল, আর অমনি চলিয়া গেলেন! একটুও ইতস্ততঃ করিলেন না! মথুরায় তিনি রাজা হইলেন। বৃন্দাবনে আবার তাঁহাকে ফিরাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা হইল। জনসাধারণের পক্ষ হইতে এই যে ফিরাইবার চেষ্টা, ইহা কি কোন দুশ্চরিত্র লম্পটের জন্য সম্ভবপর হয়? পরবর্ত্তী যুগের বুদ্ধ অবতারের পথ শ্রীকৃষ্ণ অবতার প্রশস্ত করিয়া দিলেন। রামচন্দ্র ব্রাহ্মণের যজ্ঞরক্ষা করিয়াছিলেন; ব্রাহ্মণ তাঁহাকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। শ্রীকৃষ্ণ

সমাজের নিম্নশ্রেণীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া দুষ্ট ক্ষত্রিয়ের দমন করিলেন; ব্রাহ্মণের ক্রোধ উদ্দীপিত করিলেন; জনসাধারণ তাঁহাকে অবতার বলিয়া গ্রহণ করিলেন; কিন্তু তিনি শেষ পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ের সংসর্গ ত্যাগ করেন নাই। দুষ্টের দমন করা তাঁহার জীবনের ব্রত; বিশেষতঃ দুষ্ট ক্ষত্রিয়ের দমন আবশ্যক। শিশুপাল গেল, জরাসন্ধ গেল, কুরু-কুল ধ্বংস হইল। তিনি স্বয়ং মহাপরাক্রান্ত ছিলেন। সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ক্রমশঃ তাঁহার সখ্য লাভ করিবার জন্য সকলের খুব চেষ্টা হইল। দুর্য্যোধনকে তিনি তাঁহার নারায়ণী সেনা দিয়া কতকটা সন্তুষ্ট করিলেন; নিজে পাণ্ডবের সখা হইয়া রহিলেন। শেষ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ দুষ্ট ক্ষত্রিয়ের নিধনে সহায়তা করিলেন, এমন কি দ্বারকায় যদুবংশের ধ্বংস পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিতে হইল। বুদ্ধ অবতারেব আবির্ভাবে আর কোন বাধা রহিল না। ব্রাহ্মণের যজ্ঞবক্ষা করার আবশ্যকতা আর নাই; দুষ্ট ক্ষত্রিয়ের দমন হইয়া গিয়াছে; এখন যিনি অবতার হইবেন, তিনি সমগ্র জনসাধারণকে মুক্তির পথে লইয়া যাইবেন। হয় ত তাঁহাকেও রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে কিন্তু রাজার দুষ্কৃতির বিচার-ভার তাঁহাকে লইতে হইবে না। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আরও একটু ভাবিয়া দেখ। মুক্তিব জন্য ভক্তের কোনও যাগ-যজ্ঞ, সন্ধ্যা-গায়ত্রীর প্রয়োজন নাই। শুধু নামকীর্ত্তন করিলেই মুক্তি হইবে। মুক্তিব এমন সহজ উপায় না করিয়া দিলে ব্রাহ্মণেতব সমস্ত শ্রেণীর পক্ষে সুবিধা হইত না।

"এই ত মোটামুটি আমাব থিওবি। হয় ত সব দিক হইতে কৃষ্ণতত্ত্ব ভাল কবিয়া বিচার করিলে নূতন আলো পাওয়া যাইতে পাবে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আমি যতদূব বুঝিতে পাবিতেছি, তাহাতে ব্রজের কৃষ্ণ ও মহাভাবতের কৃষ্ণকে দুজন সম্পূর্ণ আলাদা ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করাব চেষ্টা অনাবশ্যক। যদি বাস্তবিক কোনও এমন বিষম অসামঞ্জস্য থাকে যে, কিছুতেই দুয়েব মধ্যে চরিত্রগত ঐক্য সম্ভাবিত হইতে পারে না, তাহা হইলে অবশ্যই জোব কবিয়া মিলাইবার চেষ্টা করা বৃথা। কিন্তু আমার ত মনে হয় না যে, দুইয়ের মধ্যে এমন কিছু অনৈক্য আছে। Positivist religion-এর জন্য যদি আদর্শ পুরুষ দবকার হইয়া থাকে, তাহা হইলে আবশ্যক মত শ্রীকৃষ্ণকে কাটিয়া-ছাঁটিয়া দাঁড় করান কেন চাই, ইহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। বঙ্কিমবাবু রাগ করিলেন; এবং অকারণ কর্ত্তার নাম করিয়া শ্লেষ করিবার চেষ্টা করিলেন!"

রাত্রি ক্রমশঃ অধিক হইল, অথচ উঠিতে ইচ্ছা করে না। এ সকল কথা শুনিবার সুযোগ সহজে হয় না। অথচ বুঝিতে পারিতেছি, বক্তা ক্লান্ত হইয়াছেন। তবুও একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল। অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে তাঁহার প্রথম পরিচয় কেমন করিয়া হইল?

তিনি বলিলেন, "সে আমি কেমন করিয়া বলিব? বহু পূর্ব্ব হইতেই তিনি আমাদের বাড়ী আনাগোনা করিতেন; কবে যে তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াছি, সে কথা আমার স্মরণ নাই। অনেক দিন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার তিনি একজন প্রধান লেখক ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য বলিয়া তাঁহাকে আমরা জানিতাম। ক্রমে তিনি নাস্তিক হইয়া বিদ্যাসাগরের দলে মিশিলেন। বিদ্যাসাগরের কথায় তিনি চারুপাঠ প্রভৃতি বই লিখিতে আরম্ভ করিলেন। আমাদের বাড়ীতে তাঁর যাতায়াত প্রায় বন্ধ হইল।"

প্রশ্ন করিলাম—"বিদ্যাসাগর কি বাস্তবিক নাস্তিক ছিলেন?" উত্তর হইল—"ঐ এক রকমের নাস্তিক ছিলেন, যাকে বলে অজ্ঞেয়বাদী। এই অজ্ঞেয়বাদী আমি কিছুতেই সহ্য করিতে পারি না। অজ্ঞেয় বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিব কেন? অচিন্তনীয় বলিতে পার; কিন্তু তাঁহাকে অজ্ঞেয় বলিব কেন? যেটা আমার অনুভূতির সামগ্রী, সেটাকে হয় ত আমি বাহিরে present করিতে পারি না; খানিকটা represent করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতে পারি। সব জিনিষই কি বাহিরে আমরা present করিতে পারি? Represent করা ছাড়া আমাদের উপায় কি আছে? তোমার বেদনা হইয়াছে, সেটা তুমি কেমন করিয়া আমার কাছে present করিবে বল দেখি? তোমার অশ্রু তাহা represent করে মাত্র। কিন্তু তোমার বেদনা তোমারই অনুভূতির সামগ্রী হইয়া রহিল: তাহার presentation হওয়া অসম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া কি তোমার বেদনাকে অজ্ঞেয় বলিব? ইউক্লিডের লাইনকে present করিতে পারা যায় কি? কাগজে কসি টানিলেই তাহার breadth থাকিয়া যাইবে। কিন্তু তবুও ত আমরা সেটাকে represent করিবার চেষ্টা করি। ইউক্লিডের লাইন কি আমাদের অজ্ঞেয় রহিয়া গেল? Materialism চাও? আচ্ছা; ক্ষতি নাই; একবার চেষ্টা করিয়া দেখ দেখি। আমাকে, তোমাকে, প্রত্যেক sentient being-কে বাদ দিয়া শুধু material জগৎ একবার খাড়া করিয়া রাখিবার চেষ্টা কর দেখি। কিছু কোথাও থাকে কি? জর্ম্মণ পণ্ডিত কাণ্ট্ বুদ্ধির সাহায্যে এই জগৎ-তত্ত্ব বুঝিতে গিয়া একটা vicious circle-এর বিষম আবর্ত্তে ঘোরপাক খাইয়া শেষে হাল ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার অন্ধকার কিছুতেই ঘুচিল না। শঙ্কর কিন্তু যে পথ ধরিলেন, সেখানে অন্ধকার নাই, পরিষ্কার আলো। তিনি বলিলেন,—ঐ প্রকৃতির লীলা দেখিয়া তত্ত্বজ্ঞান পাইবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। প্রকৃতির লীলার কোন্‌খানে সত্য আছে, আজও তোমরা বলিতে পার কি? Electricity, space, atom প্রভৃতি যে সকল শব্দ ব্যবহার করিয়া একটা কিছু বুঝাইবার চেষ্টা কর, আজ পর্য্যন্ত তাহা ধ্রুব এবং সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে কি? প্রকৃতির কোন জিনিষটা শেষ পর্য্যন্ত খাঁটি, অভ্রান্ত, সৎ বলিয়া দাঁড়াইয়াছে? শঙ্কর বলিলেন,—

প্রকৃতির লীলাকে খবরদার বিশ্বাস করিও না ; ওকে বুঝিবার সাধ্য কাহারও নাই। এই জন্য ওকে আমি অবিদ্যা বলিতে চাই। বুদ্ধির দ্বারা উহার ভিতর হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার চেষ্টা নিষ্ফল হইবে ; উহা অবিদ্যা, মায়া। মায়া, illusion তোমাকে ফাঁকি দিবেই দিবে। কাণ্ট্ যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়া গেলেন। শঙ্কর ও-পথ একেবারেই ধরিলেন না। প্রমাণ ও প্রমেয়, উভয়ের সত্তা এক বলিয়া তিনি ধরিলেন। আগাগোড়া বিচার করিয়া তিনি যেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন সেখানে আর কিছুমাত্র অন্ধকার নাই। আসল কথাটা শঙ্কর যেমন ধরিয়াছেন, তেমন আর কেহ ধরিতে পারেন নাই। এখন, যে-আমি না থাকিলে জগৎ থাকে না, সৃষ্টি মিথ্যা হয়, সে-আমি কি একটা accident ? সমস্ত সৃষ্টিতত্ত্বটা কি একটা accident-এর উপর নির্ভর করিতেছে ? তা যদি না হয়, তবে ?”

আমি বলিলাম—“যখন শঙ্করের কথাটা উঠিল, তখন আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। উপনিষদে যে সত্যকাম জাবালের উপাখ্যান আছে, তাহাতে লেখা আছে ‘নাহমেতদ্ বেদ তাত যদ্‌গোত্রস্ত্বমসি বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে সাহমেতন্ন বেদ যদ্‌গোত্র ত্বমসি’ ; শঙ্কর ব্যাখ্যা করিতেছেন,—জবালা বলিলেন, বৎস, যৌবনে দরিদ্র স্বামিগৃহে বহু অতিথির পরিচর্য্যা করিতে হইত ; সেই সময় তোমাকে লাভ করিয়াছিলাম ; গোত্র জানি না। কেন জানি না ? এই প্রশ্ন যদি উঠে, তদুত্তরে শঙ্কর বলিতেছেন, অতিথিসেবায় দিন-রাত এত ব্যস্ত থাকিতে হইত যে, স্বামীকে গোত্রের কথা পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। অবশ্যই আসল text-এর ভিতর এ সকল কিছুই নাই। কালীবর বেদান্তবাগীশও এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন ; কিন্তু আমার যেন মনে হয়, এটা একটা white-washing-এর চেষ্টা। আপনার কি মনে হয় ?”

কিঞ্চিৎ উত্তেজিত স্বরে তিনি উত্তর করিলেন—“আমার কি মনে হয় ? শঙ্কর ঐ রকম ব্যাখ্যা করিয়াছেন বলিয়াই কি তাহা নির্ব্বিচারে মানিয়া লইতে হইবে ? দরিদ্র স্বামিগৃহে জবালার যদি পুত্র জন্মিয়া থাকে, তবে অত ঘুরাইয়া আভাসে সে কথা জানাইবার আবশ্যকতা কি ছিল। উপনিষদের ভাষায় ত কোথাও বিশেষ ঘোরপ্যাঁচ নাই। সমস্তটার context-ছাড়া একটা মানে করিলে চলিবে কেন ? যৌবনে দরিদ্র পরিচারিকার একটি ছেলে হয়েছিল ; এটা ত কিছু বিশেষ অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। স্বামিগৃহে পরের সেবা করিতে এত ভুল হইয়া গেল যে, গোত্র পর্য্যন্ত জানা হইল না ? ও-ব্যাখ্যা আমি কিছুতেই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নই। সত্যবাদী জাবাল সত্যকামের ব্রাহ্মণত্বের বিশিষ্টতা উপনিষদের ভাষায় যেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমন আর কিছুতে হইতে পারে না। বাস্তবিক যদি বিবাহিতা পত্নীর গর্ভে জন্ম হইয়া থাকে, তাহা খুব

সহজেই বুঝান যাইতে পারিত। হোক উহা শঙ্করের ব্যাখ্যা, তবু ও-ব্যাখ্যা আমি মানিতে পারি না।

"শঙ্করের কথা আলোচনা করিতে-করিতে ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে reform-এর কথা আমার মনে আসে। পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি যে, আমাদের সে-কালের সমাজের একটা প্রধান দোষ ছিল; ঐ সব reform-এর বিরুদ্ধে সে কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইত। কিন্তু তাই বলিয়া কখনও কি এ দেশের ধর্ম্মে বা সমাজে সংস্কারের movement হয় নাই? সে সকল movement সমাজের ভিতর হইতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া তবে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল। একেবারে পুরাতন সমাজকে অগ্রাহ্য করিয় নূতন কিছু করিবার চেষ্টা করিলে তাহা নিঃসন্দেহ ব্যর্থ হইবে। ফুলকে ডালসুদ্ধ গাছ হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া কাচের ফুলদানির মধ্যে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখিলে তাহার যে অবস্থা হয়, আমাদের গত শতাব্দীর বাঙ্গালার reform movement-এর সেই অবস্থা হইয়াছে। রামমোহন রায়ের সময়ে কিন্তু কেহ কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, এ-রকমটা দাঁড়াইবে। সমাজের ভিতর হইতে সমাজকে সংস্কার না করিলে, কিছুতেই সফল-প্রযত্ন হওয়া যাইবে না, ইহা তিনি বেশ বুঝিতেন। তাই তিনি অনেকটা সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পরে ঘটনা-পরম্পরায় যাহা দাঁড়াইল, তাহার জন্য অনুশোচনা করা বৃথা। ছেলেবেলায় আমার মনে কত আশা, কত আনন্দ, কি enthusiasm ছিল! ভাবিতাম, দেশ ক্রমশঃ প্রবুদ্ধ হইবে, উন্নত হইবে, আপনাকে চিনিতে পারিবে। তাহা হইল না। কেশবচন্দ্র সেন সমস্ত reform movement-টাকে এমন একটা twist, এমন একটা মোচড় দিলেন যে, সব গোলমাল হইয়া গেল। সে সব কথা স্মরণ করিলে মনে বড় ব্যথা পাই। কেশবচন্দ্র উপনিষদের কোনও ধার ধারিতেন না, ভারতবর্ষের প্রাচীন culture-এর ভিতরকার কথা ভাল করিয়া জানা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না; যতটুকু বুঝিতে পারিলেন, সেটুকুকেও পাশ্চাত্য পরিচ্ছদে মণ্ডিত না করিলে তিনি লজ্জিত বোধ করিলেন; নূতন সমাজ গঠিত করিয়া বিলাতি ছাঁচে তাঁহার নাম দিলেন—New Dispensation—নববিধান। এই যে কেশবচন্দ্র বিদেশের দিকে মুখ ফিরাইলেন, একটা উৎকট বিলাতি attitude লইলেন;—এইখানেই সমস্ত reform movement-টা পণ্ড হইবার আয়োজন হইল। তিনি উপনিষদ ছুঁইলেন না, বাইবেল পড়িলেন। তাই কি হিব্রু অথবা গ্রীক শিক্ষা করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন? নব্য ইংরাজি-শিক্ষিত যুবকসম্প্রদায় দলে-দলে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল। তবুও তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা-শুনা বন্ধ হয় নাই। কিছুদিন বেশ কাটিল। ক্রমশঃ তিনি একটা অভাব অনুভব করিলেন। Music না থাকিলে কিছুতেই চলে না। একদিন আমার কাছে আসিয়া তিনি বলিলেন,—'আমি একটু

music শিখ্‌তে চাই; তুমি আমাকে হার্ম্মোনিয়ম শেখাও।' আমি বলিলাম—'বিলাতি হার্ম্মোনিয়ম শিখে তোমার কি হবে? দেশী কীর্ত্তন বরং একটু শেখো, যাতে তোমার একটু কাজ হবে।' কথাটা তাঁর মনে লাগিল। তিনি কীর্ত্তন শিখিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ তাঁর নববিধানে কীর্ত্তনের প্রসার বাড়িয়া গেল। এ দিকে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাছে আনাগোনা করিতে লাগিলেন। যা'ক সে সকল কথা। পরিতাপের বিষয় এই যে, কেহ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন না; অথবা বুঝিবার চেষ্টা করিলেন না যে, reform movement-এর গলদ কোথায় হইল। আমি কিন্তু গোড়া হইতে বেশ বুঝিতে পারিতেছি, যে কোথায় একটা মস্ত ভুল করা হইয়াছে। বহু দিন পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছি; এবং যাঁহারা বড় গোছের চাঁই হইয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহাদিগকে 'মহাত্মা' বলিয়া রঙ্গরস করিতাম। কিন্তু তাঁহারা উল্টে ঐ শব্দ সকলে মিলিয়া আমার উপর এমন ভাবে প্রয়োগ করিতে লাগিলেন যে, ক্রমশঃ তাঁহাদের কাছে আমার নাম শুধু 'মহাত্মা' হইয়া গেল। কেশবচন্দ্রকে লইয়া কিন্তু কখনও আমি রঙ্গ-রহস্য করি নাই। মতের অমিল হইলেও তাঁহার সঙ্গে আমার মনের অমিল কখনও হয় নাই। বাবা যখন প্রথম হার্ম্মোনিয়ম আনাইলেন, সহরের মধ্যে বাঙ্গালী-সমাজে তখন আর কোথাও ঐ বাদ্য-যন্ত্রের চর্চ্চা হইত কি না সন্দেহ। সতু (সত্যেন্দ্রনাথ) ও আমি হার্ম্মোনিয়ম বাজাইতে শিখি। বাঙ্গালায় প্রথম-স্বরলিপি যে আমার রচিত, তাহা একেবারে নিঃসন্দেহ। সৌরীন্দ্রমোহন তাহার পরে তাড়াতাড়ি একটা স্বরলিপি প্রস্তুত করিয়া ছাপাইয়া দিল। দেখ এখন বুঝিতে পারিতেছি যে কতকগুলা বিষয়ে আমি pioneer-এর কাজ করিয়াছি; আমার পরে কেহ-কেহ সেই পথ ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছে। আমি যখন মেঘদূত লিখি, তখন ও-ধরণের বাঙ্গালা কবিতা কেহ লিখিতেন না; ঈশ্বর গুপ্তের ধরণটাই তখন প্রচলিত ছিল। মাইকেল তখন ইংরাজিতে কবিতা লিখিতেন। একদিন হাইকোর্টে আমার ভগিনীপতি সারদাকে[১] তিনি বলিলেন, 'আমার ধারণা ছিল, বাঙ্গালায় ভাল করিয়া কবিতা রচিত হোতে পারে না, 'মেঘদূত' প'ড়ে দেখ্‌চি, সে ধারণা ভুল।' মাইকেল বাঙ্গালা কাব্য-রচনায় মন দিলেন। ঐ যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিনি লিখিলেন, ও আমার কিছুতেই ভাল লাগিল না। রাজনারায়ণ-বাবুর কিন্তু খুব ভাল লাগিত। ইংরাজি সাহিত্যে তাঁর খুব অনুরাগ ছিল কি না, তাই তাঁ'র ঐ ছন্দ অত পছন্দসই হইয়াছিল। আমি অনেক লিখিয়াছি; এই লেখা-পড়া ছাড়া আর আমি জীবনে বড় একটা কিছুই করিতে পারিলাম না; কখনও আমি বিষয়-কর্ম্ম ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না;—বাবা ইদানীং আমাকে কোনও বিষয়-

[১] সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়, মহর্ষির দ্বিতীয়া কন্যা সৌদামিনী দেবীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়।—সং

কর্ম্মে থাকিতে দিতেন না। কিন্তু কখনও কোথাও আমার লেখার মধ্যে বিদেশী হাবভাব idiom তুমি খুঁজিয়া পাইবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মনে যদি এমন কোনও ভাব উদিত হয়, তাহা প্রকাশের উপযুক্ত খাঁটি দেশী ভাষায় প্রকাশ করা যায়,—তাহাকে প্রকাশের জন্য বিদেশী idiom-এর অনুবাদ করিতে যাইব কেন? আমি কখনও ও-পথ মাড়াই নি। আমার লেখার এই বিশিষ্টতা আর কেহ বুঝিতে পারিবে কি না জানি না; কিন্তু কৃষ্ণকমল পারিবে। এক-একবার বক্তৃতা করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। আমার লেখাতেও যে কোনও বিশেষ ফল হইয়াছে, তাহা বলিতেছি না। জ্যোতির ঝোঁক হইল, একখানা নূতন মাসিক-পত্র বাহির করিতে হইবে। আমার কিন্তু ততটা ইচ্ছা ছিল না। আমার ইচ্ছা ছিল, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'কে ভাল করিয়া জাঁকাইয়া তোলা যাক। কিন্তু জ্যোতির চেষ্টায় 'ভারতী' প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শনের' মত একখানা কাগজ করিতে হইবে, এই ছিল জ্যোতির ইচ্ছা। আমাকে সম্পাদক হইতে বলিল। আমি আপত্তি করিলাম না। আমি কিন্তু ঐ নামটুকু দিয়াই খালাস। কাগজের সমস্ত ভার জ্যোতির উপর পড়িল। আমি দার্শনিক প্রবন্ধ লিখিতাম। মলাটের উপরে একটি ছবির design আমি দিয়াছিলাম; কিন্তু সে ছবি ওরা দিতে পারিল না। আমি চিরকাল স্বদেশী। বিদেশী পোষাক-পরিচ্ছদ ভাব-ভাষা আমার দু-চক্ষের বালাই। এইজন্য অনেক সময়ে আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার মতের বিরোধ হইয়াছে। স্ত্রী-স্বাধীনতা আমি অপছন্দ করি না; কিন্তু আমার বরাবর ভয় হয়, পাছে কিছু বাড়াবাড়ি হইয়া যায়। আমি গোড়া থেকে সেই স্বদেশী culture ধরিয়া বসিয়া আছি; ঘরের মধ্যেই বসিয়া আছি। আমার ঘর, আমার home যে কি জিনিষ, তা', তোমাকেই পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেণ্টপলস্ স্কুলের ইংরাজ হেডমাষ্টার একদিন শনিবারে ছুটির পর আমাকে আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই যে সকলের সঙ্গে বাড়ী যাওয়া হইল না, তা'তে আমার যে কি ছট্‌ফটানি ধরিল, সে আমি বলিতে পারি না। খানিকক্ষণ পরে হেডমাষ্টারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য দৌড়িয়া তাঁহার bath-room—স্নানাগারের দরজা খুলিয়া বেগে ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিলাম—'আমাকে ক্ষমা করুন'। সাহেব তখন মুখ ধুইতেছিলেন. চমকিয়া আমার দিকে মুখ ফিরাইলেন; বলিলেন—'এ কি? তোমাদের বাড়ীর ঘরে কি দরজা নেই? তুমি এই দরজায় টোকা দিতে পারলে না?' আমি কাতর স্বরে বলিলাম,—'আমাদের বাড়ীর ঘরেতে খুব বড়-বড় দরজা আছে; আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছি; আপনি আমাকে বাড়ী যেতে দিন।' তিনি আমার, please let me go home শুনিয়া আমাকে ক্ষমা করিয়া বিদায় দিলেন। আমি বাড়ীতে আসিয়া বাঁচিলাম।

"কখনও আমি বাড়ীর বাহিরে কোনও একটা বড় কাজ করিতে পারিলাম না। বক্তৃতা দিলাম, কিন্তু কাহারও মন ভিজিল না। রবি তখন কবিতা লিখে বেশ সুখ্যাতি পাইতেছিল; তাহাকে বলিলাম—'তুমি বেশ মিষ্ট ভাষায় লিখিতে পার; আমাদের স্বদেশী সভ্যতার ভিতরকার কথাটা আমাদের দেশের লোককে ভাল করিয়া শুনাইতে পার? আমি ত চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, কিছুই হইল না। তোমার কথা তাহারা মন দিয়া শুনিতে পারে।' দেখ একরকম স্বদেশী আমাদের দেশের ফ্যাশান হইয়াছিল; কিন্তু তাহার মধ্যে একটা বিলাতি গন্ধ ছিল। রঙ্গলালই বল, আর রাজনারায়ণবাবুই বল, তাঁহাদের patriotism-এর বার আনা বিলাতি, চার আনা দেশী। ইংরাজ যেমন patriot, আমিও সেই রকম patriot হব—এই ভাবটা তাঁদের মনে খুব ছিল। বল দেখি, আমি তোমার মত patriot হইব কেন? আমি আমার মত patriot হইতে না পারিলে কি হইল! নবগোপাল একটা ন্যাশনাল ধুয়া তুলিল; আমি আগাগোড়া তা'র মধ্যে ছিলাম। সে খুব কাজ করিতে পারিত; কুস্তি, জিম্‌ন্যাষ্টিক, প্রভৃতির প্রচলন করার চেষ্টা তা'র খুব ছিল; কিন্তু কি রকম কি হওয়া উচিত, সে সব পরামর্শ আমার কাছ থেকে লইত। একটা মেলা বসাইবার কথা বলিল,—তাঁতি, কামার, কুমার ইত্যাদি লইয়া। আমি বলিলাম,—'ও সব ত দেশের সকলের জানা আছে; দেশী painting দেখাতে পার?' সে এক painter নিযুক্ত করিয়া ছবি আঁকাইল। মেলার ক্ষেত্রে গিয়া দেখি, প্রকাণ্ড ছবি। ব্রিটানীয়ার সম্মুখে ভারতবাসী হাতজোড় করিয়া বসিয়া আছে। আমি বলিলাম—'উল্টে রাখ, উল্টে রাখ; এই তুমি দেশী painting করিয়াছ? আর আমাদের ন্যাশনাল মেলায় এই ছবি রাখিয়াছ?' ছবিখানা সরাইয়া উল্টাইয়া রাখা হইল। তা'র ঝোঁক ছিল, বড়-বড় ইংরাজকে নিমন্ত্রণ করা। আমি অনেক বলিয়া-কহিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করাইলাম। সে বড়-বড় ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের ও দেশী রাজাদের কাছে খুব যাতায়াত করিতে পারিত। একখানা ন্যাশনাল কাগজ বাহির করিল; একেবারেই সুপাঠ্য নয়। কিন্তু নবগোপালের সময় থেকে এই 'ন্যাশনাল' শব্দটা দাঁড়াইয়া গেল। ন্যাশনাল সঙ্গীত রচিত হইতে আরম্ভ হইল।

"এই সব দেখিয়া শুনিয়া আমি ত' একেবারে হতাশ হইয়া গিয়াছিলাম। এখন আমার আর কিছু করিবার সামর্থ্য নাই। কিন্তু এখন একটু আশা হইয়াছে। এখন আমাদের দেশের মধ্যে খাঁটি patriot-এর আবির্ভাব হইয়াছে—মহাত্মা গান্ধী। ইনি আমাকে আমার মত patriot হইতে বলেন; তোমার মত, বিদেশীর মত নয়, দেখি কি হয়।"

তৃতীয় পর্য্যায়

এক

২৮শে মাঘ, ১৩২০

সম্প্রতি 'হিতবাদী' পত্রিকায় "পুরাতন প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর" শীর্ষক একটী পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আজ আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত তৎসম্বন্ধে আলাপ করিয়া তাঁহার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছি। তিনি বলিলেন,—

"লেখক মহাশয় 'অনুতাপের ঘটা' বলিয়া আমাকে একটু টিটকারী দিয়াছেন। আমি কিন্তু কুত্রাপি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উদ্ধত-স্বভাব বলি নাই। আমার বলিবার অভিপ্রায় এই,—আমরা চুনো পুঁটি আমরা তাঁহার দেখাদেখি চলিতে গেলে উদ্ধত হইবার সম্ভাবনা। সামান্য ব্যক্তির পক্ষে সকল বিষয়ে বড়লোকের অনুকরণ করা আহাম্মুকি মাত্র; কিন্তু যে ব্যক্তি বড়লোককে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করে, সে অনেক সময়ে সেই আহাম্মুকি করিয়া ফেলে। আমারও যৌবনাবস্থায় তাহাই ঘটিয়াছিল। এই কথাই কেবল আমি বলিয়াছি। তাঁহার পক্ষে যেটা তেজস্বিতা, আমার পক্ষে তাহা ঔদ্ধত্য দাঁড়াইয়া গেল।

"বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বঙ্কিমের লিখা পছন্দ করিতেন না, তাহা আপামর সাধারণ সকলেই জানেন। তাঁহার একজন গোঁড়া ভক্ত প্যারী কবিরত্ন এই সম্বন্ধে একটা ছড়া বাঁধিয়া গিয়াছেন। সেই ছড়াটি শিকদারপাড়া লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখস্থ আছে। বঙ্কিমের অপরাধ,—তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কিছু নরম গরম, সমালোচনা করিয়াছিলেন। অনেকেই ইহাতে চটিয়া গেলেন। 'হালিসহর পত্রিকা' লিখিল,—

"কভু বা ব্যাসের মাথা চিবাইয়া খেয়ে,
নাচিতেছে যাদুমণি হাততালি দিয়ে।
যা'রে পায় তা'রে ধরে দিগাদিগ নাই,
বাহবা বুকের পাটা বলিহারি যাই।
আবোল তাবোল বকে সকলই নীরস,
'সাগরে' সাঁতার দিতে করেছে সাহস।
কাল চোখে কচি খোকা পরিয়া কাজল,
আপন রূপেতে হন আপনি পাগল।
ঈশ্বরচন্দ্রেতে দিতে কলঙ্কের রেখা,
সে দিন সহরে আসি দিয়াছিল দেখা।

ভারতের মধুমাখা কবিতালহরী,
অনা'সে ফেলিল ছিঁড়ে আন্ধার করি।
এখন 'ছিঁড়িব' বলি পাড়িয়াছে ধুম।
আর আয় আয় 'বঙ্গদর্শনের' ঘুম।

"প্যারী কবিরত্ন গাহিলেন,—

বঙ্গদর্শনের দর্শনশক্তি চমৎকার,
এ দোষ দর্শনে রোষ হয় না কা'র ?
অন্ধ যে জন, নাইকো লোচন,
সমালোচন কেন তা'র ?

পদে পদে দেখ্‌তে পাই,
কর্ম্ম কর্ত্তা বোধনাই,
ভাবরসের মা গোঁসাই,
কেন লেখাব ছল ধরে ?

দুটো একটা গল্প লিখে,
রাধাকৃষ্ণ বলতে শিখে,
ধবাটাকে সবাসম জ্ঞান করে।

এ আস্পর্দ্ধা ক'ব কা'রে
গোস্পদ বলে না যা'রে
ডাগর সাগরে খোঁচা দিতে ভয় হোলো না তা'র ?

হ'তেন যদি কূপ কি ডোবা,
তা' হোলেও ত পেতো শোভা,
নদ নদী মধ্যে খুঁজে মেলা ভার।

মরি আপশোষে
কোন সাহসে,
কি জিনিস বেরুলো দেশে,
কিসের এত অহঙ্কার ?

ভারতচন্দ্র গুণাকরে,
নিন্দুকেরাই নিন্দা করে,
সেরূপ রসমাধুরী ভাষায় কি বেরুলো আর ?

অদ্যাপি কবি সকলে,
মুক্তকণ্ঠে কে না বলে,
কবিকুলে ছিলেন কণ্ঠরত্নহার।

সমকক্ষ নর,
মেলা সুদুষ্কর,
ভারতে 'ভারত'তুল্য কবি কেউ হবে না আর।

'চ্যাংড়া' কৃষ্ণচন্দ্র রায়,
শুনে শরীর জলে যায়,
এর চেয়ে চ্যাংড়ামি করা বোধ হয় হোতে পারে না আর।

দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য,
প্রভায় প্রভাহীনাদিত্য,
যে যশ অদ্যাপি ধরায় ধবে না।
তাঁর দোষ ধরা,
ক্ষ্যাপামি করা,
বাণেশ্বর শঙ্করাদি সভায় ছিলেন সভ্য যাঁ'র।

এখন গ্রন্থকর্ত্তা ঘরে ঘরে,
Editor বহু নরে,
কিন্তু কলম যে কিরূপে ধবে তা' অনেকে জানে না।

ভূষিমাল গর্দ্দাভরা,
ভেতরেতে ময়লা পোরা,
কাগজগুলা কেবল ভাল,
Binding পরিপাটি ;
একখানা বিকোয় না দেশে,
মসলা বান্ধে অবশেষে,
তবু কত সর্ব্বনেশে,
কলম ধরতে ছাড়ে না।

অতি যা'চ্ছে তাই,
যা' দেখ্‌তে পাই,
'সাগর' বৈ কে লিখ্‌তে জানে,
কা'র লেখায় কি উপকার ?

'হুতোম প্যাঁচা' বলে ছিল,
(বল্‌তে বল্‌তে মনে হোলো)
বেওয়ারিস্ বাঙ্গালা ভাষা,
যা'র যা' ইচ্ছা তাই করে।
ওয়ারিস্ কেউ থাক্‌লে পরে,
অনেকে ঝুমঝুমি পোরে,
লেখার গুণে প্রায় যেতো দ্বীপান্তরে।
কেউ শত্রু নাই,
এরা বাঁচে তাই,
যে যা' করে তাই শোভা পায়,
মগের মুল্লুক অবিচার।
Gunny cloth যা'রা বোনে,
তা'রা ভাবে মনে মনে,
কিংখাপ কাশ্মীর শাল, সে অতি সহজে হয়।
শাল যে কি বস্তু বোঝা,
তা'দের পক্ষে বিষম বোঝা,
কবিরত্ন বলে কথা সোজা নয়।
বামন হয়ে হায়,
চাঁদে হাত বাড়ায়,
কালে কালে হোলো কবি-
কদম্বের হাটবাজার।

"চিঠির উপর শ্রীহরি লেখা থাকিলে লোক নাস্তিক হয় কি না ইহার উত্তর দেওয়া আমার অসাধ্য ; তবে আমি শপথ পূর্ব্বক বলিতে পারি যে, কোনও কোনও সময়ে বিদ্যাসাগর এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন,—'ঈশ্বর যদি থাকেন ত তিনি ত আর কাম্‌ড়াবেন না।' একথা আস্তিক বা নাস্তিকের মুখে শোভা পায় তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বিবেচনা করিবেন। আর Cannot bear a brother near the throne[১] এ দুর্ব্বলতা

[১] Should such a man, too fond to rule alone,
Bear, like the Turk, no brother near the throne,
View him with scornful, yet with jealous eyes,
And hate for arts that caused himself to rise ,
—Alexander Pope (Epistle to Dr Arbuthnot) —সং

অতি তুচ্ছ ; বিস্তর বড়লোকের শুনা যায় ; ইহাতে কাহারও বড়ত্ব কিছুমাত্র হ্রাস পায় না ; এবং আমার অনেক সময় মনে হইয়াছে যে, এটুকু কিঞ্চিন্মাত্রায় তাঁহার ছিল। ইহার প্রমাণ এই যে, আমি কখনও তাঁহাকে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, Revd. K. M. Banerjee প্রভৃতি তাঁহার সমকক্ষদিগকে সমুচিত প্রশংসা করিতে শুনি নাই ; এমন কি তিনি 'সাহেব'দিগের সংস্কৃতজ্ঞতা বিষয়ে অনেক সময়ে অসঙ্গত অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেন। Goldstucker-এর একটা সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে কি একটু ভুল করিয়াছিল, তাহাই ধরিয়া তিনি কখনও কখনও এরূপভাবে কথা কহিতেন যে সংস্কৃতজ্ঞতাসম্বন্ধে Goldstucker যেন মানুষের মধ্যেই নহে ; ইহা স্মরণ করিলে আমাদের ত গা শিহরিয়া উঠে।

"বিদ্যাসাগরের রচনা-পদ্ধতির প্রতি আমি যে স্বভাবতঃই পক্ষপাতী হইব ইহা ত আমার Education-র ফলস্বরূপ। আঠার বৎসর বয়সে 'বিচিত্রবীর্য্য' নামে একখানি বাঙ্গালা বহি লিখিয়াছিলাম।[১] সে বহি বড় একটা কেউ পড়ে নাই, আদরও করে নাই ; কিন্তু বঙ্কিম বাবু তৎসম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—'এ ত বাঙ্গালা না, এ ত সংস্কৃত'—তাতেই বুঝিয়া লইবেন যে রচনাপদ্ধতিসম্বন্ধে আমি বিদ্যাসাগরের চেলা কি বিদ্বেষী। তবে আমার এই বিশ্বাস যে, ভাষার বিকাশ সম্বন্ধেও একটা Natural selection আছে ; কেন যে বিদ্যাসাগরের ভাষাই দাঁড়াইয়া গেল আর কেনই বা লোকে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষা ভুলিয়া গেল, ইহার কারণ নির্ণয় করা ভার ; নতুবা ইহারা দুইজনে বাঙ্গালাতে বিস্তর লেখা লিখিয়াছিলেন ; কিন্তু কই, আজ কাল কেহ তাহা পড়েও না জানেও না। তবে আমি এখন ইহাও দেখিতেছি যে, বঙ্কিম বাবুর রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে বিদ্যাসাগরের ভাষাপদ্ধতি অনেকটা পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে ; এখন বাঙ্গালা চলিত হইয়াছে, বিদ্যাসাগরের কাছে তাহা ধরিলে তিনি 'ছি ছি' করিয়া দূরে ফেলিয়া দিতেন।

"আমার গুরুভক্তির বিষয়ে একটু কটাক্ষপাত করা হইয়াছে। কিন্তু পুরাতন প্রসঙ্গের বিস্তর জায়গায় তাঁহার প্রতি যে প্রকার দেবতার ন্যায় ভক্তি প্রদর্শন করিয়া কথা কহিয়াছি সে সবগুলি এই পত্রের লেখক চাপিয়া রাখিয়াছেন ; কেবল দুই একটি সামান্য কথা ধরিয়া আমাকে টিটকারি দিয়াছেন। অবশ্য কাহাকেও গালি দিতে হইলে এই নিয়মেই চলা উচিত। ইহাতে আমার কোনও ক্ষোভের কারণ নাই। শ্যামাচরণ বাবুর ব্যাকরণ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর অবজ্ঞা প্রকাশ করাতে তাঁহাকে নীচপ্রকৃতি কিরূপে বলা হইল ইহা ত বুঝিতে পারিলাম না ; তিনি বাস্তবিকই বহিখানি অসার ভাবিয়াছিলেন, এবং সেই মতই প্রকাশ করিয়াছিলেন ; আমাদের এক্ষণে যে জ্ঞান জন্মিয়াছে

[১] পৃষ্ঠা ১১৬ দ্রষ্টব্য।—সং

তাহাতে সে মতের পোষকতা করিতে পারি না।[১] অতএব এখন বুঝিতেছি যে, তখন তাঁহার সঙ্গে সায় দেওয়াতে ভাল করি নাই; কিন্তু ইহার চারা কি আছে? তখন আমাদের যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি ছিল, আমরা সেইরূপ কাজই করিয়াছি। বহিখানি কিন্তু অপ্রচারিত রহিয়া গেল; এখন তাহার এক Copy খুঁজিয়া পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ, তবে আমার একটু একটু মনে হয় যে, সংস্কৃত কলেজের লাইব্রেরীতে কতকগুলা Copy কেনা হইয়াছিল। যদি আমার এ ধারণা সত্য হয়, তবে বোধ হয় সেই সময়ে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সহিত সংসৃষ্ট ছিলেন না। লেখক আমার প্রযুক্ত 'অকৌশল' কথাটি যেন অচল ও অপ্রযোজ্য বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন; কিন্তু 'অকৌশল' বলিতে মনান্তর যে চলিত আছে সেটা কি তিনি মানেন না?

"মদনমোহনের সহিত বিদ্যাসাগরের মনোমালিন্যের কারণ কি, সেটি আমি বিশেষ বিচার করিয়া দেখিলাম যে, প্রকাশ করা উচিত নহে; তবে লেখকের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, প্রকাশিত হইলে বিদ্যাসাগরের প্রতি লোকের শ্রদ্ধার হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইবে। আর সেনেটে তিনি কেন যাইতেন না, এ বিষয়ে সঠিক আমি কিছু বলিতে পারি না। তবে আমার একটা অনুমান হয় যে বিদ্যাসাগর দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করা কখনও অভ্যাস করেন নাই, এবং সময়ে সময়ে তাঁহার কথার ধরণে বোধ হইত যে, এ প্রকার বক্তৃতা করা তিনি যেন একটা সং সাজার মত জ্ঞান করিতেন, এই জন্যই তাঁহার বোধ হয় সং সাজিতে ইচ্ছা হইত না। ফলতঃ কোনও বিশেষ গুরুতর বা দরকারি কায সভা-সমিতির দ্বারা যে ভালরূপ হয় ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। ওসব তিনি কেবল ডেঁপোমি ও নিজের বাহাদুরী দেখানর উপায় বলিয়া মনে করিতেন। তিনি যে কখনও বড় একটা কোনও সভা-সমিতিতে যোগ দিয়াছিলেন এমন ত আমার মনে পড়ে না, তবে Bethune Society-তে পঠিত হইবার জন্য 'সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব'[২] নামে একটি প্রবন্ধ বাঙ্গলায় রচনা করিয়াছিলেন; নিজে কতকটা তোৎলা বলিয়া স্বয়ং পড়েন নাই, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী পড়িয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধটি ঐ বিষয়ের অদ্যাবধি চূড়ান্ত রচনাস্বরূপ হইয়া আছে।

"যাহা হউক, 'হিতবাদী'তে আমার পুরাতন প্রসঙ্গ লইয়া এই যে আলোচনা হইয়াছে ইহা অতীব আহ্লাদের বিষয়। কারণ হিতবাদীর জন্মের সময় আর পাঁচজনের সঙ্গে আমি ধাত্রীর কার্য্য করিয়াছি, এবং প্রথম লালনপালনের ভার আমারই উপর ন্যস্ত

---

১ পৃষ্ঠা ৩০ দ্রষ্টব্য; শ্যামাচরণ শর্ম সরকারের 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ' ১২৫৯ সালে প্রকাশিত হয়।—সং

২ 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' (মার্চ ১৮৫৩)।—সং

হইয়াছিল।[১] ইহার পিতার কার্য্যটা যে আমার কর্তৃক সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল, আমি জ্ঞানপূর্ব্বক সে অহঙ্কার করিতে পারি না। এত দিনের পর 'হিতবাদী' সেই প্রথম পালয়িতাকে যে স্মরণ করিয়াছে ইহাতে আমি ধন্যম্মন্য। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাত্যহিক স্মরণের জন্য যে শ্লোকখণ্ডটি বাছিয়া দিয়াছিলেন সেই 'হিতং মনোহারী চ দুর্ল্লভং বচঃ'—তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইহা যেন চিরকাল চলে, ইহাই প্রার্থনীয়।"

---

১ পৃষ্ঠা ৪৪ দ্রষ্টব্য। —সং

দুই

১৮ই ভাদ্র, ১৩৩৩

অনেক দিন পরে আজ আবার পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চরণবন্দনা করিবার সৌভাগ্য আমার হইল।

"আপনি কেমন আছেন?"

"মন্দ নয়।"

"যে বৃষ্টি!"

"দেখেছ! খনার বচন ফলিল কই? ভাদ্র মাসে এত বৃষ্টি বড় সুবিধার নয়। জান ত'—

কর্কটে ছর্‌কোট, সিং শুক্‌নো, কন্যা কানেকান,
বিনা বায়ে তুলো বর্ষে, কোথা রাখবি ধান?

—অর্থাৎ শ্রাবণ মাসে জলে কাদায় সব ছর্‌কোট, সিংহ রাশি অর্থাৎ ভাদ্র মাসে শুক্‌নো, কন্যা রাশি অর্থাৎ আশ্বিনে সমস্ত জলাশয় কানায় কানায় জলে পূর্ণ, তুলা রাশি অর্থাৎ কার্ত্তিকে ছিটা-ফোঁটা বৃষ্টি, তবে ত প্রচুর ধানের সম্ভাবনা! কিন্তু ভাদ্রের লক্ষণ বড় ভাল নয়।"

"আপনার মুখে অনেক দিন পুরানো কথা শুনি নাই; যখনই আসি, কিছু শুনিতে ইচ্ছা করে।"

"কি আর শুনিবে? সুরেন্দ্র, রাসবিহারী, সকলে চলিয়া গেল; থাকিবার মধ্যে রহিলাম আমি আর শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী। এই সেপ্টেম্বর মাসে আমার ৮৬ বৎসর পূর্ণ হইল। খুব পুরানো কথা শুনিবে? যতই বয়স বাড়িতেছে, অতীতের কথাগুলি উজ্জলতর ভাবে আমার মানসপটে প্রতিফলিত হইতেছে। কিন্তু ধারাবাহিক বলিয়া যাওয়া সম্ভবপর হইবে না। নিজের স্মৃতি কথা কতকটা autobiographic হইলে ক্ষতি কি? গোড়ার কথা একটু বলি, শোন।

"জীবনের প্রত্যূষে যে জিনিষটি আমার প্রথম মনে পড়ে, সে আমার পিতার গঙ্গাযাত্রা! তখন আমি ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করি নাই। বেশ মনে পড়িতেছে মাতা-ঠাকুরাণীর ক্রন্দন;—কেন কাঁদিতেছেন, তাহা ধারণা করিতে পারিলাম না। বিষয়টির গুরুত্ব সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান আমার ছিল না, তবে মাতাঠাকুরাণীর রোদনে একটু বিমর্ষভাব আসিল। ঊর্দ্ধে আকাশমার্গে ঘুড়ি উড়িতেছিল, অন্যমনস্ক ভাবে তাহাই

দেখিতেছিলাম।... তিন চারি দিন পরে পিতৃদেব গঙ্গালাভ করিলেন; দাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া আমার অগ্রজ গৃহে ফিরিলেন, সঙ্গে ছিলেন নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের পিতা দেবনাথ মুখোপাধ্যায়। দেবনাথ বাবু আমার পিতার ছাত্র; তিনি আমাদের বাড়িতে থাকিতেন, আমাদের অগ্রজ-স্থানীয়। এই জন্য নীলাম্বর ও ঋষিবর আমাকে শেষ পর্য্যন্ত ছোট খুড়ো বলিয়া ডাকিতেন। সে যাহা হউক, অতি কষ্টে ক্রন্দনবেগ সম্বরণ করিয়া দাদা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, চীৎকার করিয়া কাঁদিবার জন্য ছুটিয়া ঘরে ঢুকিতে গেলেন, দেবনাথ দাদা তাঁহাকে ধরিয়া রাখিলেন। সেই সময়ে হরপঞ্চানন নামে এক প্রবীণ ভদ্রলোক সদরে উপস্থিত ছিলেন; ইনি পিতার বন্ধুও বটেন, ছাত্রও বটেন। তিনি বলিলেন—'আহা উহাকে যাইতে দাও, একটু ভাল করিয়া কাঁদুক।'... সমস্ত ব্যাপারটি আমার চক্ষুর সম্মুখে দেদীপ্যমান। ম্লানায়মান অপরাহ্ণে পিতৃদেবের সেই গঙ্গাযাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত করুণ ব্যাপারটি আমার শিশুহৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গেল।

"পিতৃদেবের গঙ্গালাভের পর আমরা দুই সহোদর, এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও মাতা-ঠাকুরাণী, এই কয়জন মাত্র পরিবারভুক্ত রহিলাম। দেবনাথ দাদা আমাদের অভিভাবক রহিলেন। বাল্যকালে বাড়ীর সকলে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে খোকা বলিয়া ডাকিতেন; আমিও সকলের অনুকরণে তাঁহাকে ঐ নামে ডাকিতাম। পরে ক্রমে পাঁচজনে ইহা ভাল দেখায় না বলিয়া স্থির করিয়া দিলেন যে, আমি আমার অগ্রজকে বড়দাদা বলিয়া ডাকিব। একা আমার নিকট তাঁহার সেই সংজ্ঞা চিরকাল ছিল। তিনি আমা অপেক্ষা পাঁচ-ছয় বৎসর বয়োজ্যেষ্ঠ। তখন আমাদের উপজীবিকা ছিল মাথাঘসা গলির ধনাঢ্য বসাক বাবুদিগের নির্দ্ধারিত একটি মাসিক বৃত্তি। তাঁহারা প্রতি মাসে আমাদিগকে ২৩ টাকা করিয়া দিতেন; তদ্ভিন্ন বহুকাল যাবৎ বহু সামগ্রী, অলঙ্কার বস্ত্রাদি তাঁহারা আমাদিগকে দিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাদিগের সহিত এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ইতিহাস একটু শুনিবে কি? তখনকার হিন্দু-সমাজে ধনী গৃহস্থের সহিত দরিদ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতের কিরূপ সম্পর্ক ছিল, ইহাতে তাহার একটু নিদর্শন পাইবে।

"বহুপুরুষ যাবৎ আমরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। প্রপিতামহ কৃষ্ণকিঙ্কর, পিতামহ ঘনশ্যাম, পিতা রামজয়, সকলেই অধ্যাপক ছিলেন। ঘনশ্যামের না কি কিছু কিছু occult knowledge (অতীন্দ্রিয় জ্ঞানশক্তি) ছিল। তিনি নাকি নখদর্পণে সমস্ত জানিতে পারিতেন। বসাক-বাবুদিগের মধ্যে রাধাকৃষ্ণ বসাক তখন Treasury-র দাওয়ান। তাঁহার বিমাতার নাম ভাগ্যবতী দাসী। ঘনশ্যাম নখদর্পণ দ্বারা বলিয়া দিয়াছিলেন—তাঁহাদের বাগান হইতে ঠাকুর উঠিবেন। বাস্তবিক সিংহবাহিনী ঠাকুরের আবির্ভাব হইল। ভাগ্যবতীর যথেষ্ট স্ত্রীধন সম্পত্তি ছিল। তিনি প্রায় সমস্তই সিংহ-

বাহিনীর দেবোত্তর করিয়া দিলেন, এবং ঘনশ্যামকে কলিকাতার সিমলায় মালির বাগানে মধ্যে চার কাঠা জমির উপর একখানি দ্বিতল বাড়ি কিনিয়া দিলেন, এবং তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মথুরানাথকে ভিক্ষাপুত্র গ্রহণ করিলেন। এই মথুরানাথ না কি পরম সুশ্রী ছিলেন। তাঁহার ভিক্ষা মাতা তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন; যে সকল সাটিনের পোষাক-পরিচ্ছদ দিয়াছিলেন, তাহার অবশিষ্টাংশ আমরাও দেখিয়াছি, বিলক্ষণ মূল্যবান্ বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু অকালে মথুরানাথের মৃত্যু হয়; সেই শোকে ঘনশ্যাম কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে কাশীবাস করিতে গেলেন। ভাগ্যবতী পত্রাদি দ্বারা অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরাইয়া আনিলেন, এবং রাধামাধব নামে এক বিগ্রহ ঠাকুর করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—'ইহাকে তোমার মৃতপুত্রস্থানীয় জ্ঞান কর।' ঐ ঠাকুরের মাসিক বৃত্তি ২৩ টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। ইহা ব্যতীত যত দিন ভাগ্যবতী জীবিত ছিলেন, নানা প্রকারে তিনি এত দিতেন যে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ফলতঃ আমরা বসাকবাবুদের অন্নে প্রতিপালিত; এবং যতদিন আমার জ্যেষ্ঠের চাকরি না হইয়াছিল, আমরা উঁহাদিগেরই আশ্রিত ছিলাম বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। ভাগ্যবতীর নিজ গর্ভজাত দুইটি পুত্র,—প্রাণকৃষ্ণ ও জয়কৃষ্ণ; সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাধাকৃষ্ণ তাঁহার সপত্নীপুত্র। প্রাণকৃষ্ণ পর পর দুইবার বিবাহ করেন। প্রথম পক্ষের সন্তান,—উদয়চাঁদ : দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়া তিনি মাতার জীবদ্দশাতেই বিবাগী হইয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। জয়কৃষ্ণ পাগল ছিলেন। ভাগ্যবতীর দেহান্তে উদয়চাঁদ বসাক, এবং তাঁহার দেহান্তে তাঁহার বিমাতা সিংহবাহিনী ঠাকুরাণীর সেবায়েৎ হইয়াছিলেন। ঐ বিমাতার দেহান্তে রাধাকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র তারিণীচাঁদ এবং তৎপরে রাধাকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র নির্ম্মলচাঁদ বসাক সেবায়েৎ হন। এখন নির্ম্মলচাঁদ নাই। সেবায়েৎসত্ব লইয়া মোকদ্দমা প্রিভি কাউন্সিল পর্য্যন্ত গিয়াছে। সমস্ত ইতিহাসটুকু সংক্ষেপে বিবৃত করা আবশ্যক হইল, কারণ আমাদের রাধামাধব ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত তেইশ টাকা বৃত্তি উদয়চাঁদের আমলে কমিয়া গিয়া দশ টাকা হয়; এবং বোধহয় ১৮৫৩।৫৪ খৃষ্টাব্দে একেবারে বন্ধ হইয়া যায়

"কিন্তু অর্থাভাবে আমরা একেবারে নিঃসহায় হইয়া পড়িলাম না। তখন আমার জ্যেষ্ঠ সংস্কৃত কলেজে ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলেন; আমিও কিঞ্চিৎ পাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। আমাদের পিতা তিন হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাহাতেই একপ্রকার আমাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। তখন সস্তাগণ্ডার দিন ছিল। ইহা ব্যতীত, উপরিউক্ত তারিণীবাবুর মাতা আমার অগ্রজকে ভিক্ষাপুত্র লন। পুত্রের মত প্রচুর না হইলেও তিনি যে সকল সামগ্রী পাঠাইয়া দিতেন, তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

"পিতৃদেবের দেহাবসান কালে আমার অগ্রজের বয়স এগার বৎসর মাত্র ছিল। পিতার নিকটে তিনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, ভট্টি ও অভিধান পাঠ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। ঐ অল্প বয়সে সৎ পরামর্শ দিবার লোক বড় কেহ ছিল না; তথাপি তিনি স্বভাবসিদ্ধ সুমতির প্রভাবে আপনা হইতেই সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন। সেই শ্রেণীর অধ্যাপক মদনমোহন তর্কালঙ্কার। সংস্কৃত কলেজের যখন প্রথম সৃষ্টি হয়, তখন মাসিক ছাত্রবৃত্তি দিয়া ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সন্তানদিগকে অধ্যয়ন করিবার জন্য তথায় আকৃষ্ট করিবার ব্যবস্থা ছিল। দাদা যখন ভর্ত্তি হইলেন, তখন সে প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু ছাত্রদিগকে বেতন দিতে হইত না। পড়িবার পুস্তক কলেজের লাইব্রেরি হইতে পাওয়া যাইত। বোধহয় তিনি ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কলেজে ভর্ত্তি হন। তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপনা-প্রণালী কিরূপ ছিল জান? প্রথম চার-পাঁচ বৎসর মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়ান হইত। পরে এক বৎসর অভিধান ও ভট্টি; তদনন্তর সাহিত্য-শ্রেণীতে রঘু, কুমার, মাঘ, ভারবী প্রভৃতি কাব্য নাটক যথাসম্ভব অধ্যাপিত হইত। পর বৎসর সাহিত্যদর্পণ ও কাব্যপ্রকাশ, এই দুই অলঙ্কার গ্রন্থ পাঠের জন্য অলঙ্কারের শ্রেণী ছিল। তাহার পর দুই শ্রেণী,—স্মৃতি ও দর্শন। কেহ বা স্মৃতিতে যাইতেন, কেহ বা দর্শনে যাইতেন। কেহ কেহ আবার সাহিত্যাদি শ্রেণীতে দুই দুই বৎসর করিয়া পড়িতেন। আমার দাদা রামকমল সাহিত্যশ্রেণীতে দুই বৎসর, অলঙ্কার শ্রেণীতে নিশ্চয়ই দুই বৎসর, এবং দর্শন শ্রেণীতে একাদিক্রমে চারি বৎসর পড়িয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত আরও চার পাঁচ বৎসর কালমধ্যে ইংরাজি সাহিত্যে, গণিতে ও ইতিহাসে তিনি অসাধারণ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। এক বৎসর কাল তিনি ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। তাঁহার সময়ে অলঙ্কারের অধ্যাপক ছিলেন প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ; দর্শনের অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন। প্রত্যেকেই স্ব স্ব অধ্যাপিত শাস্ত্রে দিগ্‌গজ পণ্ডিত ছিলেন। দাদার মুখে শুনিয়াছি তিনি জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে 'বিজ্ঞানরাশি' বলিতেন। ঐ শব্দটি মুদ্রারাক্ষস নাটকে কোনও এক আয়ুর্ব্বেদোক্ত ভিষকবরের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। দাদা আমাকে ঐ শব্দের অর্থ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য একদিন বলিলেন,—'বিজ্ঞানরাশি কা'কে বলে জানিস্? যেমন মনে কর্ আমাদের তর্কপঞ্চানন মশাই। ওঁকে ঠিক "বিজ্ঞানরাশি" বলা যেতে পারে।' —তর্কপঞ্চাননের বিজ্ঞানরাশিত্ব রামকমলই প্রকৃতরূপে অনুভব করিয়াছিলেন, কারণ তিনি একাদিক্রমে চার বৎসর তাঁহার নিকটে অধ্যয়ন করেন। সে আবার যেমন তেমন চার বৎসর নহে। গ্রীষ্মাবকাশের দুই মাস কালও রামকমল পাঠের ছুটি লইতেন না। ঐ সময়ও তিনি প্রত্যহ দশটায় আহার সমাধা করিয়া প্রায় দুইক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া নারিকেলডাঙ্গায় তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া অপরাহ্ণ পাঁচটা

পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতেন। ফলতঃ একাদশ বৎসর বয়ঃক্রমে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করা অবধি যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, অধ্যয়ন ব্যতীত আর কোনও কার্য্য তাঁহার ছিল না। কখন বাটীব বাহিরে খেলাধূলার জন্ম যাইতেন না। অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে প্রথম প্রথম কিছুকাল বাটীর ঠাকুরদিগের সেবা-আরতিতে তিনি কায়মনোবাক্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বোধ হয় সতের আঠার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সন্ধ্যা, আহ্নিক, পূজা, প্রত্যহ চণ্ডীপাঠ, এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহার বিশিষ্ট নিষ্ঠা ছিল। পরে কিন্তু ইংরাজী অধ্যয়ন ক্রমে যত অগ্রসর হইতে লাগিল, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমশঃ বেশী ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিল, তত হিন্দুধর্ম্মে শৈথিল্য জন্মিল। অবশেষে তিনি সন্ধ্যা-আহ্নিকও ত্যাগ করিলেন, ঠাকুরসেবা হইতে পরাঙ্মুখ হইলেন। তখন আমি ঠাকুর-সেবা করিতে লাগিলাম। তোমার মুখে ঈষৎ হাসির রেখা দেখা যাইতেছে? আমার মত ধ্রুবদর্শনবাদী (Positivist) যে কখনও দেবসেবায় রত থাকিতে পারে, ইহা বোধ করি তুমি কল্পনা করিতে পার নাই। কিন্তু আমিও কায়মনোবাক্যে পূজা, ধূপদান, আরতি প্রভৃতি যথাবিধি সম্পন্ন করিতে লাগিলাম। প্রত্যহ চণ্ডীপাঠ ও সন্ধ্যাহ্নিক করিতাম। সমস্ত চণ্ডী আমার মুখস্থ ছিল। পরে কিন্তু আমিও জ্যেষ্ঠের পশ্চাতে অনুগমন কবিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রভাব আমাদের দুই ভাইয়ের উপর বড় সামান্য ছিল না। আমি এখন বিবেচনা করিয়া দেখিতেছি যে, কলিকাতা অঞ্চলে ব্রাহ্মণপণ্ডিতশ্রেণীর মধ্যে বৈদিকশ্রেণী সর্ব্বাপেক্ষা বহুসংখ্যক, এবং মুগ্ধবোধ ব্যাকরণই এই অঞ্চলের প্রচলিত ব্যাকরণ। সংস্কৃত ব্যাকবণের মধ্যে পাণিনি সর্ব্বব্যাকরণ শিরোমণি বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের নানা স্থানে পাণিনির বাচ্ছাস্বরূপ নানা ক্ষুদ্র ব্যাকরণ আটপৌবে ব্যবহার নিমিত্ত প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কোথাও কলাপ, কোথাও সুপদ্ম, কোথাও সংক্ষিপ্তসার, কোথাও সারস্বত, কোথাও লঘুকৌমুদী,—ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যাকরণ পরিগৃহীত হইয়াছে। মুগ্ধবোধ ত বোপদেবের রচিত, আর বোপদেব বোম্বাই অঞ্চলে দেবগিরির নগরের লোক ছিলেন। তাঁহার রচিত ব্যাকরণখানি এত বড় বড় জেলা ও প্রদেশ লঙ্ঘন করিয়া কলিকাতা অঞ্চলে কিরূপে প্রচারলাভ করিল, ইহা একটি সমস্যার কথা। ঠিক এইরূপ আর একটি সমস্যার কথা স্মৃতিশাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়। জীমূতবাহন কৃত দায়ভাগের মত বাঙ্গালাদেশ ব্যতীত আর কুত্রাপি চলে না; অথচ ঐতিহাসিক প্রবাদে যে প্রকার পাওয়া যায়, তাহাতে জীমূতবাহন গুজরাট অঞ্চলের লোক বলিয়া মনে হয়। এই সকল সমস্যার মীমাংসাকল্পে আমি নিজে কোনও মতামত প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব না।

"বিদ্যাসাগরের প্রভাবের কথা বলিয়াছি,—এত বর্ষ পরে আশা করি আমার কথায় কাহারও ক্ষোভের উদ্রেক হইবে না। ১৩।১৪ বৎসর পূর্ব্বেও এ সম্বন্ধে হিতবাদী

পত্রিকায় আমার বিরুদ্ধ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে আমি যত ঘনিষ্ঠভাবে জানি, তেমন আর কেহ জানে না, ইহা আমি স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি। বিদ্যাসাগরের প্রতি আমার অসীম শ্রদ্ধার কথা পূর্ব্বে তোমাকে অনেকবার বলিয়াছি। জানি, শিক্ষিত সমাজ বিদ্যাসাগরের ভাষার অথবা জীবনের কোনও প্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনা কখনও সহ্য করিতে পারে নাই। বঙ্কিম তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে' ভারতচন্দ্রের ও বিদ্যাসাগরের সমালোচনা করিয়া বিপন্ন হইয়াছিলেন। 'হালিসহর পত্রিকা' বঙ্কিমকে নাস্তানাবুদ করিল :

কভু বা ব্যাসের মাথা চিবাইয়া খেয়ে
নাচিতেছে যাদুমণি হাততালি দিয়ে।
যারে পায় তারে ধরে দিগাদিগ্ নাই,
বাহবা বুকের পাটা বলিহারি যাই।
আবোল তাবোল বকে সকলই নীরস,
সাগরে সাঁতার দিতে করেছে সাহস।
কাল চোখে কচি পোকা পরিয়া কাজল
আপন রূপেতে হন আপনি পাগল।
ঈশ্বরচন্দ্রেতে দিতে কলঙ্কের রেখা,
সে দিন সহরে আসি দিয়াছিল দেখা।
ভারতের মধুমাখা কবিতা লহরী
অনা'সে ফেলিল ছিঁড়ে আব্দার করি।
এখন 'ছিঁড়িব' বলি পাড়িয়াছে ধুম।
আয় আয় আয় বঙ্গদর্শনের ঘুম॥

"প্যারী কবিরত্ন বঙ্কিমের নামে ছড়া বাঁধিয়া নানাস্থানে কবির আসরে গাইয়া বেড়াইলেন—

বঙ্গদর্শনের দর্শনশক্তি চমৎকার,
এ দোষ দর্শনে রোষ হয় না কা'র ?
অন্ধ যে জন, নাইকো লোচন
সমালোচন কেন তা'র ?[১]

---

[১] সম্পূর্ণ কবিতাটি ৩০২-৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হইয়াছে। -সং

"এ সব তুমি পূর্ব্বে অনেকবার শুনিয়াছ। বিদ্যাসাগরের সহিত ভবিষ্যতে আমার অপ্রণয়ের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি নিজেই ভাবিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে অবজ্ঞা করিলাম। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। তখন আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি[১] যে, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হই। কি কুক্ষণে আমি অল্পকাল পরেই তাঁহার বিরাগ ভাজন হইলাম! যখনই মনে হয় তখনই আমি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হই। প্রভাতকুমারের 'সিন্দুরকৌটা' পড়িয়াছ? প্রভাত দেখছি মনোগ্যামিষ্ট নয়। ও প্লটটা কি প্রভাত আমার জীবন কাহিনী হইতে লইয়াছে? পাইল কোথা হইতে? কিন্তু যাহাই হউক, সিন্দুর কৌটার মিঃ বোসের প্রশংসা আমি করি না। আমার অসংযত চিত্তবৃত্তি কিসের নেশায় নাচিয়া উঠিয়াছিল? পরিণীত শিক্ষিত যুবক কেন দারান্তর-গ্রহণের জন্য আত্মহারা হইল? আমার সম্বন্ধে চারিদিকে অনেক কথা রটিল; শেষে বিদ্যাসাগর একদিন আমায় বলিলেন—'আমার বন্ধুবান্ধব আমায় কি বলে জানিস্? তুই আমার কথা শুনিস্, চিরকাল তুই আমার বাধ্য, আমি যদি তোকে এই বিয়ে করতে বারণ করি, তা' হ'লে তুই শুন্‌বি আমার কথা।' আমি অম্লান বদনে উত্তর দিলাম—'আপনি কেন তাঁদের বলেন না যে, আমি আপনার কথা না শুনতে পারি; আমি আপনার অবাধ্য।' তিনি আর কিছু না বলিয়া গম্ভীরভাবে চলিয়া গেলেন। তাঁহার দৃঢ়প্রতীতি জন্মিল, আমি তাঁহাকে অবজ্ঞা করিলাম। কিন্তু এই ঘটনার পরে আমি বরাবর বলিয়া আসিতেছি—বিদ্যাসাগর বন্ধুর মত, উপদেষ্টার মত, সোজা কথা বলিয়াছিলেন; বাস্তবিক সমস্ত দোষ, সমস্ত ভুল আমারই।

"এখন যে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রকাণ্ড বাড়ী দেখিতেছ, ও বাড়ী তখন ছিল না। রাস্তার অপর পারে পুরাতন এল্‌বার্ট্ হলে কলেজ বসিত। প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর স্থান হইয়াছিল সংস্কৃত কলেজের দুইটি কক্ষে; তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী এলবার্ট হলে স্থান পাইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বোস প্রথম বি.এ. পাশ করেন; ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; ১৮৬০ সালে রমেশচন্দ্র মিত্র, শ্যামাচরণ গাঙ্গুলী, কালিকাদাস দত্ত ও আমি বি. এ পাশ করি। কালিকাদাস প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিলেন। আমি সংস্কৃত কলেজের প্রথম গ্রাজুয়েট। এই জন্যই বোধ হয় আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। এ সব কথা অনেকবার তুমি আমার মুখে শুনিয়াছ। খানাকুল কৃষ্ণনগরে প্রসন্নকুমার

---

[১] পৃষ্ঠা ২৫ দ্রষ্টব্য।—সং

সর্ব্বাধিকারীর ইস্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করিতেছিলাম, একদিন প্রসন্নবাবুর চিঠি পাইলাম, আমাকে প্রেসিডেন্সি কলেজের জুনিয়র বাঙ্গলা অধ্যাপক মনোনীত করা হইয়াছে। তিনিই আমাকে কলিকাতায় আসিতে অনুরোধ করিলেন। আমি কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলাম।

"তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপনা হইত না। প্রেসিডেন্সি কলেজে বাঙ্গালার সীনিয়র অধ্যাপক ছিলেন রামচন্দ্র মিত্র। কয়েক মাস পরে ইনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিছু দিন আমি একা কার্য চালাইতে লাগিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুব আত্মীয়তা ছিল। রাজকৃষ্ণ কখনও ইস্কুল কলেজে পড়েন নাই ; পণ্ডিতদিগের সাহচর্য্যে কিছু কিছু সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁহাকে নিযুক্ত করাইবার জন্য বিদ্যাসাগর সচেষ্ট হইলেন। তখন স্যর সেসিল বীডন বাঙ্গালার লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর। বিদ্যাসাগরের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। রাজকৃষ্ণ বাঙ্গালার জুনিয়র অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত পড়াইবার ব্যবস্থা করা যায় কিনা, সে সম্বন্ধে আমাকে মন্তব্য প্রকাশ করিতে হয়। আমি সমস্ত বিষয়টি আলোচনা করিয়া প্রিন্সিপ্যাল সট্‌ক্লিফ্‌কে একটি পত্র লিখি। বোধ করি সে পত্র এখনও প্রেসিডেন্সি কলেজের লাইব্রেরিতে আছে। ইতিহাসের অধ্যাপক ই. বি. কাউয়েল্‌কে সট্‌ক্লিফ সেই পত্র দেখান। কাউয়েল আমাকে বলিলেন—'Your scheme is too ambitious ; তুমি কাদম্বরী প্রভৃতির নাম করিয়াছ?' কাউয়েল সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন ; গফ্‌ সাহেবের সঙ্গে মিলিয়া তিনি 'কুসুমাঞ্জলি' অনুবাদ করেন। কুসুমাঞ্জলির রচয়িতা উদয়নাচার্য্যের কালনির্ণয় করিতে না পারিয়া তিনি লিখিলেন—a fixed star whose distance in time cannot be measured। রাজকৃষ্ণ প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়াইতেন। আমিও ঐ দুই ক্লাসে কিছু কিছু পড়াইতাম। মাঝে মাঝে একটু একটু খিটমিটি লাগিত। মনে পড়ে এক দিন 'মুনিপুঙ্গব' শব্দটির সমাস আমি পাণিনির নিয়ম উদ্ধৃত করিয়া বলিয়া দিয়াছিলাম—মুনিঃ পুঙ্গব ইব ; ছেলেরা আবার রাজকৃষ্ণকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—মুনিষু পুঙ্গবঃ। ছেলেরা একটু কৌতুক অনুভব করিল। কয়েক দিন পরে তিনি ছেলেদের বলিলেন—'না তোমরা ঐটেই বোলো, মুনিঃ পুঙ্গব ইব।' কলেজে ছাত্রসংখ্যা যখন বৃদ্ধি পাইল, সংস্কৃত কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হরিশ বিদ্যারত্নকে আমি তৃতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত করাইয়া দিলাম।

"সংস্কৃত প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে আমাকে বাঙ্গলা পড়াইতে হইত। কাশীদাস কৃত্তিবাস হইতে কিছু কিছু বাছাই করিয়া পড়াইতাম। যতদূর মনে পড়ে, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র পড়িত। সে পরে হুগলিতে ও

কলিকাতার হাইকোর্টে একজন বড় উকিল হইয়াছিল; যদি আরও কিছু দিন বাঁচিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে হাইকোর্টের জজ হইত। আল্‌ফ্রেড্ ক্রফট্ দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া প্রথম প্রথম কিছু বিপন্ন হইয়াছিলেন; ত্রৈলোক্য তাঁহাকে ফিল্‌জফির ধবৃতা ধরাইয়া দিল। দেবেন্দ্র ঘোষও বোধ হয় ক্লাসে পড়িত। ইংরাজি হইতে বাঙ্গালায় অনুবাদ সে অতি সুন্দররূপে করিতে পারিত। স্পেক্টেটরের কোনও কোনও অংশ অনুবাদ করিতে দিতাম। আমার মনে আছে সে 'eccentric' শব্দটার বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দিয়াছিল—'সৃষ্টি ছাড়া'। সে পরে আলিপুরের বড় উকিল হইয়াছিল। শুনিয়াছি, তাহার একটি ছেলে হাইকোর্টের জজ হইয়াছে। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে রাসবিহারী ঘোষ ছাত্র ছিল। 'মেঘনাদ বধ' প্রকাশিত হইলে আমি উহা কলেজে ধরাইয়া দিলাম। 'সম্ভাবশতক' পঠিত হইত। বাঙ্গালা কবিদিগের রচনা হইতে অলঙ্কারের নানা উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া একখানি পুস্তক লালমোহন ভট্টাচার্য্য রচিত করিলেন।[১] সেটি পড়াইতে হইত। আমার দাদার 'বেকনের সন্দর্ভ' রাসবিহারী কণ্ঠস্থ করিয়াছিল। মুখস্থ করিবার শক্তি তাহার অসাধারণ ছিল। ক্লাসে পরীক্ষার সময় একবার সে জর্জ্জ পেনের মেণ্ট্যাল ফিলজফির ভাষা এমন ভাবে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিল যে, পরীক্ষক মনে করিলেন সে চুরি করিয়া লিখিয়াছে। তখন সে দাঁড়াইয়া সমস্তটা অনর্গল বলিয়া গেল। মুখস্থ করিবার শক্তি সারদাচরণ মিত্রেরও খুব ছিল। তারানাথ তর্কবাচস্পতির আশুবোধ ব্যাকরণখানা সে মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল।

"বি.এ. পরীক্ষা দিবার সময় জর্জ্জ পেন ও অ্যাবারক্রম্বি আমরা পড়িয়াছিলাম। তখন ভাইস্ চ্যান্সেলার ছিলেন একজন ব্যারিষ্টার,—মিঃ রিচি। প্রিন্সিপ্যাল সট্‌ক্লিফ্ সাহেব দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে গণিত অধ্যাপনা করিতেন। তিনি তাঁহার বৎসরের নবম র‍্যাংগ্লার ছিলেন। অধ্যাপক বীবি উপর ক্লাসে পড়াইতেন; তাঁহার ডবল অনার্স ছিল। সট্‌ক্লিফ তাঁহাকে বিশেষ খাতির করিতেন। সট্‌ক্লিফ ছুটি লইলে অধ্যাপক ক্লিণ্ট অধ্যক্ষের কার্য্য করিতেন। তাঁহার ব্যবহারে ছেলেরা বড়ই অসন্তুষ্ট ছিল। তিনি তাঁহার বৎসরের সপ্তত্রিংশত্তম র‍্যাংগ্লার ছিলেন। বিষম দুর্ব্যবহারে অস্থির হইয়া কয়েক জন ছাত্র তাঁহার মাথার টুপি দিয়া তাঁহার মুখ ঢাকিয়া তাঁহাকে প্রহার করে। ভবিষ্যতে যিনি প্রথম বাঙ্গালী র‍্যাংগ্লার হইবেন, সেই আনন্দমোহন বসুকে অধ্যাপক বীবি বড় ভালবাসিতেন। তিনি আদর করিয়া আনন্দমোহনকে ডাকিতেন, '**My Mymensing boy**'। ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক সাণ্ডার্স বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে টনি সাহেব আসিলেন; কিন্তু প্রথম প্রথম তিনি একটু

---

[১] লালমোহন বিদ্যানিধির 'কাব্যনির্ণয়' (নভেম্বর, ১৮৬২)।—সং

বেকায়দায় পড়িয়াছিলেন। অধ্যাপক গ্রেপেল মিল্টনের ভাষা পরিবর্ত্তন করিয়া নির্ভুল ছন্দে কবিতা রচনা করিতেন; কোথাও কোনও solecism দেখিলে তাহা লইয়া আলোচনা করিতে ভালবাসিতেন। Adam the goodliest of men his sons since born, and the fairest of her daughters Eve[১] লইয়া তাঁহার তর্ক-বিতর্ক আমার বেশ মনে পড়ে। বোধ হয় গ্রেপেল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রেজিষ্ট্রার হন।[২]

"এল্‌বার্ট হলের সিঁড়ির ধারে একটি কক্ষে অধ্যাপকদিগের বসিবার ব্যবস্থা ছিল। ইংরাজদিগের সহিত আমরা মেলামেশা সমানভাবে করিতাম বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে যেন একটু উচ্চনীচভেদ তাঁহাদের কাহারও কাহারও ব্যবহারে প্রকাশ পাইত। বাঙ্গালী বলিয়া একটু মনস্তাপ পাইতে হইত। একটা দৃষ্টান্ত দি। তখন রাস্তায় কোনও ফুটপাথ ছিল না। এল্‌বার্ট হল্‌-এর সরু সদর দরজার সম্মুখেই ক্রফ্‌টের বগি গাড়িখানা প্রত্যহ দাঁড়াইয়া থাকিত; এমন ফাঁক ছিল না যে, বাহির হওয়া যায়। অথচ প্রত্যহ আমাকে এল্‌বার্ট হল-এ কার্য সারিয়া সংস্কৃত কলেজে পড়াইতে যাইতে হইত। ভগ্ন প্রাচীর লাফাইয়া আমি বাহির হইতাম, অথচ গাড়িখানা সরান হইত না।

"১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে চাকরি ছাড়িয়া দিয়া আমি হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করিলাম। ঐ বৎসরে আমি সেনেটের সভ্য হইলাম।[৩] এখন জীবিত ফেলোদিগের মধ্যে আমিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। য়ুনিভার্সিটির ফেলো হইলাম বটে, কিন্তু এই সময় আমার জীবন এত জটিল হইয়া গেল যে, আমি খুব অল্প মিটিং-এ উপস্থিত হইতাম। আজ তোমাকে একটি মিটিং-এর কথা বলিব, যেটির উপর তোমাদের রিপণ কলেজের জীবন মরণ নির্ভর করিয়াছিল। তখন আমি রিপণ কলেজের সঙ্গে সংস্পৃষ্ট।

"সুরেন্দ্রনাথ আমা অপেক্ষা আট বৎসরের ছোট ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা সমস্ত বাঙ্গালা দেশকে গৌরবান্বিত করিয়াছিল। আজ তাঁহার সম্বন্ধে অন্য কোনও কথা বলিবার লোভ সম্বরণ করিব। কোনও কিছুতেই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। কলেজ করিলেন। দেবশঙ্কর দে'র আমলে কলেজ বেশ সুপ্রতিষ্ঠ হইল। কিন্তু খাতাপত্রগুলা যে অত্যন্ত ময়লা ও অপরিষ্কার, সে বিষয়ে তাঁহার আদৌ দৃক্‌পাত ছিল না। কেরাণী

---

১ Adam the goodliest man of men since born
His sons, the fairest of her daughters Eve. Paradise Lost, IV (—সং)

২ ১৮৫৭ খ্রীঃ Col. W. Grappel কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হন।

৩ প্রকৃতপক্ষে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করেন এবং ১৮৭৩ খ্রীঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন।—সং

নেহারের উপর নির্ভর করিয়া তিনি বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন। আমি রিপণ কলেজে তখন ল' লেকচরার; আর্টস্ বিভাগে সংস্কৃত ও ফিলজফি অধ্যাপনা করিতাম। সহসা বজ্রপাত হইল—রিপণ কলেজ disaffiliate করা কেন হইবে না তাহার কারণ দর্শাইতে হইবে। নানা কার্য্যের মধ্যে ব্যাপৃত থাকিয়া সুরেন্দ্রনাথ সকল খুঁটিনাটি দেখিবার চেষ্টা করিতেন না। অথচ কলেজের উন্নতির জন্য তিনি কি না করিয়াছিলেন! অধ্যাপক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধারলাভ করিবার জন্য তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। মানসিক ও শারীরিক গ্লানিবশতঃ তিনি কয়েকদিন শয্যাগত হইলেন। আমি তখন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হইয়াছি।[১] সুরেন্দ্রনাথের বন্ধু কটন, হ্যারিসন প্রভৃতি ইংরাজদিগের সহিত আমি দেখাশুনা করিতে লাগিলাম। তাঁহারা স্তর কোমার পেথেরামকে দলে টানিয়া লইতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু বিরুদ্ধ পক্ষ অত্যন্ত প্রবল। ভাইস্ চ্যান্সেলর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সেনেটের বৈঠক বসিল। তোমরা জান, আমার প্রতি গুরুদাসের ভক্তি অনন্যসাধারণ ছিল। যেখানে দেখা হইত সাষ্টাঙ্গ ভূমিষ্ঠ হইয়া সে আমাকে প্রণাম করিত। সুরেন্দ্রনাথের আশা ছিল, আমি প্রিন্সিপ্যাল হইলে ভাইস্-চ্যান্সেলর প্রসন্ন হইবেন। দরজা বন্ধ করিয়া সেনেটের কার্য্য আরম্ভ হইল। বক্তৃতার পর বক্তৃতা চলিতে লাগিল। ম্যাক্‌ডোনাল্ড বলিলেন,—সুরেন্দ্রনাথের কলেজ কি না, তাই বাঁচাইবার চেষ্টা হইতেছে! সভাপতির নিকট ধমক খাইয়া বক্তা বসিলেন। স্তর কোমার পেথারাম প্রস্তাব কবিলেন—That the question of the disaffiliation of the Ripon College be postponed sine die। প্রায় সমান সমান ভোট হইল, হুগলি কলেজের গ্রিফিংস্ যদি উপস্থিত হইতে পারিতেন, তাহা হইলে আমাদের সর্ব্বনাশ হইত। দু'তিন মিনিট পরে গ্রিফিংস্ আসিয়া পড়িলেন; কিন্তু তখন আমাদেব জিৎ হইয়া গিয়াছে।

"বহু বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। গুরুদাস এখন পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। যদুনাথ সরকার এখন তোমাদের ভাইস্-চ্যান্সেলর। বোধ হয় ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে যদুনাথ রিপণ কলেজেই প্রথম শিক্ষকতা সুরু করেন। তোমার মুখে শুনিতেছি, তোমরা তাঁহার কাছে স্পেন্সরের 'ফেয়ারি কুইন' পড়িয়াছ। A gentle knight was pricking on the plain, Yclad in mighty arms and silver shield মনে আছে ত? সেই gentle knight-এর মত অন্যায়েব বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া প্রবীণ যদুনাথ সরকার জয়ী হউন। তোমাদের প্রিন্সিপ্যাল নরেন্দ্রনাথ রায়ও বেশ সুখ্যাতির সহিত আমার কাছে কায করিয়াছিলেন। তোমাদের জয় হউক।"

[১] ১৮৯১-১৯০৩ পর্যন্ত রিপন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।—সং

তিন

৩০শে আশ্বিন, ১৩৩৫

অনেক দিন পরে আজ পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল-ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চরণবন্দনা করিবার সৌভাগ্য আমার হইল। দুই একটি কথার পর তিনি বলিলেন, "মানসীতে মায়ের ছবি সব দেখিলে আমার ইচ্ছা করে ঐ ছবিগুলি তুলিয়া ধরিয়া মেয়ো বিবির[১] 'মাদার ইণ্ডিয়ার' (Mother India) জবাব দিতে। ...বিদ্যাসাগরের মা'র চেহারা দেখিলে?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাকে আপনি কখনও দেখিয়াছিলেন?" তিনি বলিলেন, "না। বিদ্যাসাগর কলিকাতায় একলাই আসিতেন, মা দেশে থাকিতেন। এখন যেখানে কিং কোম্পানির হোমিওপ্যাথিক ঔষধের দোকান, ঐখানে একতালা বাড়ীতে বিদ্যাসাগর লোকজন লইয়া থাকিতেন; তাহার পূর্ব্বে বৌবাজারে রাজকৃষ্ণ বাঁড়ুয্যের পৈতৃক বাড়ীতে অনেক দিন ছিলেন। রাজকৃষ্ণ পৈতৃক সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ লইয়া দাদা নীলকমলের নিকট হইতে পৃথক হইলেন এবং সুকিয়া ষ্ট্রীটে নূতন বাড়ী করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বিদ্যাসাগর অধিকাংশ সময় ঐখানে অতিবাহিত করিতেন। ঐ বাড়ীতেই প্রথম বিধবা বিবাহ হয়। আমি তখন কলেজে পড়ি। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিবাহ;—লোকে লোকারণ্য, ভয়ানক গোলমাল,—কিন্তু বিধবাবিবাহ সুশৃঙ্খলে সম্পাদিত হইল।[২] কয়েক বৎসর পরে যখন সিপাহী-বিদ্রোহ হইল, তোমরা জান না বোধ হয় যে এই বিধবাবিবাহ প্রচলন সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছিল। শুধু দাঁত দিয়া টোটা কাটা নয়,—বিধবাদের বিবাহ দিয়া ইংরাজ হিন্দুর সর্ব্বনাশ করিতেছে, এইরূপ একটা রব উঠিয়াছিল। এই বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে আজকাল দেখিতে পাই সাধারণতঃ লোকের একটা ধারণা আছে যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতার আগ্রহে এই বিধি প্রচলিত হয়; কিন্তু আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুখে একটু অন্যরূপ শুনিয়াছি। যখন বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত, ইহা তিনি স্থির করিয়াছিলেন, তখন একদিন তাঁহার মাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'মা, আমি একটা কায করতে যাচ্ছি, তাতে তুই কি বলিস্? (বিদ্যাসাগর শেষ পর্য্যন্ত মাকে "তুই তোকারি" এই ভাবে কথা কহিতেন)। আমার বোধ হয় বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। আমি তাই বিধবাবিবাহের আইন পাশ করাবার চেষ্টা করব ভাবছি; কিন্তু আগে আমি তোর একটা মত নিতে ইচ্ছা করি।

১ ভারত পরিভ্রমণান্তে মার্কিন মহিলা Miss Katherine Mayo ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে 'Mother India' প্রকাশ করেন।—সং

২ ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সহিত পলাশডাঙা গ্রামের ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দ্বাদশবর্ষীয়া বিধবা কন্যা কালীমতীর বিবাহ হয়।—সং

এ কায তুই ভাল বলিস্ কি না?' মা একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, 'তুই কি ঠিক বুঝেছিস্ যে বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত?' আমি বলিলাম—'হ্যাঁ। আমি অনেক বিবেচনা করে দেখলাম যে, বিধবার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত,—এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না।' তখন তিনি বলিলেন, 'তবে আমি তোকে বারণ করি না, তুই এ কায করগে যা;—যে যা বলে বলুক।'

"বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সময় তারানাথ তর্কবাচস্পতি বিদ্যাসাগরের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অত বড় দিগ্‌গজ পণ্ডিত কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। কোন্ দেশে একজন পণ্ডিত একখানি এনসাইক্লোপিডিয়া রচনা করিয়াছিলেন[১] বল দেখি? কিন্তু বহু-বিবাহ আন্দোলনের সময় তারানাথ বিদ্যা-সাগরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের সমস্ত বিদ্রূপবাণ তাঁহার উপর বর্ষিত হইল। আমরা তখন ফরাসীবিপ্লব সাহিত্যে মস্‌গুল; বিদ্যাসাগরের বিদ্রূপাত্মক রচনা পাঠ করিয়া ভলটেয়ারকে মনে পড়িত। তারানাথ বিদ্যাসাগরের উপর রাগ করিয়া সমগ্র কায়স্থজাতির উপর চটিয়া গেলেন। আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, বিদ্যাসাগরের পরম বন্ধু ছিলেন কায়স্থ কুলতিলক শ্যামাচরণ বিশ্বাস। শ্যামাচরণের উপর রাগ হইল বিদ্যাসাগরের জন্য, এবং সমস্ত কায়স্থ জাতির উপর রাগ হইল শ্যামাচরণের জন্য। বাচস্পত্যভিধান রচনায় তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে আমি কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছিলাম। কতক কতক প্রুফ আমাকে দেখিতে হইত। কায়স্থ শব্দের অভিধানিক ব্যাখ্যায় গ্লানিসূচক শ্লোক দেখিয়া আমি তাঁহাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া সেই শ্লোকটি এবং আনুসঙ্গিক অপব্যাখ্যাটুকু বাদ দিতে প্রবৃত্ত করাইলাম।

"সাধারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্বন্ধে তোমাদের কি ধারণা জানি না, তারানাথের বিষয়বুদ্ধি কিন্তু অনন্যসাধারণ ছিল। শালওয়ালাদের নিকট হইতে শাল আনিয়া তিনি ধনী গৃহস্থ বাড়ীতে 'ফিরি' করিয়া বিক্রয় করিতেন। বোধ হয় তাঁহার ধারণা ছিল যে পশুলোমজাত বস্ত্র পণ্য হিসাবে ক্রয়-বিক্রয় করিতে ব্রাহ্মণের কোন বাধা নাই। একবার এক সভায় তর্কস্থলে তর্কবাচস্পতি বলিলেন, 'আমার কথা যদি মিথ্যা হয় তাহা হইলে আমি ব্যবসা ছাড়িয়া দিব।' প্রতিপক্ষ তৎক্ষণাৎ বিদ্রূপের স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোন ব্যবসা মহাশয়? —শাস্ত্রব্যবসা না শালের ব্যবসা?' তাঁহার নিজ গ্রাম অম্বিকা-কালনায় তিনি একটা সুরকির কল বসাইলেন, গ্রামবাসীরা অস্থির হইয়া উঠিল, কেহ তখনও সুরকির কল দেখে নাই। সংস্কৃত পুঁথি সম্পাদন (edit) করিয়া প্রকাশিত করিতে অনেক সময় লাগিবে, তাই তিনি বহুসংখ্যক পুঁথি যেমনটি ছিল তেমনই ভাবে মুদ্রিত করাইয়া প্রকাশিত করিলেন। পুত্র জীবানন্দ অনেকস্থলে কিছু কিছু পাদটীকা

[১] বাচস্পত্যভিধান, ১ম-২২শ খণ্ড (১৮৭৩-১৮৮৪)।-সং

সংযোজিত করিয়া দিতে লাগিলেন। জীবানন্দের সংস্করণ মার্কিণে ও ইউরোপে এমন সমাদর লাভ করিল যে একবার প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ টনি সাহেব হতাশ ভাবে বলিয়াছিলেন, ঐ জীবানন্দ লোকটার (That fellow Jibananda) সঙ্গে পাল্লা দেওয়া অসম্ভব। তারানাথ তর্কবাচস্পতির আশুবোধ ব্যাকরণ সর্ব্বত্র সমাদৃত ছিল। সেই নামের অনুকরণে জীবানন্দের পুত্রগণের নামকরণ হইয়াছিল। বাচস্পতি অভিধান রচনা করিয়া তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল।

"মানসীর একজন লেখক রামমোহন রায় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে তিনি তিব্বতে গিয়াছিলেন। ইহা তিনি কোথা হইতে পাইলেন, জানি না। আমি কখনও এ কথা শুনি নাই। এ সম্বন্ধে আরও কিছু জানিবার কৌতূহল হয়। রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদ খুব বড় উকিল ছিলেন; সকলেই আশা করিয়াছিল তিনি জজের আসন অলঙ্কত করিবেন; যখন সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইল, তিনি রোগশয্যায় পড়িলেন, এবং কিছুদিনের মধ্যে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার স্বোপার্জ্জিত বাইশ লক্ষ টাকার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হরিমোহন ও প্যারীমোহনকে আমি কিছুদিন পড়াইয়াছিলাম। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও কিছুদিন তাহাদের শিক্ষক ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথায় আমি অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী হই। রমাপ্রসাদ রায়ের বাড়ীতে পড়ানর ব্যবস্থা করা হয় নাই। স্কুলের একটি ঘরে ছেলে দুটি পড়িতে আসিত। লোকে বলিত যে, রামমোহন রায়ের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় হইলে ভাল হইত। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন একটি character ছিলেন। শুনিতে পাই, যখন হিন্দু কলেজে তিনি পড়িতেন, তখন সতীর্থদের সহিত পাল্লা দিয়া অনেক সময় কাণ্ড করিয়া বসিতেন যাহাতে শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ অস্থির হইয়া উঠিত। একদিন কথা হইল যে ক্লাসের মাঝখানে সকলের সম্মুখে জামা ও চাদর পরিত্যাগ করিতে হইবে,—কে পারে? বালক জ্ঞানেন্দ্রমোহন ব্যতীত আর কেহই পারিল না। ব্যারিষ্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহন একবার জজের সম্মুখে অবজ্ঞার সুরে বলিলেন, If the authors of Hindu Law knew anything about it, I would not have to stand before your lordships to expound it. পিতার সম্পত্তি সম্বন্ধে তিনি বলিতেন ঐ ওকালতির টাকা আমি স্পর্শ করিব না। পরে কিন্তু ঐ সম্পত্তি লইয়া শ্রাদ্ধ অনেক-দূর গড়াইয়াছিল। বিপত্নীক জ্ঞানেন্দ্রমোহন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর দানপত্রে যে বিলাতী entail-এর ব্যবস্থা করিলেন, আদালতে তাহা টিকিল না। এখানে স্যার বার্নস পিকক্ বলিলেন যে, কেবল একজনকে দিব না এই কথা ক্রমাগত বলিয়া উইল করা মোটেই ঠিক হয় নাই; বিলাতের আদালত বলিলেন যে, কোনও একজন হিন্দু সমগ্র হিন্দু আইনকে উল্টাইয়া

দিতে পারেন না; বিলাতী entail হিন্দু আইনে কিছুতেই খাপ খায় না; কাজেই যাহারা এখনও জন্মায় নাই, তাহাদের উল্লেখ করিয়া কোন হিন্দু উইল করিতে পারেন না। এই প্রসঙ্গে হাইকোর্টে অকারণ আমার কিছু প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল। আমার টেগোর ল' লেকচার[১] লইয়া কিছু নাড়াচাড়া হইল। মিঃ ডব্লু সি. ব্যানার্জ্জি বলিলেন, ঐ যে unborn generations, ওটা আগে কেহই জানিত না, তুমিই উহার জন্মদাতা।' আমি ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিতাম। তিনি বলিতেন I know, I know—you are the Father of uuborn generations।[২] এডভোকেট জেনারেল পল সাহেবের মুখেও একদিন ঐ সম্বন্ধে অপ্রত্যাশিত সুখ্যাতি লাভ করিলাম। অথচ বাস্তবিক আমি এ সুখ্যাতি পাইবার উপযুক্ত পাত্র কি না সে সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। তা'রপর যখন স্যার সৈয়দ আমেদের পুত্র জষ্টিস মামুদ তাঁহার রায়ের মধ্যে আমার লেকচার হইতে প্রায় দেড় পৃষ্ঠা উদ্ধৃত করিয়া এলাহাবাদে আমার নাম জাহির করিয়া দিলেন, তখন আমি অবাক হইয়া গেলাম।

"মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মিঃ ডব্লু. সি. ব্যানার্জ্জিকে একবার বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল যে ব্যানার্জ্জি সাহেব জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরকে বুঝাইয়া তাঁহার স্বত্বটুকু বিক্রয় করিতে প্রবৃত্ত কবাইবেন। ব্যানার্জ্জি সাহেবের মুখে আমি শুনিয়াছি যে, তিনি ঐ প্রস্তাব উত্থাপিত কবিবামাত্রই জ্ঞানেন্দ্রমোহন বলিলেন, 'কেন আমার স্বত্ব বিক্রয় করিব? আমি বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছি; নগদ কতকগুলো টাকা পাইলে ইহার অধিক আমার আর কি হইবে?' পিতার উপর তাহার আক্রোশ ছিল বটে, কিন্তু একবার তাঁহার আর্থিক অবস্থা কিছু খারাপ হওয়ার জন্য তিনি তাঁহার দুই পুত্রকে তাহাদের পিতামহের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। প্রসন্নকুমারের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জ্ঞানেন্দ্রমোহন একটি character। তারক পালিত ও ডব্লু. সি. ব্যানার্জ্জির সহিত তিনি মুরুব্বির মত ব্যবহার করিতেন। পালিতের পিঠ চাপড়াইয়া একবার তিনি বলিয়া উঠিলেন 'after all you have a mind'। ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা উঠিলে তিনি বলিলেন, 'Religion? Religion is not for men. It is for women.' শেষ বয়সে তিনি পৈতৃক সম্পত্তিতে তাঁহার সমস্ত স্বত্ব হস্তান্তরিত করিয়াছিলেন ও প্রবাসে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

"রামমোহন রায়ের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হইলে ঠিক মানাইত একথা লোকে বলিত বটে কিন্তু প্রিন্স দ্বারকানাথও উপযুক্ত পুত্রের উপযুক্ত পিতা ছিলেন। তাঁহার

---

[১] 'The Law Relating to the Joint Hindu Family" (1885).—সং

[২] পৃষ্ঠা ৩২৫ দ্রষ্টব্য—সং

দানশীলতা সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত ছিল। একবার একটি ধনী গৃহস্থ ঋণের দায়ে পৈতৃক ভদ্রাসন বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। বাড়ীটি যেদিন বিক্রয় করা হইবে, দ্বারকানাথ সেইদিন সেই বাড়ীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন। একটী শিশু তাহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মা এরা কা'রা?' মা বলিলেন, 'এই বাড়ী এখন এরা কিনবেন।' 'তবে আমরা কোথায় যাব?' 'ভগবান আছেন, আশ্রয় দেবেন।' দ্বারকানাথ সব শুনিলেন; কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঐ ছেলেটি কে?' উত্তর হইল, 'এই গৃহকর্ত্তারই পুত্র।' প্রিন্স দ্বারকানাথ ছেলেটিকে কাছে ডাকিলেন, সস্নেহে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, 'তোমরা কোথাও যাবে না বাবা, এই বাড়ীতেই থাকবে এ বাড়ী তোমারই রইল।'

"জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর বিলাতে বাঙ্গালার অধ্যাপক ছিলেন কি না ঠিক জানি না, তবে বোধ হয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদিগকে তিনি কিছু দিন বাঙ্গালা শিখাইয়া ছিলেন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে রীতিমত বাঙ্গলা অধ্যাপনা আরম্ভ হইল, আমার সময় হইতে। সিনিয়র অধ্যাপক রাম মিস্তির একটি character ছিলেন। নিরীহ ছাত্রকে সামান্য ত্রুটির জন্য হয়ত শাসন করিতেন, কিন্তু দুষ্ট ছেলের কাছে জব্দ হইতেন। তারক পালিত তখন সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাসে পড়ে; পণ্ডিত মহাশয় যে বই পড়ান তাহার এক সতীর্থ বন্ধু সে বই সেদিন ক্লাসে আনে নাই; রাম মিস্তির তাহাকে একটি চড় মারিলেন, তারক বলিল, 'পণ্ডিত মহাশয়, আপনি ওকে মারলেন?'

'হ্যাঁ মেরেছি, ও বই আনে নি কেন?'

'আমিও ত বই আনি নি—আমাকে মারুন দেখি?'

অতি কোমল স্বরে পণ্ডিত মহাশয় উত্তর দিলেন, 'তুমিও বই আন নি! আচ্ছা বাবা, পাশের ছেলেটির বই দেখে পড়।' এডুকেশন কমিটির প্রেসিডেণ্ট ড্রিঙ্কওয়াটার বিটন সাহেবের সহিত দেখা করিতে হইবে; এনসাইক্লোপিডিয়া হইতে বিটনের বংশ সম্বন্ধে তিনি কিছু পড়িয়া লইলেন। সাহেবের সঙ্গে কার্ডিনাল বিটন সম্বন্ধে আলাপ করিয়া রাম মিস্তির বলিলেন, 'আহা, আর একজন পণ্ডিত আপনাদের বংশে ছিলেন। তিনি গ্যালিলিওর জীবন চরিত্র লিখিয়াছেন, তাঁহারও নাম ড্রিঙ্কওয়াটার বিটন।' 'তিনি আমার পিতা; তোমার দেখিতেছি অনেক জানা শুনা আছে।' এই বলিয়া সাহেব রাম মিস্তিরের পিঠ চাপড়াইতে লাগিলেন। সংস্কৃত ও বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে পণ্ডিত মহাশয়ের প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও ইংরাজী সাহিত্যজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার সুখ্যাতি ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে আসিবার পূর্ব্বে তিনি একটি স্কুলে ইংরাজী পড়াইতেন; সেখানে তাঁহার সুযশ হওয়ায় মাসিক তিন শত টাকা বেতনে প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। সংস্কৃত কলেজ হইতে বাহির হইয়া আমি যখন প্রেসিডেন্সি

কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, অধ্যাপক রাম মিত্তির আমার জন্য একটু স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিলেন। এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় অনুবাদ করিবার ভার বিশেষ ভাবে আমার উপর ন্যস্ত হইল। পণ্ডিত মহাশয়ের পুত্রের নাম ছিল গিরিশ, তিনি তাহাকে 'বাবা গিরিশ' বলিয়া ডাকিতেন; কলেজের সব ছেলেরাই ক্রমে তাহাকে বাবা গিরিশ বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল।

"জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে পণ্ডিত মহাশয়ের একটু প্রতিপত্তি ছিল।

"ধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের মন্তব্য তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি ত তবু রিলিজনটাকে বিশেষ স্ত্রীলোকের সামগ্রী বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন; সম্প্রতি সোভিয়েট রুশিয়ার কি ব্যবস্থা হইয়াছে, কাগজে দেখিয়াছ কি? সরকার নাকি হুকুম জারি করিয়াছেন যে, তরুণ শিক্ষার্থীদিগের সম্মুখে গড্ ও রিলিজন্ উপস্থিত করা চলিবে না; ভগবানে ও ধর্ম্মে বিশ্বাস তাঁহাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তরায়। দেখ, অনেক পূর্ব্বে কারলাইল যীশু খৃষ্টের প্রতিকৃতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিয়াছিলেন, 'The game is played out'। আজ তিনি জীবিত থাকিলে কি বলিতেন? জার্ম্মানীর দুরবস্থা দেখিয়াই বা তিনি স্থির থাকিতেন কি?"

চার

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬

পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন,—"গত মাসের প্রবন্ধটা পড়িয়া আমার একটা কথা মনে হইতেছে, ঐ 'Father of unborn generations' কথাটা হয়ত অনেক পাঠক ভুল বুঝিবেন। আমি টেগোর ল' লেকচার দিই ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে; কিন্তু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উইলের মকদ্দমা কলিকাতা হাইকোর্টে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছিল প্রায় সতের-আঠার বৎসর পূর্ব্বে। তখন আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করি। কিছুদিন আগে হইতেই আমি ঐ কলেজে রীতিমত ছাত্রহিসাবে ল' ক্লাসে আইন পড়িতাম। ব্যরিষ্টার মন্‌ট্রিও ছিলেন আমাদের অধ্যাপক। একদিন তিনি ক্লাসে আসিয়া বলিলেন, 'আমি শুনিলাম, প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন অধ্যাপক আমার ছাত্র; সে ব্যক্তি কে?' অগত্যা আমি পরিচয় দিতে বাধ্য হইলাম। তিনি বলিলেন, 'বেশ হইল; রেজিষ্টরির খাতাখানা লইয়া তুমি ছেলেদের নাম ডাক; ওটা তোমার অভ্যাস আছে, আমার পক্ষে একটু কষ্টকর।' হিন্দু ল' সম্বন্ধে সংস্কৃত পুঁথি হইতে নানা বিষয়ের ব্যাখ্যা তিনি আমার মুখ হইতে শুনিতে চাইতেন। তখনকার দিনে একটু আধটু খ্যাতি আমার ছিল বটে, কিন্তু ঐ উইল সম্বন্ধে unborn generations-এর কথাটা তুলিয়াছিলেন স্বয়ং বার্নেস পিকক্। কেহ তাঁহাকে ওকথা বলিয়া দেয় নাই। দায়ভাগের সূক্ষ্ম পর্য্যালোচনায় তিনি ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। অনেক পরে ডব্লিউ. সি. বনার্জ্জি আমার ঘাড়ে উহা জোর করিয়া চাপাইয়া দিয়াছিলেন। পরিহাস করিয়া নহে, আমার বিশ্বাস তিনি ভুল করিয়া ঐ কথা বলিতেন। আবার কখনও কখনও তিনি কতকটা ভ্রমবশতঃ, কতকটা পরিহাসের ছলে 'বিদ্যাম্বুধি'র পরিবর্ত্তে আমাকে 'দীর্ঘাজ্ঞি' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ঐ 'বিদ্যাম্বুধি'র উপাধিটি আমি পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি। মন্‌ট্রিও সাহেবের জন্য দুঃখ হয়। তাঁহার মত ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যবহারজীবী কলিকাতা হাইকোর্টে তখন বিরল। পাগল স্ত্রী লইয়া তাঁহাকে ঘর করিতে হইত। একটি ইংরাজ বালিকা বিদ্যালয়ের তিনি পেট্রন ছিলেন। তাঁহার এমন পদস্খলন হইল যে, সমাজে তিনি আর মাথা তুলিতে পারিলেন না। নিজের অতীত কাহিনী বিবৃত করিতে বসিয়া একদিন তিনি অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলিলেন, 'Well, I just drifted.' সে যাহা হউক, কিছুদিন

পরে এশিয়াটিক সোসাইটির জন্য আমি পরাশর সংহিতা অনুবাদ করিয়াছিলাম; রাজেন্দ্রলাল মিত্র ভাষাটা মার্জ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন।

"রামমোহন রায়ের তিব্বতাভিযান সম্বন্ধে অজ্ঞতা স্বীকার করায় আমি দেখিতেছি একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। ভালই হইয়াছে। নানাদিক হইতে নানা প্রশ্ন উঠিয়াছে; সে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলে তবে খাঁটি চরিতাখ্যান রচিত হইবে। অথচ তাঁহার গৌরব ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা নাই। বালক রাজারামের সঙ্গে তাঁহার কি সম্বন্ধ ছিল? পোষ্যপুত্র? তবে কি মিশনরিসুলভ বিদ্বেষবশতঃ রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সে কথায় সন্দেহ প্রকাশ করিতেন? হরেস্ হেম্যান্ উইলসন রামমোহন রায়ের প্রাইভেট সেক্রেটরি সম্বন্ধে রামকমল সেনকে চিঠি* লিখিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কোনও গবেষণা হইয়াছে কি? যদিই ধরিয়া লওয়া যায় যে, রামমোহন রায়ের সমস্ত ইংরাজি রচনা প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ইংরাজ প্রাইভেট সেক্রেটরি রচিত, তাহাতেই বা আসে যায় কি? সমস্ত তর্ক-বিতর্ক আলোচনা প্রসঙ্গ তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। নিশ্চয় তিনি ভাল রকম ইংরাজি শিখিয়াছিলেন, নহিলে শুধু সেক্রেটরির সাহায্যে অত তর্ক-বিতর্ক চালাইতে পারা যাইত কি? আধুনিক বাঙ্গালা

*In a letter dated 21-12-1833 Dr. Wilson (Boden Professor of Sanskrit at the Oxford University) writes to Ram Comul Sen:

In a letter I wrote to you I mentioned the death of Ram Mohun Roy. Since then I have seen Mr. Hare's brother, and had some conversation with him on the subject. Ram Mohun died of brain-fever, he had grown very stout, and looked full and flushed when I saw him. It was thought he had' the liver, and medical treatment was for that and not for determination to the head. It appears also that mental anxiety contributed to aggravate his complaint. He had become embarrassed for money and was obliged to borrow of his friends here; in doing which he must have been exposed to much annoyance, as people in England would as soon part with their lives as their money. Then Mr. Sandford Arnot, whom he had employed as his Secretary, importuned him for the payment of large arrears which he called arrears of salary, and threatened Ram Mohun, if not paid to do what he was done since his death, claim as his own writing all that Ram Mohun published in England. In short, Ram Mohun got amongst a low, needy unprincipled set of people, and found out his mistake, I suspect, when too late, which preyed upon his spirit and injured his health. With all his defects, he was no common man and his country may be proud of him. (Vide pp 14-15 of Peary Chand Mittra's Life of Dewan Ram Comul Sen)—লেখক

গদ্য সাহিত্যের তিনি প্রবর্ত্তক, ইহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ;—অথচ এ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইবার কিছুই নাই। সাহিত্য ও সমাজ হিসাবে ইহা শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে করি। রামমোহন রায় আজ আপন গৌরবে দেদীপ্যমান্। অথচ খাটি মানুষটিকে চিনিতে হইলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গবেষণা আবশ্যক। চরিতাখ্যান রচনায় যে প্রণালী অবলম্বন করিলে মাল-মসলা সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহার পরিচয় শ্রীমান মন্মথনাথের[১] লেখায় কতকটা পাওয়া যাইতেছে। তাহার জ্যেষ্ঠতাত অবিনাশ আমার ছাত্র ছিল ; পিতামহ গিরীশচন্দ্র ঘোষ আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু ছিলেন।

"খুব বাল্যকাল হইতে গিরীশ বাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। মালীর বাগানে তাঁদের বাড়ীর কাছে একটি গলির ভিতর আমাদের বাড়ী ছিল। গিরীশ বাবুর পিতামহ কাশী ঘোষ কায়স্থসমাজে বেশ প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন। স্বনামখ্যাত রামদুলাল সরকারের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। মালীরবাগানে তিনি একখানি বড় বাড়ী নির্ম্মাণ করাইলেন ; বোধ হয় তজ্জন্য কিছু বেশী টাকাকড়ি ব্যয় হইয়া গেল, এবং কিছুদিন খরচ-পত্তরের একটু টানাটানি করিতে হইয়াছিল। অবিনাশের মুখে শুনিয়াছি যে, এই ব্যাপার লইয়া কাশী বাবুর এক অহিন্দু আত্মীয় পরিহাসছলে একটি শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন,—'দাদা খান পানে চান্, নুন দিয়ে ভাত খান।' সে যাহা হৌক, ছেলেবেলায় এই বাড়ীতে ঝুলনের সময় পাঁচ দিন যাত্রা গান শুনিতে যাইতাম, আমার অগ্রজের কঠোর শাসন কিছুতেই আমাকে বাধা দিতে পারিত না। দাদা যাত্রা গান শুনিতে ভাল বাসিতেন না ; কিন্তু কাশী ঘোষের তিন পৌত্রের সহিত তিনি সখ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। ক্ষেত্র, শ্রীনাথ ও গিরীশের বিদ্যাচর্চ্চার খ্যাতি অল্পদিনের মধ্যে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের পাড়ায় দত্তদের ও ঘোষেদের পাশ্চাত্য বিদ্যানুশীলন খ্যাতি যেমন দাঁড়াইয়া গেল, তেমনটি আর কাহারও হইল না। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, পারদর্শিতা হিসাবে তিনটি ভাইয়ের মধ্যে কেহ কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহেন।

"আজ গিরীশচন্দ্রের কথা বিশেষ করিয়া আমার মনে পড়িতেছে। সত্য বটে তাঁহার অগ্রজ শ্রীনাথ কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রথম বাঙ্গালী ভাইস চেয়ারম্যান হইয়া বংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন ; তাঁহার খুল্লতাত পুত্র জীবন ঘোষ কলিকাতা ছোট আদালতে সর্ব্বপ্রথম প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী উকিল হইয়া বংশ-মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে

১ শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম. এ., এফ. এস. এস., এফ. আর. ই. এস.। ইনি রাজা দক্ষিণারঞ্জন রায়, কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ, জাপান প্রবাস, ত্রিবেণী, নব্য জাপান, মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র, মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির গ্রন্থের লেখক।—সং

সমর্থ হইয়াছিলেন। আবার জীবন বাবুর খুল্লতাতপুত্র প্রিয়নাথ একজন বড় এটর্ণি; সম্প্রতি প্রিয়নাথের জামাতা কুমার মন্মথনাথ মিত্র রায় বাহাদুর ও পুত্র এটর্ণি শৈলেন্দ্র নাথ যথাক্রমে কলিকাতায় শেরিফ ও ডেপুটি শেরিফ হইয়াছিলেন। কিন্তু গিরীশচন্দ্রের ধীশক্তি দেশের ও দশের কাজে যেভাবে প্রকটিত হইয়াছিল, তেমনটি আর কাহারও হয় নাই। তিনি আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিলেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শত বর্ষ পরে তাঁহার কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবার বিশেষ কারণ আছে। তোমরা তাঁহার কোন পরিচয় জান না। তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া কর্ম্ম করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, সেযুগেব বাঙ্গালী যে কয়জন কর্ম্মী ইতিহাসে রেখাপাত করিয়া গিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম; অথচ তাঁহার নাম একেবারে মুছিয়া গিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে হিন্দু প্যাট্রিয়ট প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনায় তাঁহারা তিন ভাই[১] (এবং প্রধানতঃ তিনি নিজে) হরিশ মুখুজ্জের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন, সে প্যাট্রিয়ট সম্পর্কে হরিশ মুখুজ্জের নাম চিরস্মরণীয় হইল, গিবীশবাবুব নাম সকলে ভুলিয়া গেল। যে 'বেঙ্গলী' পত্রিকা তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং দশ বৎসরের অধিক কাল তিনি যাহার সম্পাদক ছিলেন, সে 'বেঙ্গলী' হইতে তাঁহার নাম একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল; ইদানীং তাহার শিরোদেশে দেখিতে পাওয়া যায়—Founded by Surendranath Banerjee, অথচ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন 'বেঙ্গলী' প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন সুরেন্দ্রনাথের বয়স দশ বৎসর মাত্র।[২] হিন্দু প্যাট্রিয়টের প্রথম সংখ্যা বাহির হওয়ার কথা আমার মনে নাই; কিন্তু বেঙ্গলীর গোড়ার কথা আমার বেশ মনে পড়ে।

"অধ্যাপক লব্ সাহেবের অনুরোধে গিরীশ বাবু তাঁহার 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় ধ্রুব দর্শন (Positivism) সম্বন্ধে আমাকে কিছু লিখিতে বলেন। একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কোঁৎ সম্বন্ধে কি ভাবে আলোচনা করেন, ইহা জানিবার জন্য লব সাহেবের বড় কৌতূহল হইয়াছিল। তাঁহার মত ধ্রুবদর্শনবাদী একনিষ্ঠ কোঁৎ-শিষ্য তখন এদেশে বিরল ছিল। কোঁৎ-এর প্রভাব আমার অগ্রজ রামকমলের উপর বড কম ছিল না; তাই তিনি অল্প বয়সেই পূজা, চণ্ডীপাঠ ইত্যাদি আমার উপরে ন্যস্ত করিয়া নিজেকে কতকটা মুক্ত করিবার প্রয়াসী হইয়াছিলেন। লব সাহেবের সহিত আমার সাক্ষাৎ পরিচয় বড় বেশী ছিল না। খর্ব্বাকৃতি মানুষটি,—কিছুদিন তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। গিরীশ বাবুও যে ধ্রুব-দর্শন সাহিত্য শ্রদ্ধার সহিত অনুশীলন

---

১ শ্রীনাথ ঘোষ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ-এর পরিচালনায় সাপ্তাহিক 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' ৬ই জানুয়ারী ১৮৫৩ থেকে প্রাকাশিত হইতে প্রকাশিত সুরু করে।—সং

২ ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের সুরু হইতে সুরেন্দ্রনাথ 'বেঙ্গলী'-র সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন কিন্তু সাপ্তাহিক 'বেঙ্গলী'র প্রথম আবির্ভাব হয় ৬ই মে, ১৮৬২।—সং

করিতেন, ইহা প্রথম প্রথম আমি জানিতে পারি নাই। অথচ খাঁটি ব্রাহ্মণ্য-হিন্দু-সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া পাদরীর আক্রমণ হইতে ধ্রুব-দর্শনকে রক্ষা করিতে তিনি তৎপর হইতেন।

"গিরীশ বাবু ও তাঁহার অগ্রজদ্বয় ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনরিতে বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন। কাপ্তেন ডি.এল. রিচার্ডসনের ছাত্র না হইয়াও তাঁহারা তাঁহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কাপ্তেন সাহেবের কাছে বোধ হয় তাঁহাদিগকে পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। বিদ্যানুরাগ তাঁহাদের শেষ পর্য্যন্ত প্রগাঢ় ছিল। সরকারি কাজ করিয়াও পত্রিকা পরিচালনে গিরীশ বাবু যে দক্ষতা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা আজকাল তোমরা কল্পনা করিতে পারিবে না। হিন্দু-প্যাট্রিয়ট যখন কালীপ্রসন্ন সিংহের টাকায় জমিদারের মুখপত্র দাঁড়াইয়া গেল, তখনই মূঢ় মূক রায়তের বাণী স্বরূপ বেঙ্গলীর আবির্ভাব হইল। গিরীশ ঘোষ কোনও কারণে ন্যায় ও সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইতেন না। তাঁহার সঙ্গে আমার নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল; অথচ তিনি তাঁহার কাগজে আমার 'বিচিত্রবীর্য্যে'র যে তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহাতে আমি বিচলিত হইয়াছিলাম। ধীরভাবে প্রণিধান করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, তিনি অবিচার করেন নাই। আমার সেই সংস্কৃত ভাষাবহুল রচনাকে তিনি অন্যান্য বিশেষণের মধ্যে turgid আখ্যায় বিশেষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার ছাত্র চন্দ্রনাথ বসু প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিনে 'বিচিত্রবীর্য্যে'র যে প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িলে ইচ্ছা হয় একবার অন্বেষণ করিতে, কোথাও সেই ম্যাগাজিনের সেই খণ্ডটি পাওয়া যায় কি না।

"দীর্ঘকায় বিপুল বলিষ্ঠ গিরীশ ঘোষ অল্প বয়সেই ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তিনি বেলুড়ে কিছু জমি কিনিয়া বাড়ী নির্ম্মাণ করিলেন; স্বহস্তে কোদাল লইয়া বাগানে ভূমি খনন করিতে ভালবাসিতেন। আমার দাদাকেও তিনি তাঁহার জমির নিকটে একটু ভূমি ক্রয় করাইয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু সে বাড়ীতে যাইবার পূর্ব্বেই আমার অগ্রজের অপমৃত্যু ঘটিল।[১] এই মাটি খোঁড়ার কথায় বিদ্যাসাগরের কথা মনে পড়িয়া যায়। পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি, সংস্কৃত কলেজের এক অংশে যখন তিনি থাকিতেন, তখন কুস্তি করিবার জন্য সেইখানে জমি প্রস্তুত করা হইয়াছিল, সেই জমিতে তিনি কুস্তি করিতেন।[২] ইহাতে তাঁহার লজ্জা-সঙ্কোচ বিন্দুমাত্র ছিল না। বিদ্যাসাগর পাল্কী চড়িতেন, ঘোড়ার গাড়ী চড়িতে সহজে রাজি হইতেন না; বলিতেন যে, পাল্কী চড়ায় কোন দোষ আছে মনে করি না। ঘোড়ার গাড়ী চড়ায় কিন্তু আমার বিশেষ আপত্তি। ঘোড়াগুলাকে তাহাদের অনিচ্ছায় আমাকে বহন করিতে

১ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুলাই আত্মহত্যা করিয়া মৃত্যুবরণ করেন।—সং

২ পৃষ্ঠা ৮ ও ৮০ দ্রষ্টব্য।—সং

বাধ্য করান হয়; কিন্তু পাল্কী বেয়ারারা স্বেচ্ছায় অর্থের প্রত্যাশায় আমাকে বহন করে। এই জন্য এক হিসাবে ঘোড়ার গাড়ী চড়া কতকটা immoral মনে করি।

"যাক, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে আমি হাওড়ায় বাসা করি। তখন আমি ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর অভ্ স্কুল্‌স। সাহেব ইন্‌স্পেক্টর। গিরীশ বাবুর সঙ্গে প্রায় দেখা শুনা হইত। বাঙ্গাল বাবুর বাড়ীতে দীনবন্ধু বাবুর নাটক অভিনীত হইত; গিরীশবাবু ও আমি একত্রে তাহা উপভোগ করিতাম। সাঁংরাগাছি স্কুলের পারিতোষিক বিতরণে আমি তাঁহার সুললিত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলাম। সুন্দর বাগান বাড়ি, অটুট স্বাস্থ্য, বিপুল খ্যাতি;—অথচ এই অকৃত্রিম দেশসেবক তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র হইতে চল্লিশ বৎসর বয়সে সরিয়া পড়িলেন।"

POSITIVISM

বা

ধ্রুবদর্শন প্রসঙ্গ

যে কয়জন মনীষী বাঙ্গালী কোম্‌তের সর্ব্বপ্রথম মন্ত্রশিষ্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অন্যতম পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক দিন কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন "দেখ, যে শাস্ত্র গত পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া আলোচনা করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। ইচ্ছা হয়, মৃত্যুর পূর্ব্বে ধ্রুবদর্শন সম্বন্ধে আমার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করি।

"Ecstatics philanthropy কথাটা জান কি? শব্দটি হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের সৃষ্টি। উহার অর্থ করা যাইতে পারে, পরোপকারে আনন্দ-বিহ্বলতা। স্পেন্সার কোম্‌তের গ্রন্থাদি পড়িতেন না; কোম্‌তের দার্শনিক মতসমূহ তিনি পছন্দ করিতেন না। তিনি নিজে যে দার্শনিক প্রস্থান (School of Philosophy) প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু দুই চারিজন কোম্‌তের ভক্তের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল; যথা, দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস-লেখক লুইস এবং উহার চিরসঙ্গিনী (যদিও অবৈধরূপে) প্রসিদ্ধ উপন্যাস-রচয়িত্রী জর্জ্জ ইলিয়ট ওরফে কুমারী ইভান্স[১] এবং বোধহয় কোম্‌তের দর্শনের অনুবাদিকা কুমারী মার্টিনো[২]। ইঁহারা কয়েকজনে মিলিয়া এক্স্ (X) ক্লব নামক একটি গোষ্ঠিতে মিলিত হইতেন। দশ জনের অধিক সভ্য হইবে না এই নিমিত্ত উহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল। বোধ হয়, হাক্সলিও[৩] উহার মধ্যে ছিলেন। হাক্সলিও কোম্‌তকে অত্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন; তাঁহার নামের উল্লেখ হইলেই বদ্‌খৎ দর্শনশাস্ত্র ও ততোধিক নিকৃষ্ট বিজ্ঞানশাস্ত্র (Bad philosophy and worse science) এই প্রকার শব্দ প্রয়োগ করিতেন। কিন্তু এ প্রকার মতভেদ সত্ত্বেও সভ্যদিগের মধ্যে কিছুমাত্র মনোমালিন্য ছিল না। লুইস কোম্‌তের একজন গোঁড়া ভক্ত ছিলেন; জর্জ্জ ইলিয়ট ততদূর না হউন, কোম্‌তকে ঊনবিংশ শতাব্দীর এক প্রধান জ্যোতিঃ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। লুইস আপনার দর্শনের ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, কোম্‌তের প্রণালী পূর্ব্বতন দর্শনকারদিগের প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। দর্শনকার-দিগের মধ্যে চিরকালই একপ্রকার ঢেঁকির কচ্‌কচি চলিয়া আসিতেছে, নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং; জর্ম্মান্ দর্শনকাররা স্কটল্যাণ্ডের মনোবিজ্ঞানবেত্তাদিগকে হেয়জ্ঞান

[১] Adam Bede, Silas Marner প্রভৃতি গ্রন্থের লেখিকা George Eliot (1819-80)। ইঁহার প্রকৃত নাম: Mary Ann Cross (nee' Evans)।—সং

[২] Harriet Martineau (1802-76)। ইঁহার ভ্রাতা James Martineau (1805-1900)-ও প্রখ্যাত দার্শনিক।—সং

[৩] Thomas Henry Huxley (1825-95)—ডারউইনের মতবাদের প্রখ্যাত প্রবক্তা ও অজ্ঞেয়বাদী দার্শনিক ছিলেন।—সং

করেন, ইঁহারা আবার উহাদিগকে দুর্বোধ্য স্বপ্নভাষী (Dreamy) বলিয়া শিকায় তুলিয়া রাখিতে চাহেন। কোম্‌ৎ যখন তাঁহার নিজের ধরণে দর্শন গঠন করিতে বসিলেন, তখন অনেকেই মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে, দেখা যাউক ইনিই বা কি করেন। কিন্তু যখন তিনি তাঁহার দর্শনের ছয় খণ্ড শেষ করিলেন, তখন তাঁহার কৃতকার্য্যতা দেখিয়া লুইস যে একটি প্রশংসা-সূচক শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলেন সেটি আমার বড়ই মিষ্ট লাগে। তিনি বলেন, এই ব্যাপারে কোম্‌তের কৃতকার্য্যতা stupendous, অত্যাশ্চর্য্য—ভাবিলে মুণ্ড ঘুরিয়া যায়। লুইসকে মিল তত একটা উচ্চদরের দার্শনিক মনে করেন না, কিন্তু কোম্‌তের দর্শন সম্বন্ধে মিল ও লুইসের বিশেষ বিভিন্ন মত নাই। পরে কোম্‌ৎ যখন তাঁহার নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিলেন, তখন উহার কতকটা আভাস হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বোধ হয় লুইস প্রভৃতির নিকটই পাইয়া থাকিবেন। তিনি নিজে কোম্‌ৎ বড় পড়িতেন না। ফেডরিক হ্যারিসন স্পেন্সারকে এক স্থলে পরিহাস করিয়া বলিয়াছেন যে, হার্ব্বার্ট স্পেন্সার সর্ব্বদা যে Great unknown-এর উল্লেখ করিয়া থাকেন সে বস্তু যাহাই হউক না কেন, কোম্‌ৎ কিন্তু স্পেন্সারের পক্ষে একটি Great unknown অর্থাৎ বিরাট বিপুল অজ্ঞেয় ব্রহ্ম (ব্রহ্ম=বৃহ+মন্=বৃহৎ)[১]। Religion কাহাকে বলে, এ বিষয়ে কোম্‌ৎ ও স্পেন্সারে অনৈক্য। কোম্‌ৎ বলেন Religion শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ একতাপাদন, পাঁচটাকে একটা করিয়া বাঁধা; পৃথিবীর তাবৎ পূর্ব্বতন Religion-এর ইহাই উদ্দেশ্য ও ইহাই কার্য্যকারিতা। এই একতাপাদন দুই প্রকার। প্রত্যেক ব্যক্তিরই পাঁচটা বিভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী মনোবৃত্তিকে একটা সর্ব্বপ্রধান মনোবৃত্তির বশীভূত করিয়া রাখা। দ্বিতীয়তঃ, পাঁচজন বিভিন্ন ব্যক্তির একটা মতের অনুবর্ত্তী হওয়া। যাহার দ্বারা এই দুই প্রকার কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহারই নাম Religion। ইহা কোম্‌তের অর্থ। স্পেন্সার বলেন—তাহা নহে; মানুষের বুদ্ধি ব্রহ্মাণ্ডের ঘটনাবলির তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে যাইয়া কতক দূর কৃতকার্য্য হয়, কিন্তু তাহার পর আর বুঝিতে পারে না; জ্ঞানের এলাকার বাহিরে এক প্রকাণ্ড অজ্ঞেয় পারাবার বিস্তারিত রহিয়াছে; বুদ্ধি, যতই অগ্রসর হউক না কেন, কতক দূর গিয়া ঠেকিয়া যায়; কিন্তু বুদ্ধি কতকটা চুলবুলে, ঠেকিয়াও স্থির থাকিতে পারে না; সেই অজ্ঞেয় পারাবারকে স্পষ্টরূপে আকলন করিতে না পারিয়াও কল্পনাপ্রয়োগ করিতে থাকে। এটি মানবচিত্তের একটি অনিবার্য্য বৃত্তি। স্পেন্সার বলেন, সেই সমস্ত কল্পনার নাম Religion। এই নিমিত্ত স্পেন্সার যখন বুঝিলেন যে, কোম্‌তের Religion-এর তাৎপর্য্য কেবল নরজাতির হিতসাধন করা এবং কায়মনোবাক্যে ঐকান্তিক আগ্রহ-সহকারে অনন্তকর্ম্মা হইয়া পরোপকারব্রতে ব্রতী

[১] ব্রহ্ম=বৃন্হ্ (বৃদ্ধি পাওয়া, দীপ্তি পাওয়া)+মন্ (র্তৃ)=ব্রহ্মন্ ১মা ১ব।'—সং

হওয়া তখন তিনি বলিলেন, ইহাকে Religion বল কেন? ইহাকে বরং Ecstatic philanthropy—আনন্দবিহ্বল পরোপকারব্রত এই সংজ্ঞা দাও।

"এইরূপে উক্ত নামটির সৃষ্টি হইয়াছে। সে যাহা হউক ভাবিয়া দেখিলে কিন্তু বোধ হয় যে, কোম্‌ৎ Religion শব্দের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই সঙ্গত।"

আমি প্রশ্ন করলাম,—"কোম্‌তের Religion কিছু narrow হইল না?"

উত্তর হইল—"না। দেখ না, ধর্ম্মমাত্রেই ঈশ্বরপ্রেমপ্রধান, আর সব গৌণ। বৌদ্ধধর্ম্মে দয়াবৃত্তি প্রধান। কোম্‌ৎও সর্ব্বভূতে দয়া প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে মাংস খাওয়া আবশ্যক, কিন্তু পশুহত্যায় নিষ্ঠুরতা পরিহার করা চাহি।

"সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মণ দর্শনকার কাণ্ট আমাদিগের মনোবৃত্তিদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন, যথা বুদ্ধিবৃত্তি (Intellect), সুখদুঃখজ্ঞান (Feeling), চিকীর্ষা বা যত্ন (Volition)। আজ দুই শত বৎসরাধিক হইল এই বিভাগটি প্রায় সর্ব্বজনপরিগৃহীত হইয়াছে। কোম্‌ৎও ইহা পরিগ্রহণ করিয়াছেন। এই কয় বিভাগের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা এ স্থলে করা যাইতে পারে। বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্য মোটের উপর দুই প্রকার বলিলে বলা যায়—সাদৃশ্যজ্ঞান (Synthetic) ও বৈসদৃশ্যজ্ঞান (Analytic); ইহা ব্যতীত কাল ও দেশ (Time and Space) এই দুই বিষয়ের অনুভবও, বোধ হয়, বুদ্ধিবৃত্তির সামিল ধরিতে হইবে।—সুখদুঃখজ্ঞান নানাবিধ। একটি একটি সুখদুঃখজ্ঞানের সঙ্গে একটি একটি মনোবৃত্তি সংশ্লিষ্ট আছে, যেমন কাম (Sexual Instinct), ক্রোধ (Instinct of Destruction), লোভ অর্থাৎ সঞ্চয়বাসনা; ইহা ব্যতীত অহঙ্কার (Pride), যশোলিপ্সা (Vanity), ভক্তি (Veneration), স্নেহ বা প্রীতি (Affection), ইত্যাদি বৃত্তিগুলিকে কোম্‌ৎ আঠারো ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।—চিকীর্ষা বা যত্ন তিনি তিন ভাবে দর্শন করেন,—সাবধানতা বা অগ্রপশ্চাৎ জ্ঞান (Prudence), সাহস বা নির্ভীকতা (Courage), অধ্যবসায় (Perseverance)। এই তিনের আবার এক সমবেত নাম Character বা চরিত্র।

"এই সমস্ত মনোবৃত্তিকে একতাপন্ন করিবার জন্যই যখন যে ধর্ম্ম উদিত হইয়াছিল সেই ধর্ম্ম চেষ্টা করিয়াছে। প্রাচীন যে সকল ধর্ম্ম হইয়া গিয়াছে, অধিকাংশই দেবভক্তির উপর-নির্ভর করিয়া সেই বিষয় সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

"প্রাথমিক অবস্থায় আমাদিগের অবিকশিত বুদ্ধি ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র আমাদিগের অপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন কতকগুলি ব্যক্তির কল্পনা করিয়া আসিয়াছে; এবং তাহাদিগকে ভয় করিয়াই হউক কিম্বা তাহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্যই হউক, আমরা কার্য্য করিতে অভ্যাস করিয়া আসিয়াছি। ক্রমে ক্রমে সেই ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি একজনে দাঁড়াইয়াছে। ইহুদি, খৃষ্টান, মুসলমান এবং প্রাচীন উপনিষদের ধর্ম্ম সেই একজন

ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিকে লইয়া গঠিত হইয়াছে। কিন্তু কেবলমাত্র একজন কুত্রাপি ধর্ম্মকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিতে পারে নাই; ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমানরা Angel এবং হিন্দুরা অনেক দেবদেবী বরাবর বজায় রাখিয়া আসিয়াছেন; কেবল একজনকে সর্ব্বোপরিস্থ পদ দিয়াছেন, তিনি পরমেশ্বর, বা পরব্রহ্ম বা নারায়ণ ইত্যাদি নানা আকারে চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়া আসিয়াছেন। পরব্রহ্ম একেবারে আকাশের মত অচিন্তনীয়, অভাবনীয়, একটি অপরিসীম পদার্থরূপে চিন্তিত হয়েন।

"মনোবৃত্তিসমূহের একতাপত্তি বলিতে কি বুঝিলে? যখন যে মনোবৃত্তি মনে প্রবল হয়, যদি আমরা তাহাকেই তখন প্রসর দিই, তাহা হইলে শুধু যে আমাদিগের নিজের মনের শান্তি একেবারে বিলুপ্ত হয় তাহা নহে, মনুষ্যসমাজ একেবারে উচ্ছিন্ন হয়। মনে কর, উপস্থিত অপত্যস্নেহবশতঃ আপনার সন্তানকে এক্ষণে লালন করিলাম, কিঞ্চিৎ পরে কোনও কারণবশতঃ তাহার উপর ক্রোধ উপস্থিত হওয়াতে তাহার প্রাণসংহার করিলাম। যদি সকল বৃত্তিসম্বন্ধে এই ভাবে চলা যায়, তাহা হইলে মনুষ্যসমাজের যে কি ভীষণ অবস্থা দাঁড়ায় তাহা বুঝিতে বড় ক্লেশ পাইতে হয় না। এই জন্যই মনোবৃত্তিদিগের পরস্পর সামঞ্জস্য রক্ষা অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য্য। কোম্‌ৎ বলেন যে, পরিণামে পরের প্রতি স্নেহ আমাদের যে একটি স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তি তাহার উপর নির্ভর করিয়াই সেই সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিতে হইবে; ইহাকে দয়া বলে, করুণা বলে, উপচিকীর্ষা বলে, বিশ্বসংগ্রাহী স্নেহও বলা যাইতে পারে। মনুষ্যের মনোমধ্যে এইরূপ একটি স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তি যে আছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ করা উচিত নহে। কতকগুলি একদেশদর্শী দর্শনকার সেই সন্দেহ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মতে পরোপচিকীর্ষা আমাদিগের স্বার্থানুসন্ধান হইতেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু সেটা যে ঠিক নহে তাহা, বোধ হয়, সহজেই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। আমরা যতই স্বার্থপর হই না, পরের কষ্ট উপস্থিতপ্রায় দেখিলে আপনা হইতেই আমাদিগের মনোমধ্যে একটা চাঞ্চল্য—ছটফটানি—আইসে। একজন যদি রাস্তায় চলিতে চলিতে গাড়ির সম্মুখে পড়ে, আমাদের আপনা হইতেই শরীরের মধ্যে এই রকম একটা ভাব আইসে যেন সেই গাড়ির সম্মুখভাগ হইতে পার্শ্বে দাঁড়াই। একজন বাজিকর দড়ির উপর যখন বাজি দেখায় তখন যদি দেখি যে, সে পড় পড় হইয়াছে, তখন আমরা আপনাদের শরীরকেই এমন ভাবে নাড়াচাড়া করি যাহাতে দুই দিকের ভার সমান হইয়া বাজিকর সামলাইয়া যায়, যদি বাজিকর দক্ষিণ দিকে ঝুঁকে আপনা হইতেই আমাদের দেহ বামদিকে হেলে। এইটি স্বভাবসিদ্ধ—পরদুঃখে দুঃখানুভব। এবং ইহা এই অপূর্ণ অবস্থা হইতেই ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া এক্ষণকার বিশাল বিপুল বিশ্বসংগ্রাহী স্নেহে পরিণত হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে জন হাইয়ার্ড কয়েদিদিগের ক্লেশনিবারণের চেষ্টায়

প্রবৃত্ত হইয়া কয়েদখানায় সংক্রামক রোগে প্রাণত্যাগ করিলেন ; ইহারই প্রভাবে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একজন ফরাসি ধর্ম্মযাজক প্রশান্ত মহাসাগরের এক দ্বীপে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন ; ইহারই প্রভাবে কত স্থানে কতপ্রকার পরোপচিকীর্ষা-গর্ভ বহুলব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠান সমুদিত হইতেছে। সে সমস্ত যে কেবল লোকের নিকট বাহবা পাইবার জন্য তাহা নহে। অ্যাডাম স্মিথ নামক মনোবিজ্ঞান-বেত্তার Moral Sentiments নামক গ্রন্থের প্রারম্ভে পরোপকারিতাবৃত্তির স্বভাবসিদ্ধতাসম্বন্ধে বিস্তর প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। সেগুলির আলোচনা করিয়া দেখিলে এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই থাকিবার কথা নহে। কোম্‌ৎ বলেন এই স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তিটি অতি দুর্ব্বল। স্বার্থপরতা-মিশ্রিত বৃত্তিগুলিই সমধিক প্রবল। এই নিমিত্ত উপচিকীর্ষাবৃত্তি মনুষ্য-সমাজে অদ্যাপি প্রার্থণীয়মত প্রবলতা লাভ করে নাই, এখনও নিতান্ত ক্ষীণ অবস্থাতেই রহিয়াছে ; যে স্থলে স্বার্থের সহিত ইহার সংঘর্ষ হয়, সে স্থলে প্রায়ই স্বার্থ ইহাকে দাবিয়া রাখে। কিন্তু মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, শারীরবিধান-শাস্ত্রের (Physiology) একটি মৌলিক সিদ্ধান্ত এই যে, আমাদের যে যে ক্রিয়াশক্তি আছে, অভ্যাসদ্বারা সে সমস্তই ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত করা যায়। চলিত কথাতেও বলে, আহার, নিদ্রা ইত্যাদি যত বাড়াও ততই বাড়িবে। কেবল অভ্যাস হইতেই এই বৃদ্ধি সম্পাদিত হয়। মাংসপেশী-চালনা অভ্যাস কর, উহার বলবৃদ্ধি হইবে ; বুদ্ধির চালনা অভ্যাস কর, চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পাইবে ; সেইরূপ উপচিকীর্ষাবৃত্তি চালনা অভ্যাস করিলে উহা অবশ্যই ক্রমশঃ বলবত্তর হইতে থাকিবে। যেমন অভ্যাস বৃত্তিবিশেষকে বলবত্তর করে, তেমনই অনভ্যাস উহাকে ক্ষীণতর করে। কোম্‌ৎ বলেন, আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, কোন্ কোন্ মনোবৃত্তিপ্রবণতা (Tendency) মনুষ্যসমাজকে পরস্পর বিশ্লিষ্ট করে, সেইগুলিকে অনভ্যাসদ্বারা যতদূর সম্ভব ক্ষীণতর করিতে হইবে। আর যে সকল বৃত্তি সমাজকে পরস্পর সংশ্লিষ্ট করে, সেইগুলিকে অভ্যাসদ্বারা প্রবল করিয়া তুলিতে হইবে। যশোলিপ্সা একটি সংশ্লেষক বৃত্তি। ব্যক্তিবিশেষের প্রতি স্নেহ-ভক্তিও সংশ্লেষক বৃত্তি। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য সংশ্লেষকবৃত্তিই উপচিকীর্ষা, অথচ এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল, অতএব বিশেষ যত্নপূর্ব্বক অভ্যাসের দ্বারা ইহার বলবৃদ্ধি করা আবশ্যক। ভবিষ্যতে ইহাই সমাজের একমাত্র বন্ধনস্বরূপ হইবে এরূপ আশা করা যায় এবং দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকল প্রাচীন ধর্ম্মই স্পষ্ট বা অস্পষ্টরূপে এইটি বাড়াইবার দিকেই প্রবণতা দেখাইয়াছে। অবশ্য ইতিহাসে ইহাও দেখা যায় যে, ইহার বিরুদ্ধে বিস্তর তামসিক অনুষ্ঠান সময়ে সময়ে ধর্ম্মের নামে সম্পাদিত হইয়াছে, যথা ক্রুশযুদ্ধ (Crusade), নাস্তিক পোড়ান, ডাইনী পোড়ান, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে কাটাকাটি, মুসলমানের জেহাদ, হিন্দুর সতীদাহ।

"ধর্ম্মের নামে এইরূপ অত্যাচারের কারণ আছে। কারণ এই বলিয়া বোধ হয় যে, স্বার্থপর বৃত্তিগুলি এত প্রবল যে, উহাদিগকে সংযত রাখিবার চেষ্টা যতই কর না কেন, সময়ে সময়ে উহারা নিজের বলবত্তর ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে কখনই ছাড়িবে না। সেণ্ট পল বলিয়া গিয়াছেন,—পরস্পরকে স্নেহ কর (Love ye one another)। যিশুখৃষ্টও বলিয়া গিয়াছেন, অন্যের যে প্রকার আচরণ তোমার প্রতি তুমি ইচ্ছা কর, অন্যের প্রতি তোমার সেইরূপ আচরণ করা উচিত (Do unto others as you would they should do unto you)। ইহাকে বলে ধর্ম্মনীতির চরম সূত্র (Golden rule of conduct)। কিন্তু Inquisitor যখন বিধর্ম্মীকে দাহ করিতে বসেন, তখন তিনি এসকল কথা ভুলিয়া যায়েন। অভিমান নামে তাঁহার যে একটি স্বার্থপর বৃত্তি আছে, সেইটিই তখন প্রবল। তিনি ভাবেন, ধর্ম্মের বিষয় আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহাই ঠিক, তাহার বিপরীত আর সকল মতই ভুল ; ঐ সকল মতের অনুবর্ত্তীদিগকে ধরিয়া পোড়াইবার ক্ষমতা আমার আছে। এই ক্ষমতা ভগবানই আমাকে দিয়াছেন, অতএব ইহা ভগবানেরও অভিপ্রেত ; বোধ হইতেছে যে, আমি বিধর্ম্মীকে ধরিয়া দাহ করি। যখন যখন লোক ধর্ম্মের নামে অন্যের উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তখনই বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত প্রকার একটি যুক্তিবিন্যাস অত্যাচারীর মনে অপ্রকাশভাবে উদিত হয়,—সে অম্লানবদনে ঘোরতর পাষণ্ডের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। ইহাতে বুদ্ধির দোষও আছে, স্বভাবের দোষও আছে। সকল স্বভাবের লোক Inquisitor হইতে পারে না। যাহারা উগ্রপ্রকৃতি, নিষ্ঠুর ও নৃশংস, তাহারাই ধর্ম্মের নামে অত্যাচার করিতে অগ্রসর হয়।

"কোম্‌তের প্রবর্ত্তিত ধ্রুবধর্ম্মে এই একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় যে, তিনি দেবদেবী-বিষয়ক সর্ব্বপ্রকার অলৌকিক বিশ্বাস একেবারে পরিহার করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বতন প্রাচীন কোনও ধর্ম্মেই অলৌকিক বিশ্বাস (supernatural belief) একেবারে পরিহৃত দৃষ্ট হয় না। এমন কি বৌদ্ধ ধর্ম্ম যদিও নাস্তিকের ধর্ম্ম বলিয়া বিখ্যাত—যদিও বৌদ্ধরা একজন পরমেশ্বর স্বীকার করেন না, তথাপি ছোট খাট অনেকপ্রকার অলৌকিক জীবের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতে তাঁহাদের আপত্তি নাই—তাঁহারাও জন্মান্তর মানেন ; ভূত, প্রেত, পিশাচ, বিদ্যাধর ইত্যাদি দেবযোনির সত্তাও স্বীকার করেন। কোম্‌ৎ সে সকলই এক কালে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। ধ্রুবধর্ম্মের প্রশ্নোত্তর (Catechism of Positivism) নামক যে গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন তাহার প্রথমেই এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনাও আছে। শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—'আপনি যখন অলৌকিক বিশ্বাস একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন আপনার প্রতিষ্ঠিত এই ব্যবস্থাকে ধর্ম্ম (Religion) বলেন কেন? কারণ, সকল ধর্ম্মেই কিছু না কিছু অলৌকিক বিশ্বাস

বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়।' গুরু উত্তর করলেন,—'যদি Religion শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য (connotation) কি তাহা অনুধাবন করিয়া দেখ, তবে বুঝিতে পারিবে যে, বিশ্বাস-বিশেষের সহিত সেই তাৎপর্য্যের কোনও সম্পর্ক নাই।- Religion শব্দের ব্যুৎপত্তি পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইবে যে, সেই তাৎপর্য্য একতাপাদন—ligo to bind।' এই প্রকার কহিয়া গুরু পূর্ব্বোক্ত প্রকারের 'একতাপাদন' এই অর্থে religion শব্দের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিলেন। গুরু আরও কহিলেন,—'ভাবিয়া দেখ, প্রত্যেক ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী লোকদিগের সংখ্যা অপেক্ষা বিরোধী লোকদিগের সংখ্যাই অধিক, অর্থাৎ খৃষ্টান অপেক্ষা বেখৃষ্টানের সংখ্যা অধিক ; হিন্দু অপেক্ষা হিন্দুত্ববিরোধীর সংখ্যা অধিক, মুসলমানের চেয়ে ইসলামদ্বেষীর সংখ্যা অধিক। পৃথিবীর সমস্ত নর-জাতির সংখ্যা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এ কথা অখণ্ডনীয়রূপে প্রতিপন্ন হয়।' অতএব কোনও একটি ধর্ম্মের সত্যাসত্য ভোটের সংখ্যা ধরিয়া নির্ণীত হইবার নহে। কেবল যুক্তির দ্বারাই ধর্ম্মের সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে হইবে। কিন্তু অলৌকিক বিশ্বাস লইয়া যুক্তি প্রয়োগ করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। অলৌকিক বিশ্বাসের বনিয়াদ কল্পনা। কল্পনা এমন বস্তু নহে যে, যুক্তির দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিবে। এই নিমিত্তই প্রাচীন সকল ধর্ম্মেরই নানা সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছে। তাহারা আবার পরস্পর এত বিরোধী যে, ক্রুশের যুদ্ধে খৃষ্টান ও মুসলমানদিগের যেরূপ রক্তারক্তি হইয়াছিল, ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্টদিগের মধ্যেও সেইরূপ রক্তারক্তি হইয়া গিয়াছে। সময়ে সময়ে এরূপ বিরাট-হত্যা (massacre) সংঘটিত হইয়াছে—যথা Massacre of St Bartholomew[১]—যে, ভাবিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, এবং মনে এ প্রকার সন্দেহ হয় যে, ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাপকগণ (founders of religion) ভূলোকের ইষ্ট কি অনিষ্ট করিয়া গিয়াছেন তাহা বলা ভার।

"ধ্রুবধর্ম্মের আকাঙ্ক্ষা এবং অভিপ্রায় এই যে, কেবল যুক্তির দ্বারা বুঝাইয়া সমস্ত নরজাতিকে কালসহকারে একধর্ম্মান্বিত করিয়া তুলিবে। কোম্‌ৎ বলিয়াছেন, কোনও প্রাচীন ধর্ম্মই অশ্রদ্ধেয় বা দ্বেষ করিবার বিষয় নহে। সকলেরই এক একটা উপযোগিতা ছিল এবং অদ্যাপি আছে। তিনি কোনও প্রাচীন ধর্ম্মকেই নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তি বলিতে প্রস্তুত নহেন এবং জবরদস্তি দ্বারা কোনও ধর্ম্মই উঠাইয়া দিতে চাহেন না। যেমন ত্রিকোণ ক্ষেত্রের তিনটি কোণ মিলিয়া দুইটি সমকোণের তুল্য এ কথার প্রতিবাদ চলে না, যেমন পৃথিবীর আকর্ষণের পরিমাণ, জলের উপাদান, মস্তিষ্কের কার্য্যকারিতা, পাকস্থলির কার্য্যকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে আর মতভেদ চলিতে পারে না, তেমনই উপচিকীর্ষাই ধর্ম্মের ভিত্তি স্বরূপ, এ সম্বন্ধেও মতভেদ উঠিয়া যাইবে।

---

[১] ফরাসী সম্রাট ৯ম চার্লসের আদেশে 'ফিস্ট অভ্ বার্থলোমিউ' দিবসে ফ্রান্সের সর্বত্র হিউগানো সম্প্রদায়ভুক্ত বহু খ্রীষ্টান (Huguenots)-কে হত্যা করা হয় (১৫৭২ খ্রীঃ)।—সং

"মিলও এ কথার অনুমোদন করেন বলিয়া বোধ হয়। 'কোম্‌ৎ ও ধ্রুবদর্শন' সম্বন্ধে তিনি যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে তিনি স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন যে, কোম্‌ৎ ধ্রুবধর্ম্মের যে নক্সা গঠন করিয়াছেন তাহা অতি চমৎকার হইয়াছে। প্রাচীন ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী লোকরা তাহা হইতে বিস্তর শিক্ষালাভ করিতে পারেন। সম্প্রতি মিলের অপ্রকাশিতপূর্ব্ব চিঠিপত্রের যে দুই খণ্ড বহি বাহির হইয়াছে, তাহারও এক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরোপকার ব্রত (universal love) মনুষ্য-হৃদয়ের যে বৃত্তি তাহা লইয়া এমন একটি ধর্ম্মপ্রণালী গঠিত হইতে পারে যে, তাহা অবলম্বন করিয়া মনুষ্য-সমাজ অবলীলাক্রমে আত্মরক্ষা করিয়া যাইতে পারে। সেই ধর্ম্ম-প্রণালীর গঠন করাই কোম্‌তের উদ্দেশ্য। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, তদ্বিষয়ে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন; তিনি অন্যান্য প্রধান প্রধান চিন্তয়িতারা (thinkers) এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত কত দূর একমত হইবেন এখনও তাহার নির্ণয় করা যায় নাই। কিন্তু তাঁহার গঠিত ধর্ম্মপ্রণালীর মধ্যে কতকগুলি রচনা এমন পরম সুন্দর ও সুমধুর বলিয়া আমার বোধ হয় যে, সেগুলির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমি বড়ই আপ্যায়িত হইয়া যাই ও তৃপ্তিলাভ করি। তন্মধ্যে একটি Positivist Calendar। এক্ষণে খৃষ্টানরা অনেকগুলি মাসের নাম গ্রীক ও রোমকদিগের দেবদেবীর নামের সহিত সম্পর্কযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। যথা: January—Janus; March—Mars; June—Juno; ইত্যাদি। কোম্‌ৎ যে পঞ্জিকার সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে বৎসরকে তের মাসে বিভক্ত করিয়াছেন, প্রত্যেক মাসের দিনসংখ্যা ২৮। ইহাতে বৎসরের দিনসংখ্যা ৩৬৪ হয়। অবশিষ্ট এক দিনকে তিনি সমস্ত মৃত ব্যক্তির পর্ব্বাহ বলিয়া ধার্য্য করিয়াছেন। চারি বৎসর অন্তর যে এক অতিরিক্ত দিন হয়, তাহাকে তিনি সাধ্বী নারীদিগের স্মরণার্থ পর্ব্বাহ ধার্য্য করিয়াছেন। আর প্রত্যেক মাসের নাম এক একজন অতি প্রধান নরজাতির মহোপকারসাধনকর্ত্তার নামে দিয়াছেন। যথা:

প্রথম মাসের নাম মোসেস। ইনি য়িহুদি জাতির জাতীয়তার মূলীভূত যাবতীয় ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা; খৃষ্টানরা য়িহুদি জাতির শিষ্য; খৃষ্টানদিগের দ্বারাই এক্ষণে পৃথিবীর সর্ব্বাংশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সভ্যতা বিস্তারিত হইতেছে; অতএব এ বিষয়ে হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি বেখৃষ্টানদিগেরও অভিমান করিবার কোনও কারণ দেখি না। এক্ষণকার বিজ্ঞান য়ুরোপের নিকট হইতেই সকলকে লইতে হইতেছে। য়ুরোপের সভ্যতার উন্নতি খৃষ্টান ধর্ম্মের নিকট যে কতদূর ঋণী হইয়া আছে তাহা বর্ণনাতীত। খৃষ্টান ধর্ম্ম আবার য়িহুদি জাতি ব্যতীত উৎপন্ন হইত না। সেই য়িহুদি জাতির জাতীয়তার প্রতিষ্ঠাতা যদি মোসেস হয়েন তবে তিনি সমস্ত পৃথিবীর কি মহোপকার পরম্পরা সম্বন্ধে করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে

তাঁহাকে মাস বিশেষের অধিষ্ঠাতা বলিয়া স্বীকার করিতে কাহারও কোন আপত্তি থাকা উচিত নহে।

"দ্বিতীয় মাসের অধিষ্ঠাতা হোমার। য়ুরোপে কবিতাসম্বন্ধে হোমারের সর্ব্ব-প্রাধান্য কেহই অস্বীকার করিবেন না। তবে হিন্দুরা এ বিষয়ে অভিমান করিবেন; বলিবেন, আমরা বাল্মীকিকে ছাড়িব কেন? সে সম্বন্ধে উপস্থিত অবসরে আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না; বলিতে গেলে হয় ত গোঁড়া Positivist বলিয়া প্রতিপন্ন হইব। এই নিমিত্ত কোম্‌ৎ যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহাই এ স্থলে বলিয়া যাই।

"তৃতীয় মাসের অধিষ্ঠাতা আরিষ্টটল। স্থলবিশেষে কোম্‌ৎ বলিয়াছেন যে, আরিষ্টটল যাবতীয় প্রকৃত চিন্তয়িতাদিগের চিরস্থায়ী সম্রাট (the eternal prince of all true thinkers)। এ স্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, কোম্‌ৎ যে পঞ্জিকা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা য়ুরোপীয়দিগের উপযোগী; এবং আরিষ্টটল য়ুরোপের প্রাচীন দর্শন-শাস্ত্রের মূর্ত্তিমান আবির্ভাব (representation) বলিলে বলা যায়। সুতরাং মাসের অধিষ্ঠাতাদিগের মধ্যে তাঁহার নাম অবশ্যই স্থানলাভ করিবে। তবে মিল আরিষ্টটলকে তত উন্নত পদ প্রদান করিতে প্রস্তুত নহেন। 'কোম্‌ৎ ও ধ্রুবদর্শন' নামক গ্রন্থে মিল বিদ্রূপ করিয়া কহিয়াছেন যে, আরিষ্টটল, ডেকার্ট এবং কোম্‌ৎ এই তিন ব্যক্তিকে কোম্‌ৎ নিজে যত বড় লোক মনে করেন আমরা (অর্থাৎ মিল প্রভৃতি) তত বড় লোক মনে করিতে রাজি নহি (we have not that degree of admiration for the trio) ইহাতে প্রকারান্তরে বলা হইল যে, কোম্‌ৎ আপনাকেও একজন বড় লোক বলিয়া জ্ঞান করিতেন, অনেক স্থলে যেন তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মিল এক স্থলে বলিয়াছেন যে, কোম্‌তের আত্মগরিমা অতিমানুষ (his self-confidence was gigantic)।

"চতুর্থ মাসের নাম আর্কিমিডিস। ইনি প্রাচীন বিজ্ঞানের প্রতিনিধি স্বরূপ। পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে আর্কিমিডিস যে কি পর্য্যন্ত উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন তাহা বিজ্ঞানবিৎ মাত্রেই সম্যক অবগত আছেন। আমরা তাহা উত্তমরূপ অনুধাবন করিতে পারি কি না সন্দেহ!

"পঞ্চম মাস—সিজার। ইনি সভ্যতাসমুচিত যুদ্ধবিদ্যার (military civilisation) আদর্শ স্বরূপ। সিজারকেও মিল তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তিনি বলেন যে, আপনার জন্মভূমির স্বাধীনতা উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা ব্যতীত সিজারের আর কি গুণ ছিল? কিন্তু আমাদিগের অল্প বুদ্ধিতে সালা, মারিয়াস, পম্পে প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের পরস্পর বিদ্বেষে ও দলাদলিতে রোম এবং সেই সঙ্গে তৎকালের প্রায় সমস্ত সভ্য জগৎ উচ্ছন্ন যাইতেছিল. এবং শান্তি পৃথিবী হইতে প্রায় লোপ পাইতেছিল। সেই অবস্থাটি সিজার

স্তম্ভিত করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার পর হইতে সাম্রাজ্যব্যবস্থা সংস্থাপিত হওয়াতে লোক হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। ফলতঃ সিজারের সময়ে রোমকরা স্বাধীনতা রক্ষা করিবার উপযোগী সমস্ত গুণগ্রাম হারাইয়া ফেলিয়াছিল।

"ষষ্ঠ মাস—সেণ্ট পল্। কোম্তের মতে সেণ্ট্ পলই খৃষ্টান ধর্ম্মকে বিধিবদ্ধ ও ব্যবস্থাযুক্ত করিয়া দিয়া যায়েন।

"সপ্তম মাস—শার্লমান্[১]। ফিউড্যাল ব্যবস্থা নামক যুরোপে যে ব্যবস্থা এক সময়ে সার্ব্বত্রিক হইয়াছিল, ইনি তাহার আদর্শ স্বরূপ। ঐ feudal ব্যবস্থার দ্বারা য়ুরোপের সভ্যতা বিশিষ্টরূপে অগ্রসর হইয়াছিল।

"অষ্টম মাস—দাঁতে (Dante)। বলা বাহুল্য ইনি ইদানীন্তন কালের কাব্য শাস্ত্রের আদর্শ স্বরূপ।

"নবম মাস—গটেনবার্গ। ইনি মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সভ্যতার উন্নতিকল্পে মুদ্রাযন্ত্রের মহোপকারিতা বোধ হয় আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এই কারণেই কোম্ৎ তাঁহাকে ইদানীন্তন কালের শিল্পচর্চ্চার (modern industry) আদর্শ বলিয়া সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

"দশম মাস—সেক্সপীয়র। ইনি বর্ত্তমান কালের নাটককারদিগের আদর্শ।

"একাদশ মাস—ডেকার্ট (Descartes)। ইনি বর্ত্তমান কালের দর্শন শাস্ত্রের আদর্শ। ডেকার্টকে এত উচ্চপদ প্রদান করাতে ইংরাজ, জার্ম্মাণ প্রভৃতি জাতিরা বোধ হয় কোম্ৎকে স্বজাতিপক্ষপাতিত্বদোষে অভিযুক্ত করিবে। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে য়ুরোপে এখন যাহাকে দর্শনশাস্ত্র বলে, তাহার অনেকগুলি মৌলিক কথা ডেকার্টের দোহাই দিয়াই চলিতেছে। এবং যদিও তাঁহার Theory of Vortices স্থানচ্যুত হইয়া নিউটনের Universal Gravitation সেই স্থান অধিকার করিয়াছে, তথাপি ডেকার্ট Analytical Geometry-র সৃষ্টিকর্ত্তা। আমার সামান্য বুদ্ধিতে ত বোধ হয় যে, যিনি Analytical Geometry সৃষ্টি করিয়াছেন শাস্ত্ররাজ্যের মধ্যে এমন কোন উচ্চস্থান নাই যাহা তাঁহাকে দেওয়া না যায়। শিল্পচর্চ্চাতে বাষ্পযন্ত্র যে প্রকার, গণিতমূলক বিজ্ঞানের অপরাপর শাখার চর্চ্চাতে Analytical Geometry সেরূপ অত্যাশ্চর্য্য যন্ত্রস্বরূপ।

"দ্বাদশ মাস—ফ্রেড্রিক দি গ্রেট্। আধুনিক রাজ্যশাসনের (modern polity) আদর্শ।

"ত্রয়োদশ মাস—বিশা (Bichat)। ইনি একজন শারীরবিধানবেত্তা। ঐ শাস্ত্রে tissue এই নামক যে নূতন একটি idea উদ্ভাবিত হইয়াছে, বিশা তাহারই উদ্ভাবক।

---

[১] Charlemagne—Charles the Great (742-814), the king of the Franks. ফ্রান্স, উত্তর ও দক্ষিণ ইতালী, জার্মানী প্রভৃতি ইঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।—সং

এই উদ্ভাবনার দ্বারা উক্ত শাস্ত্রে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত আধুনিক বিজ্ঞানে বিশার পদ এত উচ্চ।

"এই ত হইল মাসের অধিষ্ঠাতাদিগের নাম। এতদ্ব্যতীত বৎসরের প্রত্যেক দিনের জন্য এক এক জন অধিষ্ঠাতা কল্পিত হইয়াছেন। ফলতঃ প্রত্যেক দিবস ও প্রত্যেক সপ্তাহ এক একজন অধিষ্ঠাতার দ্বারা অধিষ্ঠিত এবং Leap-year-এর জন্য আবার এক একজন পৃথক অধিষ্ঠাতা কল্পিত হইয়াছেন। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ বোধ হয় চতুঃশতাধিক মহাত্মদিগের নাম পঞ্জিকামধ্যে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

মাস		সপ্তাহের নাম
প্রথম	:	নিউমা, বুদ্ধ, কন্‌ফুসিয়স, মহম্মদ ;
দ্বিতীয়	:	এস্‌কাইলস, ফিডিয়স্, আরিষ্টফেনিস, বর্জ্জিল্ ;
তৃতীয়	:	থেলিস, পাইথাগোরাস, সক্রেটিস, প্লেটো ;
চতুর্থ	:	হিপক্রেটিস, অপলোনিয়স, হিপার্কস, (বৃদ্ধ) প্লিনি ;
পঞ্চম	:	থেমিষ্টক্লিস, আলেকজন্দর, সিপিও, ট্রাজান ;
ষষ্ঠ	:	সেণ্ট অগষ্টিন, Hildebrand (Gregory the Great), সেণ্ট বার্ণার্ড, বস্থয়ে (Bossuet) ;
সপ্তম	:	আলফ্রেড, গডফ্রি, তৃতীয় ইনোসেণ্ট, রাজা সেণ্ট লুই ;
অষ্টম	:	আরিয়ষ্টো, রাফেল, টাসো, মিল্টন ;
নবম	:	কলম্বস, ভোক্যান্স, ওয়াট, মংগল্‌ফিয়ে (Montgolfier) ;
দশম	:	ক্যালিরন (Calderon), কর্ণিয়ে, মোলিয়ে, লোজার ;
একাদশ	:	টমাস একুইনিস্, বেকন, লাইবনিটজ, হিউম ;
দ্বাদশ	:	একাদশ লুই, তৃতীয় উইলিয়ম, রিস্‌লু (Richelieu), ক্রমওয়েল ;
ত্রয়োদশ	:	গ্যালিলিও, নিউটন, লাভুসিয়র (জল oxygen ও hydrogen-এ বিভক্ত করেন)।[১]

"এই ত গেল সপ্তাহের নামকরণ। দিনের নামকরণের কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম মাসে নিম্নলিখিত নামগুলি আছে—

Promotheus, Hercules, Orpheus, Ulysses, Lycurgus, Romulus, Cadmus Manu, Cyrus, Zoroaster, Semiramis, Abraham, Solomon, John the Baptist, Harun al Raschid, David ইত্যাদি।

১ ৩৫২-৫৪ পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য।—সং

"দ্বিতীয় মাসে—Anacreon, Pindar, Sophocles, Theocritus, Sapho, Euripides, Aesop, Juvnal, Horace, Ovid, Lucretius, ইত্যাদি।

"তৃতীয় মাসে—Herodotus, Solon ইত্যাদি।

"চতুর্থ মাসে—Galen, Avicenna, Euclid, Ptolemy, Nasiruddin, Strabo, Plutarch ইত্যাদি।

"পঞ্চম মাস—Miltiades, Leonidas, Aristides, Xenophon, Epaminondas, Demosthenes, Brutus, Hannibal ইত্যাদি।

"ষষ্ঠ মাসে—Eloisa, William Penn, St Xavier, George Fox ইত্যাদি।

"সপ্তম মাসে—Joan of Arc, Albuquerque, Charlemagne, Peter the Hermit, Thomas à Becket ইত্যাদি।

"অষ্টম মাসে—Boccaccio, Chaucer, Rabelais, Cervantes, La Fontaine, Robert Burns, De Foe, Goldsmith, Titian, Rembrandt, Rubens, Chateaubriand, Walter Scott, Spenser, Petrarch, Byron, Madam de Stael ইত্যাদি।

"নবম মাসে—Marco Polo, Vasco da Gama, Arkwright, Dalton ইত্যাদি।

"দশম মাসে—Otway, Goethe, Voltaire, Schiller, Racine, Miss Edgeworth, Richardson ইত্যাদি।

"একাদশ মাসে—Montaigne, Erasmus, Pascal, Locke, Diderot, Adam Smith, Kant ইত্যাদি।

"দ্বাদশ মাসে—Charles V, Henry IV, Washington, Hampden, ইত্যাদি।

"ত্রয়োদশ মাসে—Copernicus, Kepler, Hilley, Pristley ইত্যাদি।

"এই সকল নামের ফর্দ্দ দেখিয়া একজন ইংরাজ লেখক পরিহাস করিয়া লিখিয়াছেন যে, উল্লিখিত দেবতা ও ক্ষুদ্রদেবতা (God and God-king) দিগের মধ্যে যে কত ফরাসীর নাম আছে তাহা বলা ভার। এ কথাটি কোম্‌তের স্বজাতিপক্ষপাতিত্বার উপর ব্যঙ্গ করিয়া লিখা হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত নাম গণনা করিয়া দেখিলে কথাটি ঠিক 'ভজিবে' কি না সন্দেহ। তেরটি মাসের নামের মধ্যে ত দেখা যায় যে দুইজন য়িহুদি—মোসেস ও সেণ্ট পল; তিনজন গ্রীক—হোমার, আরিষ্টটল, আর্কিমিডিস্। শার্লমানকে ফরাসীও বলা যায়, জর্ম্মনও বলা যায়; দাঁতে—ইটালীয়; গটেনবার্গ, ফ্রেডরিক—জর্ম্মন; সেক্ষপীয়র—ইংরাজ; ডেকার্ট ও বিশা—ফরাসী। অতএব মাসের নামে ত স্বজাতিপক্ষপাতিত্ব বিশেষ দৃষ্টা হয় না। মিল এই সকল নামের ফর্দ্দ উপলক্ষ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই নামসংগ্রহ অতি চমৎকার ও সর্ব্বসংগ্রাহক হইয়াছে। কোম্‌ৎ ইহাতে অসামান্য গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। যেসকল ব্যক্তির পরস্পর এতদূর বিদ্বেষ ছিল যে, দেখা হইলে তাহারা পরস্পরের গলা ছেঁড়াছিঁড়ি করিত, এতাদৃশ

ব্যক্তিগণকে তিনি এক স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ফলতঃ কোম্‌ৎ যেন প্রত্যেকের নিকটে যাইয়া বলিতেছেন—তুমি আর যাহাই হও না কেন, তোমা হইতে মনুষ্যজাতির এই উপকার সাধিত হইয়াছে অতএব তুমি আমাদের সকলের নমস্ত এবং পূজনীয়।

"এই নামসংগ্রহ দেখিয়া ভারতবর্ষবাসীরা হয় ত অভিমান করিয়া বলিবেন যে, ব্যাস, কণাদ, কপিল, বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি কোথায় গেলেন? কিন্তু তৎসম্বন্ধে পুনর্ব্বার বলিতে হয় যে, কোম্‌ৎ য়ুরোপীয় সভ্যতার উন্নতি ব্যাখ্যা করিতে বসিয়াছেন। তিনি দেখাইয়া দিতে চাহেন যে, গ্রীকদিগের সেই প্রাচীন কাল হইতে সভ্যতার একটি স্রোত কখনও বা মন্দবেগে কখনও বা প্রবল বেগে এ কাল পর্য্যন্ত বহিয়া আসিয়াছে, এবং এক্ষণে উহা ক্রমশঃ বিশাল ও বিপুল হইয়া উঠিয়া সমস্ত ভূমণ্ডলে অপর্য্যাপ্ত-ফলপ্রসবকারী বারি বিস্তার করিতে উদ্যত হইয়াছে। সেই স্রোতের বহন-কার্য্যে যাঁহারা অল্পবিস্তর সহায়তা করিয়াছেন, কোম্‌ৎ তাঁহাদিগেরই নাম করিয়া নিরস্ত হইয়াছেন। অন্যান্য দেশের সভ্যতার স্রোত কতক দূর বহিয়া সরস্বতীর স্রোতের ন্যায় বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হইয়াছে, অবিচ্ছিন্নভাবে একাল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইতে পায় নাই। এটি একটি সেই সেই দেশের অদৃষ্টবৈগুণ্য বলিতে হইবে। কিন্তু কোম্‌ৎ যে, সে বিষযে একেবারে দৃষ্টিহীন ছিলেন তাহা বোধ হয় না; কারণ, দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, তিনি মনু, বুদ্ধ, কন্‌ফুসিয়স, মহম্মদ প্রভৃতিরও নাম করিয়াছেন। এই নাম করিবার কারণও আছে। ইহাদিগের নামের সহিত এমন কতকগুলি idea সংশ্লিষ্ট আছে, যেসকল idea য়ুরোপীয়দিগের মনোমধ্যে সময়ে সময়ে প্রবিষ্ট হইয়া উঁহাদিগের বুদ্ধিবিকাশের সহায়তা করিয়াছে। এই জন্য কোম্‌ৎ য়ুরোপীয় সভ্যতা-বিকাশের ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। বিশেষতঃ তিনি মহম্মদের বড়ই ভক্ত ছিলেন। স্থলবিশেষে তিনি লিখিয়াছেন—মহম্মদের জুড়ি মিলে না, the incomparable Mohammad। নিজে খৃষ্টানবংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াও তিনি খৃষ্টানদিগের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য লিখিয়াছেন যে, খৃষ্টানরা কিসের এত গর্ব্ব করেন? তিন শত বৎসর ক্রুশের যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া শেষ কালে আপনাদিগের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তয়িতার জন্মভূমি পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের হস্তে ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছেন!

"এই পঞ্জিকার মধ্যে নেপোলিয়নের নাম নাই। কোম্‌ৎ তাঁহাকে ভয়ানক পাষণ্ড বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার মতে নেপোলিয়ন humanity-র শত্রু।

"কোম্‌তের যে পঞ্জিকার ব্যাখ্যা করা গেল, তাহাতে কোম্‌ৎ বলিয়াছেন, Concrete Calendar অর্থাৎ ব্যক্তিমূলক পঞ্জিকা। তদ্ব্যতীত তিনি আর একটি Calendar প্রস্তুত করেন, উহার নাম দিয়াছেন Abstract Calendar—ব্যবস্থামূলক

পত্রিকা (ব্যবস্থা=social institutions, যথা বিবাহ ইত্যাদি)। ইহার প্রথম মাসের নাম humanity ; ২য় মাস—বিবাহ (marriage) ; ৩য় মাস—পিতৃত্ব সম্বন্ধ (paternal relation) ; ৪র্থ মাস—পুত্রত্ব সম্বন্ধ ; ৫ম মাস—ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ ; ৬ষ্ঠ মাস—স্বামি-ভৃত্য সম্বন্ধ। তিনি এই ছয়টি ব্যবস্থার সাধারণ নাম দিয়াছেন—লোকস্থিতি বা সমাজের মৌলিক সম্বন্ধ, fundamental social relations। ৭ম মাস—জড়পদার্থ পূজা (fetishism) ; ৮ম মাস—বহুদেব পূজা (polytheism) ; ৯ম মাস—একেশ্বরবাদ (monotheism) ; তিনি এই তিন ব্যবস্থার সাধারণ নাম দিয়াছেন—preparatory stage, সমাজ গঠনের আরম্ভকাল। ১০ম মাস—নারীজাতি। কোম্‌ৎ নারীজাতিকে ধর্ম্মনীতির অধিষ্ঠাতৃদেবতারূপে—moral providence—কীর্ত্তন করিয়াছেন। ১১শ মাস—যাযকসম্প্রদায় (priesthood); ইহারা বুদ্ধিবৃত্তিচালনার অধ্যক্ষস্বরূপ, intellectual providence। ১২শ মাস—সম্ভ্রান্তলোকসম্প্রদায় (patriciate) ইহাদিগকে তিনি বাহ্যব্যাপারের অধ্যক্ষ (material providence) বলিয়াছেন। ১৩শ মাস—শ্রমজীবীগণ (proletariate)। ইহারা general providence সর্ব্বসাধারণ তাবৎ বিষয়ের অধ্যক্ষ।

"এ স্থলে বলা উচিত কোম্‌ৎ providence এই শব্দটি বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগ করেন। সাধারণতঃ লোক ভগবানকেই providence কহে, অর্থাৎ যিনি আবশ্যক বস্তুসকলকে জোগাইয়া দিতেছেন। এই 'জোগাইয়া দেওয়া' অর্থ ধরিয়া কোম্‌ৎ মনুষ্যসমাজে সেই সম্প্রদায়কে সেই বিষয়ের providence বলিয়া কীর্ত্তন করেন, যে সম্প্রদায় যে বিষয়ের অধ্যক্ষতা করেন এবং প্রয়োজন অনুসারে জোগাইয়া রাখেন। যথা banker, merchant, manufacturer ও farmer—এই চারি সম্প্রদায়কে তিনি patriciate কহেন। ইহারা উক্ত চারি প্রকার সামাজিক ব্যাপারের অধ্যক্ষ, অধিষ্ঠাতা এবং যোগক্ষেমকর্ত্তা (যোগক্ষেম বলিতে অলব্ধ বস্তুর লাভ ও লব্ধবস্তুর রক্ষা ; কি রহিল, কি খরচ হইল, কি চাহি, এ বিষয় দেখা)। নারীজাতিকে তিনি ধর্ম্মনীতির অধিষ্ঠাত্রী কহেন ; তাৎপর্য্য এই নারীর চারি মূর্ত্তি—জননী, গৃহিণী, ভগিনী ও দুহিতা ; আমাদিগের প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা ইহাদিগের নিকট হইতেই হয়। যাযকসম্প্রদায় (priesthood) বুদ্ধিচালনা-ঘটিত ব্যাপারের অধিষ্ঠাতা, কোম্‌তের ব্যবস্থামত ইহারাই লোকদিগকে লিখাপড়া শিখাইবেন, সর্ব্বদা আবশ্যকমত উপদেশ দিবেন, আচরণে কোথায় কি ভুল হইতেছে দেখাইয়া দিবেন, অযথা বুদ্ধিপরিচালনা হইতে নিরস্ত রাখিবেন, ইত্যাদি। শ্রমজীবীগণ সর্ব্বসাধারণ সকল বিষয়েই তত্ত্বাবধানকর্ত্তা ; আহার, আচ্ছাদন, বসতবাটীনির্ম্মাণ, যাবতীয় অত্যাবশ্যক অপরিহার্য্য কার্য্য, ইহাদিগেরই হস্তে। ইহারা পরিশ্রম না করিলে সমাজকে অচিরাৎ গ্রাসাচ্ছাদনাদির অভাবে বিলুপ্ত হইতে হয়। আমরা অভ্যাসদোষে এবং ভ্রমান্ধকারে আচ্ছন্ন বলিয়া শ্রমজীবীদিগকে নীচ জাতিমধ্যে পরিগণিত করিয়া

রাখিয়াছি; কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, যেরূপ অক্লিষ্ট কঠোর পরিশ্রমে ইহারা সমাজকে খাড়া করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে আমাদিগের যারপর নাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাই কর্তব্য। এক্ষণকার বিবেচনামত হয়ত বলিব যে কৃতজ্ঞতা আবার কিসের? পয়সা দিয়া চাউল কিনি, ভাত খাই। শ্রমজীবীরা পেটের দায়ে ক্লেশ স্বীকার করে। তাহারা কি আমাদিগকে খাওয়াইবে পরাইবে বলিয়া পরিশ্রম করে? কিন্তু এ প্রকার কুতর্কের চালনা করিলে মা বাপকে পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি রহিত করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ তর্কবাগীশ অনেক নব্য যুবক আধ তামাসার ছলে এ প্রকার পরিহাসও কখনও কখনও করিয়া থাকেন, বাপ মা'কে শ্রদ্ধা করিতে যাইব কেন? তাঁহারা বৃত্তিবিশেষের বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন, ফলে আমার জন্মলাভ হইল, ইহাতে কৃতজ্ঞতার বিষয় কি আছে? কিন্তু ভাবিয়া দেখ, আমরা সকল সময়ে কৃতজ্ঞতাচালনাবিষয়ে অত সূক্ষ্ম বিবেচনা করি না। হিন্দুরা দুগ্ধদাত্রী গাভীর পূজা করিয়া থাকেন, ধান্যাদি শস্যেরও পূজা করেন। আমার স্বর্গীয় বন্ধু যোগেন্দ্র[১] কোম্‌ৎ পড়িয়া পড়িয়া মনোবৃত্তিকে এতদূর পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিয়াছেন যে, তাঁহার আবাদের চাষীরা তাঁহাকে নমস্কার করিবার জন্য তাঁহার বাটীতে কখনও কখনও আসিত। একদা তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন— 'দেখ, তোমরা আমাদিগকে খাইতে দাও বলিয়া আমরা চারটি চারটি খাইতে পাই।' চাষারা ত শুনিয়া অবাক ও হতবুদ্ধি। তাহারা কখনও কখনও জমীদার বাবুর মুখে এ প্রকার অত্যাশ্চর্য্য বাক্য শ্রবণ করে নাই। তাহারা শিহরিয়া উঠিল, কিছুই তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারিল না; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রমজীবীগণকে এইরূপ দৃষ্টিতে দর্শন করাই আমাদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য; এবং যত দিন আমাদের সে অভ্যাস না হইতেছে, ততদিন সমাজের সম্পূর্ণ সংস্কার ব্যাহত হইয়া থাকিবে।

"কোম্‌ৎ বিবাহব্যবস্থার নামে একটি মাস গণনা করিয়া ঐ ব্যবস্থা যে সমাজের পক্ষে কত আবশ্যক তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন; কারণ এক্ষণে তর্কবিতর্ক ও বাদানুবাদের প্রবাহে বিবাহব্যবস্থা ও স্বত্বাস্বত্বের ব্যবস্থা (institutions of marriage and property) একপ্রকার যায় যায় হইয়াছে। বড় বড় গ্রন্থরচনার দ্বারা প্রতিপন্ন করা হয় যে, মনুষ্যসমাজে বিবাহের আবশ্যকতা নাই। এই ব্যবস্থা পশুদিগের মধ্যে নাই, অন্যান্য ইতর প্রাণীদিগের মধ্যে নাই, তাহারা কি নির্ম্মূল হইতেছে? কিঞ্চিৎ সাবধান হইয়া চলিলেই বিনা বিবাহে মনুষ্যসমাজ বেশ খাড়া থাকিতে পারে। এ প্রকার কুতার্কিকদিগের সহিত বাদানুবাদ করিয়া কোনও ফল নাই। ইহাদিগকে ঘোরতর অবজ্ঞার তলে নিক্ষেপ করিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবে। স্বত্বাস্বত্বের বিষয়েও উক্তপ্রকার বিশ্ববিপ্লাবক অনেক আন্দোলন এক্ষণে চলিতেছে,—Socialism, Communism, Nihilism ইত্যাদি

[১] যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।—সং

মতের আবির্ভাব তাহার দৃষ্টান্ত। এই সকল কুতর্কের প্রতি কোম্‌ৎ এককালে খড়্গহস্ত এবং অবজ্ঞাপূর্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তবে সোশ্যালিজম ঘটিত একটি কথা তিনি ভুলেন নাই ; অর্থাৎ নিতান্ত দুর্ব্বৃত্ত না হইলে পৃথিবীস্থ তাবৎ জীবিত ব্যক্তিরই খাইতে পরিতে এবং উপযুক্ত বাসস্থানে থাকিতে পাওয়া আবশ্যক। যাঁহারা সমাজের নেতৃত্ব করেন, উক্ত বিষয়ের ব্যবস্থা করা তাঁহাদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য, করিতে না পারিলে তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে নেতৃত্ব করিবার অযোগ্য। ফলতঃ এ কথা সমাজ নেতারা অনেক সময়ে নিজমুখেই স্বীকার করিয়াছেন, এবং তদনুসারে কার্য্যও করিয়াছেন। এতদ্দেশে দুর্ভিক্ষের সময় আমাদিগের গভর্ণমেণ্টের কার্য্যপ্রণালী ইহার দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহারা ত এ কথা বলিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারেন না যে, অনটনবশতঃ লোক মরে, আমাদের কি ? আমি শুনিয়াছি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পশ্চিমে যে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তৎকালে তথাকার শাসনকর্ত্তা ম্যাকৃডনেল (এক্ষণে লর্ড ম্যাকৃডনেল) অত লোক অনাহারে মরিবে ভাবিয়া পাগলের মত হইয়াছিলেন, এবং দিবারাত্র ঘোরতর পরিশ্রম করিয়া দুর্ভিক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালেও যে, সময়ে সময়ে এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইত, তাহাও নিশ্চিত বোধ হয়। ম্যাকৃডনেলের কথা শুনিয়া 'শকুন্তলার' এক পংক্তি শ্লোকের প্রকৃত অর্থ স্ফুরিত হইয়া উঠে ; যখন কশ্যপ ঋষি দুষ্যন্তকে তাঁহার পুত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতির কথা বলিতেছেন, তখন কহিতেছেন— পুনর্যাস্যত্যাখ্যাং ভরত ইতি লোকস্য ভরণাৎ—অর্থাৎ ইনি লোকদিগকে খাইতে দিয়া ভরত ভরণপোষণকর্ত্তা এই নাম লাভ করিবেন। এটাকে আমি বরাবর হ য ব র ল humdrum commonplace কথা বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলাম ; রাজা রাজপুরুষরা লোকদিগকে খাইতে দেন কি দুশো-পাচশো কাঙ্গালী খাওয়ান ইহাতে আবার বাহাদুরি বা পৌরুষ কি ? আর খেতাবনাম পাইবারই বা কি হিসাব আছে ? কিন্তু ম্যাকৃডনেলের কথাটা শুনিয়া হঠাৎ আমার মনে উদয় হইল যে, কথাটা আর কিছু নহে, দুষ্যন্তের পুত্র বোধ হয় কোনও ঘোরতর দুর্ভিক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাই 'ভরত' এই খেতাবনাম পাইয়াছিলেন। ইহাতে দেখা যাইতেছে 'ভরত' এই শব্দটা অতি উন্নত ও ঔদার্য্যপূর্ণ অর্থ ধারণ করে।

"এইবার Positivist Chivalry-র কথা বলিব। ইহা কোম্‌তের অপর একটি অভিপ্রেত ব্যবস্থা। Chivalry শব্দের অর্থ বাঙ্গালাতে কিরূপে ব্যক্ত করা যাইবে ? আমি অনেক বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছি যে, 'শরণ্যসম্প্রদায়' এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিলে কতকটা হইতে পারে। য়ুরোপের ইতিহাসে যাহাকে মধ্যযুগ বলে সেই সময়ে chivalry নামক ব্যবস্থা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মুখ্য অভিপ্রায় পরিণামে এই দাঁড়াইয়াছিল,—অন্ততঃ লোক ভাবিত, যে তাঁহারা দুর্ব্বলকে

প্রবলের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্ত এবং দুরাত্মাদিগের দৌরাত্ম্য হইতে স্ত্রীজাতির মান ও ইজ্জৎ রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর থাকিবেন। ইহাই ছিল তাঁহাদিগের জীবনের একমাত্র ব্রত, উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য। যদি বল যে, এ কার্য্য ত দেশের শাসনকর্ত্তাকেই অর্শে; তাহার উত্তরে বলিতে হয় যে, দেশের শাসনকর্ত্তা সকল স্থলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারেন না। কালিদাসের শকুন্তলাকে রাজা দুষ্যন্ত নিজেই বলিয়াছেন—

অহন্যহন্যাত্মন এব তাবৎ
জ্ঞাতুং প্রমাদ স্খলিতং ন শক্যং
প্রজাসু কঃ কেন পথা প্রযাতী
ত্যশেষতো বেদিতুমস্তি শক্তিঃ।

অর্থাৎ 'দিন দিন নিজেরই কত ত্রুটি হইয়া থাকে তাহা নিরূপণ করা ভার; তাহার আবার প্রজাদিগের মধ্যে কখন কে কি করিতেছে ইহা কি জানিতে পারা যায়?' এই নিমিত্ত যে যে স্থানে Humanity কতকদূর অগ্রসর হইয়াছে সেই সেই স্থানে রাজ্যশাসন কার্য্যের সহিত লিপ্ত না থাকিয়াও কতকগুলি মহাত্মা আপনা হইতেই প্রবলের অত্যাচার নিবারণ ও স্ত্রীজাতির সতীত্বরক্ষাবিষয়ে ব্রতী হইয়া থাকেন।

"য়ুরোপের chivalry ব্যবস্থার কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে সার্ভান্টিস নামক স্পেনদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের Don Quixote গ্রন্থপাঠে; সত্য বটে সার্ভান্টিস্ ঐ গ্রন্থে উক্ত ব্যবস্থার হাস্যাস্পদ মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াছেন। তখন chivalry-র শেষ দশা। অতিপ্রসঙ্গদোষে এবং অযোগ্য ব্যক্তিদিগের নির্বুদ্ধিতাবশতঃ ব্যবস্থাটি বাস্তবিকই হাস্যাস্পদ হইয়াছিল। কিন্তু এক সময়ে হাস্যাস্পদ হইয়াছিল বলিয়া কোম্‌ৎ মনে করিতেন না যে, প্রকারান্তরে উহার পুনরুত্থাপন করা সঙ্গত নহে, কিংবা উহা আবার কার্য্যোপযোগী করা যাইতে পারে না।

"শাসনকর্ত্তাদিগের দ্বারা যে অত্যাচারনিবারণ হয় বা অপরাধের দণ্ডবিধান হয় তাহা সমাধা করিতে আইন-আদালত আবশ্যক। সভ্যসমাজে অর্থব্যয় ব্যতিরেকে আইন-আদালতে সাহায্য লওয়া প্রায় সম্ভবে না। এই নিমিত্ত ফল দাঁড়ায় এই যে, যাঁহাদের সঙ্গতি আছে তাঁহারাই আপন আপন স্বত্বরক্ষা ও আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন; যাঁহাদের সঙ্গতি নাই তাঁহাদের প্রায়ই কিল খাইয়া কিল চুরি করিয়া থাকেন এবং আপন আপন স্বত্ব হইতে ক্রমশঃ অপসারিত হইয়া যায়েন, পরিশেষে বংশলোপই তাঁহাদিগের শেষ দশা। সংসারের কার্য্য আবহমানকাল অনেক স্থলে এইরূপ চলিয়া আসিতেছে; ইহাকেই ডারুইন কহিয়াছেন—natural selection, স্পেন্সর কহিয়াছেন—survival of the fittest; কিন্তু যে ব্যক্তির মনোমধ্যে ন্যায়ান্যায়ের

জ্ঞান কিঞ্চিদংশে স্ফুরিত হইয়াছে তিনি কখনই এ প্রকার অবস্থার প্রতি সন্তুষ্টচিত্তে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে পারিবেন না। ইহার প্রতিকার-চিন্তা সর্ব্বদাই তাঁহাকে ব্যথিত করে। ডারুইন বা স্পেন্সরের মতাবলম্বী ব্যক্তিরা বলিবেন বটে যে—ইহার আর উপায় কি? ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মই এই; সে নিয়ম রোধ করিবার চেষ্টা করা আর Ecliptic-কে Equator-এর সঙ্গে মিলাইয়া দিবার চেষ্টা করা তুইই সমান। যাঁহারা এই প্রকার বাক্যপ্রয়োগ করেন, তাঁহাদিগের করুণা নামক মনোবৃত্তিটি অবশ্যই স্বভাবতঃ খর্ব্ব হইবে, নহিলে তাঁহারা কখনই ঐ উপায়ে মনকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিতেন না।

"Positivist Chivalry—যাহাকে আমি শরণ্যসম্প্রদায় বলিতেছি—উক্ত অনর্থের প্রতীকাব করিবাব জন্য একটি উপায় কল্পনারূপে উদ্ভাবিত হইয়াছে। যদি ক্ষমতাপন্ন ভদ্রসন্তানগণ প্রকৃতপক্ষে পরহিতাব্রতী হইতে পারেন, তাহা হইলে অনেক স্থলেই সহজে প্রবলের অত্যাচার নিবারণ করিতে পারেন। তবে ইহাতে নিজের কোনও লাভেব প্রত্যাশা নাই, অনেক সময়ে ঝঞ্ঝাটেও পড়িতে হয়। লাভের মধ্যে একটা সংকার্য্য সম্পাদন করিলাম—এই আত্মপ্রসাদমাত্র। এক্ষণে নরজাতির যে অবস্থা তাহাতে উক্তপ্রকার আত্মপ্রসাদ লাভেব লোভে যে অধিক লোক ঝঞ্ঝাটে পড়িতে অগ্রসর হইবেন তাহা বোধ হয় না; তবে কালসহকারে পরহিতব্রতের চমৎকারিতা আবার বিস্তারিতরূপে অনুভূত হইলে এবং অভ্যাসবশে আমাদিগের মস্তিষ্কের বর্ত্তমান অবস্থা ক্রমশঃ পবিবর্ত্তিত হইলে আশা করা যাইতে পারে যে, শরণ্যসম্প্রদায়েব ব্যবস্থাটি বিশিষ্টরূপে কার্য্যকরী হইবে।

"শরণ্যসম্প্রদায়ের কিছু আভাস আমি বঙ্কিমবাবুর একখানি উপন্যাস হইতে একটি উদাহরণ উদ্ধার করিয়া কিঞ্চিদংশে বুঝাইয়া দিতে পারি। উপন্যাসখানির নাম আমার এখন মনে পড়িতেছে না। বঙ্কিমবাবু উহাতে লিখিয়াছেন যে, কোনও পল্লিগ্রামের এক বেলেল্লা সামান্য একটি গৃহস্থবাটীর বিধবা কন্যার প্রতি অবৈধ লালসা ধারণপূর্ব্বক কিছু কিছু অত্যাচারের উদ্যোগ করিতেছিলেন। গ্রামেব জমিদার একটি ভদ্রসন্তান ছিলেন, তিনি বয়সেও প্রবীণ; তিনি এ উপলক্ষে হাউচাউ কবা সঙ্গত বোধ না করিয়া ছোকরাটিকে একদা আপনার বাটিতে ডাকাইলেন এবং বিলক্ষণরূপে তাহার তু'টি কাণ মলিয়া দিয়া সতর্ক করিয়া দিলেন যে, ভবিষ্যতে সে আর সে প্রকার কায না করে। ছোকরা অবশ্য মনে করিলে জমিদারের নামে Penal Code করিতে পারিত এবং তাঁহাকে একটু কষ্ট দিলেও দিতে পারিত, কিন্তু বোধ হয় সে দুষ্ট সরস্বতী তাহার মনে উদয় হয় নাই, সুমতির বশবর্ত্তী হইয়া সে চুপ করিয়া রহিল। শরণ্যব্যক্তিগণ মনে করিলে এ প্রকার সামান্য সামান্য সংকার্য্য অনেক সম্পাদন করিতে পারেন এবং তদ্বারা সমাজের বিস্তর দুর্ঘটনাস্রোত রোধ করিতে পারেন, কিন্তু তৎকল্পে নিজে শান্ত

সুবোধ ও চরিত্রবান হওয়া চাহি। নচেৎ ফল দর্শিবার সম্ভাবনা নাই। আমার বোধ হয় Positivist Chivalry কোম্‌ৎ সেণ্ট সাইমন্‌ নামক একজন সমসাময়িক ফরাসী চিন্তয়িতার উপদেশ হইতে পাইয়া থাকিবেন। কোম্‌তের যখন বয়স অল্প তখন সেণ্ট সাইমন বিলক্ষণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অনেকে তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। কোম্‌ৎ ও কয়েক বৎসর তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতে যাইতেন। কিন্তু তৎপরে এই ব্যক্তির প্রতি কোম্‌তের অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। কোম্‌ৎ আপনার গ্রন্থে তাঁহার নামোল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—he was a sort of literary juggler অর্থাৎ তাঁহার অনেক কথা অসার বুজরুকি মাত্র। কিন্তু তিনি যাহাই বলুন, Humanity এবং Religion of Humanity ইত্যাদি অনেক নূতন ধরণেব কথা সেণ্ট সাইমনই বোধ হয় প্রথম উদ্ভাবিত কবেন; এবং যে সময়ে কোম্‌ৎ দর্শন শাস্ত্রকেই নরজাতির সর্ব্বকার্য্যসাধন বলিয়া জ্ঞান করিতেন, সেই সময়ে সেণ্ট সাইমন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মপ্রণালীব্যতীত নরজাতির কোনও মতেই চলিবে না; কেবল দর্শনশাস্ত্রের দ্বারা মানুষের অন্তঃকরণ তৃপ্তিলাভ করে না। এই তত্ত্বটি কোম্‌ৎ তৎকালে vague religiousness বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে দেখা যাইতেছে যে, ১০।১৫ বৎসর পরে তিনি নিজেই ঐ তত্ত্বে উপনীত হইয়া বহু বিস্তাররূপে উহা ঘোষণা করিলেন, Religion of Humanity সংস্থাপিত করিলেন। আমার বোধ হয় যে, Eugène Sue (অজেন সু) নামক সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী উপন্যাসলেখকও ঐ সেণ্ট সাইমনের শিষ্য। তৎপ্রণীত Mysteries of Paris নামক বিস্তীর্ণ আখ্যায়িকাগ্রন্থে রুডল্‌ফ নামে একটি চরিত্র চিত্রিত আছে। রুডল্‌ফ একজন জার্ম্মাণ নরপতি। তিনি কোনও কার্য্যবশতঃ ছদ্মবেশে পারিসে আসিয়া কিছুকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন, এবং শারণ্যসম্প্রদায়ের মত বিস্তর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহাকে সময়ে সময়ে বিলক্ষণ বিপদে পড়িতে হইয়াছিল এবং সময়ে সময়ে এমন অনেক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল যাহা ধর্ম্মনীতি কখনও কোনও দিন অনুমোদন করিবে না। তবে মোটের উপর এ পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, সর্ব্বস্থলে পরহিতব্রতই তাঁহার চরম উদ্দেশ্য ছিল। কতকগুলি সন্দিগ্ধ কার্য্য ব্যতীত তাঁহার চরিত্রকে শরণ্যসম্প্রদায়ের অতি সুন্দর আদর্শস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করা যাইতে পারে। Mysteries of Paris নামক গ্রন্থ যদিচ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ আন্দাজ সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল তথাপি এখন পর্য্যন্ত উহার নূতন নূতন সংস্করণ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ইংরাজী ভাষাতে উহা অনেকবার মুদ্রিত হইয়াছে। উপন্যাস পুস্তকের এতাদৃশ দীর্ঘ জীবন অতি বিরল। ইহাতে বোধ হয় বহিখানা দৃঢ়রূপে লোকের চিত্তকে আয়ত্ত করিয়া বসিয়াছে।"

যে মহাত্মাদের নামে সপ্তাহের নামকরণ হইয়াছে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(পৃষ্ঠা ৩৪৩ দ্রষ্টব্য)

Numa Pompilius (৭১৫-৬৭২ খ্রীঃ পূঃ) : রোমের রাজা (দ্বিতীয়)। রাজ্যশাসন, ধর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যাপারে শৃঙ্খলতা আনয়ন করেন। পাশ্চাত্য জগতের প্রথম বিধানকর্তা (lawgiver) বলিয়া পরিগণিত।

Lord Buddha (আনুঃ ৫৬০-৪৮০ খ্রীঃ পূঃ) : বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক।

Confucious (আনুঃ ৫৫০-৪৭৮ খ্রীঃ পূঃ) : কনফিউসিয়াস মতবাদীরা 'শিক্ষিতদের সম্প্রদায়' নামে পরিচিত। কনফিউসিয়াস সুষ্ঠু সমাজ গড়িবার জন্য ব্যক্তির দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

Mohammad (আনুঃ ৫৭০-৬৩২) : ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক।

Aeschylus (৫২৫-৪৫৬ খ্রীঃ পূঃ) : এথেন্সবাসী কবি এবং বিয়োগান্ত নাটকের জনক বলিয়া কথিত।

Phidias (আনুঃ খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দী) : গ্রীস দেশীয় ভাস্কর।

Aristophenes (আনুঃ ৪৪৪-৩৮০ খ্রীঃ পূঃ) : এথেন্সবাসী নাট্যকার। সমসাময়িক বিখ্যাত ব্যক্তিদের লইয়া বহু কৌতুক নাটক রচনা করেন।

Virgil (৭০-১৯ খ্রীঃ পূঃ) : Aenid কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা।

Thales (খ্রীঃ পূঃ ৭ম শতাব্দী) : 'সপ্ত ঋষি'র অন্যতম দার্শনিক। প্রখ্যাত জ্যামিতিবেত্তা ও জ্যোতির্বিদ। পার্থিব বস্তুর মধ্যে জলকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করিতেন।

Pythagoras (খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী) : গ্রীসের অন্তর্গত সামোসের অধিবাসী। একাধারে বিখ্যাত দার্শনিক ও সুদক্ষ গাণিতিক ছিলেন। 'He believed in transmigration of souls and evolved the ideas that the explanation of the universe is to be sought in nu ubers and their relations.' এ প্রসঙ্গে জ্যামিতির 'পাইথাগোরাস উপপাদ্য' স্মর্তব্য।

Socrates (৪৬৯-৩৯৯ খ্রীঃ পূঃ) : পাশ্চাত্য দর্শনের জনক বলিয়া স্বীকৃত।

Plato (আনুঃ ৪২৭-৩৪৮ খ্রীঃ পূঃ) : সক্রাটিসের শিষ্য। গুরুর শিক্ষা ও উপদেশকে ভিত্তি করিয়া যে dialogue-গুলি রচনা করেন সেগুলি বিখ্যাত।

Hippocrates (৪৬০-৩৫৭ খ্রীঃ পূঃ) : গ্রীস দেশীয় প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ্। কোস দ্বীপের পৃথিবীখ্যাত ভেষজ বিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন। এখনও চিকিৎসকেরা তাঁর নামে শপথ গ্রহণ করিয়া নিজ পেশা শুরু করেন।

Pliny the Elder (আনুঃ ২৩-৭৯) : Natural History গ্রন্থের লেখক। ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে প্রাণ হারান।

Thamistocles (আনুঃ ৫২৪-৪৫৯) : প্রখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ সেনানায়ক। পারসীক নৌবাহিনীর আক্রমণে গ্রীসের সঙ্কট উপস্থিত হইলে এই সমরনায়কের দূরদর্শিতা ও কৌশলের ফলে সেই পারসীক নৌবাহিনী শুধু পর্যুদস্তই হয় নাই—গ্রীস চিরতরে পারস্যের নৌবল হইতে ভয়মুক্ত হয় (৪৮০ খ্রীঃ পূঃ)।

Alexander the Great (৩৫৬-৩২৩ খ্রীঃ পূঃ)।

St Augustine of Hippo (৩৫৪-৪৩০) : Pagan পিতা ও খ্রীষ্টান মাতা (St Monica)-র সন্তান। উত্তর আফ্রিকার হিপোর ধর্মযাজক হইয়া তথাকার প্রাচীন ধর্মমতের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া খ্রীষ্টধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। Civitas Dei (City of God) ও Confession গ্রন্থ রচনা করেন।

Hildebrand (১০৭৩-৮৫) : ইনি পরে পোপ হইয়া ৭ম গ্রেগরী নাম গ্রহণ করেন।

St Bernard of Menthon (৯২৩ ১০০৮) : প্রখ্যাত আলপাইন ধর্মশালার (hospice) প্রবর্তক। আল্পস্ পর্বতে প্রবল তুষার-ঝঞ্ঝায় পথভ্রষ্ট পথিকদের শিক্ষিত কুকুর দ্বারা উদ্ধার করিয়া এই সব ধর্মশালায় আনিয়া খাদ্য পানীয় দিয়া এখনও শুশ্রূষা করা হয়।

Jacqus Be'nigne Bousset (১৬২৭-১৭০৪) : ফরাসী ধর্মযাজক।

Alfred the Great (৮৪৯-৮৯৯) : পশ্চিম স্যাক্সনের নরপতি।

Innocent III (১১৯৮-১২১৬) : রোমের পোপ ছিলেন। রাজার উপর চার্চের কর্তৃত্ব করবার অধিকার আছে—এই মতবাদের একজন প্রধান প্রবক্তা। ইনিই ৪র্থ ক্রুসেডের আয়োজন করেন।

Lodovico Ariosto (১৪৭৪-১৫৩৩) : ইতালীয় কবি। Orlando Furioso নামক বিখ্যাত রোমান্টিক কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা।

Santi Raffaello (১৪৮৩-১৫২০) : রেনেসাঁস যুগের ইতালীয় অন্যতম চিত্রকর।

Torquato Tasso (১৫৪৪-৯৫) : Jerusalem Delivered কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা। জাতিতে ইতালীয়।

John Milton (১৬০৮-৭৪) : ইংরেজ কবি।

Christopher Columbus (আনু: ১৪৪৫-১৫০৬) : আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কারক জেনোয়াবাসী নাবিক।

James Watt (১৭৩৬-১৮১৯) : জাতিতে স্কচ্। স্টিম ইঞ্জিন আবিষ্কারক।

Joseph Michael Montgolfier (১৭৪০-১৮১০) ও Jacques Etienne Montgolfier (১৭৪৫ ৯৯) : মঁগোলফিয়ে ভ্রাতৃদ্বয় বেলুনে গরম বাতাস ভরিয়া তাহা আকাশে উত্তোলনের পন্থা আবিষ্কার করেন।

Pedro Calderon de la Barca (১৬০১ ৮১) : প্রসিদ্ধ স্পেনীয় নাট্যকার। ইনি শতাধিক নাটক রচনা করেন। 'For man's greatest crime is to have been born', 'For I see now that I am asleep that I dream when I am awake' প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত উক্তি।

Pierre Corneille (১৬০৬-৮৪) : ফরাসী নাট্যকার। Le Cid, Horace প্রভৃতি পৌরাণিক বিয়োগান্ত নাটক রচনা করিয়া অমর হন।

Moliere (১৬২২-৭৩) : ইনিও একজন ফরাসী নাট্যকার। প্রকৃত নাম Jean Baptiste Paquelin।

St Thomas Acquinas (আনু: ১২২৫-৭৪) : ইতালীয় নাগরিক। 'Summa Totius Theologiae' নামক বিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থের প্রণেতা।

Francis Bacon (১৫৬১-১৬২৬) : বিখ্যাত প্রবন্ধকার।

Gottfried Wilhelm Leibnitz (১৬৪৬-১৭১৬) : জার্মান গাণিতিক ও দার্শনিক। Differential Calculus এর আবিষ্কর্তা এবং বার্লিনের 'Academy of Science'-এর প্রতিষ্ঠাতা।

David Hume (১৭১১-৭৬): স্কচ্ দার্শনিক। 'in his system of philosophical scepticism human knowledge is restricted to experience of ideas and impressions and ultimate verification of their truth or falsehood is impossible.'

Louis XI (১৪২৩-৮৩): ১৪৬১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সামন্ত-তান্ত্রিক অধিনেতাদের অধিকার খর্ব করিয়া রাজার সার্বভৌম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন।

William III (১৬৫০-১৭০২): ইংলণ্ডের রাজা। ২য় জেমসের কন্যা মেরীকে বিবাহ করেন।

Richlieu (১৫৮৫-১৬৪২): ইনি রিশ্লিয়েরর ডিউক ছিলেন। প্রকৃত নাম Armand Jean de Plessis। ইনি French Academy স্থাপন করেন।

Oliver Cromwell (১৫৯৯-১৬৫৮): ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধে গণতন্ত্রবাদীদের নেতা ছিলেন।

Galileo (১৫৬৪-১৬৪২): প্রখ্যাত ইতালীয় জ্যোতির্বেত্তা।

Isaac Newton (১৬৪২-১৭২৭): মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কর্তা।

Antoine Laurent Lavoisier (লাভোয়াজিয়ে) (১৭৪৩-৯৪): ফরাসী রসায়নবিদ। 'giving a correct explanation of the part played by oxygen in combustion.'

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	
সংস্করণ	শেষ	'বিমলাদেবীর' স্থানে 'কমলাদেবী' হইবে।
১	১৫	বীডন উদ্যান বর্তমান 'রবীন্দ্রকানন'। আপার চিৎপুর রোড় এবং বিডন স্ট্রীটের সংযোগস্থলে অবস্থিত।
১	১৮	'আজ নীরবে ভুঞ্জন...' রবীন্দ্রনাথের সোনার তরীর অন্তর্ভুক্ত 'মানস-সুন্দরী' কবিতা।
২	১০	ইলবার্ট বিল লর্ড রিপন যখন ভাইসরয় (১৮৮০-৮৪), তখন মিঃ ইলবার্ট ছিলেন তাঁহার আইন সচিব। দেশীয় ম্যাজিস্ট্রেটগণ ইউরোপীয়দের বিচার করিতে পারিবেন, এই মর্মে ইলবার্ট সাহেব এক আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। ইহাই ইলবার্ট বিল নামে পরিচিত। ইহাতে সমস্ত ইংরেজ সমাজ রিপনের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন।
৩	১	অনাথবাবুর বাজার—বিডন স্ট্রীটের উপর এবং বিডন স্ট্রীট ডাকঘরের নিকট অবস্থিত। সাধারণের নিকট ইহা 'ছাতুবাবুর বাজার' নামে পরিচিত। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার—এখন ইহার চিহ্নমাত্র নাই।
৩	১৮	মতিচুর—মিহিদানার ন্যায় একপ্রকার ঘৃতপক্ক মিষ্টান্ন।
৩	২০	নিখুঁতি—অদ্যাবধি এই মিষ্টান্নের প্রচলন আছে কিন্তু ভিন্ন নামে।
৩	২৮	কাতারি কাটিয়া শুখো দই—"দই তিন প্রকার, শুখো, চলন ও দৌড়-চলন। 'শুখো'—দুধ ঘন করিয়া জ্বাল দিয়া দই পাতা। 'চলন'—দহি আদৎ দুধে কতক কতক জল দিয়া তাহা জ্বাল দিয়া জলটা মারিয়া দই পাতা। 'শুখো দই' ভাঁড় উপুর করিলেও পড়ে না—এক পাশ হইতে কাটিয়া কাটিয়া পাতে দিলে বেশ চাপ চাপ থাকে। ইহাকেই 'কাতারি কাটা' বলে। 'চলন দই' কখনও কতক পরিমাণে পাতে থাকে, কখনও একটু একটু চলে; এইজন্য উহার 'চলন দই' নাম হইয়াছে। আর 'দৌড়-চলন'—পাতে খুব কমই থাকে, যেন দৌড়িয়া নিম্নগামী হয়; এইজন্য উহার এই নাম।"
৪	১৫	রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটক প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে। কিন্তু ইহার প্রথম অভিনয় হয় নতুন বাজারে রামজয় বসাকের বাড়ীতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	
৫	২২	বাচখেলা—নৌকা-চালানো প্রতিযোগিতা। উনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতার বাঙালী ধনকুবেরদের মধ্যে এই খেলার বিশেষ প্রচলন ছিল।
৭	৩	এগারোজন বাঙালী—১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ব্রিটিশ-ফৌজী-গোরা-দলের বিরুদ্ধে খেলিয়া মোহনবাগান ক্লাব আই. এফ. এ. শীল্ড জয় করে। ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম এক ভারতীয় দল পরাধীন জাতির আত্মার প্রতীক রূপে চিহ্নিত হইয়াছিল। এই এগারোজন বাঙালীর নাম যথাক্রমে—রাজেন সেনগুপ্ত, নীলমাধব ভট্টাচার্য, হীরালাল মুখার্জী, মনোমোহন ঘোষ, রেভারেণ্ড সুধীর চ্যাটার্জী, হাবুল সরকার, সুকুলবাবু, কানু রায়, অভিলাষ ঘোষ, বিজয়দাস ভাদুড়ী ও শিবদাস ভাদুড়ী।
৮	১১-১২	রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী—১২ নং সুকিয়া স্ট্রীট। ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃত সাহিত্যাধ্যাপক ছিলেন।
৯	২০ ২১	বিদ্যোৎসাহিনী সভা—মাত্র তেরো বছর বয়সে জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত সিংহ পরিবারের মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ এই সভার প্রতিষ্ঠা করেন (১৪. ৬. ১৮৫৩)। বাঙালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে এবং যাঁহারা এই ভাষা ও সাহিত্যের সাধনা করিতেন তাঁহাদেরকে উৎসাহ দানই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল।
৯	২৫	মধুসূদন দত্ত কৃত দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ'-এর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ (১৮৬১) ও প্রচারের দায়ে রেভারেণ্ড লঙের এক মাস কারাবাস ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড হয় (২৪শে জুলাই, ১৮৬১)।
১০	৫	'শুধু কথার উপরে কথা……'—রবীন্দ্রনাথের
১০	১২	শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি রিপন কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন।
১২	৩	জন স্টুয়ার্ট মিল—জাতিতে মুচি। পিতা জেমস্ মিলের অসাধারণ মনোবল ও ছেলেকে মানুষ করিবার জন্য বিস্ময়কর অধ্যবসায়, তাঁহাকে বড় হইতে সহায়তা করে। কোঁতেরই মত ইনিও একজন বিখ্যাত দার্শনিক। কোঁতের বহু মতকে ইনি স্বীকার করিয়াছেন, আবার বহু মতের সঙ্গে তাঁহার অমিল হইয়াছে।
১২	৯	Synthetic Philosophy—কোঁতের একটি বিশিষ্ট দার্শনিক মতবাদ।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	
১৪	২৪	পল বর্জিনিয়া—ফরাসী লেখক Jacques Henri Bernardin de Saint Pierre (১৭৩৭-১৮১৪)-এর লেখা Paul et Virgine (১৭৮৭)-এর অনুবাদ।
১৭	১৪	হার্বার্ট স্পেন্সার—বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক (১৮২০-১৯০৪)।
২০	৫	গোবিন্দ শিরোমণি—প্রকৃত নাম রামগোবিন্দ গোস্বামী (তর্করত্ন)। ১১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
২০	১৬-১৭	স্যার সুরেন্দ্রনাথের পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ডাক্তারী করিবেন স্থির করিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 'হেডরাইটার-কোষাধ্যক্ষে'র পদ ত্যাগ করেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই পদে পাঁচ হাজার টাকা জামিন দিয়া আশী টাকা মাসিক বেতনে নিযুক্ত হন (১লা মার্চ, ১৮৪৯)।
২০	পাদটীকা	ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হেডরাইটার-কোষাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিবার পর বিদ্যাসাগর শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক ডঃ ময়েটের অনুরোধে পুনরায় সংস্কৃত কলেজে ফিরিয়া আসেন এবং সাহিত্যের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন (৫ই ডিসেম্বর, ১৮৫০)। পরে রসময় দত্ত সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিলে বিদ্যাসাগর অস্থায়ী সম্পাদক হিসাবে ৪ঠা হইতে ২১শে জানুয়ারী (১৮৫১) পর্যন্ত কলেজের কার্য পরিচালনা করেন। কলেজের সম্পাদক ও সহ-সম্পাদকের পদ দুইটি পরে লোপ করিয়া অধ্যক্ষের পদ সৃষ্টি হইলে তিনি সেই পদে প্রথম অধ্যক্ষরূপে নির্বাচিত হন (২২শে জানুয়ারী ১৮৫১) এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর পর্যন্ত এই পদে বৃত ছিলেন।
২১	১৬-১৭	Education Despatch—১৯৫ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।
২১	২৫-২৬	প্রকৃতপক্ষে 'সর্বশুভকরী' পত্রিকার (ঠনঠনিয়া সর্বশুভকরী সভার মুখপত্র) সম্পাদক ছিলেন মতিলাল চট্টোপাধ্যায়। এই পত্রিকায় মদনমোহন তর্কালঙ্কার লিখিতেন; ইহার দ্বিতীয় সংখ্যায় (আশ্বিন ১৭৭২ শকাব্দ) তাঁহার বিখ্যাত প্রবন্ধ 'স্ত্রী শিক্ষা' প্রকাশিত হয়।
২২	৪	'বাঙ্গলার ইতিহাস' ১ম ভাগ রচনা করেন রামগতি ন্যায়রত্ন ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে, ২য় ভাগ রচনা করেন বিদ্যাসাগর ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং ৩য় ভাগ রচনা করেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে।
২৪	২৩	অবোধবন্ধু—কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধু একত্রে মিলিয়া এই মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত করেন। ১৮৭১ সাল পর্যন্ত ইহা প্রকাশিত হয়।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	
২৬	৪	লালমোহন বিদ্যানিধির অলঙ্কার বিষয়ক পুস্তকটির নাম 'কাব্যনির্ণয়'—'অলঙ্কার নির্ণয়' নহে।
২৬	১০	স্যার রাসবিহারী ঘোষ (১৮৪৫-১৯২১) প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী এবং বঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ সন্তান। আইন জ্ঞান সম্বন্ধে ইনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। স্যার তারকনাথ পালিতের ন্যায় ইনিও স্বোপার্জিত সমস্ত অর্থ দেশের বিজ্ঞান শিক্ষাকল্পে দান করিয়া যান। এই দুইজনের দানে কলিকাতার সায়ান্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।
২৬	২৫	স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯১৮)—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় ভাইস-চ্যান্সেলার, হাইকোর্টের বিচারপতি, শিক্ষাব্রতী এবং আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের ছাত্র ছিলেন।
২৭	১৩	আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ১৮৬২ হইতে ১৮৭৩ সাল পর্য্যন্ত প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করেন।
২৮	৬-৭	ডঃ স্যামুয়েল জনসন: ইংরেজী অভিধান সংকলন করেন। জেমস বসওয়েল তাঁর কথোপকথন লিপিবদ্ধ করিয়া অমর হইয়াছেন।
৩১	১৪-১৬	এ প্রসঙ্গে বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতায় রাজনারায়ণ বসুর উক্তি প্রণিধানযোগ্য:—অনেকে অবগত নহেন যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অক্ষয়কুমার দত্ত কত উপকৃত আছেন। তাঁহারা তাঁহার লেখা প্রথম প্রথম বিস্তর সংশোধন করিয়া দিতেন।
৪০	১৬	'চিত্রক্ষেত্রে'র স্থানে চিত্তক্ষেত্র হইবে।
৪২	৫	রমাপ্রসাদ রায়—রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র।
৪৯	১৮-১৯	এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে মধুসূদনের প্রথম রচনা 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক (ও উহার ইংরেজী অনুবাদ) পাইকপাড়ার রাজারা মুদ্রিত করাইয়া দেন (জানুয়ারী ১৮৫৯)।
৫০	৮	কাশীর সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।
৫০	১১	কালীপ্রসন্ন সিংহ এবং কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য উভয়েই ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।
৫০	২০	শব্দকল্পদ্রুম—শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের পৌত্র রাজা রাধাকান্ত দেব তাঁহার সমগ্র জীবনব্যাপী যে সকল মহান কার্য সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, 'শব্দকল্পদ্রুম' নামে বাংলা ভাষার এই বিরাট অভিধানটির রচনা ও সংকলন তাঁহার মহান জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

৫২ ২৭ বর্তমান ১৫ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীটস্থ 'অ্যালবার্ট হলে'র দক্ষিণাংশে ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের পিতামহ রামকমল সেনের বসত বাটিটি অবস্থিত ছিল।

৫৩ ৭ ৯ কেশবচন্দ্র সেন ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ থিয়েটারে 'Jesus Christ : Europe and Asia' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন ; ইহার ফলে এই ধারণার সৃষ্টি।

৫৩ ১০ সোমপ্রকাশ—দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত এই সাময়িক পত্রিকাটি তৎকালীন বাঙ্গলা সাহিত্যের সর্বোচ্চশ্রেণীর পত্রিকা ছিল।

৬০ ১ পাদটীকা—'সদর্থ…প্রভাকর' স্থলে 'সদর্থ…প্রভাকরঃ' হইবে।

৬২ ১১-১২ অক্ষয়কুমার দত্ত আমিষ খাদ্য অপেক্ষা নিরামিষ খাদ্য অধিকতর উপকারী বলিয়া স্থির করেন এবং নিজেও আমিষ গ্রহণ বন্ধ করেন। কিন্তু ইহাতে তিনি শিরোঘূর্ণন রোগে আক্রান্ত হন এবং চিকিৎসকের পরামর্শে নৌকায় করিয়া বহুদিন গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করিতে এবং শামুক-গুগ্‌লির ঝোল খাইতে বাধ্য হন। এই ঘটনাটিকে উপলক্ষ্য করিয়া কবি ঈশ্বর গুপ্ত লেখেন—

মাথামুণ্ড ঘুরে গেল মাথামুণ্ড লিখে।
ফিরে নদে শান্তিপুর, ফিরিয়া হুগলি।
শেষ করিয়াছ যত দেশের গুগ্‌লি ॥

৬৬ ৮-৯ নিষ্ক—এই প্রসঙ্গের আলোচনা ১৩৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৬৯ ১৪-১৫ রিচার্ডসনের মুখে সেক্সপীয়রের আবৃত্তি শুনিয়া মেকলে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন : 'I can forget everything of India but your reading of Shakespeare.'

৬৯ ২১ রাজেন্দ্রলাল দত্ত—প্রকৃত নাম রাজেন্দ্রনাথ দত্ত।

৭০ ৪-৫ সেক্সপীয়রের ২০ নং সনেটটি—

A woman's face, with Nature's own hand painted,
Hast thou, the Master-Mistress of My passion ; ইত্যাদি

সম্পর্কে অধ্যক্ষ ডি. এল. রিচার্ডসন তাঁর Literary Leaves গ্রন্থে এরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন—'One of the most painful and perplexing (poems) I ever read…I could heartily wish that Shakespeare had never written it.'

৭৬ ৮-৯ ৩০৪ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	
৮৮	১৭	ধীবাজ—বর্ধমান রাজসভার গায়ক ছিলেন। 'ধীরাজ' আসলে মহারাজ প্রদত্ত উপাধি, এই নামেই তিনি সুপরিচিত ছিলেন। আসল নাম এখন ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয়। তিনি কলিকাতাব অভিজাত মহলেও গান শুনাইতেন।
৯০	১৪	'ক্ষন্দ্র সেন' স্থলে 'ক্ষেত্র সেন' হইবে।
৯০	১৭	'একটিকে লক্ষ্য করিয়া' স্থলে 'এইটিকে লক্ষ্য করিয়া' হইবে।
৯২	১৭	প্যাবীমোহন কবিবত্ন (১৮৩৪-৭৫): ইনিও ধীরাজের ন্যায় হাস্যাত্মক কবিতা ও গান রচনায় পটু ছিলেন এবং ধীবাজের ন্যায় ইঁহারও 'কবিরত্ন' উপাধি বর্ধমানেব মহারাজা মহতাপচন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত। ইহাব আধ্যাত্মিক গানের মধ্যেও প্রচুব হাস্যরস ছিল—

ওবে মন, তোমারে আজ বাদে কাল ভবে পটল তুলতে হবে।
এখনও উপায় আছে—ভেবে নে ভবানী ভবে ॥
কোথা থাকবে বাড়ি-ঘডি, পডে গডাগডি যাবে।
গালপাট্টা কটা গোঁফে কে আতব মাখাবে ॥
পোমেটম হেয়াবে দিয়ে চেয়ারে কে বসে রবে।
বিধুমুখে নিধুব টপ্পা গান করে কে প্রাণ জুড়াবে ॥ ইত্যাদি

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	
৯৩	২৯-৩০	Auld Lang Syne—ইহা স্কটল্যাণ্ডেব একটি পবিচিত লোক-সঙ্গীত। ইহাব অর্থ: 'in days gone by' অর্থাৎ ফেলে আসা দিনগুলি বা হারানো দিনগুলি। বর্তমানে ইহা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের সর্বত্র বিদায় অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত হিসাবে গীত হয়। যে গানটি অধিক প্রচলিত তাহা ববার্ট বার্নস্ (১৭৫৯-১৭৯৬) এব রচিত। গানটিব প্রথম স্তবক নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

Should auld[1] acquaintance be forgot,
And never brought to mind ?
Should auld acquaintance be forgot,
And auld lang[2] syne[3] !

(কোরাস) For auld lang syne, my dear,
For auld lang syne,
We'll tak a cup O' kindness yet
For auld lang syne.

[[1] old ; [2] lang , [3] since]

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	
৯৪	১০	ঢেক ফাজিল—'ওজনে পাল্লার ঝোঁকতা দিকের পরিমাণ কম করিয়া দুই দিক সমান করা।'
৯৫	৪ ৬	তদানীন্তন কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্‌-চেয়ারম্যান নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের পিতা পণ্ডিত দেবনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিহারীলাল চক্রবর্তীর গৃহ-শিক্ষক ছিলেন।
৯৯	১৪ ১৫	সাধের আসন—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী কাদম্বরী দেবী বিহারীলালের সারদামঙ্গল পাঠ করিয়া শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসাবে একখানি আসন নিজ হাতে বুনিয়া কবিকে দান করেন। ঐ আসনে সারদামঙ্গল হইতে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত ছিল— 'হে যোগেন্দ্র যোগাসনে ঢুলুঢুলু দু নয়নে বিভোর বিহ্বল মনে কাহারে ধেয়াও ?' এবং আসনটি প্রদানকালে আসনদাত্রী ইহার উত্তর কবির নিকট হইতে চান। কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর পর (১৯শে এপ্রিল, ১৮৮৪), তাঁহার স্মরণে বিহারীলাল এই 'সাধের আসন' রচনা করে ১২৯৫-৯৬ বঙ্গাব্দে।
১০১	১১	উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Banerjee), প্রথম কংগ্রেস সভাপতি;
১০১	১৪	কৃষ্ণনাথ মুখোপাধ্যায়—ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (১৮৬৫-১৯৪৮) পিতা।
১০২	১	অমরকোষ—মহারাজা বিক্রমাদিত্যের 'নবরত্ন সভা'র সভ্য অমর সিংহ অমরকোষ নামে এই অভিধানটির রচয়িতা। এই অভিধানটি তিন কণ্ডে ও অষ্টাদশবর্গে বিভক্ত। মল্লিনাথ, ভরত মল্লিক প্রভৃতি বিখ্যাত টীকাকাররা এর টীকা রচনা করিয়াছেন।
১০২	২৭	'হার্বার্ট, স্পেন্সার ও মিলের' স্থলে 'হার্বার্ট স্পেন্সার ও মিলের' হইবে।
১০৫	৩	বিদ্যাসাগরের 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।
১০৬	৩	মদনমোহন তর্কালঙ্কার ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদের জজ পণ্ডিত হইয়া সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করেন।
১০৬	২৩	Falstaff—'সেক্সপীয়রের Merry Wives of Windsor নাটকের একটি হাস্যোদ্দীপক চরিত্র।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

১০৮ ২. ৫ স্তার তারকনাথ পালিত দুই দফায় (জুন ১৯১২ ও অক্টোবর ১৯১২) অর্থ ও :সম্পত্তি মিলিয়ে পনেরো লক্ষ টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। প্রধানত তাঁহার ও স্তার রাসবিহারী ঘোষের দানে 'University College of Science and Technology' প্রতিষ্ঠিত হয় (২৭শে মার্চ, ১৯১৪)।

১০৮ ২৫ টীকাকার মল্লিনাথ—একজন প্রসিদ্ধ টীকাকাব। ইহাব প্রকৃত নাম কোলাচল মল্লিনাথ। ডাক নাম পেড্ড ভট্ট। খুব সম্ভব ইনি দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন। ব্যাকরণ, কাব্য, অলংকার হইতে আরম্ভ করিয়া স্মৃতি, দর্শন, বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি সর্বশাস্ত্রেরই ইনি টীকা লিখিয়াছেন এবং ইহাতেই ইহার বিশেষ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। টীকার ব্যাপাবে 'মল্লিনাথ' নামটি উপমা হইয়া রহিয়াছে।

১১৪ ৯-১২ তিনজন পণ্ডিতের অন্যতম ছিলেন নাথুরাম শাস্ত্রী। অপর দুজন পণ্ডিতের নাম প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ও পাণিনী শ্রেণীর অধ্যাপক গোবিন্দরাম উপাধ্যায়।

১১৪ ৪ পণ্ডিত 'যোগাধ্যান মিশ্র সংস্কৃত কলেজের জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন (১৮২৬-৪৯)।

১১৬ ৪ 'পল-বর্জিনিয়া' অনুবাদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

'অবোধবন্ধু কাগজে বিলাতি পৌলবর্জিনী গল্পের সরস বাংলা অনুবাদ পড়িয়া কত চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই। আহা, সে কোন্ সাগরেব তীর। সে কোন্ সমুদ্র সমীরকম্পিত নারিকেলের বন! ছাগল চরা সে কোন্ পাহাড়ের উপত্যকা! কলিকাতা শহরের দক্ষিণের বারান্দার দুপুরের রৌদ্রে সে কী মধুর মরীচিকা বিস্তীর্ণ হইত। আর সেই মাথায় রঙীন রুমাল পরা বর্জিনীর সঙ্গে সেই নির্জন দ্বীপের শ্যামল বনপথে একটি বাঙালী বালকের কি প্রেমই জন্মিয়াছিল।'

১১২ ১৯ 'আদ্র' স্থলে আর্দ্র হইবে।

১২৬ ২১ 'বাজীকরেন' স্থলে 'বাজীকরের' হইবে।

১৩১ ৩০ একবার হিন্দুকলেজের কতিপয় ছাত্র মিশনারীদের দ্বারা প্রদত্ত বাইবেল গ্রহণ করে। ডেভিড হেয়ার তাহা জানিতে পারিয়া সেই সব

পৃষ্ঠা পঙক্তি

বাইবেলগুলি হস্তগত করিয়া প্রত্যেককে বারো ঘা করিয়া বেত্রাঘাত দিয়া ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া ছাড়িয়া দেন।

১৩৩ ২৪ বরাহমিহির—মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন ছিলেন পণ্ডিত বরাহমিহির। ইনি জ্যোতিষী ছিলেন।

১৩৪ ৩ বিষুব সংক্রমণ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের মত এই—

"যদা মেষতুলয়োর্বর্ত্ততে তদা অহোরাত্রাণি সমানানি ভবন্তি।
যদা বৃষভদ্দিষু পঞ্চসু চ রাশিষু চরতি তদাহান্যের বর্দ্ধন্তে।
হ্রসতি চ মাসি মাস্যেকৈকা ঘটিকা রাত্রিষু॥ ৪॥
যদা বৃশ্চিকাদিষু পঞ্চসু রাশিষু বর্ত্ততে তদাহোরাত্রাণি বিপর্য্যয়াণি
ভবন্তি॥ ৫॥

শ্রীমদ্‌ভাগবত—স্কন্ধ ৫। অধ্যায় ২১।

অর্থাৎ—

সূর্য মেষ ও তুলা রাশিতে উপস্থিত হইলে দিবারাত্রি-মান সমান হইয়া থাকে। বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ ও কন্যা রাশিতে অবস্থান পর্যন্ত দিবামান বড এবং বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন রাশিতে থাকা পর্যন্ত রাত্রিমান বড় থাকে।"

অমরকোষ বলিতেছেন—

"সমরাত্রিন্দিবে কালে বিষবন্‌ বিষুবঞ্চ তৎ।"

'যখন দিবারাত্রি সমান, তখনই বিষুব সংক্রামণ হইয়া থাকে।'

উপরি উল্লিখিত প্রমাণসমূহ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্বে বিষুব সংক্রমণের গণনা যেরূপ হইত, এখন আর সেরূপ হয় না। এখন ৩১শে চৈত্র মহাবিষুব সংক্রমণ পঞ্জিকায় লিখিত হইলেও দিবারাত্রি সমান হয় ৮ই চৈত্র। এবং ঐ দিনটিকেই মহাবিষুব সংক্রান্তি বলা উচিত। মহাবিষুব সংক্রান্তিতে দিবা ও রাত্রি সমান হয় এবং সেই দিন হইতে দিবামান বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অর্থাৎ গ্রীষ্মকাল আরম্ভ হয়।

১৩৪ ১৪ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের তত্ত্বাবধানায় পুনরায় পঞ্জিকা সংশোধন হইয়াছিল। সেই সংশোধনীয় নীতিতেই বর্তমানে পঞ্জিকা লিখিত ও গৃহীত হয়।

১৩৪ ২২ মন্ত্রযুগ ও ব্রাহ্মণযুগ—বৈদিকযুগই মন্ত্রযুগ নামে পরিচিত। কারণ ঐ সময়ে ঋষিরা যজ্ঞ-ক্রিয়াদির অনুষ্ঠানে মন্ত্রের ব্যবহার করিতেন। ইহার পরবর্তী যুগ ব্রাহ্মণ যুগ নামে পরিচিত।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

১৩৪ ২৬ ঋগেদ সংহিতাঃ মণ্ডল ও সুক্ত—"চতুর্বেদের মধ্যে প্রাচীনতম বেদ। মতান্তরে সামবেদের পরবর্তী প্রাচীনতম বেদ। ইহা জগতের প্রাচীনতম সাহিত্য। ঋগ্বেদ সংহিতা প্রথমত শাকল ঋষি কর্তৃক অধীত হইয়াছিল। এইরূপে বাস্কল, অশ্বলায়ন, শঙ্খায়ন ও মণ্ডুক এই ঋষি চতুষ্টয় ঋগ্বেদ পরে পরে অভ্যাস করিলে ইঁহাদেব নাম অনুসারে পাঁচ শাখাব উদ্ভব হয়। অর্থাৎ ঋগ্বেদ যতবার নূতন নূতন ঋষি কর্তৃক অভ্যস্ত হইয়াছে, ততবারই ইহার নূতন শাখার উদ্ভূত হইয়াছে। এবং প্রতিবাবেই মূলের কিছু কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। যাহাকে আমরা 'নূতন সংস্করণ' বলিয়া থাকি, তাহাই বৈদিক সময়ে শাখা বলিয়া আখ্যাত হইত।" এই পাঁচ শাখা ব্যতীত ঐতরেয়ী, কৌষিতকী, শৈশিরী, পৈঙ্গী ইত্যাদি বহুবিধ উপশাখা আছে। ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ নামক দুই প্রধান বিভাগ আছে—ঐতরেয় এবং কৌষিতকী বা শাঙ্খ্যায়ন।

১৩৪ শেষ 'শক্ত্রি' হইবে। বশিষ্ঠ মুনির পুত্রেব নাম শক্ত্রি।

১৪৭ ৫-১০ নিম্নলিখিত রূপ হইবে—

স। কি লো কুঞ্জ—দেখা হোলো?
কু। না, সত্যই মা, না।
স। ও বাড়ী নেই,—গেছে কোথা?
কু। ইচ্ছে যেথা।
স। তোমাব মাথা!—ভেঙ্গে বল। তোর আজ্‌জে নতুন কেতা!
কু। সবই নতুন—একলাই কেনে থাকবো ছেঁড়া ন্যাতা?

(পববর্তী উক্তি-প্রত্যুক্তি ঠিক আছে)

১৫৮ ১ ব্রজবাবুব এই স্কুল প্রতিষ্ঠাব বিস্তারিত ইতিহাস 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার ১৩২১ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যাব ১১২৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

১৫৯ ১৬ Dr Adams—ইঁহাব পুবা নাম Willam Adam (Adams) নহে।

১৬৩ ২ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ইহা 'বিদ্যালয়' নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইহা 'হিন্দু কলেজ' বলিয়া উল্লিখিত হইতে থাকে। মাত্র কুড়ি জন ছাত্র লইয়া শুরু হইয়াছিল এই বিদ্যায়তন। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন বর্ধমানের মহারাজা, পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বাড়ী এবং বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ ডঃ হোরেস উইলসন প্রভৃতি কয়েকজন হৃদয়বান ইংরেজ। সর্বোপরি ছিলেন রাজা রামমোহন রায়।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী প্রথম শুরু হইয়াছিল এবং 'হিন্দু কলেজ'রূপে দ্বারোদ্ঘাটন হয় ১লা মে ১৮২৬। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন হইতে ১০১ জন ছাত্র লইয়া ইহা 'প্রেসিডেন্সী কলেজ' নামে কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের মধ্যমণিরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

১৬৪ ৭-৮ প্রথমে এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য তৎকালীন শাসক-সম্প্রদায় মোটেই উৎসাহিত ছিলেন না। যদিও ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ময়রা বলিয়াছিলেন, 'It is human, it is generous to protect the feeble ; it is meritorious to redress the injured ; but it is a God-like bounty to bestow expansion of intellect to infuse the Promethean spark into the statue and awaken it into a man.'—কিন্তু তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে এদেশে ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সচেষ্ট হন নাই। প্রধানত এই শিক্ষা ব্যবস্থা বেসরকারী উদ্যোগে এদেশে প্রথম প্রবর্তিত হয়। কিন্তু উহা এদেশীয় (এবং শাসক-সম্প্রদায়ের) অনেকের মনঃপূত ছিল না। তাঁহারা দেশীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন। সরকারের শিক্ষা বিভাগেও এইরূপ দুই দল ছিল (Anglicist ও Orientalist)। অতঃপর লর্ড টমাস বেবিংটন মেকলে ভারত সরকারের আইন-সচিব হইয়া এদেশে আসেন (১৮৩৪) এবং এ্যাংলিসিস্ট্ দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্কের নিকট এদেশে শিক্ষার বাহন কি হইবে তৎসম্পর্কে এক মন্তব্য পেশ করেন। ইহাতে তিনি প্রাচ্য সাহিত্য ও শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি বিরূপ মন্তব্য করিয়া ('...a single shelf of good Europen Library is worth the whole native literature of India and Arabia') ইংরেজীকে শিক্ষার বাহন করিবার জন্য সুপারিশ করেন। তাঁহার মন্তব্যের যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া সপরিষদ লর্ড বেন্টিঙ্ক সরকারের নূতন নীতি ব্যক্ত করেন (৭ই মার্চ ১৮৩৫)। নূতন নীতি অনুযায়ী স্থির হয়,—'the great object of the British Government ought to be the promotion of European literature and science among the natives of India, and that all the funds apprcpriated for the purpose of education would be best employed on English education

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

alone. His Lordship in Council directs that all the funds...be henceforth employed in imparting to the native population a knowledge of English literature and science through the medium of the English language.'

এই নীতি চালু হইবার পর লর্ড মেকলে তাঁহার পিতার নিকট এক পত্রে লেখেন, 'It is my firm belief that, if our plans of education are followed up, there will not be a single idolator among the respectable classes in Bengal thirty years hence...I heartily rejoice at the prospect.' তিনি অন্যত্র প্রকাশ্যে বলিয়াছেন যে, এই ব্যবস্থার ফলে এদেশে 'a class of persons Indian in blood and colour but English in tastes, in opinion, in morals and in intellect'-এর উদ্ভব হইবে।

১৭৪ ২১ ১৩২১ সালের ভাদ্র সংখ্যা ভারতবর্ষে (পৃঃ ৪২৬) এই স্থানে রহিয়াছে, "আচার্য্য দত্ত মহাশয় চুপ করিলেন। আমি বলিলাম—'বীটসনের পদে আপনি উন্নীত হইলেন, এই পর্য্যন্ত কাল বলিয়াছেন; তারপরে?' "

১৭৫ ১-২ উড়িষ্যার 'ন-অঙ্ক' দুর্ভিক্ষ (১৮৬৬)। ইহাতে প্রায় তিরিশ লক্ষ প্রাণ হারায়।

১৮৪ ১৬ ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়—কৃষ্ণনগরের শিক্ষা বিস্তার ব্যাপারে এঁর দান অনেকখানি। ইহারই নামানুসারে 'ব্রজবাবুর স্কুল'টি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৪ ২৮ হোঁদল কুৎকুৎ—দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীন তপস্বিনী' নাটকের জলধর চরিত্র দ্রষ্টব্য।

১৮৫ ৫ হিন্দু প্যাট্রিয়ট—প্রকৃতপক্ষে চোরবাগানের শ্রীনাথ ঘোষ, ক্ষেত্র ঘোষ ও গিরিশ ঘোষ এই তিন ভাইয়ের সহায়তায় ও তত্ত্বাবধানায় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই ইংরেজী পত্রিকাটি প্রকাশিত করেন।

১৯৭ ১৭ 'বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'-এর লেখক রামগতি ন্যায়রত্ন হুগলীর ইলছোবা মন্দলই স্কুলের হেডপণ্ডিত ছিলেন।

১৯৯ ৯ রামনারায়ণ তর্করত্নের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রাণকৃষ্ণ 'বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন। ইহার রচিত পুস্তকের নাম—কুলরহস্য, শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাশতকং, ধর্মসভা বিলাস ও শ্রীশিবশতক স্তোত্ররত্ন।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

২০১ ২৯ ভারত সরকার অভিযোগ করিল যে, বরোদার গায়কোয়াড় মলহার (বা মাধব) রাওয়ের প্ররোচনায় বরোদার তৎকালীন রেসিডেণ্ট কর্নেল ফেয়ার (Col. Phayre)-কে বিষ খাওয়াইবার চেষ্টা করা হইয়াছে (৯ই নভেম্বর, ১৮৭৪)। এই ব্যাপারে অনুসন্ধান করিবার জন্য ভারত সরকার এক কমিশন নিয়োগ করে। বিচারের জন্য মলহার রাওকে কলিকাতায় প্রেরণ করা হয়। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় মলহার রাও গদীচ্যুত হইলেন (২৩শে এপ্রিল ১৮৭৫) এবং মাদ্রাজে নির্বাসিত হইলেন। সেখানে অসহায় অবস্থায় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।

২০২ ২৪ ভাস্কর ও রসরাজ—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য ওরফে গুড়গুড়ে ভট্টাচার্যের প্রকাশিত 'সংবাদ-ভাস্কর' ও 'সংবাদ-রসরাজ' এই দুই সংবাদপত্রের সহিত ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'পাষাণ্ড পীড়ন' সংবাদপত্রের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনা ও চিত্র প্রকাশ দ্বারা সাহিত্যিক লড়াই চলিত।

২০৫ ৩০-৩১

সুরেন দ্বিজেন সেই, আধ-ভাষী শিশু নেই,
পরীক্ষা-সমরে আজি জয়ী বিদ্যাবীর।
দুজনের অঙ্ক আলা, করে দুটি চারুবালা,
পেয়েছে পিতার বিদ্যা দ্বিজেন সুধীর ॥
সুরেন পণ্ডিত প্রায়, পণ্ডিতের দুহিতায়
ভার্যাভাবে লভিয়াছে আপনার ভাগে।
দ্বিজেন সার্জন সাব্, বিদ্যাসনে বৈদ্যভাব
বরিয়াছে বরাননী তাবে অনুরাগে ॥

—অমৃতলাল বসু (লোকনাথ মৈত্র)

২০৭ ২-৩ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী আন্দামানে এক ওয়াহাবী কর্তৃক লর্ড মেয়ো ছুরিকাহত হইয়া নিহত হন।

২০৯ ১৬ 'কেশববাবু বক্তৃতা করিলেন' একত্রে হইবে।

২১৫ ২৯ Wards' Institution :—এই প্রতিষ্ঠানটি ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে কোর্ট অভ্ ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে ৮ হইতে ১৪ বৎসর বয়সের অপ্রাপ্তবয়স্ক জমিদারদের উন্নত ধরণের শিক্ষা দিবার জন্য ব্যবস্থা ছিল। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার ডিরেক্টর ছিলেন—প্রতিষ্ঠাতা নন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে এই শিক্ষায়তনটি বন্ধ হইয়া যায়। বর্তমানে 'Wards' Institution Street' কলিকাতার বুকে ইহার স্মৃতি বহন করিতেছে।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	
২২৬	৮	'করিতে পারে। শিশিরবাবু'...হইবে।
২৩৩	৭	মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত মাসিক পত্রিকার নাম 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'।
২৬০	১২	তরজা গানের প্রথম প্রবর্তকের নাম হোসেন খাঁ। এই গানে প্রায়ই পৌরাণিক আখ্যায়িকা হইতে হেঁয়ালির মত প্রশ্ন করা হইত। এবং প্রতিপক্ষকে তাহার চটপট্ উত্তর দিতে হইত। উত্তর দিতে না পারিলে তাহার পরাজয় হইত।
২৬০	৩০	রূপচাঁদ পক্ষী—আসল নাম রূপচাঁদ দাস মহাপাত্র (জন্ম ১৮১৫)। ইহার দলের নাম ছিল 'পংক্ষীর দল'। আখড়ায় তাঁহার দলের সভ্যরা পাখিদের মত দাঁড়ে বা খাঁচায় অবস্থান করিত। রূপচাঁদ (ইংরেজীতে ইনি R.C.D. Bird নামে পরিচিত ছিলেন) কলিকাতার লোকেদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত খাঁচার অনুরূপ এক গাড়ি তৈরী করাইয়া সারা শহরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার রচিত গান সে সময়ে খুব পরিচিত ছিল। ইংরেজী বাংলায় রচিত রাধার বিরহ-বিলাপ উদ্ধৃতিযোগ্য—

আমাবে ফ্রড করি কালিয়া ড্যাম তুই কোথা গেলি।
আই এ্যাম ফর ইউ ভেরি সরি গোল্ডেন বডি হোল কালি।
হো মাই ডিয়ার ডিয়ারেস্ট,
মধুপুর তুই গেল্পি কেষ্ট
ও মাই ডিয়ার, হাউ টু-রেস্ট
হিয়ার ডিয়ার বনমালী।
শুনরে শ্যাম তোরে বলি।
পুয়োর ক্রিচার মিল্ক গের্ল,
তাদের ব্রেস্টে মারলি শেল,
ননসেন্স তোর নাইকো আক্কেল,
ব্রিচ অফ্ কনট্রাক্ট করলি,
ফিমেল গণে ফেল করলি।
লম্পট শঠের ফরজুন খুললো,
মথুরাতে কিং হলো,
আক্কেলের প্রাণ নাশিল,
কুজার কুঁজ পেলে ডালি,
নিলে দাসীরে মহিষী বলি।

পৃষ্ঠা পঙ্‌ক্তি

শ্রীনন্দের বয় ইয়ং ল্যাড
ক্রুকেড মাইণ্ড হার্ড,
কহে আর সি ডি বার্ড,
এ পেলাকার্ড কৃষ্ণকেলী।
হাফ ইংলিশ হাফ বেঙ্গালী॥

রূপচাঁদ কেবলমাত্র হাসির গানই রচনা করেননি, ধর্ম-বিষয়ক গান রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন—

ভাঙলো না তোর মায়ার ঘুম।
বিষয় মদে চক্ষু মুদে শুয়ে আছ বেমালুম॥
ঐশ্বর্যের মাৎসর্যে তুমি মনে করো বাদশা-রুম।
এ প্রপঞ্চ একসাজ সেজেছে, ঠিক যেন ভাই হাথুমথুম॥

ইত্যাদি—

২৬১ ২৮-২৯ সংস্কৃত কলেজের সম্মুখস্থ ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীটস্থ ভবনটি শ্যামাচরণ (দে) বিশ্বাসের বাড়ি।

২৭০ ৪ 'বকগাছের স্থলে 'বটগাছের' উপরে হইবে।

২৯৬ ২১-২৪ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে Captive Lady প্রকাশিত হইলে (এপ্রিল, ১৮২৯) মধুসূদন তাহার এক খণ্ড বাল্যবন্ধু গৌরদাস বসাকের মাধ্যমে বেথুনকে উপহার দেন। বেথুন ধন্যবাদ জানাইয়া গৌরদাসকে এক পত্র লিখিয়া (২০শে জুলাই, ১৮৩৯), মন্তব্য করেন, '......It seems an ungracious return for his (মধুসূদন দত্তের) offering that I should take this opportunity through you, of endeavouring to impress on him the same advice which I have already given to several of his countrymen, which is that he might employ his time to better advantage than in writing English poetry......he could render far greater service to his country and have a better chance of achieving a lasting reputation for himself, if he will employ the taste and talents, which he has cultivated by the study of English, in improving the standard and adding to the stock of the poems of his own language, if poetry at all events he must write.'

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	
২৯৭	১১	১২৮৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে 'ভারতী' প্রকাশিত হয়।
২৯৮	২৩	১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অগস্ট হইতে "The National Paper" প্রকাশ হইতে শুরু করে।
৩১৯	১২-১৩	১২নং সুকিয়া ষ্ট্রিটে (বর্তমান মহেন্দ্র শ্রীমানী ষ্ট্রিট) প্রথম বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।
৩০৯	১৯	মাথাঘষা গলি—'গনেশ টকীজ' সিনেমা গৃহের পার্শ্ববর্তী তারাসুন্দরী পার্কের সন্নিহিত রাস্তাটিই মাথাঘষা গলি নামে বিখ্যাত ছিল।
৩১০	১	মালীর বাগান—বিডন ষ্ট্রিটস্থ অনাথ বাবুর বাজার ও বিডন ষ্ট্রিট পোষ্ট অফিসের উত্তরে (অর্থাৎ দর্জিপাড়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে) অবস্থিত ছিল। বর্তমানে এই অঞ্চলে বীণাপানি পর্দা গার্লস স্কুল অবস্থিত।

[৩৮৭-৮৮ পৃষ্ঠার পুস্তকাবলী ছাড়া নিম্নলিখিত গ্রন্থেরও সাহায্য লওয়া হইয়াছে :

১। খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরস—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২। জীবন-স্মৃতি—রজনীকান্ত মৈত্র, ৩। বাংলার নব-জাগরণের স্বাক্ষর—মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ৪। বিশ্বকোষ, ৫। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু; ৬। রজনীকান্ত গুহ এবং ৭। Oxford Illustrated Dictionary।—সং]

পুস্তকে উল্লিখিত কতিপয় ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবনী

১। **অকল্যাণ্ড, লর্ড (George Eden, Earl of Auckland—১৭৮৪-১৮৪৯)**: ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে অগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের শাসনকর্তা রূপে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল এদেশে আসেন। তাঁহার শাসনকালীন ১ম আফগান যুদ্ধ (১৮৩৯-৪২) উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ এদেশ ত্যাগ করেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি দেহত্যাগ করেন।

২। **অক্ষয়কুমার চৌধুরী** (১৮৫০-১৮৯৮): মিহিরচন্দ্র চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে আন্দুলে জন্মগ্রহণ করেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। "ভারতী" পত্রিকার সুরু হইতে সম্পাদকীয় মণ্ডলীর অন্যতম সভ্য হন। স্ত্রী, সাহিত্যিকা শরৎকুমারী চৌধুরাণীও "ভারতী"র সহিত জড়িত ছিলেন। 'উদাসিনী' (১৮৭৪), 'সাগর সঙ্গমে' (১৮৮১) ও 'ভারত-গাথা' (১৮৯৫) নামে তিনখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। ইহার রচিত কয়েকটি গান রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মিকী প্রতিভা'য় স্থান পাইয়াছে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর মৃত্যু হয়।

৩। **অক্ষয়কুমার দত্ত** (১৮২০-১৮৮৬): পীতাম্বর দত্তের পুত্র অক্ষয়কুমার ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই নবদ্বীপের নিকটবর্তী বর্ধমানের চুপী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারিতে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর পিতার মৃত্যুর জন্য স্কুল ত্যাগ করিতে হয়। এই সময় ঈশ্বর গুপ্তের সংস্পর্শে আসেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' (১৮৪০) প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে বিদ্যাসাগরের সুপারিশে নর্ম্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' কৃতিত্বের সহিত সম্পাদনা করেন। রচনাবলীর মধ্যে স্কুলপাঠ্য 'ভূগোল' (১৮৪১), 'চারুপাঠ' ১ম-৩য় ভাগ (১৮৫৩, ১৮৫৪, ১৮৫৯), ছাড়াও 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' ১ম ও ২য় ভাগ, 'ধর্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব', 'পদার্থ বিদ্যা' (১৮৪৬), 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়', ১ম ও ২য় ভাগ (১৮৭০ ও ১৮৮৩) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'বাহ্যবস্তু'র ১ম ভাগে আমিষ ভোজনের বিরুদ্ধে এবং ২য় ভাগে মদ্যপানের বিরুদ্ধে লেখেন। ১৮৮৬ সালের ২৮শে মে মৃত্যু হয়। ইহার পৌত্র স্বনামধন্য কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

৪। **অক্ষয়চন্দ্র সরকার** (১৮৪৬-১৯১৭): সাহিত্যিক গঙ্গাচরণের পুত্র—১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর চুঁচুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৮ খ্রীঃ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহরমপুরে ওকালতি সুরু করেন। "সাধারণী" পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন। তিন বৎসর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। 'প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ' (১৮৭৪-৭৭), 'গোচারণের মাঠ' (১৮৮০), 'আলোচনা' (১৮৮২), 'কবি হেমচন্দ্র' (১৯১১), 'রূপক ও রহস্য' (১৯২৩) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯১৭ সালের ২রা অক্টোবর মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৫। **অজিতনাথ ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায়** (১৮৩৯-১৯২০): নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। স্বভাব কবি—দ্রুত কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। রচনাবলীর মধ্যে কাশীখণ্ডের বাংলা অনুবাদ, চৈতন্য শতক, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতির অন্তর্ব্যাকরণ নাট্য-পরিশিষ্টের টীকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৬। **অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়** (১৮২৯-১৮৭১): দেওয়ান বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র। হিন্দু কলেজে পাঠ সমাপ্ত করিয়া হাওড়া ফৌজদারী আদালতে নাজীর হন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে সিনিয়র গভর্মেণ্ট প্লীডার হন। দ্বারকানাথ মিত্র পরলোক গমন করিলে পর তাঁহার স্থানে হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব সদস্য ছিলেন। মাত্র বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন।

৭। **অমৃতলাল বসু** (১৮৫৩-১৯২৯): কলিকাতায় ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। পিতা, কৈলাসচন্দ্র বসু, গৌরমোহন আঢ্য প্রতিষ্ঠিত ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির প্রধান শিক্ষক ছিলেন। পিতৃ প্রতিষ্ঠিত কম্বুলিয়াটোলা স্কুলে (বর্তমান 'শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুল') শিক্ষা শুরু হয় ; ১৮৬৯ সালে জেনাবেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। পরীক্ষা দিবাব পূর্বেই পনের বছব বয়সে বিবাহ হয়। বাল্যকাল হইতে ডাক্তারীর দিকে প্রবণতা ছিল বলিয়া মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন কিন্তু মাত্র দুই বছর অধ্যয়ন করিয়া কলেজ ছাড়িয়া দেন। ইহার পূর্ব হইতে হোমিওপ্যাথির দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন এবং এ কারণ কাশীতে পিতৃবন্ধু প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ লোকনাথ মৈত্রের কাছে বহুদিন ছিলেন। ১৮৭২ খ্রীঃ কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। ঘটনাচক্রে ন্যাশনাল থিয়েটরের প্রথম অভিনয়-রজনীতে (৭. ১২. ১৮৭২) 'নীলদর্পণ' নাটকে সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকায় অবতরণ করেন। নট-জীবনে বহু রঙ্গালয়ে অংশ গ্রহণ করেন। বাল্যকালের প্যারডি রচনা বাদ দিলে, 'মডেল স্কুল' নাটক তাঁহার প্রথম রচনা—ইহা ন্যাশনাল থিয়েটরে অভিনীত হয়। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে 'হীরকচূর্ণ নাটক' (১৮৭৫), 'চ্যাটুজ্যে ও বাড়ুয্যে' (১৮৮৪), 'বিবাহ বিভ্রাট' (১৮৮৪), 'অমৃত-মদিরা' (১৯০৩), 'খাস-দখল' (১৯১২), 'যাজ্ঞসেনী' (১৯২৮), প্রভৃতির নাম করা যায়। মিঃ স্নোবল (হীরকচূর্ণ), কৃষ্ণকান্ত (কৃষ্ণকান্তের উইল), নীলকমল (সরলা),

নিতাই (খাসদখল), রমেশ (প্রফুল্ল), বিহারী খুড়ো (তরুবালা) প্রভৃতি ভূমিকায় অভিনয় উল্লেখযোগ্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি (১৯২৩) ছিলেন। প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯২৫ খ্রীঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'জগত্তারিনী স্বর্ণপদক' পান। ১৯২৯ সালের ২রা জুলাই ইহলোক ত্যাগ করেন।

৮। **অম্বিকাচরণ ঘোষ** (১৮৩০ ?-১৮৫০): গদাধর ঘোষের দ্বিতীয় পুত্র যশোহর জেলার চৌগাছা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে পিতা-মাতা উভয়কে হারান। তের বৎসর বয়সে বিদ্যাশিক্ষার জন্য কৃষ্ণনগর কলেজে ভর্তি হন এবং অল্পকালের মধ্যে কৃতী ছাত্র বলিয়া স্বীকৃতি পান। মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৯। **অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি** (১৮৫০-১৯০৯): রঙ্গালয়ের 'মুস্তফি সাহেব' ১৮৫০ সালের জানুয়ারি মাসে বাগবাজারে জন্মগ্রহণ করেন। অমৃতলাল বসুর সতীর্থ ও পাথুরিয়াঘাটার রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পিসতুতো ভাই। সতের বৎসর বয়স হইতে অভিনয় সুরু করেন। বাংলাদেশের সাধারণ রঙ্গালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পথিকৃত এবং একাধারে নট ও নাট্যাচার্য। কৌতুক ভূমিকায় অতুলনীয় অভিনয় করিতেন। গুরুগম্ভীর ভূমিকায়ও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। রমেশ (প্রফুল্ল), আবুহোসেন (আবুহোসেন), রডা (প্রতাপাদিত্য), বিদ্যাদিগ্‌গজ (দুর্গেশনন্দিনী), উড সাহেব (নীলদর্পণ), বিদূষক (জনা) প্রভৃতি চরিত্র উল্লেখযোগ্য।

১০। **অ্যাডাম, উইলিয়ম**: স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাপ্টিস্ট মিশনের পাদ্রী হইয়া ভারতে আসেন। রামমোহন রায়ের সহিত পরিচিত হইবার (১৮২১) পর খ্রীষ্টীয় ত্রিশ্বরবাদ পরিত্যাগ করিয়া একেশ্বরবাদী হন। ইণ্ডিয়া গেজেটের সম্পাদক ছিলেন। দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং অনুসন্ধানের ফলাফল (এডুকেশন রিপোর্ট) তিনখণ্ডে (১৮৩৫-৩৮) সরকারের নিকট পেশ করেন।

১১। **অ্যাডিসন, জোসেফ** (**Addison, Joseph**—১৬৭২-১৭১৯): বিখ্যাত ইংরেজ কবি ও প্রবন্ধকার। প্রথমে (১৭১১-১২) সার রিচার্ড স্টিলের সহযোগিতায় দৈনিক স্পেক্টেটার সম্পাদনা করেন। পরে (১৭১৪) একাই ইহার সম্পাদনা করিতেন।

১২। **আদিশূর**: গৌড়াধিপতি আদিশূর বাঙ্গালার সেন রাজন্যবর্গের আদিপুরুষ। তিনি 'বীরসেন' ও 'শূরসেন' নামেও খ্যাত ছিলেন। কান্যকুব্জাধিপতি সাহসাঙ্কের

সমকালে বা কিঞ্চিদুত্তর কালে তিনি বর্তমান ছিলেন বলেই অনুমিত হয়। সাহসাঙ্কের রাজ্যকাল খ্রীঃ ৯০০ (৮২২ শক), এবং আদিশূরও উক্ত সময়ের কিছুকাল পরে অর্থাৎ খ্রীঃ ৯৯৪ (৯১৬ শক) সম্ভবতঃ রাজত্ব করতেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মধ্যে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণী এবং কায়স্থগণের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ীর শ্রেণী বিভাগ তাঁর সমসাময়িক কালেই প্রবর্তিত হয়। আদিশূর দু'বার দুই বিরাট যজ্ঞ করেন। প্রথম যজ্ঞে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে তিনি যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তাঁরাই বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হিসাবে খ্যাত হয় এবং পরবর্তী দ্বিতীয় বার কান্যকুব্জ থেকে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে আনিয়ে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদন করেন, তারাই গৌড়ে রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হিসাবে পরিচিত লাভ করে। বিখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও গ্রন্থকার শ্রীহর্ষ আদিশূর কর্তৃক কান্যকুব্জ থেকে নীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম ছিলেন।

১৩। **আনন্দচন্দ্র শিরোমণি** (১৮০৯?-১৮৮৭): ভাটপাড়ার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কাশীনাথ বিদ্যাবাচস্পতির পুত্র। বাল্যে ব্যাকরণ, কাব্য ও নাট্যশাস্ত্র যত্নের সহিত শিক্ষা করেন। ন্যায়শাস্ত্রেও বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। তৎকালীন কবি ও পাঁচালীকারদের অন্যতম। সুবল সংবাদ, উদ্ধবসংবাদ, কলঙ্ক ভঞ্জন প্রভৃতি পুস্তক উল্লেখযোগ্য।

১৪। **আব্দুল লতিফ, নবাব বাহাদুর** (১৮২৮-১৮৯৩): ইঁহার কোন এক পূর্বপুরুষ ভাগ্যান্বেষণে তুরস্ক হইতে বাংলায় আসিয়া ফরিদপুরে বসতি স্থাপন করেন। পিতা কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে ব্যবহারজীবী ছিলেন। বাল্যে কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কলিকাতার পুলিস কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট রূপে যোগ্যতার সহিত কার্য করেন। পরে ভূপালের প্রধান মন্ত্রী হন। ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। এসিয়াটিক সোসাইটি, মুসলমান লিটারারি সোসাইটি প্রভৃতির সহিত যুক্ত ছিলেন।

১৫। **আশুতোষ দেব** (১৮০৫-১৮৫৬): বিত্তশালী ব্যবসায়ী রামদুলাল দেব সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দুদের পৌরাণিক ধর্মগ্রন্থ-গুলির দেবনাগরী হইতে বাংলায় লিপ্যন্তর করিবার ব্যবস্থা করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম সভ্য। সে যুগে সঙ্গীত ও রঙ্গ-মঞ্চের একজন উল্লেখযোগ্য পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বহু টপ্পা গান রচনা করেন। বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম জুরী নির্বাচিত হন।

১৬। **ইডন, সার অ্যাশলী (Eden, Sir Ashley—১৮৩১-১৮৮৭)**: যুক্তরাজ্যের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী সার অ্যান্টনি ইডনের পূর্বপুরুষ ও লর্ড অকল্যাণ্ড (জর্জ ইডন)-এর

ভ্রাতুষ্পুত্র। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা সমাপনান্তে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে আসেন। ১৮৬২-৭১ পর্যন্ত বঙ্গ সরকারের সচিব ছিলেন। পরে বাংলার শাসনকর্তা হন (১৮৭৭-৮২)। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুলাই মারা যান।

১৭। **ইয়ং, গর্ডন (Young, William Gordon):** ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের Education Despatch-এর নির্দেশমত পূর্বতন শিক্ষা-সভা (Council of Education)-র স্থলে শিক্ষা-অধিকার (Directorate)-এর সৃষ্টি হইলে গর্ডন ইয়ং ইহার প্রথম শিক্ষা অধিকর্তা নিযুক্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমাবধি ফেলো ছিলেন। ইনি একজন সিভিলিয়ান।

১৮। **ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯):** জন্মস্থান কাঁচড়াপাড়া। অল্প বয়সে মাতৃবিয়োগ হয়। পিতা, হরিনারায়ণ গুপ্ত, পুনরায় দার পরিগ্রহ করিলে জোড়াসাঁকোর মাতুলালয়ে চলিয়া আসেন। যুগান্তরকারী 'সংবাদ প্রভাকর' ছাড়াও আরো তিনটি পত্রিকা (সংবাদ রত্নাবলী, পাষণ্ড পীড়ন ও সংবাদ সাধুরঞ্জন) সম্পাদনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রঙ্গলাল, দীনবন্ধু, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির সাহিত্যিক জীবনের শুরু হয় তাঁহার পত্রিকায়। তাঁহার রচিত 'কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত' (১৮৫৫), 'প্রবোধ প্রভাকর' (১৮৫৮), 'কবিতাসংগ্রহ,' রামপ্রসাদ সেনের 'কালীকীর্তন'-এর সম্পাদনা প্রভৃতি এবং পুরাতন কবিদের (যথা রামপ্রসাদ সেন, নিধুবাবু, হরু ঠাকুর, রাম বসু প্রভৃতির) জীবনী ও রচনা উদ্ধার উল্লেখযোগ্য। ১৮৫৯ সালের ২৩শে জানুয়ারি ইহলোক ত্যাগ করেন।

১৯। **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (বন্দ্যোপাধ্যায়) (১৮২০-১৮৯১):** ১৮২০ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। আট বছর বয়সে পিতা, ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত কলিকাতায় আসেন এবং ১৮২৯ খ্রীঃ সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। ১৮৪১ খ্রীঃ পাঠ সমাপন করিয়া কলেজ ত্যাগ করেন এবং উক্ত বৎসরেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রথম-পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। পরে সংস্কৃত কলেজের সহ-সম্পাদক হন (১৮৪৬); অবশ্য সম্পাদকের সহিত মতান্তর ঘটায় কলেজ ত্যাগ করিতে হয় (১৮৪৭)। পরে আবার সংস্কৃত কলেজে ফিরিয়া আসেন এবং প্রথম অধ্যক্ষরূপে সংস্কৃত কলেজের আমূল সংস্কার করেন। বিধবা বিবাহ আইন পাশ করান (১৮৫৬) জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) ও হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফাণ্ড প্রতিষ্ঠা করেন। রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭), 'বাঙ্গালার ইতিহাস' ২য় (১৮৪৮) 'বোধোদয় (১৮৫১), 'উপক্রমণিকা' (১৮৫১), 'ঋজুপাঠ' ১ম-৩য়, 'ব্যাকরণ কৌমুদী', 'শকুন্তলা' (১৮৫৪),

'সীতার বনবাস' (১৮৬০), 'ভ্রান্তিবিলাস' (১৮৬৯), প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই ইহলোক ত্যাগ করেন।

২০। **ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ** (১২৩৮-১২৬৭ বঙ্গাব্দ) : পাইকপাড়ার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বংশধর এবং নারায়ণচন্দ্র সিংহের অন্যতম পোষ্য পুত্র। বাল্যে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। বঙ্গীয় নাট্যশালার উন্নতি কল্পে বিশেষ যত্ন ও বহু অর্থব্যয় করিয়া ছিলেন। অশ্বারোহণে পারদর্শী ছিলেন। বেলগাছিয়া উদ্যানে (ইহা দ্বারকানাথ ঠাকুরের নিকট হইতে ক্রয় করেন) অশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ পরলোক গমন করেন।

২১। **উইলসন, হরেস হেম্যান** (Wilson, H. H.—১৭৮৬-১৮৬০) : জন্ম ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর। ১৮০৮ খ্রীঃ কলিকাতায় আসেন এবং পরে কলিকাতা টাকশালে যোগ দিয়া অ্যাসে মাস্টার হ'ন। বহু বৎসর এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন। সংস্কৃত ও প্রাচ্য বিদ্যা প্রসারের জন্য চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপনার কৃতিত্ব প্রধানতঃ তাঁরই। ইংলণ্ড প্রত্যাগমনের পর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক হন এবং রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির ডিরেক্টর নির্বাচিত হন। ছাত্রদের মধ্যে মনিয়র উইলিয়মস্, ই. বি. কাওয়েল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মৃত্যুর পর সমস্ত রচনাবলী বারো খণ্ডে প্রকাশিত হয় (১৮৬২-৭১) ; তন্মধ্যে 'ঋগ্বেদ' 'মেঘদূত', 'গ্রামার অব স্যান্স্কৃত ল্যাঙ্গুয়েজ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মৃত্যু : ৮ই মে, ১৮৬০ (লণ্ডন)।

২২। **উইলিয়মস্, সার মনিয়র** (Williams, Sir Monier—১৮১৯-১৮৮৯) : ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর বোম্বাইতে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত ও প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদ। অক্সফোর্ডে সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেন। সুবৃহৎ সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধানের জন্য চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। অন্যান্য গ্রন্থ 'হিন্দুইজম' (১৮৭৭), 'রিলিজ্যস থটস্ অ্যাণ্ড লাইফ ইন ইণ্ডিয়া' (১৮৮৩) প্রভৃতি। মৃত্যু : ১১ই এপ্রিল, ১৮৮৯।

২৩। **উদয়নাচার্য** (আঃ ৯৪৪-১০৪৪ খ্রীঃ) : মিথিলার অধিবাসী—দ্বারভাঙ্গা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ন্যায়শাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। কল্যাণ রক্ষিত প্রণীত 'ঈশ্বর ভঙ্গকারিকা' নামক ন্যায় গ্রন্থের ভুল প্রদর্শনের জন্য 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' প্রণয়ন করেন। ইহা ব্যতীত লক্ষণাবলী, তাৎপর্য পরিশুদ্ধি, আত্মতত্ত্ববিবেক, কিরণাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

২৪। **উপেন্দ্রনাথ দাস** (১২৫৫-১৩০২ বঙ্গাব্দ) : হাইকোর্টের উকিল শ্রীনাথ দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র। একাধারে নাট্যকার, নাট্যপরিচালক ও রিফর্মার। ইণ্ডিয়ান র‍্যাডিক্যাল লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। কুড়ি বৎসর বয়সে প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর এক বিধবাকে বিবাহ করেন। ইহার পরে দারুণ অর্থকষ্ট ও ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়েন। কয়েক বৎসর পরে ব্যারিস্টারি পড়িবার জন্য বিলাত যান এবং কোন কারণ বশতঃ সেখানে কয়েদ হন। দেশে ফিরিবার পর নাট্যান্দোলনে মাতেন এবং গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারের পরিচালক নিযুক্ত হন। 'শরৎ সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নামে দুটি নাটক রচনা ও মঞ্চস্থ করেন। হিন্দু রমণী কর্তৃক প্রিন্স অব ওয়েলসকে অভ্যর্থনা করার ঘটনা (৪৫ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য) লইয়া 'গজদানন্দ ও যুবরাজ' নামক প্রহসনটি পরিচালনার জন্য পুলিশী রোষে পড়েন এবং পরে তাঁহার ও অমৃতলাল বসুর একমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই ঘটনার পরই সরকার কর্তৃক "ড্রামাটিক পারফরমেন্স কণ্ট্রোল অ্যাক্ট" পাস করান হয় (১৮৭৬)।

২৫। **উমেশচন্দ্র দত্ত (গুপ্ত)** (১৮২৯-১৯১৬) : দুই বৎসর বয়সে পিতৃহারা হন। কিছুকাল স্কুলে পাঠ গ্রহণের পর অতি অল্প বয়সে চাকুরি করিতে বাধ্য হন। জনৈক ইংরেজ রাজকর্মচারী তাঁর প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া উমেশচন্দ্রকে কৃষ্ণনগর কলেজে ভর্তি করাইয়া দেন। ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন তখন অধ্যক্ষ। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে দর্শন শাস্ত্রে লাইব্রেরী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর চট্টগ্রাম স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। কিছুকাল বাদেই কৃষ্ণনগর কলেজে চলিয়া আসেন। মধ্যে এক বৎসরের জন্য ঢাকা স্কুলেব প্রধান শিক্ষক ছিলেন (১৮৬৬)। কিছুকালের জন্য কৃষ্ণনগর কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ হন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সাতাশী বৎসর বয়সে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুন তারিখে ইহলোক ত্যাগ করেন। ছাত্রদের মধ্যে মনোমোহন ও লালমোহন ঘোষ, মতিলাল ঘোষ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণনগর কলেজ প্রসঙ্গে দীনবন্ধু মিত্র লিখেছিলেন :

> এ কলেজ একবার উমেশ-প্রভায়
> উঠেছিল সর্বোপরি বিদ্যা পরীক্ষায়।

২৬। **উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৮৪৪-১৯০৬) : ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর খিদিরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অ্যাটর্নী ছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীঃ ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি শুরু করেন। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম (বোম্বাই—১৮৮৫) এবং অষ্টম (এলাহাবাদ

—১৮৯২) অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। ছাত্রাবস্থায় লণ্ডনে 'ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র প্রথম সম্পাদক ছিলেন। স্ত্রী খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিলেও নিজে স্বধর্ম ত্যাগ করেন নাই। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুলাই প্রাণত্যাগ করেন।

২৭। **এণ্ড্রুজ, চার্লস্ ফ্রীয়র** (Andrews, C.F.—১৮৭১-১৯৪০): ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। ডিগ্রি লাভের পর কিছুকাল কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯০৪ খ্রীঃ ভারতে আসেন এবং দিল্লীতে অধ্যাপনা শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত হইবার পর শান্তিনিকেতনে যোগ দেন। গান্ধীজীর সহিতও বন্ধুত্ব ছিল। কার্যকলাপ ও মতামতের জন্য নিজের সমাজ ও ব্রিটিশ সরকারের অপ্রীতিভাজন হন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল কলিকাতায় পি. জি. হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন।

২৮। **কটন, সার হেনরী জন স্টেডম্যান** (১৮৪৫-১৯১৫): জন্ম মাদ্রাজ প্রদেশে। ইহারা পুরুষানুক্রমে ভারত সরকারের কর্মচারী। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ সরকারের অধীনে কার্যে যোগদান করেন। পরে আসামের চীফ্ কমিশনার হন (১৮৯৬-১৯০২)। আসামের চা-বাগানের কুলীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য স্বজাতীয়দের বিরাগভাজন হন। 'New India' গ্রন্থের জন্য ভারতবাসীর নিকট অমর হইয়া থাকিবেন।

২৯। **কাওয়েল, এডওয়ার্ড বাইলস্** (Cowell, Edward Byles—১৮২৬-১৯০৩): ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় উইলিয়ম জোন্সের গ্রন্থরাজি দেখিয়া সংস্কৃত সাহিত্য তথা প্রাচ্যবিদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হন। অক্সফোর্ডে হরেস হেমান উইলসনের নিকট সংস্কৃত সাহিত্যের পাঠ নেন। ১৮৫৬ খ্রীঃ প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় পদত্যাগ করিলে পর ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর সংস্কৃত কলেজের ভার গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে এসিয়াটিক সোসাইটির যুগ্ম সম্পাদক হন। ইংলণ্ডে প্রত্যাগমনের (১৮৬৪) পর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক নির্বাচিত হন (১৮৬৭)। রচিত ও সম্পাদিত পুস্তকাবলীর মধ্যে বিক্রমোর্বশী, ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তার, সর্বদর্শন সংগ্রহ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৩০। **কানাইলাল পাইন** (১৮২৯-১৮৯১): বাল্যকালে কয়েক বৎসর মাত্র মতিলাল শীলস্ ফ্রী কলেজে অধ্যয়ন করেন। চব্বিশ বৎসর বয়সে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজের একজন প্রধান হইয়া উঠেন। ইংরেজীতে ব্রাহ্মধর্মের এক ইতিবৃত্ত লেখেন। মস্তিকের পীড়ায় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুন ইহলোক ত্যাগ করেন।

৩১। **কার্তিকেয়চন্দ্র রায় (চক্রবর্তী), দেওয়ান (১৮২০-১৮৮৫)**: ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ 'দেওয়ান' বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে উত্তমরূপে ফার্সি ভাষা রপ্ত করেন। রাজা শ্রীশচন্দ্র কর্তৃক প্রথমে সেক্রেটারি এবং পরে দেওয়ান নিযুক্ত হন। কার্তিকেয়চন্দ্র রচিত 'ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত' এবং 'আত্ম-জীবনচরিত'-এ সে যুগের বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রামাণিক ইতিহাস পাওয়া যায়। পুত্রদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কবি ও নাট্যকার হিসাবে পরবর্তী কালে খ্যাতি অর্জন করেন।

৩২। **কার্লাইল, টমাস (Carlyle, Thomas—১৭৯৫-১৮৮১)**: প্রখ্যাত স্কচ্ ঐতিহাসিক। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস রচনা তাঁহার অমর কীর্তি। সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলীও উল্লেখযোগ্য।

৩৩। **কালীকৃষ্ণ ঠাকুর (১৮৪১-১৯০৫)**: গোপীমোহন ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ও গোপাললাল ঠাকুরের পুত্র—পাথুরিয়াঘাটার সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ওরিয়েন্ট্যাল সেমিনারি ও হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, সে যুগে পুত্রদ্বয়ের বিবাহে আড়ম্বরের জন্য অযথা অর্থব্যয় না করিয়া সেই অর্থ মহেন্দ্রলাল সরকারের Indian Association for the Cultivation of Science-এর উন্নতিকল্পে দান করিয়াছিলেন।

৩৪। **কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১২৫০-১৩১৭ বঙ্গাব্দ)**: ভরাকর (ঢাকা) গ্রামের শিবনাথ ঘোষের পুত্র। ইংরেজীতে বক্তৃতা করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। ভাওয়াল জমিদারের কর্মসচিব ছিলেন। 'বান্ধব' পত্রিকা সম্পাদনা সাহিত্যিক জীবনের এক স্মরণীয় কীর্তি। 'প্রভাতচিন্তা', 'নিশীথ চিন্তা', 'ভ্রান্তিবিনোদ' প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

৩৫। **কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০)**: জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ সিংহ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নন্দলাল সিংহ। বাল্যে হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেন, তবে কৃতী ছাত্র বলিয়া তেমন সুনাম ছিল না। মাত্র তেরো বৎসর বয়সে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা' প্রতিষ্ঠা করেন (১৪. ৬. ১৮৫৩)—'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' এই সভার সহিত যুক্ত ছিল। এই রঙ্গমঞ্চ 'বেণী সংহার' নাটকের দ্বারা উন্মোচিত হয় এবং তাহাতে কালীপ্রসন্ন অভিনয় করিয়া যশোলাভ করেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে ও সম্পাদনায় 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। ইহা ছাড়া 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (৭ম পর্ব) ও 'সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা' মাসিক পত্র এবং দৈনিক 'পরিদর্শক' সম্পাদনা করেন। মূল মহাভারতের অনুবাদ ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' ছাড়াও 'মালতী মাধব নাটক' 'বিক্রমোর্বশী নাটক', 'বাবু নাটক', প্রভৃতি প্রণয়ন করেন। ১৮৬৩ খ্রীঃ অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট হন। ১৮৭০ খ্রীঃ ২৪শে জুলাই ইহলোক ত্যাগ করেন।

৩৬। **কীর্তিচন্দ্র রায়, মহারাজা :** বর্ধমানের মহারাজা জগৎরামের পুত্র। পিতা ঘাতকের হস্তে নিহত হইলে, রাজ্যভার গ্রহণ করেন (১৭০২ খ্রীঃ) এবং স্বীয় বাহুবলে মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, হুগলী প্রভৃতি স্থানের বহু জমিদারদের পরাস্ত করিয়া তাঁদের জমিদারী নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

৩৭। **কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য** (১৮৪০-১৯৩২) **:** মালদহের অধিবাসী। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। কৃতী ছাত্র ছিলেন—১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ও ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এনট্র্যান্স পরীক্ষা প্রবর্তিত হইলে উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে এক বছর পড়েন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পাশ করিয়া কিছুকাল স্কুলে শিক্ষকতা ও কলিকাতার বিদ্যালয় সমূহের উপ-পরিদর্শকরূপে কাজ করার পর ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। এগারো বৎসর অধ্যাপনা করার পর ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ওকালতি করিবার জন্য কলেজ ত্যাগ করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' নিযুক্ত হন। ১৮৯১ খ্রীঃ হইতে ১৯০৩ খ্রীঃ পর্যন্ত রিপণ (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ) কলেজের অধ্যক্ষতা করেন। 'বাচস্পত্যভিধান' সংকলনে সাহায্য করার জন্য তারানাথ তর্কবাচস্পতি 'বিদ্যাম্বুধি' উপাধি দেন। 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' (১৮৫৭) ছাড়াও 'বিচিত্রবীর্য' (১৮৬২), 'ধর্মশাস্ত্র' (১৮৮৫) প্রভৃতি রচনা করেন। 'দুরাকাঙ্ক্ষ' সম্পর্কে সাহিত্যরথী অক্ষয়চন্দ্র সরকারের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

"...ইহাতে কাদম্বরীর আড়ম্বর নাই, বিদ্যাসাগরের সরসতা নাই, অক্ষয়কুমারের প্রগাঢ়তা নাই, প্যারীচাঁদের গ্রাম্য সরসতা নাই, অথচ যেন সকলই আছে। এবং উহাদের ছাড়া আরও যেন কিছু নূতন আছে।... আমার বিশ্বাস দুরাকাঙ্ক্ষের ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার জননী।"

৩৮। **কৃষ্ণচন্দ্র রায়, মহারাজা** (১৭১০-১৭৮২) **:** কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে কৃষ্ণনগর রাজবংশের এবং নদীয়ার অসাধারণ উন্নতি হয়। স্বয়ং সংস্কৃত ও ফার্সি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং গুণীর আদর করিতেন। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, রামপ্রসাদ সেন, ভারতচন্দ্র রায় প্রভৃতি প্রথিতযশা ব্যক্তিদের নানাভাবে সাহায্য করিতেন।

৩৯। **কৃষ্ণদাস পাল** (১৮৩৮-১৮৮৪) **:** পিতা ঈশ্বরচন্দ্র পাল। শিক্ষা—ওরিয়েন্ট্যাল সেমিনারি ও মেট্রোপলিটান কলেজ। অসাধারণ বক্তা ও প্রসিদ্ধ সাংবাদিক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'-এর সম্পাদক হন। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েসনের সহ-সম্পাদক ছিলেন।

৪০। **কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়**, রেভঃ (১৮১৩-১৮৮৫): পিতা জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। ডিরোজিয়োর অন্যতম ছাত্র। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ইহার বিশ বৎসর বাদে বিশপ্‌স্‌ কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বহু ভাষাবিদ্‌ পণ্ডিত ছিলেন। অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। Inquirer পত্রিকা সম্পাদনা করিতেন। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার অনুকরণে বাংলা ভাষায় বিদ্যাকল্পদ্রুম বা Encyclopaedia Bengalensis কোষগ্রন্থ সংকলন সুরু করেন। বেথুন কলেজের দক্ষিণে 'ক্রাইস্ট চার্চ' গীর্জার উদ্বোধন (১৮৩৯) হইলে কৃষ্ণমোহন ইহার আচার্য নিযুক্ত হন এবং একাদিক্রমে তেরো বৎসর ঐ পদে আসীন ছিলেন।

হেদোর এঁদো জলে কেউ যেও না তায়,
কৃষ্ণ বন্দ্যো জটে বুড়ী শিকলি দেবে পায়। —ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

৪১। **কেশবচন্দ্র সেন** (১৮৩৮-১৮৮৪): ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর কলুটোলার বিখ্যাত সেন-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে পিতৃহারা (পিতা: প্যারীমোহন সেন —১৮১৪-১৮৪৮) হন। হিন্দু কলেজ ও হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের ছাত্র ছিলেন। সহপাঠী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাধ্যমে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত পরিচিত হন এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। পরে দেবেন্দ্রনাথের সহিত মনোমালিন্য ঘটায় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ (নববিধান) স্থাপিত করেন। এলবার্ট সোসাইটি (হল ও কলেজ) প্রতিষ্ঠা (২৬শে এপ্রিল, ১৮৭৬) একটি স্মরণীয় ঘটনা। ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান, ধর্মসাধন, আচার্যের উপদেশ ১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড, ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ, সেবকের নিবেদন, ব্রহ্মোপসনা, Young Bengal—This is for you, Essential Principles of Brahma Dharma প্রভৃতি পুস্তক-পুস্তিকাও রচনা করেন। The Indian Mirror, সুলভ সমাচার, বালকবন্ধু প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি ইহলোক ত্যাগ করেন।

৪২। **কোঁৎ, অগস্ত** (Comte, Auguste ১৭৯৮-১৮৫৭): ১৭৯৮ সালে ফ্রান্সের মঁ পেলিয়ারের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে কোঁৎ জন্মগ্রহণ করেন। প্যারিসের পলিটেকনিক স্কুলে তাঁর গণিত বিজ্ঞান শিক্ষা হয়। কিন্তু জনৈক শিক্ষকের বিরুদ্ধে অশিষ্ট ব্যবহার করার ফলে তিনি ঐ স্কুল থেকে বিতাড়িত হন। আঠারো বৎসর বয়সে এই ঘটনা ঘটে এবং পিতাও তাঁকে গৃহে স্থান দিতে রাজী হন না। বন্ধুর গৃহে আশ্রয় নেন। কিন্তু ছয় বছর পরে বন্ধুর সহিত মতভেদ হওয়ায় সেখানকার আশ্রয়ও তিনি ছাড়তে বাধ্য হন। এই সময় 'সমাজ সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক

পদ্ধতি'র একটি পরিকল্পনা বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ লেখেন। এই একটি প্রবন্ধই কোঁৎকে খ্যাতিমান করে তোলে। কোঁতের বিবাহিত জীবন সুরু হয় এক ভ্রষ্টা নারীকে নিয়ে। কিন্তু এ বিবাহ সুখের না হওয়ায় কিছুকাল পরে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়। ইতিমধ্যে তাঁর 'পজিটিভ ফিলজফি' বা ধ্রুব দর্শন পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হয় এবং আলোড়ন তোলে। কিন্তু আর্থিক অবস্থা ক্রমশই অবনতির দিকে যাইতে থাকে। এই সময় ইংলণ্ডের মিল ও অন্যান্য বন্ধু তাঁকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য পাঠাতে থাকেন। ইংলণ্ডে এক বিবাহিত নারীর প্রেমে পড়েন। কিন্তু এ প্রেম মিলনে শেষ হয়নি। মহিলাটির মৃত্যু কোঁতের জীবন-দর্শনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর দ্বিতীয় প্রধান গ্রন্থ 'ধ্রুব রাজনীতি'তে এই প্রভাব বোঝা যায় যায়। ১৮৫৭ সালে এই কালজয়ী দার্শনিকের মৃত্যু হয়।

৪৩। **গিরিশচন্দ্র ঘোষ** (১৮৪৮-১৯১১): খ্যাতনামা অভিনেতা ও নাট্যকার। বাল্যে ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারি ও হেয়ার স্কুলে কিছুদিন পড়িবার পর পিতার মৃত্যুর জন্য স্কুল ত্যাগ করিতে হয়। অভিনয়ের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ বাল্যকাল হইতেই ছিল। প্রথম জীবনে এ্যামেচার থিয়েটারে অভিনয় করেন; পরে মিনার্ভা, স্টার, এমারেল্ড, ক্লাসিক প্রভৃতি মঞ্চের সহিত যুক্ত হন। রচিত গ্রন্থরাজির মধ্যে জনা, বিল্বমঙ্গল, প্রফুল্ল, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৪৪। **গিরিশচন্দ্র ঘোষ** (১৮২৯-১৮৬৯): প্রখ্যাত সাংবাদিক ও বাগ্মী। কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন—আদি নিবাস নদীয়া জেলায়। ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারির কৃতী ছাত্র। কালীপ্রসাদ ঘোষের 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার', কৈলাসচন্দ্র বসুর 'লিটারারি ক্রনিকল', অগ্রজ শ্রীনাথ ঘোষের 'বেঙ্গল রেকর্ডার', শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'মুখার্জীজ ম্যাগাজিন' প্রভৃতি পত্রিকার সহিত যুক্ত ছিলেন। নিজে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট', 'বেঙ্গলী' প্রভৃতি পত্রিকা সাফল্যের সহিত সম্পাদনা করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন, বেঙ্গল সোসাইটি, উত্তরপাড়া হিতকারিণী সভা প্রভৃতির সহিত যুক্ত ছিলেন।

৪৫। **গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন (ভট্টাচার্য)** (১৮২২-১৯০৩): দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার রাজপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া উক্ত কলেজে অধ্যাপনা করিতেন (১৮৪৫-১৮৮৩)। মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া নিজ রচিত ও সম্পাদিত বহু পুস্তক প্রকাশ করেন; তন্মধ্যে রঘুবংশ, দশকুমার চরিত, শব্দসার, বিধবা বিষম বিপদ, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দের ৩রা নভেম্বর ইহলোক ত্যাগ করেন।

৪৬। **গিরীশচন্দ্র রায়, মহারাজা** (১৭৮৬-১৮৪১): ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের (কৃষ্ণনগর) মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র গিরীশচন্দ্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন (১৮০২)। খুব অপব্যয়ী হওয়ায় প্রায় সমস্ত জমিদারী হস্তচ্যুত হয়। নিজে খুব শিক্ষিত না হইলেও গুণীদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দিল্লীর প্রসিদ্ধ গায়ক কায়েম খাঁ ও তাঁহার তিন পুত্র মিয়া খাঁ, হম্মু খাঁ ও দেলওয়ার খাঁ তাঁহার সময়ে কৃষ্ণনগরে আসিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

৪৭। **গোপীমোহন ঠাকুর (বন্দ্যোপাধ্যায়-কুশারী)**: পিতা পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ জমিদার দর্পনারায়ণ ঠাকুর। বাল্যে গৃহ-শিক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করেন এবং ইংরেজী, ফরাসী, পর্তুগীজ, সংস্কৃত, ফার্সি ও উর্দু ভাষায় দক্ষতা লাভ করেন। হিন্দু কলেজ স্থাপয়িতাদেব অন্যতম। ১২২৫ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে প্রাণত্যাগ করেন। পুত্রদের মধ্যে হরকুমার ও প্রসন্নকুমার সুপ্রসিদ্ধ।

৪৮। **গোল্ডস্টুকার, থিওডর** (Goldstucker, Theodore, ১৮২১-১৮৭২): জন্ম: কনিগস্‌বের্গ (প্রুশিয়া)—১৭ই জানুয়ারী, ১৮২১। শিক্ষা: কনিগস্‌বের্গ ও বন বিশ্ববিদ্যালয়; ১৮৪০ খ্রীঃ প্রথমোক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টরেট লাভ করেন। ১৮৫২ খ্রীঃ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি তাঁহার ছাত্র। রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রবোধ চন্দ্রোদয়, জৈমিনীয় ন্যায়মালা বিস্তার, পাণিনি—হিজ প্লেস ইন স্যাংস্কৃত লিটারেচর প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মার্চ লণ্ডনে মারা যান।

৪৯। **গৌরমোহন আঢ্য** (১৮০৫-১৮৪৫): ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জানুয়ারি কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে পড়াশুনায় অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তৎকালে পাছে ধর্মভাব শিথিল হইয়া যায় এই আশঙ্কায় অভিভাবকেরা খ্রীষ্টীয় মিশনারি স্কুলে সন্তানদের ভর্তি করাইতে চাহিতেন না। সে কারণে, গৌরমোহন ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দের ১লা মার্চ স্বীয় প্রচেষ্টায় 'ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারি' প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে কৃষ্ণদাস পাল, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ (সাংবাদিক), কৈলাসচন্দ্র বসু, চন্দ্রনাথ বসু, উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি পরবর্তী জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী নৌকাডুবির ফলে প্রাণ হারান।

৫০। **গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (ভট্টাচার্য) বা গুড়গুড়ে ভট্চাজ** (১৭৯৯-১৮৫৯): বাংলা সাময়িক-সাহিত্যের অন্যতম সাংবাদিক। শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতার

পরলোক গমনের পর উচ্চশিক্ষার্থে নবদ্বীপে আসেন। ইহার পর কলিকাতায় আসিয়া রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সুনজরে পড়েন এবং তাঁহারই পৃষ্ঠপোষকতায় 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা পরিচালনা করেন। ইহা ছাড়া 'সম্বাদ ভাস্কর', 'সম্বাদ রসরাজ' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা করেন। রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে জ্ঞান-প্রদীপ ১ম ও ২য় খণ্ড, নীতিরত্ন, ভূগোলসার, 'ভগবদ্গীতা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৫১। **গ্রাণ্ট, সার জন পীটর** (Grant, Sir John Peter, ১৮০৭-১৮৯৩) আই. সি. এস: ভারত সরকারের অধীন নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেন। পরে বাংলা দেশের শাসনকর্তা হন (১৮৫৯-১৮৬২)। নীলকর আন্দোলনে রায়তদের প্রতি সহানুভূতি দেখানর জন্য স্বদেশবাসীদের বিরাগভাজন হন। এখানকার কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পর জ্যামাইকার শাসনকর্তা হন।

৫২। **গ্ল্যাডস্টোন, উইলিয়ম ইউআর্ট** (Gladstone, William Ewart, ১৮০৯-৯৮): ইংলণ্ডের উদারনৈতিক দলের নেতা ছিলেন। বহু বৎসর যাবৎ (১৮৬৮-৭৪, ১৮৮০-১৮৮৫, ১৮৮৬ ও ১৮৯২-৯৪) ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

৫৩। **চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য:** সমুদ্রগুপ্তের পুত্র। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। আনুমানিক রাজত্বকাল ৪০০-৪১৫ খ্রীষ্টাব্দ। কালিদাস প্রভৃতি 'নবরত্ন' সভার পৃষ্টপোষক ছিলেন বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। পবে বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার রাজত্বকালে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতে আসেন।

৫৪। **চন্দ্রনাথ বসু** (১৮৪৫-১৯১১): হুগলী জেলার কৈকালা গ্রামে জন্ম। ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীতে অধ্যয়নকালীন তথাকার 'বিতর্ক সভা'র উৎসাহী সভ্য ছিলেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া ইতিহাসে এম. এ. পরীক্ষা পাশ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করার পর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। অতঃপর যথাক্রমে জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ, বেঙ্গল লাইব্রেরীর কর্মাধ্যক্ষ ও বাংলা সরকারের অনুবাদকের পদ গ্রহণ করিয়া ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুন ইহলোক ত্যাগ করেন। রচিত পুস্তকাবলীর মধ্যে 'সাবিত্রী তত্ত্ব', 'পৃথিবীর সুখ দুঃখ', 'হিন্দুত্ব' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৫৫। **চন্দ্রমুখী বসু:** কাদম্বিনী বসু (গঙ্গোপাধ্যায়)-র সহিত একযোগে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন ফিমেল স্কুল (পরবর্তী কালে কলেজ) হইতে তৎকালীন সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম মহিলা স্নাতক হইবার গৌরব অর্জন করেন। পর বৎসর (১৮৮৪)

দশম স্থান অধিকার করিয়া ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. পাশ করেন। ১৮৮৬ হইতে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বেথুন কলেজের অধ্যক্ষতা করেন। উল্লেখযোগ্য যে ইঁহার সহোদরা রাজকুমারী দাসও পরবর্তী কালে (১৯২৮-৩১) এই কলেজের অধ্যক্ষা হন।

৫৬। **চুনীলাল বসু**, রায়বাহাদুর, সি. আই. ই (১৮৬১-১৯৩০): ২৪-পরগনার চাংড়িপোতার অধিবাসী। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল ব্রহ্মদেশে সহকারী শল্য চিকিৎসক রূপে কাজ করেন। অতঃপর কলিকাতায় আসিয়া সরকারের অধীন Chemical Examiner নিযুক্ত হন। মধ্যে কিছুকাল মেডিক্যাল কলেজে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপনাও করেন। প্রথম নিখিল ভারত চিকিৎসাবিদ্‌দের সম্মেলন (১৮৯৪)-এর অন্যতম সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। পরে কলিকাতার শেরিফ হন। 'বাঙ্গালীর খাদ্য' অন্যতম রচনা।

৫৭। **জগদিন্দ্রনাথ রায়, মহারাজ** (১৮৬৮-১৯২৬): নাটোরের মহারাজার দত্তক পুত্র। রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকা দক্ষতার সহিত সম্পাদনা করেন। নিজে সুকবি ছিলেন। এক মোটর দুর্ঘটনায় ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে দেহত্যাগ করেন।

৫৮। **জয়গোপাল তর্কালঙ্কার (ভট্টাচার্য)** (১৭৭৫-১৮৪৬): ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর নদীয়া জেলার বজরাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কাশীতে পাঠ গ্রহণ করেন। সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল (১৮২৪) হইতে বাইশ বৎসর সেখানে অধ্যাপনা করেন। ছাত্রদের মধ্যে বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভাষা আমূল পরিবর্তন করিয়া বর্তমান রূপ দেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল পরলোক গমন করেন।

৫৯। **জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন (ভট্টাচার্য)** (১৮০৫-১৮৭২): দক্ষিণ ২৪-পরগনার মুচাদিপুর গ্রামের অধিবাসী। শালিখায় টোল স্থাপন করেন। পরে সংস্কৃত কলেজের ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক হন এবং সুদীর্ঘ তিরিশ বৎসর ধরিয়া এখানে অধ্যাপনা করেন। 'সর্বদর্শন সংগ্রহ', 'ন্যায়দর্শনম্‌' প্রভৃতি রচনা উল্লেখযোগ্য।

৬০। **জোন অভ আর্ক, সাধ্বী** (১৪১২-৩১): ফরাসী দেশে চাষীর ঘরে জন্ম। ইংরেজের সহিত শতবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধে ফরাসীদের যখন সঙ্গীণ অবস্থা তখন জোন দৈববাণীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ফরাসী সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধের মোড় ফিরাইয়া দেন। পরে কিন্তু ইংরেজদের বন্ধু বার্গণ্ডির ডিউকের সৈন্যদের হস্তে

বন্দী হইয়া ইংরেজদের হস্তে পতিত হন। বিচারে তাঁহাকে ডাইনী সাব্যস্ত করিয়া জীবন্ত দগ্ধ করা হয়।

৬১। **টমাস আ কেমপিস্** (Thomas à Kempis, ১৩৮০-১৪৭১): জার্মাণীর ডুসেলডর্ফের নিকট কেমপেনে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া কেমপিসের টমাস নামেই পরিচিত। আসল নাম টমাস হেমারকেন (Hämmerken)। অগস্টিনীয় সম্প্রদায়ের একজন সন্ন্যাসী ছিলেন। 'ঈশা অনুকরণ' (De Imitation Christe) পুস্তকের প্রণেতা।

৬২। **টেম্পল, সার রিচার্ড** (Temple, Sir Richard, ১৮২৬-১৯০২) আই. সি. এস.: বাংলা ও বোম্বাই প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। তারই আমলে হাওড়ার পুরানো ভাসমান সেতু তৈরী হয়। 'Men and Events of My Time in India' ও 'The Story of My Life' তাঁহার উল্লেখযোগ্য রচনা।

টাসো: 'তাসো' দ্রষ্টব্য।

৬৩। **ডাফ, ডঃ আলেকজাণ্ডার** (Duff, Rev. Dr Alexander, ১৮০৫-১৮৭৮): খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে General Assembly of the Church of Scotland-এর অধীন খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক হইয়া ভারতে আসেন। রামমোহনের সহায়তায় 'জেনারেল এসেম্বলিজ ইন্‌স্টিটিউশন' প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৩০); কিন্তু পরে মূল প্রতিষ্ঠানের সহিত মনান্তর হওয়ায় 'ফ্রি চার্চ ইন্‌স্টিটিউশন' (পরে 'ডাফ কলেজ') নামে আর একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৪৩)। এই উভয় কলেজ মিলিয়া বর্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজের সৃষ্টি। নীলকর আন্দোলনে অন্যান্য বহু পাদ্রীর ন্যায় রায়তদের পক্ষ সমর্থন করেন। ইনিই রেভঃ কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়কে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন (১৮৩২)।

৬৪। **ডিরোজিও, হেনরি** (Derozio, Henry Louis Vivian, ১৮০৯-৩১): Fakir of Jhungeera-র কবি ডিরোজিও মৌলালী দর্গার নিকট (বর্তমান ১৫৫, আচার্য জগদীশ বসু রোডস্থিত ভবনটি যেখানে অবস্থিত) জন্মগ্রহণ করেন। ভাগলপুরে নীলকুঠীতে কাজ করিবার সময়ে 'Juvenis' ছদ্মনামে কবিতা লিখিতে শুরু করেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষকের পদ পান। Academic Association নামে এদেশের প্রথম বিতর্ক সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। নাস্তিক বলিয়া হিন্দু কলেজ হইতে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কলেরায় অতি অল্প বয়সে মহাপ্রয়াণ করেন। ডিরোজিওর শিক্ষা প্রণালী বাংলার নব্য যুবকদের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। তাঁর ছাত্রদের ('ইয়ং বেঙ্গল') অশালীন ব্যবহার প্রাচীন পন্থীরা সুনজরে দেখিতেন না। এ প্রসঙ্গে পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের শ্লোকটি উল্লেখযোগ্য:

দক্ষিণারঞ্জনো রামো রসিকঃ কৃষ্ণমোহনঃ।
তারাচাঁদো রাধানাথো গোবিন্দশ্চন্দ্রশেখরঃ ॥
হরচন্দ্রো রামতনুঃ শিবচন্দ্রশ্চ মাধবঃ।
মহেশোঽমৃতলালশ্চ প্যারীচাঁদো মধুব্রতাঃ ॥
ফিরীঙ্গী পুঙ্গব শ্রীমদ্ ডিরোজিও কৃপেশয়ে।
মধুপানরতাঃ সম্যগ্ বিদিগ্ জ্ঞানবর্জিতাঃ ॥

[দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-৭৮), রামগোপাল ঘোষ (১৮১৪-৬৮), রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-৫৮), কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-৮৫), তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৬-৫৭) রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-৭০), গোবিন্দচন্দ্র বসাক, চন্দ্রশেখর দেব, হরচন্দ্র ঘোষ (১৮০৮-৬৮), রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-৯৮), শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-৯০) মাধবচন্দ্র মল্লিক, মহেশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল মিত্র এবং প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৩)।]

ডেভিড হেয়ার : 'হেয়ার, ডেভিড' দ্রষ্টব্য।

ডাণ্টে : 'দান্তে' দ্রষ্টব্য।

৬৫। **তারকনাথ পালিত, সার** (১৮৩১-১৯১৪): হুগলী জেলার ইলছোবা গ্রামের অধিবাসী। কলিকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথিত যশা ব্যারিস্টার ছিলেন। শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রভূত অর্থ ও সম্পত্তি দান করেন। এদেশে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (বর্তমান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর দান উল্লেখযোগ্য।

৬৬। **তারানাথ তর্কবাচস্পতি (ভট্টাচার্য)** (১৮০৬-১৮৮৫): কালনা মহকুমার অম্বিকা গ্রামে জন্ম। এক বৎসর বয়সে মাতৃহারা হন। অসাধারণ ধীসম্পন্ন এবং বহু সংস্কৃত গ্রন্থের উদ্ধর্তা। বাল্যকাল হইতে অসম্ভব জেদী ছিলেন। বাল্যে পিতার নিকট একবার উপদেশ পাইয়াছিলেন 'কারণই প্রত্যেক কার্যের জন্য দায়ী।' ইহার কিছুদিন পরে ভগ্নীপতি শিবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের নিকট উত্তম-মধ্যম প্রহার লাভ করেন। ইহাতে বালক তারানাথ রাগে বাড়ীর পুকুরে পড়িয়া আকণ্ঠ ডুবিয়া রইলেন। কাহারো কথায় উঠিয়া আসিলেন না। তখন পিতা আসিয়া আকণ্ঠ জলে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করায় বালক উত্তর দিল, "অনেকক্ষণ জলে থাকলে আমার জ্বর-বিকার হবে আর তাতে আমি মারা যাব—ফলে আমার মরার কারণ শিবচন্দ্র বাঁড়ুর্য্যের ফাঁসি হবে।" ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হইয়া সাহিত্য, দর্শন, জ্যোতিষ, গণিত, ন্যায়, স্মৃতি প্রভৃতি বিষয়ে পাঠ গ্রহণের পর ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আরো শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে কাশী গমন করেন এবং তেত্রিশ বৎসর বয়সে পাঠ সমাপনান্তে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৪৫ (২৩শে

জানুয়ারি) খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা সুরু করেন এবং ১৮৭৩ (৩১শে ডিসেম্বর) খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। কলের জলের ব্যবহারের বিরুদ্ধে মত দেওয়ায় ও পুত্র জীবানন্দের সহিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রাগারাগি হওয়ায় বিদ্যাসাগরের সহিত তাঁর বন্ধু বিচ্ছেদ হয়। অবসর গ্রহণ করিয়া পরিণত বয়সে তৃতীয় পত্নী সহ কাশীবাসী হন এবং সেখানে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন মারা যান। গ্রন্থরাজির মধ্যে শব্দার্থরত্ন, বাক্যমঞ্জরী, শব্দস্তোমমহানিধি (পাঁচ খণ্ডে), বাচস্পত্য অভিধান (বাইশ খণ্ডে) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৬৭। **তারাশঙ্কর তর্করত্ন (চট্টোপাধ্যায়)** : উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে নদীয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত কলেজে পাঠ সমাপনান্তে উক্ত কলেজের গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। পরে বিদ্যাসাগরেব অধীনে নদীয়ার সাব-ইনস্পেক্টর অভ স্কুলস হন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে অপরিণত বয়সে মারা যান। 'কাদম্বরী' ও 'রাসেলাস' (Rasselas)-এর অনুবাদ করেন।

৬৮। **তাসো, তরকাতো (Tasso, Torquato, ১৫৪৪-১৫৯৫)** : ইতালির অন্যতম কবি। 'Jerusalem Delivered' কাব্যগ্রন্থ উল্লেখযোগ্য রচনা।

৬৯। **দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাজা** (১৮১৪-১৮৭৮) : পাথুরিয়াঘাটার সূর্যকুমার ঠাকুরেব দৌহিত্র। কলিকাতায় জন্মগ্রহণ কবেন। 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর অন্যতম স্তম্ভ এবং হিন্দু কলেজে ডিবোজিওর প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় 'জ্ঞানান্বেষণ' নামে এক পত্রিকা বাহির কবেন। বর্তমান বেথুন কলেজের প্রতিষ্ঠাকল্পে একখণ্ড জমি দান করেন। প্রথমা স্ত্রীর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটায় বর্ধমানের স্বর্গীয় মহারাজা তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের কনিষ্ঠা বিধবারানীকে বিবাহ করেন। সিপাহী বিদ্রোহেব পর অযোধ্যার জমিদারীর ভাব গ্রহণ করিয়া তথায় বসবাস করিতে থাকেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই লক্ষ্ণৌ নগরীতে প্রাণত্যাগ কবেন।

৭০। **দাশরথি রায়** (১৮০৬-১৮৫৬) : অন্যতম পাঁচালী রচয়িতা। কাটোয়া মহকুমার বাঁধমুড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করিলেও কালনাব নিকটবর্তী পীলা গ্রামে মাতুলালয়ে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটান। প্রথম জীবনে কবি দলে যোগ দেন। পরে স্বাধীনভাবে পাঁচালী রচনায় মন দেন। কবিরাজী জানিতেন এবং বিনা পারিশ্রমিকে গরীবদের চিকিৎসা কবিতেন। একান্ন বৎসর বয়সে যক্ষ্মা রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

৭১। **দান্তে, আলিগিয়ারি (Dante, Alighieri, ১২৬৫-১৩২১)** : ইতালির অমর কবি। ফ্লোরেন্স নগরে জন্মগ্রহণ করেন। 'Vita Nouva' ও 'Divina Commedia' নামক বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের স্রষ্টা।

৭২। **দীনবন্ধু মিত্র** (১৮৩০-১৮৭৩)**:** হেয়ার সাহেবের কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল (বর্তমান হেয়ার স্কুল) ও হিন্দু কলেজ হইতে পাঠ সমাপন করিয়া ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ডাক বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। ডাক বিভাগে চাকুরী করা কালীন নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতে হইত এবং সেই সময় নীলকরদের দৌরাত্ম্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর পরলোক গমন করেন। নবীন তপস্বিনী, জামাই বারিক, সধবার একাদশী প্রভৃতি অনেক নাটক ও প্রহসন লিখিলেও 'নীল দর্পণং নাটকং' (১৮৬০)-এর জন্য চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। ইহার ইংরেজী অনুবাদ (অনুবাদক: মধুসূদন দত্ত) প্রকাশের জন্য রেভারেণ্ড লঙ-এর অর্থদণ্ড ও কারাবাস হয়। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে ইহার ইংরেজী সংস্করণ বাহির হয়। আধুনিক ভারতীয় ভাষায় রচিত পুস্তকের ইহাই সর্বপ্রথম বিদেশী সংস্করণ।

৭৩। **দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (বন্দ্যোপাধ্যায়-কুশারী), মহর্ষি** (১৮১৭-১৯০৫)**:** প্রিন্স দ্বারকনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র। অত্যন্ত ধার্মিক প্রবণ ব্যক্তি ছিলেন। রামমোহনের মৃত্যুর পর (আদি) ব্রাহ্ম সমাজকে পুনর্জীবিত করেন এবং ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন (১৮৪৩)। ধর্ম আলোচনার জন্য তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এই সভা তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পরিচালনা করিত। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারি পরলোক গমন করেন।

৭৪। **দ্বারকানাথ অধিকারী:** নদীয়া জেলার গোস্বামী দুর্গাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও দীনবন্ধু মিত্রের ন্যায় ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর'-এ কবিতা লিখিতেন। 'বুনো কবি'-র ছদ্মনামে বঙ্কিম ও দীনবন্ধুকে কটাক্ষ করিয়া সংবাদ প্রভাকরে 'সরস্বতীর মোহিনী বেশ ধারণ' কবিতা প্রকাশ করিলে এই তিনজনের মধ্যে যে কবিতা যুদ্ধ চলিয়াছিল তাহা উল্লেখযোগ্য। 'সুধীরঞ্জন' কাব্যগ্রন্থ উল্লেখযোগ্য রচনা। দ্বারকানাথ দীর্ঘায়ু ছিলেন না।

৭৫। **দ্বারকানাথ ঠাকুর (বন্দ্যোপাধ্যায়-কুশারী)** (১৭৯৪-১৮৪৬)**:** যোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের যশোভাগ্য তাঁহার সময় থেকেই আরম্ভ হয়। প্রথম জীবনে বহু ভূ-সম্পত্তির মালিক হইয়াও নিমক মহলে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং তথায় দেওয়ান হন। পরে 'কার ঠাকুর কোম্পানি' প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যবসার দ্বারা প্রচুর অর্থের অধিকারী হন। জমিদার সভা (বর্তমান ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন)-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা (১৮৩৮)। রামমোহনের প্রধান সহযোগী ছিলেন। দুইবার (১৮৪২ ও ১৮৪৫) ইংলণ্ড গমন করেন এবং তথায় ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অগষ্ট মৃত্যুমুখে পতিত হন।

৭৬। **দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (ভট্টাচার্য)** (১৮১৯-১৮৮৬): দক্ষিণ ২৪-পরগনার চাংড়িপোতা গ্রামে এক দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে পাঠ সমাপনান্তে উক্ত কলেজে অধ্যাপনা স্বরু কবেন। 'সোমপ্রকাশ' (১৮৫৮) তাঁহার জীবনের প্রধান কীর্তি। শেষ জীবনে ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য রেওয়া রাজ্যের সাতানায় বসবাস করিতেন এবং সেখানে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে অগষ্ট পরলোক গমন করেন। সোমপ্রকাশ ছাড়াও 'কল্পদ্রুম' নামে আর একখানি পত্রিকাও (মাসিক) সম্পাদনা করেন। রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে নীতিসার, রোমরাজ্যের ইতিহাস, গ্রীসদেশের ইতিহাস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৭৭। **দ্বারকানাথ মিত্র** (১৮৩৩-১৮৭৪): হুগলী জেলায় আগুনসি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান দখল করেন (১৮৫০)। পরে আইন পরীক্ষা পাশ করিয়া আইন ব্যবসায় স্বরু কবেন। স্বীয় প্রতিভাবলে অল্প কালের মধ্যে সরকারী উকিল হন। শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মৃত্যুব পর তাঁহার স্থলে হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন (১৮৬৭) এবং সাত বৎসর ধরিয়া সুনামের সহিত এই কার্য করেন। এই সময়ে ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হন এবং ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারি ইহলোক ত্যাগ করেন।

৭৮। **দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর** (১৮৪০-১৯২৬): মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র। সাধক ও কবি হিসাবে যেমন খ্যাত, তেমনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ হিসাবেও বিশেষ পরিচিত। জোড়াসাঁকো ঠাকুব বাড়িব কাব্য-সাহিত্যের ধারা ও শিল্পানুভূতি তাঁব থেকেই অন্যান্য অনুজদের মধ্যে সংক্রামিত বলে অনেকে মনে করে থাকেন। মাত্র কুড়ি বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি মেঘদূতের অনুবাদ করেন। অন্যান্য শাস্ত্র অপেক্ষা দর্শনশাস্ত্রই তাঁর অধিকতর ভাবে অধিগত ছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ আজীবন আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁর সম্পাদনায় উক্ত সমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। বিখ্যাত 'ভারতী' মাসিক পত্রিকাও তাঁব সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় এবং তিনি ১২৮৪ হইতে ১২৯০ সাল পর্যন্ত 'ভারতী' সম্পাদনা করেন। 'হিতবাদী' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসাবেও তাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ১৯১৪ সালে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি এবং কিছুকালের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেরও সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন (১৮৯৭-১৯০০)। তাঁর গ্রন্থাদির মধ্যে কাব্যমালা, স্বপ্নপ্রয়াণ, মেঘদূত, নানাচিন্তা এবং ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মসাধন বিখ্যাত।

৭৯। **নবীনচন্দ্র সেন** (১৮৪৭-১৯০৯): ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম জেলার নয়াপাড়া গ্রামে বিখ্যাত রায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বৃত্তি পাইয়া ১৮৬৩

খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পাশ করেন। ইহার পর বাংলা সরকারের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন উচ্চ পদে ছত্রিশ বৎসর কার্য করিয়া ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। কবিতা রচনা শুরু করেন ১০।১১ বৎসর বয়স হইতে এবং পরবর্তী জীবনে সুকবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিছুদিনের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি দেহত্যাগ করেন। রচনাবলীর মধ্যে অবকাশরঞ্জিনী ১ম ও ২য়, পলাশির যুদ্ধ, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, আমার জীবন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইহার পূর্বপুরুষেরা হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে বাস করিতেন।

৮০। **নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়,** সি. আই. ই.: পণ্ডিত দেবনাথ মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় পুত্র। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া সংস্কৃততে এম. এ. পাশ করেন। পর বৎসর আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় আইন ব্যবসায় সুরু করেন। পরে (১৮৬৯) কাশ্মীর রাজ্যের প্রধান বিচারপতি হন। অবসর গ্রহণের পর কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান হন (১৮৯৬)।

৮১। **পিকক, সার বার্নস** (Peacock, Sir Barnes, ১৮১০-১৮৯০): সুপ্রীম কাউন্সিলের সভ্য নিযুক্ত হইয়া ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে আসেন এবং ১৮৫৯-১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার সুপ্রীম কোর্ট ও সদর দেওয়ানী আদালত অবলুপ্ত হইয়া কলিকাতা হাইকোর্টের সৃষ্টি হইলে ইহার প্রথম প্রধান বিচারপতি (১৮৬২-৭০) হইবার গৌরব অর্জন করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর প্রিভি কাউন্সিলের সভ্য হন।

৮২। **পেত্রার্ক** (Petrach, Francesca, ১৩০৪-৭০): ইতালির মানবতাবাদী কবি। লরার প্রতি প্রেম বিষয়ক কবিতাবলী বিখ্যাত।

৮৩। **প্যারীচরণ সরকার** (১৮২৩-১৮৮৩): হেয়ার সাহেবের ইস্কুল ও হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। কলুটোলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক থাকা কালীন উক্ত স্কুলের নাম পরিবর্তন করিয়া হেয়ার স্কুল করেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এডুকেশন গেজেট, হিতসাধক, প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। বিখ্যাত 'ফার্স্ট বুকের' রচয়িতা। সুরাপান নিবারণ প্রচেষ্টাকল্পে Bengal Temperence Society প্রতিষ্ঠা করা জীবনের উল্লেখযোগ্য কাজ।

৮৪। **প্যারীচাঁদ মিত্র** (১৮১৪-১৮৮৩): হুগলী জেলার অধিবাসী। কলিকাতায় নিমতলা পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। স্বনামখ্যাত কিশোরীচাঁদ তাঁহার অনুজ ছিলেন।

হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। Calcutta Public Library-র গ্রন্থাগারিক হিসেবে বহুদিন কার্য করেন (১৮৩৬-৬৬)। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য ছিলেন। 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনা সুপরিচিত। ইহার ইংরেজী অনুবাদ পরে প্রকাশিত হয়। স্ত্রীর মৃত্যুর পর প্রেততত্ত্বে বিশ্বাসী হইয়া উঠেন এবং এ বিষয়ে বহু রচনা প্রকাশ করেন। ডেভিড হেয়ারের জীবন চরিত, কৃষি পাঠ, অভেদী প্রভৃতি রচনা উল্লেখযোগ্য।

৮৫। **প্রমদানাথ রায়, রাজা** (১৮৭৬-১৯৩৩): দীঘাপতিয়ার জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। অনেক স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

৮৬। **প্রসন্নকুমার ঠাকুর** (১৮০১-১৮৬৮): পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু কলেজে পাঠ সমাপনান্তে জমিদারী দেখাশুনা করিতে থাকেন। পরে আইন ব্যবসা শুরু করেন। 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' পদ সৃষ্টির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে বহু অর্থ প্রদান করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করায় তাঁহাকে ত্যাজ্যপুত্র করেন।

৮৭। **প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী (বসু)** (১৮২৫-১৮৮৭): হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় ১৮৫৩ খ্রীঃ সংস্কৃত কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে এই কলেজে অধ্যক্ষতা করার সৌভাগ্য হইয়াছিল। কিছুকাল প্রেসিডেন্সি কলেজেও অধ্যাপনা করেন। বাংলা ভাষায় পাটিগণিত ও বীজগণিত রচনা অন্যতম কাজ। ডাঃ সূর্যকুমার সর্বাধিকারী ইঁহার মধ্যম ভ্রাতা। স্ত্রী সুরঙ্গিনী দেবী সুলেখিকা ছিলেন; লেখিকার রচিত তারাচরিত (রাজস্থানীয় ইতিহাসমূলক আখ্যায়িকা) ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৮৮। **প্রেমচন্দ্র (চাঁদ) তর্কবাগীশ (চট্টোপাধ্যায়)** (১৮০৫-১৮৬৭): বর্ধমান জেলার অধিবাসী। সংস্কৃত কলেজে পাঠ সমাপনান্তে উক্ত কলেজের অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং সুদীর্ঘকাল (১৮৩১-৬৩) এখানে অধ্যাপনা করেন। অবসর গ্রহণের পর কাশীবাসী হন এবং তথায় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল ইহলীলা সংবরণ করেন। যে সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা রচনা করেন তন্মধ্যে রঘুবংশম, কুমারসম্ভবম, অভিজ্ঞানশকুন্তলম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৮৯। **ফুলকুমারী দেবী (গুপ্তা)** (১৮৬৯-১৯৩১): শ্যামাচরণ সেনের কন্যা। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। বর্ধমান নিবাসী শ্রীশচন্দ্র গুপ্তের সহিত বিবাহ হয়। 'সৃষ্টিরহস্য' রচনা করিয়া তৎকালীন পণ্ডিতবর্গের সপ্রশংস

দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হন। ইহা ছাড়া 'অবসর' কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন (১৯০৮)। ২রা মার্চ, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

৯০। **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** (১৮৩৮-১৮৯৪): কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক (১৮৫৮) এবং বন্দেমাতরম মন্ত্রের অমর স্রষ্টা।

৯১। **বলবন্ত গঙ্গাধর টিলক** (১৮৫৬-১৯২০): 'লাল-বাল-পাল' ত্রয়ীর অন্যতম রাজনীতিবিদ ও জননায়ক। তদানীন্তন কংগ্রেসের 'চরমপন্থী' দলভুক্ত ছিলেন। দেশের জন্য বহুবার কারাবরণ করেন। 'গীতারহস্য', 'The Orion' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনা। মহারাষ্ট্রে 'শিবাজী-উৎসব' প্রবর্তন করেন।

৯২। **বল্লাল সেন**: সেন বংশের প্রসিদ্ধ নরপতি। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজত্ব করিতেন। বাংলা দেশে কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন করেন। ইঁহারই পুত্র লক্ষণ সেন। ইঁহারা ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় ছিলেন।

৯৩। **বায়রন, লর্ড জর্জ গর্ডন** (**Byron, Lord George Gordon**, ১৭৮৮-১৮২৪): ইংরেজী সাহিত্যের রোমান্টিক কবি। 'Childe Harold's Pilgrimage' অন্যতম রচনা। পরে গ্রীক বিদ্রোহীদের সহিত যোগ দেন এবং তথায় মারা যান।

৯৪। **বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী** (১৮৪১-১৮৯৯): প্রখ্যাত ধর্মপ্রচারক। অদ্বৈতাচার্যের অধস্তন পুরুষ। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন। যৌবনে দীক্ষা-গ্রহণপূর্বক ব্রাহ্ম-সমাজে যোগদান করেন কিন্তু পরে ব্রাহ্মসমাজের সহিত সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করেন (১৮৮৬)।

৯৫। **বিডন, স্যার সিসিল** (**Beadon, Sir Cecil**): সিভিলিয়ন হিসাবে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন। স্বীয় অধ্যাবসায় পরে বাংলার শাসনকর্তা হন (১৮৬২-৬৭)। ইঁহার আমলে কলিকাতায় কলের জলের প্রচলন হয়। নীলকর সাহেবদের বিরোধিতা করায় তাহাদের বিরাগভাজন হন।

৯৬। **বিনয়কৃষ্ণ দেব, রাজা** (১৮৬৬-১৯১২): মহারাজা নবকৃষ্ণের প্রপৌত্র। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। 'কলিকাতার ইতিহাস' রচনা করেন।

৯৭। **বিভারিজ, হেনরী** (**Beveridge, Henry**, ১৮৩৭-১৯২৯): 'A Comprehensive History of India' গ্রন্থের প্রণেতা বিভারিজের পুত্র এবং 'বিভারিজ প্ল্যান' খ্যাত স্যার উইলিয়ম বিভারিজের পিতা। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি স্কটলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে

ভারতে আসেন এবং ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই নভেম্বর ইহলোক ত্যাগ করেন। স্ত্রী অ্যানেৎ-ও বিদুষী রমণী ছিলেন। রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে The Trial of Maharaja Nando Kumar, আবুল-ফজলের আকবরনামার অনুবাদ, Memoirs of Jehangir প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

৯৮। **বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী** (১৮৩৫-১৮৯৪): ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। অল্পবয়সে মাতৃহারা হন। বিদ্যালয়ে পড়াশুনা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু বাল্যকাল হইতে কবিতা ও সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ ছিল। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে মে বহুমূত্র রোগে মারা যান। স্বপ্নদর্শন, সঙ্গীত শতক, সারদামঙ্গল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনা।

৯৯। **বিটন, ড্রিংকওয়াটার** (Bethune, John Elliot Drinkwater, ১৮০১-৫১): কেমব্রিজের প্রখ্যাত ছাত্র। আইন অধ্যয়নান্তে বিলাতে হোম অফিসে ওকালতি শুরু করেন। বড়লাটের শাসন পরিষদে আইন সচিব পদে নিযুক্ত হইয়া ভারতে আসেন (এপ্রিল, ১৮৪৮)। আমৃত্যু পদাধিকারবলে Council of Education-এর সভাপতি ছিলেন। রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির চেষ্টায় ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে Calcutta Female School (বর্ত্তমান বেথুন স্কুল) স্থাপন করেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অগস্ট দেহত্যাগ করেন।

১০০। **ব্রজমোহন মল্লিক**: ১৮৩২ সালে ৬ই জুন তারিখে হুগলী ঘুঁটিয়া বাজারে জন্ম। গণিত-শাস্ত্র এবং সাহিত্য—দু'দিকেই তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ১৮৬৩ সালে 'রণজিৎ সিংহের জীবনী' রচনা করেন। ১৮৭১ সালে থেকে ১৮৯৪ সালের মধ্যে পাঁচখানি গণিতের পুস্তকও তিনি রচনা করেন।

১০১। **ভরতচন্দ্র শিরোমণি**: ২৪-পরগনার দক্ষিণে লাঙ্গলবেড়িয়া গ্রামে বৈদিক পণ্ডিত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সুদীর্ঘকাল (১৮৪০-৭২) সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করিয়া ৬৮ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর, গিরিশ বিদ্যারত্ন প্রভৃতি তাঁহার ছাত্র ছিলেন। রচিত ও সম্পাদিত পুস্তকের মধ্যে দায়ভাগ, মনুসংহিতা, স্মৃতিচন্দ্রিকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১০২। **ভারতচন্দ্র রায় (মুখোপাধ্যায়)** (১১১৯-১১৬৭ বঙ্গাব্দ): হুগলী জেলার আমতার নিকটবর্ত্তী পেঁড়ো-বসন্তপুর গ্রামে এক ধনী ভূ-স্বামী বংশে জন্মগ্রহণ করেন (আনুমানিক ১৭১২ খ্রীঃ)। বাল্যে টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। ভ্রাতাদের সহিত মনোমালিন্য ঘটায় দেবানন্দপুরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। এখানে ফারসি ভাষায়

শিক্ষালাভ করেন। পিতা ঠিকমত খাজনা দিতে না পারায় তাঁকে একবার কারাবাস করিতে হয়। প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়সে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত পরিচয় হয় এবং মহারাজার সভাসদ নিযুক্ত হন। তখন হইতে তাঁর যশ ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। বহুমূত্র রোগে মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, কালিকা-মঙ্গল, গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

১০৩। **ভুদেব মুখোপাধ্যায়,** সি. আই. ই. (১৮২৫-১৮৯৪) : কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র। বহু স্কুলে শিক্ষকতা করে। পরে ইনস্পেক্টর অভ স্কুলস্ হন। শিক্ষা বিস্তারের জন্য বহু টাকা দান করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তাঁর সামাজিক প্রবন্ধ ও পারিবারিক প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য।

১০৪। **মদনমোহন তর্কালঙ্কার (চট্টোপাধ্যায়)** (১৮১৭-১৮৫৮) : 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল, কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল'-র কবি মদনমোহন নদীয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত কলেজে পাঠ সমাপনান্তে ঐ কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে জজ-পণ্ডিত (১৮৫০) ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট (১৮৫৫) হন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হন। বাসবদত্তা, শিশুশিক্ষা ১ম, ২য় ও ৩য় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনা।

১০৫। **মধুসূদন দত্ত** (১৮২৪-১৮৭৩) : কপোতাক্ষ তীরবর্তী সাগরদাঁড়ী গ্রামে জন্ম (২৫.১. ১৮২৪)। বাল্যে কলিকাতায় আসিয়া হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। পরে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ব্যারিস্টারি পড়িবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড গমন করেন এবং ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পর বৎসর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। শেষ জীবনে আর্থিক অনটনের মধ্যে কাটাইতে হয় এবং জেনারেল হাসপাতালে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ শে জুন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে শর্মিষ্ঠা, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ, মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য প্রভৃতি সুপরিচিত।

১০৬। **মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় :** প্রাথমিক যুগের নাট্যকার হিসাবে এবং নাট্য রচনার একটি বিশেষ ধারার প্রবর্তক রূপে ইনি স্মরণীয়। নক্সা জাতীয় সংলাপ রচনার ধারা অনেকে যে মধুসূদনের প্রবর্তনা মনে করেন সে কথা ঠিক নয়। এঁর 'চার ইয়ারে (র) তীর্থযাত্রা' নাটকটিই এ ধরনের প্রথম রচনা। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালে। এতে রচনার কৃতিত্ব যে খুব বেশী আছে তা নয়—তবে শহরে নেশাখোর যুবকদের প্রতি লেখকের প্রচণ্ড ব্যঙ্গ তাদের অতীব দুরবস্থা থেকেই প্রমাণিত হয়।

১০৭। **মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন (বন্দ্যোপাধ্যায়)** (১৮৩৬-১৯০৬): বিদ্যাসাগর, ই. বি. কাওয়েল ও প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর পর মহেশচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের চতুর্থ অধ্যক্ষ হন (১৮৭৭-১৮৯৫)। রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্বদর্শন সংগ্রহ, কুসুমাঞ্জলি তাৎপর্য বিবরণ, কাব্যপ্রকাশ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১০৮। **রাজনারায়ণ বসু** (১৮২৬-১৮৯৯): রাজা রামমোহন রায়ের অন্যতম প্রাথমিক শিষ্য ও একান্ত সচিব নন্দকিশোর বসুর পুত্র। কলিকাতার দক্ষিণে বোড়াল গ্রামে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের আদিবাস কলিকাতার গড় গোবিন্দপুরে। হেয়ার সাহেবের স্কুল ও হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। সহপাঠীদের মধ্যে মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত, জগদীশনাথ রায় প্রভৃতি পরবর্তী জীবনে খ্যাতি অর্জন করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরেব সংস্পর্শে আসিয়া ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন (১৮৪৬) এবং ক্রমে আদি ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম নেতা হন। শিক্ষকতা কার্যে মোদনীপুরে বহু বৎসর কাটান (১৮৫১-৬৯) এবং তথায় অনেক জনহিতকর কার্য করেন। 'সুরাপান-নিবারণী সভা' স্থাপনা জীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কার্য। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর দেওঘরে পরলোক প্রাপ্ত হন। রচিত গ্রন্থের মধ্যে ব্রহ্মসাধন, তাম্বুলোপহার, আত্মচরিত, হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১০৯। **রাজেন্দ্রলাল মিত্র**, সি. আই. ই. (১৮২২-১৮৯১): প্রখ্যাত পণ্ডিত ও প্রত্নতাত্ত্বিক। মেডিক্যাল কলেজের কৃতী ছাত্র এবং এশিয়াটিক সোসাইটির ও বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনের ডিরেক্টর ছিলেন্। বিদেশের বহু বিদ্বজ্জন-সভা কর্তৃক সম্মানিত হন। সচিত্র প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'-এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। ইহা ছাড়া বহু পুস্তক রচনা করেন।

১১০। **রাধাকান্ত দেব, রাজা** (১৭৮৪-১৮৬৭): মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের পৌত্র। ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন এবং হিন্দু কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে আমৃত্যু ইহার সভাপতি ছিলেন। শব্দকল্পদ্রুম রচনা জীবনের অক্ষয় কীর্তি। রামমোহন রায়ের প্রতিপক্ষ রক্ষণশীল দলের নেতা ছিলেন।

১১১। **রাধামাধব কর**: সে যুগের বিখ্যাত ডাক্তার দুর্গাদাস করের মধ্যম পুত্র। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর (আর. জি. কর) বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন।

রাধামাধব কর এক খ্যাতিমান অভিনেতা এবং নাট্য উন্নয়ন প্রকল্পের একজন কর্ণধার ছিলেন। আদি ন্যাশনাল থিয়েটার দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেলে—গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ গেলেন নব-গঠিত 'স্টার' থিয়েটারে; রাধামাধব কর কয়েক জনের সঙ্গে 'এমারল্ড থিয়েটার' এ যোগ দেন। ইনি নাট্যকার হিসাবেও নিতান্ত-অযোগ্য ছিলেন না। ১৮৭৯ সালে 'বসন্ত কুমারী' নামে একটি নাটক রচনা করেন। গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে এটি একটি বিয়োগান্ত নাটক।

১১২। **রামকমল ভট্টাচার্য** (১৮৩৪-১৮৬০): সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্র। নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। মাত্র ছাব্বিশ বৎসর বয়সে আত্মহত্যা করিয়া ইহলীলা সংবরণ করেন। বেকনের সন্দর্ভ, জ্যামিতি, ইংলণ্ডের ইতিহাস প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন।

১১৩। **রামচন্দ্র মিত্র** (১৮১৪-১৮৭৪): হিন্দু কলেজের অধ্যয়নকালীন কৃতী ছাত্র হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। পরে হিন্দু (ও পরবর্তী কালে প্রেসিডেন্সি) কলেজের বাংলার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বেথুন সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। পশ্বাবলী, জ্ঞানান্বেষণ প্রভৃতি পত্রিকা সাফল্যের সহিত সম্পাদনা করেন। কয়েকটি পুস্তকও লিখিয়াছিলেন।

১১৪। **রামতনু লাহিড়ী** (১৮১৩-১৮৯৮): ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চৈত্র মাসে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে হেয়ার সাহেবের স্কুলে ও পরে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। পাঠ সমাপনের পর হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে বর্ধমান, বারাসত, উত্তরপাড়া, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে সুনামের সহিত শিক্ষকতা করিয়া ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা ছিলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অগস্ট ইহলীলা সংবরণ করেন।

১১৫। **রামনারায়ণ তর্করত্ন (ভট্টাচার্য)** (১৮২২-১৮৮৬): ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ শে ডিসেম্বর কলিকাতার দক্ষিণে অবস্থিত হরিনাভি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সে পিতৃমাতৃ হারা হওয়ায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয় ও তৎপত্নী কর্তৃক লালিত-পালিত হন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ও পরবর্তী কালে ইহার অধ্যাপকও ছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ শে জানুয়ারি মারা যান। রচিত গ্রন্থের মধ্যে পতিব্রতোপাখ্যান, কুলীন কুলসর্বস্ব নাটক, বেণীসংহার নাটক, নব নাটক, রুক্মিণীহরণ নাটক, আর্যাশতকম্ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'নাটুকে রামনারায়ণ' নামে সমধিক প্রসিদ্ধ।

১১৬। **রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী** (১৮৬৪-১৯১৯): ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে কান্দী স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রসায়ন শাস্ত্রে এম. এ. দিয়া প্রথম হন এবং পর বৎসর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে রিপন (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন এবং পরে ইহার অধ্যক্ষও হন (১৯০৩-১৯)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম স্তম্ভ ছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্বে কিছুদিনের জন্য ইহার সভাপতি হন। রচনাবলীর মধ্যে প্রকৃতি, জিজ্ঞাসা, বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা, চরিত কথা, যজ্ঞ কথা প্রভৃতি সুপরিচিত।

১১৭। **রিচার্ডসন, ক্যাপ্টেন** (Richardson, David Lester): ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীন চাকুরী গ্রহণ করেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড বেন্টিঙ্কের পার্শ্বচর নিযুক্ত হন। মধ্যে কিছুকাল Calcutta Literary Gazette, Calcutta Magazine, Bengal Annual, Bengal Hurkaru প্রভৃতি পত্রিকা অতি কৃতিত্বের সহিত সম্পাদন করেন (১৮৩০-৩৬)। পরে হিন্দু কলেজ, হুগলী কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ হন। কিন্তু চারিত্রিক অবনতির জন্য শিক্ষা পরিষদের সভাপতি বিটনের কোপদৃষ্টিতে পড়েন ও চাকুরী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বহু পরে কিছুকালের জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যক্ষতা করেন। তাঁহার সেক্সপীয়র পাঠ সে যুগের বহু মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। মধুসূদনেব কবি প্রতিভার উন্মেষের জন্য তিনি বহু অংশে দায়ী। অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত (গুপ্ত) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শেষ'জীবনে দারুণ অর্থকষ্টের মধ্যে পড়েন এবং ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই নভেম্বর স্বদেশে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। History of the Blackhole of Calcutta গ্রন্থটি তিনিই রচনা করেন।

১১৮। **শিশিরকুমার ঘোষ** (১৮৪০-১৯১১): যশোহর জেলার পলুয়া-মাগুরার প্রসিদ্ধ ঘোষ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কলুটোলা ব্রাঞ্চ (বর্তমান হেয়ার) স্কুল হইতে বৃত্তি পাইয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৮৫৭)। স্বগ্রামে ভ্রাতার সহিত 'অমৃত প্রবাহিনী' পত্রিকা বাহির করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে বাংলায় এবং পরে ইংরেজীতে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' সম্পাদনা করিতে শুরু করেন (১৮৬৮)। মধ্যে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। তাঁর রচিত শ্রীঅমিয় নিমাই (১ম-৩য়) ও Lord Gouranga (I & II) সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

১১৯। **শ্যামাচরণ (শর্ম) সরকার, বিদ্যাভূষণ** (১৮১৪-১৮৮২): নদীয়ার অধিবাসী। পিতা হরনারায়ণ সরকার পূর্ণিয়ার দেওয়ান ছিলেন। ফার্সি, সংস্কৃত,

ইংরেজী, ল্যাটিন গ্রীক প্রভৃতি বহু ভাষায় দখল ছিল। কলিকাতা মাদ্রাসা (১৮৩৭-৪২) ও সংস্কৃত কলেজে (১৮৪২-৪৮) বহুদিন শিক্ষকতা করেন। পরে সুপ্রীম কোর্টের চীফ ইণ্টারপ্রিটর নিযুক্ত হন (১৮৫৭)। প্রথম ঠাকুর আইন অধ্যাপক হার্বার্ট কাওয়েলের পর দ্বিতীয় ঠাকুর আইন অধ্যাপক রূপে পর পর দুই বৎসর (১৮৭৩ ও ৭৪) নিযুক্ত হন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে Introduction to the Bengalee Language (১৮৫০), বাংলা ব্যাকরণ (১২৫৯ সাল), The Mahammadan Law, পাঠ্যসার, নীতি-দর্শন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১২০। **সারদাচরণ মিত্র**: ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারী কৃতী ছাত্র ছিলেন। চার বৎসব হাইকোর্টের বিচারক পদে আসীন ছিলেন (১৯০৪-০৮)। কলিকাতায় একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করেন এবং বর্তমানে উহা 'সারদাচরণ এরিয়ান ইনস্টিটিউশন' নামে খ্যাত।

১২১। **হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩)**: ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল হুগলী জেলার রাজবল্লভহাটে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এনট্র্যান্স পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন ও ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পাশ করেন। পরে আইন পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৬২ খ্রীঃ মুন্সেফ নিযুক্ত হন। কিছুকাল মুন্সেফী করিবার পর স্বাধীনভাবে হাইকোর্টে ওকালতি সুরু করেন এবং ১৮৯০ খ্রীঃ প্রধান সরকারী উকিল হন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মে ইহলীলা সংবরণ করেন। বীরবাহু কাব্য, বৃত্রসংহার, নাকে খৎ (১৮৮৫) প্রভৃতি রচনা প্রসিদ্ধ।

১২২। **হেয়ার, ডেভিড (Hare, David—১৭৭৫-১৮৪২)**: স্কটলণ্ডের অধিবাসী। পঁচিশ বৎসর বয়সে ঘড়ি ব্যবসায়ী হিসাবে কলিকাতায় আসেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে বন্ধুর হস্তে ব্যবসা অর্পণ করিয়া এদেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য সর্ব শক্তি নিয়োগ করেন। তাঁহারই পরামর্শ ও পরিকল্পনা মত ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই বৎসরেই প্রধানত তাঁহারই প্রচেষ্টায় স্কুল বুক সোসাইটি স্থাপিত হয়। হিন্দু কলেজের ভবন নির্মাণের জন্য গোলদীঘির উত্তর দিকের ভূমি খণ্ডটি দান করেন (বর্তমানে এখানে সংস্কৃত স্কুল ও কলেজ এবং হিন্দু স্কুল অবস্থিত)। স্কুল বুক সোসাইটির অধীন কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল তিনিই পরিচালনা করিতেন (বর্তমানে ইহা 'হেয়ার স্কুল' নামে পরিচিত)। এদেশ হইতে মরিশাস প্রভৃতি স্থানে কুলি চালানের বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম প্রতিবাদ উত্থাপিত করেন এবং এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে হস্তক্ষেপে বাধ্য করেন।

চিরকুমার হেয়ার কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন ইহলোক ত্যাগ করেন।

দেখ মাতা গোলদীঘি, বড় রক্ত জোর,
বিরাজে দক্ষিণ দিকে হেয়ারের গোর।
দীন দুঃখী শিশুদের পরম আত্মীয়,
বঙ্গের বদান্য বন্ধু প্রাতঃস্মরণীয়,
বাঙ্গালীর উন্নতির নির্মল নিদান
যার জন্য করেছেন সর্বস্ব প্রদান। —দীনবন্ধু মিত্র।

নির্ঘণ্ট

১। ব্যক্তি

২। বিবিধ

৩। ইংরেজী

রচনাপঞ্জী

কার্তিকেয়চন্দ্র রায়—আত্ম-জীবনচরিত

কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত—উমেশচন্দ্র দত্ত (মানসী ও মর্মবাণী, ১৩২৩)

ডঃ গোপিকামোহন ভট্টাচার্য—সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, ২য় খণ্ড

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত—বিদেশীয় ভারত-বিদ্যা পথিক

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস—বাঙ্গালা ভাষার অভিধান

তারাধন তর্কভূষণ—তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনী এবং সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতি (১৮১৩)

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ—ভারত কোষ, ১ম ও ২য় খণ্ড

—সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ১ম - ৯ম খণ্ড

বিনয় ঘোষ—সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১ম - ৩য় খণ্ড

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গ সাহিত্যে নাবী

—বঙ্গীয় নাট্যশালা

—বঙ্গীয় নাট্যশালাব ইতিহাস

—সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, ১ম খণ্ড

মন্মথনাথ ঘোষ—মনীষী কৈলাসচন্দ্র বসু (মানসী ও মর্মবাণী, ১৩২৩)

—রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (মানসী ও মর্মবাণী, ১৩২৩-২৪)

যোগেশচন্দ্র বাগল—বাংলাব উচ্চশিক্ষা

—বাংলাব জনশিক্ষা

—বেথুন সোসাইটি

রাজনারায়ণ বসু—আত্মচরিত

—সে কাল আর এ কাল

শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার—জীবনী কোষ, ১ম - ৫ম খণ্ড

শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন-বঙ্গ সমাজ

সতীশ মুখোপাধ্যায়—ভারত প্রতিভা, ১ম খণ্ড

ডঃ সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড

সুধীরকুমার মিত্র—হুগলী জেলার ইতিহাস, ১ম ও ২য় খণ্ড

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ—কালিদাসের কুমারসম্ভবম্

হরিহর শেঠ—প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়
হেমেন্দ্রকুমার রায়—যাঁদের দেখেছি, ১ম খণ্ড

Banerjee, Hiranmay—The House of Tagores
Bethune College Centenary Volume, 1949
Ghosh, K. C.—The Roll of Honour
High Court Centenary Souvenir, 1962
Hundred Years of the University of Calcutta, 1957
Mittra, Peary Chand—David Hare
Nurullah and Naik—The Students' History of Education in India
Presidency College Centenary Volume, 1955